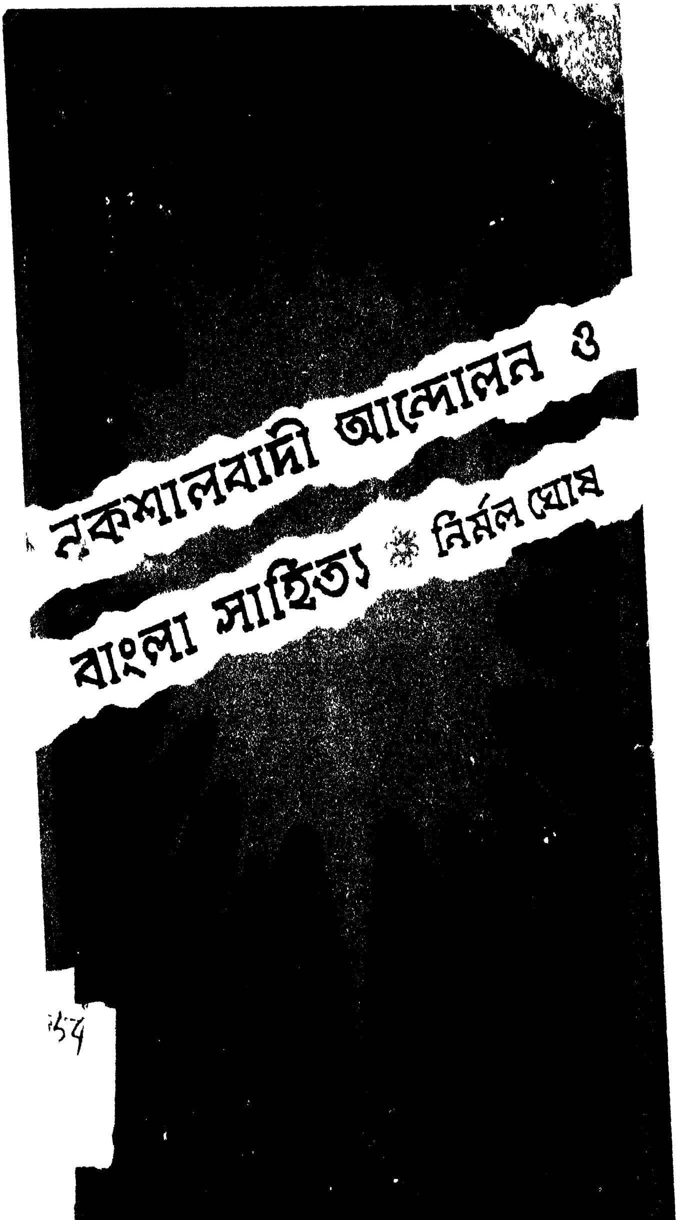

নকশালবাদী আন্দোলন ও
বাংলা সাহিত্য
নির্মল ঘোষ

নকশালবাদী আন্দোলন
ও
বাংলা সাহিত্য

নির্মল ঘোষ

করুণা প্রকাশনী। কলকাতা-৯

প্রকাশক
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
১৮এ, টেমার লেন
কলকাতা-৯

মুদ্রাকর
শ্রীযামিনীভূষণ উকিল
দি মুকুল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০১এ, বিধান সরণী
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী
খালেদ চৌধুরী

মূল্য ২৫·০০

উৎসর্গ

যাদের 'আত্মবলিদান
ক্রমাগত
আত্মরক্ষার বিরুদ্ধে লড়ছে',
তাঁদের সকলকে—

ভূমিকা

১৯৬৭-র মার্চ মাসে তরাই-এর নকশালবাড়ী এলাকায় যে কৃষক আন্দোলনের সূত্রপাত, তা নানা কারণে ভারতবর্ষের রাজনীতিক ও সামাজিক ইতিহাসে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই আন্দোলন যেমন একদিকে এদেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির রাজনীতিক কর্মকাণ্ড এবং সংসদীয় রাজনীতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিল, তেমনি শহরের ছাত্র যুবক বুদ্ধিজীবীদের এক বিশাল অংশকে যুক্ত করতে পেরেছিল কৃষক আন্দোলনের অংশভাগ হিসাবে। ফলে মধ্যশ্রেণীর উপরোক্ত অংশ এতাবৎকালের দোলায়মান শ্রেণীঅবস্থান থেকে, সাময়িককালের জন্যে হলেও চেষ্টিত হয়েছিলেন আপন শ্রেণীচ্যুতি ঘটাতে। কার্যক্ষেত্রে তা কতটা সার্থক বা ব্যর্থ হয়েছিল, সে বিচারের দায় ইতিহাসের। অবশ্য এ-তথ্য অনস্বীকার্য যে, তেভাগা আন্দোলন, কাকদ্বীপের লড়াই ইত্যাদি কৃষক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ইতিপূর্বেও কবিতা-গান-গল্প লেখা হয়েছে, কিন্তু সেগুলি শেষ পর্যন্ত ছিল মধ্যবিত্তের রচিত মধ্যবিত্ত চেতনার সাহিত্য। তা কোনদিন যথার্থ অর্থে কৃষক-চেতনার সাহিত্য হয়ে উঠতে পারেনি। অথবা বলা চলে, সে চেষ্টাও মধ্যবিত্তশ্রেণীর সাহিত্যিকেরা করেননি।

নকশালবাড়ী আন্দোলনে যে মধ্যবিত্ত ছাত্র যুবকেরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের সকলেই আকাঙ্ক্ষিত ছিলেন কৃষকের সঙ্গে একাত্ম হতে এবং তাদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে। যারা এই আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন বা যারা সংযুক্ত না থেকেও এই আন্দোলনকে রাজনীতিকভাবে সমর্থন করেছিলেন, তাদের সকলের কাছেই উক্ত প্রাথমিক চেতনাই ছিল এক মূল্যবান শর্ত। স্বাভাবিক-ভাবেই এই চেতনা থেকেই তাঁরা গণমুখী সাহিত্যের বিষয়ে ভাবিত হলেন; চেষ্টা করলেন সাহিত্যে, কৃষক-শ্রমিক জনগণের চিন্তা এবং সংগ্রামকে সাহিত্যে নিয়ে আসতে। এর ফলে সমাজ-বিষয়ক চিন্তায় যেমন একটা নতুন বৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রকাশ ঘটলো, তেমন সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এল পরিবর্তিত চেতনার নতুন প্রকাশ বাসনা। সার্থকতা বা ব্যর্থতা বিষয়ে এখানেও অবশ্য বিতর্কের অবকাশ থেকেই যাচ্ছে।

তবু এই আন্দোলন এবং নতুন চেতনাকে কেন্দ্র করে ১৯৬৭-র শেষদিক থেকে যে সাহিত্য-সৃষ্টির প্রয়াস চলেছে, তার গুরুত্ব কিছুমাত্র কম নয়। আর অন্যদিকে বুর্জোয়া শিবিরের লেখকেরা (যাদের মধ্যে কেউ কেউ অবশ্য নিজেদের বামপন্থী

বলে দাবীও করেন) এই আন্দোলনকে নস্যাৎ করতে যে পরিমাণ লেখা লিখেছেন তার পরিমাণও যথেষ্ট। আমার কাজ এই পুরো প্রয়াসকে নিয়েই। বলা ভালো যে, এই সমীক্ষা কোনক্রমেই একটি সম্পূর্ণ বা সার্থক সমীক্ষা হয়ে উঠতে পারেনি. হয়েছে একটি নমুনা সমীক্ষা মাত্র। কারণ নকশালবাদী আন্দোলনের বহু পত্রপত্রিকা অনেক চেষ্টা করেও আমি সংগ্রহ করতে পারিনি; কারণ বহু পত্রপত্রিকা আজ হারিয়ে গেছে। তবু অনেক পত্রিকার পক্ষ থেকে সংগ্রহের ব্যাপারে আমাকে যে-পরিমাণ সহায়তা করা হয়েছে তার জন্যে সেইসব পত্রপত্রিকার বন্ধুদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। অন্যপক্ষের লেখকদের যা সংগ্রহ করতে পারিনি, তার জন্যে আমার কোন ক্ষোভ নেই। কেননা তাঁদের মধ্যে থেকে যে কয়েকটি বই নিয়ে নমুনা-সমীক্ষা করা হয়েছে, তার ছকেই অন্য সব লেখক বা বইগুলিকে বিচার করা চলে।

সর্বোপরি, আমি আমার নিজের চিন্তাভাবনার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন। জানি, কোন যোগ্যতর ব্যক্তি একাজ করলে, আমার চেয়ে অনেক ভালভাবে করতে পারতেন। প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখযোগ্য ইরাবান বসু রায়ের 'বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ ও বাংলা কথা সাহিত্য' নামীয় লেখাটি (অনীক, এপ্রিল-মে, ১৯৮০)। কিন্তু যেহেতু ইতিমধ্যেই বহু লেখা হারিয়ে গেছে এবং আরো দেরি করলে, আরো বেশি লেখা বিলুপ্তির সম্ভাবনা, তাই প্রায় তাড়াহুড়ো করে যা পাওয়া গেল, এ-গ্রন্থে নথিভুক্ত করা হোল।

ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, এ-গ্রন্থের জন্যে পত্রপত্রিকাদি সংগ্রহের ব্যাপারে আমি বহু জনের কাছেই ঋণী। শ্রীশঙ্কর সরকার প্রধানত পুরোন পত্র-পত্রিকাদি সংগ্রহ করে দিয়েছেন। তার কাছে আমার ঋণ অপরিসীম। শ্রী শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমার পাণ্ডুলিপি দেখে তাঁর মূল্যবান মন্তব্যাদি দ্বারা আমাকে সহায়তা করেছেন। তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা মনে রেখেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি না। একইভাবে উল্লেখযোগ্য বন্ধুবর দীপঙ্কর চক্রবর্তী ও পবিত্র সরকারের নাম। এতদ্‌ব্যতীত, আরো অনেক অনেক সহৃদয় লেখক সম্পাদক সংস্কৃতিকর্মী বন্ধুর কথা এ প্রসঙ্গে কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করি। বইটি ছাপার ব্যাপারে এত দেরি হোল যে তাঁদের সকলের নাম আজ আমি স্মৃতি থেকে উদ্ধারে অপারগ। বন্ধুরা আমার অসহায়তাকে ক্ষমা করবেন আশা করি।

নির্মল ঘোষ

প্রথম অধ্যায়

॥ এক ॥

পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসে নকশালবাদী রাজনীতি এবং আন্দোলন নানা কারণে সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কৃষককে বঞ্চনার অভিশাপ থেকে মুক্ত করার সংকল্প নিয়ে ১৯৬৭-র মার্চ মাসে নকশালবাড়ী এলাকায় যে আন্দোলনের সূত্রপাত তা অচিরাৎ ছড়িয়ে পড়ে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষে। গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে সশস্ত্র কৃষি-বিপ্লবের এই রাজনীতি কার্যত এতাবৎকালের লালিত সমাজ সম্পর্কিত সমস্তপ্রকার চিন্তাচর্চার মূল ধরে নাড়া দিল। ১৮৩৫ সালের ইংরেজি-ভিত্তিক পশ্চিমীমুখী শিক্ষাব্যবস্থা যার মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তালিম দিয়ে সাম্রাজ্যবাদ অনুগামী প্রভুভক্ত এক পেটি বুর্জোয়া শ্রেণী গড়ে তোলা, এবং যা কার্যত সামন্তবাদ প্রভাবিত ভারতীয় মানসের ওপর সাংস্কৃতিক দাসত্বের বোঝা চাপিয়ে দেয়, তা এদেশে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পরও একইভাবে অব্যাহত রইলো, জমিদারী প্রথা কাগজে কলমে বিলুপ্ত হলেও, কার্যকর মালিকানা হরেকরকম ফাঁকির মাধ্যমে সামন্তপ্রভুরাই ধরে রইলেন, আইনত জমি হাতে পাওয়া কৃষকেরাও ঋণ, বীজধান, জল ইত্যাদির প্রয়োজনে পুনর্বার ঋণগ্রস্ত এবং নিঃস্ব হতে থাকলো। গ্রামাঞ্চলে সরকারের সমস্ত ঋণদান ইত্যাদি ব্যবস্থাই প্রহসনে পরিণত হচ্ছে এবং পূর্বকালের মতোই সামন্তপ্রভুরা যাবতীয় সরকারী সহায়তার ফসল ঘরে তুলছে। সামগ্রিকভাবে দেশব্যাপী উক্তপ্রকার আর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক শোষণ ও নৈরাজ্যের দিকে শহর ও গ্রামের বৃহত্তর জনসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হোল নকশালবাদী রাজনীতি। ফলে উনিশ শতকের সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের ফলে শহর ও গ্রামের মধ্যে যে দূরত্ব ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয়েছিল, শিক্ষা-ব্যবস্থার ফলে যে ইংরেজদের শেখানো ইতিহাসের বুলি আওড়ানো চলছিল, এই প্রথম উক্ত রাজনীতি তাকে পুনর্বিবেচনার কঠিন মাটিতে এনে দাঁড় করালো। সচেতন সাহিত্যিক কবি শিল্পীরা এর ফলে যেমন নিজেদের শিল্পসৃষ্টিতে সমাজচৈতন্যের প্রতি যথাযথ আস্থাবান হলেন তেমনিই সমাজতাত্ত্বিক এবং বুদ্ধিজীবীরা আগ্রহী হলেন সমাজ ও ইতিহাসের সচেতন দ্বান্দ্বিক ব্যাখ্যায়।

মাও-ৎসে-তুঙের চিন্তাধারার প্রয়োগে কৃষি-বিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত করার প্রয়াস এদেশে প্রথম লক্ষিত হয় ১৯৪৬-৫১ সালে রাজেশ্বর রাও-এর নেতৃত্বে তেলেঙ্গানার আন্দোলনে। অবশ্য কমিনফর্মের প্রধান সোভিয়েত কম্যুনিস্ট পার্টির নির্দেশে সে আন্দোলন স্থগিত রাখা হয়। এবং অনস্বীকার্য যে নকশালবাড়ীতেই প্রথম মাও ৎসে-তুঙের চিন্তাধারার ব্যাপক ও সুসংহত প্রয়োগের প্রয়াস লক্ষিত হয়। এর একদিকে ছিল সংসদীয় রাজনীতির প্রতি গভীর অনাস্থা এবং এতাবৎকালের কম্যুনিস্ট আন্দোলনের প্রতি কঠোর সমালোচনামূলক মনোভাব আর অন্যদিকে সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কৃষি-বিপ্লব সার্থক করার প্রয়াস। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)-র কর্মসূচীতে বলা হয়েছিল, 'ভারতীয় বিপ্লবের মূল কাজ হচ্ছে সামন্ততন্ত্র আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদ ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের উৎখাত করা। এটাই আমাদের বিপ্লবের স্তর নির্ধারিত করেছে। আমাদের দেশ এখন গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে রয়েছে, যে বিপ্লবের অন্তর্বস্তু হল কৃষি বিপ্লব।' (১) নকশালবাড়ী অভ্যুত্থানের পর তার মূল্যায়নে চীনের পীপ্‌ল্‌স্ ডেইলী পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লেখা হয়, 'ভারতীয় কৃষকদের বিদ্রোহ ও ভারতীয় জনগণের বিপ্লব হচ্ছে অনিবার্য কারণ প্রতিক্রিয়াশীল কংগ্রেস শাসক এছাড়া আর বিকল্প রাখেনি। কংগ্রেস শাসনাধীন ভারত, নামে স্বাধীন হলেও বাস্তবত এখনও একটা আধাসামন্ততান্ত্রিক ও আধাঔপনিবেশক দেশ। কংগ্রেস সরকার ভারতীয় সামন্ত রাজকুমার, বৃহৎ জমিদার এবং আমলাতান্ত্রিক মুৎসুদ্দি পুঁজিপ্রুতিদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করছে। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সে ভারতীয় জনগণের ওপর নির্দয় নির্যাতন ও নির্মম শোষণ চালাচ্ছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার পুরোন প্রভু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ওপর নির্ভরশীল থেকেই সে তার নতুন প্রভু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং তার এক নম্বর সহযোগী সোভিয়েত সংশোধনবাদী চক্রের কোলে নিজেকে সঁপে দিয়েছে। এভাবে সে ভারতের জাতীয় স্বার্থকে ব্যাপকভাবে বিকিয়ে দিয়েছে। কাজেই ভারতীয় জনগণের বিশেষ করে শ্রমিক ও কৃষক জনতার পিঠের ওপর বিরাট পাহাড়ের মতো চেপে আছে সাম্রাজ্যবাদ, সোভিয়েত সংশোধনবাদ, সামন্ততন্ত্র ও আমলাতান্ত্রিক মুৎসুদ্দি ও পুঁজিবাদ। গত কয়েক বছরে কংগ্রেস সরকার অনেক বেশি তীব্রভাবে ভারতীয় জনগণের ওপর তার নির্যাতন ও শোষণ বাড়িয়েছে এবং জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতার নীতি অনুসরণ করছে। দেশে নেমেছে দুর্ভিক্ষ। ক্ষুধা এবং অনাহারে মৃত মানুষের লাশ ছড়িয়ে পড়ে থাকে প্রান্তরে প্রান্তরে। ভারতীয় জনতার বিশেষ করে ভারতীয় কৃষকদের জীবনধারণই অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। দার্জিলিং অঞ্চলের বিপ্লবী কৃষকেরা তাই ফেটে পড়েছে

বিদ্রোহে, হিংসাত্মক বিপ্লবে। এটা সারা ভারত জুড়ে কোটি কোটি জনতার হিংসাত্মক বিপ্লবেরই সূচনা।' (২)

নকশালবাড়ী অঞ্চলের ধনী জোতদার ও চা-বাগান-মালিকদের উদ্বৃত্ত জমি দখলের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী)-র বামপন্থী অংশ। ইতিমধ্যে ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের একাধিপত্যে ভাঙন আসে। সতেরোটি রাজ্যের আটটিতে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারায়। ১৯৬২-তে কংগ্রেস পেয়েছিল শতকরা ৪৪'৭২ ভোট, তা ১৯৬৭-তে গিয়ে দাঁড়ায় শতকরা ৩৭'৮৭ তে; লোকসভায়ও তাদের সদস্যসংখ্যা ৩৫৮ থেকে কমে গিয়ে দাঁড়ায় ২৮২ সংখ্যায়। কেরালা ও পশ্চিম বাংলায় মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসেন। এমতাবস্থায় যখন নকশালবাড়ী আন্দোলন বিস্তৃতি পেতে থাকে এবং এই আন্দোলন দমনে বাংলা কংগ্রেস, প্রজা সোশালিস্ট পার্টি ও কংগ্রেস প্রচার, আবেদন ইত্যাদির দ্বারা সচেষ্ট হয়, তখন মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে দু'ধরনের সমস্যা প্রকট হয়ে ওঠে। এর প্রথমটি হোল, এই আন্দোলন দমন করতে না পারলে কেন্দ্রীয় সরকার 'আইন শৃঙ্খলা' রক্ষার নামে যুক্তফ্রন্ট-সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে, আর অন্যটি হোল, যদি সরকার দ্বারা ঐ আন্দোলন দমিত হয়, তবে বুর্জোয়া সংসদীয় ব্যবস্থার সঙ্গে সমঝোতা, এবং সরকারে টিকে থাকার জন্যে শ্রেণীসংগ্রাম পরিহার করার অভিযোগ দলের ভেতর থেকেই উত্থাপিত হতে পারে। এই সংকটের আপাত সমাধান তারা নকশালবাড়ীতে পুলিশী হামলার নিন্দা করেন এবং পার্টির বামপন্থী অংশের সঙ্গে আদর্শগত সংগ্রামের সিদ্ধান্ত নেন।

এদিকে সংসদীয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হবার ফলে সি. পি. এমের বামপন্থী অংশ যথেষ্ট বিক্ষুব্ধ ছিলেন। অবশ্য অনেক কর্মীই ধরে নিয়েছিলেন যে পার্টির এই সরকারে অংশগ্রহণ কার্যত সংসদীয় গণতন্ত্রের কংগ্রেস ও অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলির সত্যিকার চরিত্র উদ্‌ঘাটনের জন্যেই এবং যে-কোন দিনই আবার তারা সরকার থেকে বেরিয়ে এসে প্রমাণ করে দেবে যে জনসাধারণের প্রকৃত মুক্তি সংসদীয় গণতন্ত্রের মধ্যে দিয়ে কখনোই আসতে পারে না। কিন্তু জঙ্গী পার্টি কর্মীদের সে-আকাঙ্ক্ষা পূরণের কোন লক্ষণই দেখা গেল না। তদুপরি পার্টির নেতারা ও মন্ত্রীরা, জোতদাররা বেআইনীভাবে দখল করা জমি যাতে ভোগ করতে না পারে এবং গরীব ও ভূমিহীন কৃষকদের ওপর শোষণের চিরন্তন ব্যবস্থা বজায় রাখতে না পারে, তার জন্যে ব্যবস্থা গ্রহণের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা কার্যত পূরণেও সমর্থ হলেন না। ফলে পার্টির জঙ্গী কর্মীরা অধিকতর বিক্ষুব্ধ হতে থাকলো। পরবর্তীকালে বিধানসভায় এক বক্তৃতায় হরেকৃষ্ণ কোঙার

স্পষ্টতই বলেছিলেন, '…বর্তমান সামাজিক, রাজনৈতিক পটভূমিকায় এবং বর্তমান সংবিধানের গণ্ডির মধ্যে সত্যিকারের ভূমি সংস্কার—যে ভূমি-সংস্কার সত্যিকারের ভূমির সমস্যার সমাধান করতে পারে, যা গরীব কৃষকদের সত্যই জমি দিতে পারে, যা জমিদার ও মহাজনদের লুণ্ঠনকে সম্পূর্ণরূপে অপসারণ করতে পারে সে—এই কাঠামোর মধ্যে সম্ভব নয়।' (৩) পক্ষান্তরে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি তৎকালে নকশালবাড়ীর 'ক্ষমতা দখলের' স্লোগানকে অগ্রাহ্য ক'রে সমস্ত আন্দোলনকে চিহ্নিত করে উপজাতিদের গণতান্ত্রিক আর্থনীতিক অধিকার রক্ষার লড়াই হিসাবে অভিহিত করে। এবং বলা হয় যে নকশালবাড়ী আন্দোলনকে আইন-শৃঙ্খলার সমস্যা হিসেবে দেখা ভুল, আর সেইসঙ্গে ভূমি-ব্যবস্থার সামাজিক আর্থনীতিক দিকগুলো খুঁটিয়ে দেখবার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। তদুপরি পার্টির বিচারে যা 'হঠকারী লাইন' তা পরিত্যাগ করার জন্যে নকশালবাড়ী শাখার সঙ্গে আলোচনা চালানো হয়। (৪) তৎকালীন ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী হরেকৃষ্ণ কোঙার নিজেই নকশালবাড়ী ও শিলিগুড়ি যান চারু মজুমদার ও কানু সান্যালের সঙ্গে আলোচনা করতে, কিন্তু কার্যত তাঁর সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। 'কারণ মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির বামপন্থী অংশ, যারা নকশালবাড়ীর পথকেই একমাত্র পথ বলে বিশ্বাসে অটল ছিলেন, তাঁরা কিছুতেই উক্ত আলাপ-আলোচনায় ঐক্যমত হলেন না। পক্ষান্তরে তাঁরা দলের মধ্যেই 'সংশোধনবাদে'র বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ডাক দিলেন। চারু মজুমদার স্পষ্টতই লিখলেন,

"ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির (মার্ক্সবাদী) কেন্দ্রীয় কমিটি একটি রাজনীতিক পন্থা গ্রহণ করেছেন যা মূলত বিপ্লববিরোধী; চেয়ারম্যান মাও ৎসে-তুঙের চিন্তা এবং মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদবিরোধী; শ্রেণী সমঝোতা ও সংশোধনবাদী আদর্শ-বাদের ভিত্তিতে গঠিত। মাদুরাই সম্মেলনে কেন্দ্রীয় কমিটি শান্তিপূর্ণ পথে সমাজবাদে উত্তরণের অনুকূলে এক ঘোষণা করেন এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে দেশের উন্নতির পথ বেছে নেন…কৃষক সংগ্রামগুলি প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় কমিটি কোন ভণিতা না করে মেনশেভিক রাজনীতিক পন্থা গ্রহণ করেন ও বর্তমানে সংগ্রামের বিরোধিতায় শেষ করেন কথা…এখন, যখন মাদুরাই প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে কেন্দ্রীয় কমিটি কোন বিপ্লবী কমিটি নয়। অতএব, প্রতি মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদীর বিপ্লবী কর্তব্য হল এই কেন্দ্রীয় কমিটির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা।" (৫)

১৯৬৭-র শেষদিকে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিধাবিভক্ত চেহারাটা স্পষ্টত লক্ষিত হয়। পার্টির সদস্য-সংখ্যাও কমতে থাকে। সি. পি. আই (এম)-এর

নিজস্ব পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে ১৯৬৪ সালে পার্টির সদস্য ও প্রার্থী সদস্য সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১,০৬,৩১৩ ও ১২, ৩৭০ যেটা ১৯৬৮-র প্রারম্ভে গিয়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৬৫,৪০২ এবং ১১,·২৩ জনে (৬) এবং অনস্বীকার্য যে এই ঘটনা মুখ্যত আন্তপার্টি সংঘর্ষেরই ফল। পার্টির মাদুরাই সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির মতের সঙ্গে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে যে মতপার্থক্য ছিল এবং যাকে তৎকালীন বামপন্থী অংশ 'সংশোধনবাদ'রূপে চিহ্নিত করেছিলেন, ১৯৬৮-র এপ্রিলে অনুষ্ঠিত বর্ধমান প্লেনামে পার্টির মধ্যে সংঘর্ষ গুরুতর হওয়া সত্ত্বেও, নেতৃত্ব সে প্রস্তাবটিকেই কার্যত দাখিল করলেন। ফলে সোভিয়েট লাইন ও চীনা লাইন থেকে প্রায় সমদূরত্ব বজায় রেখে একটা মধ্যপন্থা অবলম্বনের প্রয়াস এই প্রস্তাবে স্পষ্টতর হোল। এবং সোভিয়েট দৃষ্টিভঙ্গীতে বিবেচনায় এই ক্ষমতা প্রস্তাব ছিল সংশোধনবাদবিরোধী আর চীনা দৃষ্টিতে এটা ছিল পরিপূর্ণ সংশোধনবাদী। (৭) এই প্রস্তাবে দাবী করা হয় যে সি. পি. আই (এম) ভারতীয় বিপ্লবের স্তর ও কৌশল সংক্রান্ত তত্ত্বের ক্ষেত্রে ডাঙ্গেবাদীদের শ্রেণী সমঝোতার সংশোধনবাদী পথ পরিত্যাগে সমর্থ হয়েছে। (৮)

এই প্রস্তাবের প্রারম্ভেই স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল যে আমরা এক নতুন যুগে উপনীত যে যুগ হোল ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের যুগ। "আমাদের যুগ অবশ্যই এক নতুন যুগ ; পুঁজিবাদ থেকে সমাজবাদে উত্তরণের এক যুগ ; এ এক যুগ, যখন বিশ্ব-উন্নয়নের পন্থা নির্ধারণ করার কাজে সিদ্ধান্ত নেবার দায়িত্ব বর্তাচ্ছে আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপরে ; এ জাতীয় মুক্তির ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগ, এ যুগ ঔপনিবেশিকতার দ্রুত অবক্ষয় ও ধ্বংসের মরণোন্মুখ পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের শক্তিগুলির মহান সংগ্রামের এবং জাতীয় মুক্তির বিদ্রোহের যুগ, বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদের পতন ও সমাজতন্ত্রবাদ এবং সাম্যবাদের চূড়ান্ত জয়ের যুগ (৯)

সমস্ত পৃথিবীব্যাপী ধনতন্ত্রবাদের এই ক্ষয়িষ্ণুতা এবং বিপ্লবী শক্তিসমূহের বর্তমানে তাকে পরাজিত করার মত ক্ষমতা অর্জন করার ফলে, উক্ত প্রস্তাব অনুযায়ী, তাকে সংগঠিত ও সুসংহত করার জন্যে প্রয়োজন,

"সমাজতন্ত্রবাদী কটনীতির এক বিপ্লবী সংঘট, যার উদ্দেশ্য হবে সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদী দলগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা—আর সে কাজে ব্যবহৃত হবে সমাজতন্ত্রী শিবিরের সশস্ত্র শক্তি। যে সব প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি শান্তিকামী দেশগুলির উপর আক্রমণনীতি গ্রহণ করে, অথবা জাতীয় মুক্তি আন্দোলনগুলিকে রক্তে নিমজ্জিত করতে চেষ্টা করে, তাদের বিরোধী এই শক্তি।" (১০) এ-বক্তব্য

স্পষ্টতই প্রমাণ করে যে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি সোভিয়েট লাইনের ভাবনায় ভাবিত ছিল না। কারণ সোভিয়েট লাইনের মতে ধনতন্ত্রবাদ কোন দেশের পক্ষেই আর ভয়ঙ্কর শত্রু বা বিপদ হিসেবে গ্রাহ্য নয়। একালের মূল সামাজিক দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে উক্ত প্রস্তাবে বলা হয় যে সমকালের দ্বন্দ্ব হোল, সমাজতন্ত্রের শিবিরগুলির সঙ্গে পুঁজিবাদী শিবিরগুলির, পুঁজিবাদী দেশে প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যে, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সঙ্গে শোষিত দেশগুলির, এবং সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে ও একচেটিয়া পুঁজিপতিদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব। এইসঙ্গে উক্ত দলিলে 'আধুনিক সংশোধনবাদী'দের নিন্দা করা হয়েছে, তাদের "অ-মার্ক্সীয় ও সুবিধাবাদী প্রবণতার জন্য। যে কারণে তারা সমাজতন্ত্রী শিবির ও সাম্রাজ্য-বাদী শিবিরের বিরোধকেই, বিশ্ব উন্নয়নের পন্থা নিরূপণকারী একমাত্র বিরোধ হিসাবে প্রায় দেখে।" (১১) তদুপরি সংশোধনবাদীরা সমাজতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে নিয়ত যে আর্থনীতিক, রাজনীতিক, মতাদর্শগত এবং সামরিক লড়াই চলছে, তা গোপন রেখে উভয় প্রকার দেশের মধ্যে শান্তিপূর্ণ আর্থনীতিক প্রতিযোগিতা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের তত্ত্বই প্রচার করে। এই তত্ত্বকে খণ্ডন করে বাস্তবে বলা হয় যে, এর দ্বারা সংশোধনবাদীরা সাম্রাজ্যবাদের অবিরাম আক্রমণকে গোপন রেখে তাকে তুষ্ট করে আর সেইসঙ্গে বিশ্বের প্রলেতারিয়েতদের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আর্থনীতিক, রাজনীতিক, মতাদর্শগত ও সামরিক লড়াইয়ের ক্ষেত্রে নিরস্ত্র করে। (১২)

এবং এই প্রস্তাবেই শান্তিপূর্ণ পথে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পথকে সমর্থন করা হয় এবং বলা হয়, "এ সত্য অনস্বীকার্য যে শান্তিপূর্ণ উপায়েই বিপ্লব সাধন করে ক্ষমতা অর্জন করতে বেশি পছন্দ করবে প্রলেতারিয়েত" এবং "আমাদের পার্টি ...... সংগ্রাম করছে শান্তিপূর্ণ উপায়ের মাধ্যমে জনগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে এবং সমাজতন্ত্রী রূপান্তর সাধন করতে।" (১৩) কিন্তু উক্ত মতাদর্শগত প্রস্তাব অনুযায়ী আধুনিক সংশোধনবাদীদের বক্তব্যে, "প্রতিদেশে ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে, প্রলেতারিয়েতের এবং সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শের পক্ষীয় শক্তিগুলির পারস্পরিক সম্পর্কে পরিবর্তনের কারণে— , বৃহৎ জনসংখ্যার মনে সমাজতন্ত্রবাদ বিষয়ে ধারণা ক্রমে দৃঢ় হয়ে ওঠার কারণে— ; মার্ক্স, এঙ্গেলস, লেনিন ও স্তালিন, সহিংস বিপ্লবের যে বিশ্বজনীন নীতির উপর জোর দিয়েছেন—যা বুর্জোয়া শ্রেণী প্রলেতারিয়েতের উপর চাপিয়ে দিয়েছে, তা এখন সেকেলে হয়ে পড়েছে। অতএব তা বর্জনীয়। তাঁরা যুক্তি দেখান, এর পরিবর্তে স্থান নেওয়া উচিত শান্তিপূর্ণ উত্তরণ ও সংসদীয় পন্থার নীতির। তাঁরা এ তত্ত্বও প্রচার করেন, তথাকথিত এক জাতীয় গণতন্ত্রী

রাষ্ট্র তৈরি করে সমাজতন্ত্রবাদী রূপান্তর কার্যকরী করা সম্ভব। তাতে বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েত, উভয় শ্রেণীই যুক্ত নেতৃত্ব দেবে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে এবং জাতীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে। এইভাবে তাঁরা, প্রলেতারিয় বিপ্লবের কিছু প্রাথমিক ও মৌল প্রসঙ্গকেই সংশোধন করতে চান। যেমন, রাষ্ট্র ও বিপ্লব বিষয়ে মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী ধারণা। যেমন, বর্তমান যুগে বিপ্লবে প্রলেতারিয় নেতৃত্ব বিষয়ে ধারণা।" (১৪)

এই প্রস্তাবেই আধুনিক সংশোধনবাদী'দের তথাকথিত অ-পুঁজিবাদী পথ ও জাতীয় গণতন্ত্রের নীতিকে 'দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ' হিসাবে নিন্দা করা হয়; কারণ এ হোল সে তত্ত্ব যা "প্রলেতারিয় নেতৃত্বের ধারণাকে নাকচ করে, সমাজতন্ত্রবাদী উত্তরণ কার্যকরী করার জন্য বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে যুক্ত নেতৃত্বের পক্ষে ওকালতি করে। পশ্চাৎপদ দেশগুলি সমাজতন্ত্রবাদে পৌছতে হলে পুঁজিবাদী সম্পর্কের স্তরটি বাদ দিয়ে যাবার যে নতুন সম্ভাবনা লেনিনীয় ধারণায় আছে, এই তত্ত্ব তাকে বিকৃত করে।" (১৫) তদুপরি সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতিতম কংগ্রেসে ক্রুশ্চেভ উপস্থাপিত শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, শান্তিপূর্ণ আর্থনীতিক প্রতিযোগিতা ও শান্তিপূর্ণ উত্তরণের তত্ত্বকে আধুনিক সংশোধনবাদীরা শ্রেণী-বিরোধ দূরীকরণ ও শ্রেণী সমঝোতার হাতিয়ারে পরিণত করেছে। এবং "যেহেতু এই সংশোধনবাদী ধারণাগুলি যথেষ্ট উন্নত, যেহেতু এগুলি কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করে এক কম্যুনিস্ট পার্টির নেতারা—যেহেতু সে পার্টি প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে পরিচালনা করছে —যেহেতু সে রাষ্ট্র আর্থনীতিক, রাজনীতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে এক ক্ষমতাশালী ভয়াবহ শক্তি হয়ে উঠেছে—, সেহেতু শান্তি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জন্য বিশ্ব-ব্যাপী সংগ্রামের উপর এর প্রতিক্রিয়া সত্যিই বিধ্বংসী।" (১৬) এবং "সোভিয়েট রাষ্ট্র এবং সি-পি-এস-ইউ-এর সংশোধনবাদী নেতৃত্ব অনুসৃত আপসপন্থী ও সমঝোতা-বাদী নীতি বিষয়ে আমাদের যে সমালোচনা, তাতে কোথাও এই সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণার অবকাশ নেই, যে (আমাদের মতে) সোভিয়েট ইউনিয়ন, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মিত্র, অথবা (সে) বিশ্বের নেতৃত্ব আমেরিকার সঙ্গে ভাগাভাগি করে নেবার জন্য, অথবা পৃথিবীতে প্রভাব বিস্তারের অঞ্চল ভাগাভাগির জন্য কাজ চালাচ্ছে। কেননা এহেন ধারণার মানে দাঁড়ায়, সোভিয়েট ইউনিয়নকে সমাজতন্ত্রী শিবিরের বহির্ভূত বলে চিহ্নিত করা।" (১৭) আর সোভিয়েট নেতৃবৃন্দের এই দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী লাইন গ্রহণের ফলে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীদের আগ্রাসী নীতি ও সম্প্রসারণ দিনে দিনে বিস্তার লাভ করছে। সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা বিশ্বশক্তি, বিভিন্ন দেশের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ব্যাহত হচ্ছে আর সেই

সঙ্গে সমস্ত পৃথিবীতে শান্তি, গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের জন্যে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী সংগ্রাম সংহত হতে পারছে না।

কর্মের মধ্যে দিয়ে ঐক্য স্থাপনার স্লোগান প্রসঙ্গে এই প্রস্তাবে সোভিয়েট নেতৃত্বের সমালোচনা করে বলা হয় যে ভিয়েতনামে তারা সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার বিরুদ্ধে এই নীতি কার্যকর করতে দিচ্ছে না•এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় তাদের প্রতিশ্রুতি পালনেও সক্রিয় নয়। নীতিগত ও রাজনৈতিক বিষয়ে মত-পার্থক্য থাকা সত্বেও সোভিয়েট নেতৃবৃন্দ চীনা কমিউনিস্ট পার্টি ও নেতৃবৃন্দের কাছে, ভিয়েতনামে আমেরিকার আক্রমণকে রুখতে উক্ত ঐক্য প্রস্তাব (Unity in action) রাখেন। কিন্তু চীনা কমিউনিস্ট পার্টি, ভিয়েতনামে সোভিয়েত ভূমিকাকে কার্যত আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের সহায়ক বিবেচনা করেই, সে-প্রস্তাব বাতিল করে। চীনের এই পদক্ষেপ স্বাভাবিক কারণেই বিশ্বের কমিউনিস্টদের কাছে বিতর্কিত বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির উক্ত প্রস্তাবে বলা হয় যে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির এ-প্রসঙ্গে সোভিয়েটের উদ্দেশ্যে বা আন্তরিকতা পরীক্ষা করে দেখা উচিত, কারণ, "কর্মে ঐক্যের মানে দাঁড়ায় সংশোধনবাদী এবং মার্ক্সবাদী লেনিনবাদীর মধ্যে ঐক্য, এই কারণ দেখিয়ে ঐক্য-বদ্ধ কর্মের স্লোগানটিকে নীতিবিবর্জিত আখ্যা দিয়ে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করা—বাস্তব বিচারে, সংশোধনবাদীদের বিচ্ছিন্ন করার পরিবর্তে রাষ্ট্র ও নাগরিকদের সংশোধনবাদীদের হাতে সমর্পণ করার সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়।" (১৮)

ভ্রাতৃপ্রতিম কমিউনিস্ট পার্টিগুলির সঙ্গে সঠিক সম্পর্ক প্রসঙ্গে উক্ত প্রস্তাবে বলা হয় যে মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী নীতি অনুসারে প্রত্যেক দেশের কমিউনিস্ট পার্টিই স্বাধীন ও পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমান; এক্ষেত্রে বৃহৎ ও ক্ষুদ্রের মধ্যে আনুগত্য বা শাসনের প্রশ্ন অবাস্তর। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, রাষ্ট্রক্ষমতা করায়ত্তকারী পার্টিগুলি অন্য দেশের পার্টিগুলির ওপর আধিপত্য বিস্তার করছে এবং কর্তৃত্ব কায়েম করতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু, আমাদের পার্টি, "বিশ্বের সৌভ্রাত্র্যমূলক সকল অন্য পার্টিগুলির ভুলভ্রান্তি ও সার্থকতা থেকে শিক্ষা নেবার মত যথেষ্ট বিনয় ধরে বটে, আবার সেইসঙ্গেই তার উচিত বাইরের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করা, নিজের স্বাধীনতা এবং স্বাধীন রাজনৈতিক পন্থাকে প্রাণপণে প্রতিরক্ষা করা।" (১৯)

বর্ধমান প্লেনামে এই গৃহীত প্রস্তাবের খসড়া নিয়ে যে আলোচনা বা বিতর্ক চলে সেখানে পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থীরা কার্যত অংশ নিতে পারেন নি। কারণ দলবিরোধী কার্যকলাপের কারণে তাঁদের অনেককেই পার্টি থেকে বহিষ্কার করা

হয়েছিল। এইপ্রকারে বহিষ্কৃত প্রায় চারশ' সদস্যের মধ্যে ছিলেন চারু মজুমদার, কানু সান্যাল, সৌরেন বসু, সুশীতল রায়চৌধুরী, পরিমল দাশগুপ্ত, অসিত সেন, সরোজ দত্ত প্রমুখেরা। পার্টির দার্জিলিং জেলা কমিটি ভেঙে দিয়ে নতুন অ্যাড হক্ কমিটি গঠন করা হয়। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি বর্ধমান প্লেনামে যে মনোনীত প্রতিনিধিদের পাঠায়, তাঁদের সকলেই ছিলেন উক্ত প্রস্তাবের সপক্ষে। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও পার্টি থেকে বহিষ্কৃত বামপন্থীদের বক্তব্য প্রকাশিত হয়। তাঁরা ইতিমধ্যেই 'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি' গঠন করেছিলেন। তাঁদের ইংরেজি মাসিক 'লিবারেশন'-এর 'নোটস্' কলামে লেখা হয় :

"যা আশা করা গিয়েছিল, ইদানীং বর্ধমানে অনুষ্ঠিত সি.পি.আই. (মার্ক্সবাদী)-র কেন্দ্রীয় কমিটির তথাকথিত প্লেনাম এমন এক আদর্শগত রাজনীতিক পন্থাকে চূড়ান্ত সমর্থন জানাল, যা মূলত সংশোধনবাদী। কিছুকাল আগেই চীনের কমরেডরা বলেছিলেন, বিশ্ব কম্যুনিস্ট আন্দোলনের সামনে যে সমস্যাগুলি আছে, সেগুলি বিষয়ে যারা আজ নিরপেক্ষ, তারা শীঘ্রই সুবিধাবাদের পথ গ্রহণ করবে এবং পরিণামে যোগ দেবে প্রতিবিপ্লবী শিবিরে। যতদিন চলছিল মহান আদর্শগত সংগ্রাম, মার্ক্সবাদ লেনিনবাদ ও সংশোধনবাদের মাঝামাঝি থেকে সি পি আই এম. এর নেতারা নিরপেক্ষ থাকার ভান করছিলেন। কিন্তু তাঁদের কাজে ও কথায় প্রমাণ থাকছিল, যে তাঁরা এক সংশোধনবাদী, প্রতিবিপ্লবী পন্থা নিয়েছেন প্রথমে মাদুরাই ও পরে বর্ধমানে, আদর্শগত প্রশ্নগুলি প্রসঙ্গে বক্তব্য যে খোলে বলতে হয়েছে, সে ভালই। কিন্তু মার্ক্সীয় লেনিনীয় নীতির প্রতি তাদের কপট বিশ্বস্ততা এবং সি-পি-এস-ইউ-এর নেতৃত্বের চক্রান্তের সংশোধনবাদী তত্ত্ব ও নীতির প্রতি তাঁদের অকপট সমর্থন, এ দুয়ের সংযোগ ঘটাতে এই সব কৌশলী ও ধূর্ত লোক প্রাণপণ চেষ্টা করেন। মার্ক্সীয় বাক্‌চ্ছটাজালে তাঁরা তাঁদের বেইমানিকে ঢেকে রাখার চেষ্টা করেছেন বটে, কিন্তু সে মুখোশ তাঁদের স্বরূপ লুকাতে সামান্যই সক্ষম হয়েছে। গত বছর নকশালবাড়ী কৃষক বিদ্রোহ এই নয়া-সংশোধনবাদী চক্রান্তের প্রতিবিপ্লবী চরিত্রটি আগেকার সব কিছু থেকে অনেক কার্যকরীভাবে উদ্‌ঘাটন করে দিয়েছে। এ আর গোপন নেই যে এইসব লোক, কৃষকদের সংগ্রামকে রক্তে নিমজ্জিত করার জন্য প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীগুলির হাতিয়ার হিসাবে, তাঁদের রাষ্ট্র প্রশাসন যন্ত্রের অংশ হিসাবে কাজ করছেন। প্রতিক্রিয়ার এইসব দালাল, যাঁরা মার্ক্সবাদী বলে মুখোশ পরে বেড়ান, বর্ধমান তাঁদের মুখোশ খুলে ফেলার কাজ সম্পূর্ণ করেছে ··· সোভিয়েট সংশোধনবাদীদের মতই এঁরা প্রচার করে থাকেন, আজকের প্রধান বিরোধ হল সমাজতান্ত্রিক শিবির ও সাম্রাজ্যবাদী

শিবিরের বিরোধ। অন্যত্র সর্বত্র মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী ও চীনা কমরেডরা যা ঘোষণা করেছেন, এঁরা তা বর্জন করেছেন। তাঁরা বলেছেন, "এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বিদ্রোহী জাতিগুলি, এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদীরা, এদের অন্তর্বর্তী বিরোধ হল সমসাময়িক বিশ্বের মুখ্য বিরোধ।" (লিন পিআও : লং লিভ দি ভিক্ট্রি অফ পীপ্‌লস্‌ ওয়ার)। ... সংশোধনবাদীদের মত এই সুবিধাবাদীদের দলও শান্তিপূর্ণ উত্তরণের শ্লোগান তুলেছে। সহিংস বিপ্লবের বিশ্বজনীন নীতিকে অকেজো বলে বর্জন করার জন্য সংশোধনবাদীদের যখন এঁরা দোষী করেন, তখন মার্ক্সবাদকে এঁরা কপট মৌখিক সমর্থন জানান। ... এই "মার্ক্সবাদী" নেতারা ভারতীয় বিপ্লবের এক নতুন পথ আবিষ্কার করতে উঠে পড়ে লেগেছেন। যে পথ রুশীদের মত নয়, চীনাদের মতও নয়। চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে এই অন্বেষণ চলেছে, এখনো সে মেহনতের ফলাফল ঘোষণা করা বাকি আছে তাঁদের। ... তাঁদের "ভারতীয়" পন্থা, যে পন্থা ধরে এই সুবিধাবাদীরা চলছেন, তা আসলে শ্রেণী সমঝোতার—শ্রমজীবী মানুষের প্রয়োজনীয় স্বার্থগুলির প্রতি বেইমানির পথ। -' এই সকল উদীয়মান সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতেই ভারতীয় বিপ্লবের পথ নির্ণয়ে নকশালবাড়ী কৃষক সংগ্রাম এক প্রতীকী গুরুত্ব অর্জন করে।" (২০)

সি. পি. (এম)-এর উক্ত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে অন্য উল্লেখযোগ্য প্রস্তাবটি উপস্থাপিত হয় অন্ধ্রের রাজ্য কমিটির দ্বারা। জানুয়ারী, ১৯৬৮-তে অনুষ্ঠিত অন্ধ্র প্রদেশ রাজ্য প্লেনাম কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাবের খসড়াটি ১৫৮-৫২ ভোটে নাকচ করা হয় এবং তাঁরা দাবী করেন যে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির জুন ১৪, ১৯৬৩-র বক্তব্যের লাইনে পুরো প্রস্তাবটির পুনর্লিখনের। এবং এই মর্মে টি. নাগি রেড্ডি, সি. পুলা রেড্ডি এবং কোলা ভেনকাইয়া দুটি বিকল্প খসড়া প্রস্তাবও উপস্থিত করেন। অন্ধ্র গোষ্ঠীর এই বিকল্প প্রস্তাবে কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাবিত রাজনৈতিক এবং নীতিগত দু'একটি বিচার্য বিষয়ে মতভেদ ছিল না, ভারতের বিপ্লবী আন্দোলন ও আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন বিষয়ক সমস্ত মৌলিক প্রশ্নেই তাদের মতভেদ ছিল বর্তমান। (২১) চীনা কমিউনিস্ট পার্টির আদর্শগত লাইনের দৃষ্টিভঙ্গীতে রচিত অন্ধ্র-প্রস্তাবে ভারতের বিপ্লবের ক্ষেত্রে সমস্ত দিকগুলি খুঁটিয়ে দেখা হয় এবং তাঁদের মতে কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাবটি 'সোভিয়েট সংশোধনবাদী নেতৃবৃন্দের সঠিক চরিত্র উদ্‌ঘাটনে ব্যর্থ হয়েছে' এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনকে দুর্বল ও খণ্ডিত করেছে আর 'পরিণামে পরিণত হয়েছে এক প্রতিবিপ্লবী শক্তিতে।' (২২) অন্ধ্র থিসিসে আরো বলা হয় যে দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে সোভিয়েট সংশোধনবাদ এখন এতই শক্র-

ভাবাপন্ন যে তার সঙ্গে কোনপ্রকারেই চীনা পার্টির ঐক্য সম্ভব নয় এবং একই কারণে 'সংশোধনবাদী' সি. পি. আই-এর সঙ্গে সি. পি. আই (এম)-এর যুক্তফ্রন্ট গড়ার প্রশ্ন অবান্তর। টি. নাগি রেড্ডি, পুলা রেড্ডি এবং কোলা ভেনকাইয়া চীনা কমিউনিস্ট পার্টির অভিজ্ঞতা ও ব্যাখ্যায় নির্দেশিত পথে ভারতের অবস্থা ও জন-যুদ্ধের পথ গ্রহণের তত্ত্ব হাজির করেন। এই থিসিসেই বলা হয়, "আমরা মনে করি যে চীনা বিপ্লবের সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা, এবং পশ্চাৎপদ দেশগুলির মুক্তিসংগ্রামের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা দেখিয়ে দিয়েছে জনযুদ্ধ, দীর্ঘায়িত সশস্ত্র কৃষিবিপ্লব হল সকল পশ্চাৎপদ দেশের সামনে সামাজিক মুক্তির একমাত্র পথ। আমাদের দেশের বিশেষ বাস্তব অবস্থা বিবেচনায় রেখে আমরা মনে করি, জনযুদ্ধই বিপ্লবের একমাত্র পথ" (২৩) এবং অন্ধ্র প্রদেশের প্রতিনিধিদের বিপুল চাপে অবশেষে ন'টি সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং খসড়া প্রস্তাবে, 'মূল দ্বন্দ্বসমূহ', 'যুগোস্লাভ সংশোধনবাদ' এবং 'কর্মের মধ্যে ঐক্য' প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে সংশোধন কার্যকর হয়. অবশ্য অন্ধ্র পার্টির মূল বক্তব্য ও বিরোধিতার কারণসমূহ অপরি-বর্তিতই থেকে যায়। তাঁদের অভিযোগ ছিল, কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাবে এই কারণসমূহে বহু দায়িত্ব অস্বীকার করা হয়েছে। যেমন,—"সি-পি-এস-ইউ-এর নেতৃবর্গের সংশোধনবাদী তত্ত্ব ও নীতি ও সেগুলির বিধ্বংসী পরিণামকে নির্মম নির্দয়তায় উদ্‌ঘাটন করা হয়নি; 'সোভিয়েট সংশোধনবাদের পক্ষ সমর্থনের কাজ করা হয়েছে; সোভিয়েট সংশোধনবাদের শ্রেণী মূলগুলি খুঁজে বের করতে এবং মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ ও আধুনিক সংশোধনবাদের পরস্পরবিদ্বেষী শ্রেণী বিরোধ দেখতে' অস্বীকার করা হয়েছে; 'সোভিয়েট সংশোধনবাদকে শ্রেণীশত্রু' হিসাবে দেখতে অস্বীকার করা হয়েছে এবং সোভিয়েট সংশোধনবাদের সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট গঠনের নীতির সপক্ষে জোর দেওয়া হয়েছে; 'সোভিয়েট সংশোধনবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে পীপ্‌ল্‌স রিপাবলিক অফ চায়না ও কম্যুনিস্ট পার্টি অফ চায়নার নেতৃত্বের ভূমিকা' মেনে নিতে অস্বীকার করা হয়েছে; 'চীনের কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বকে বাম সংকীর্ণতাবাদী বলা হয়েছে এবং আমাদের দেশে চীন-বিরোধী প্রচার বিস্তারে এদের নিজের অবদান যুক্ত হয়েছে'; 'সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসের অন্তিম পর্যায়ে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ভূমিকা যে নিরূপকের' তা মানতে অস্বীকার করা হয়েছে এবং 'জনযুদ্ধ হল সেই বিশ্বজনীন সংগ্রাম পন্থা, যা ভারত-বর্ষসহ সকল পশ্চাৎপদ রাষ্ট্রে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামকালে প্রযোজ্য' তা স্বীকার করা হয়নি; 'সংগ্রাম বিষয়ে আমাদের নীতি ও কৌশল বিষয়ে চীনের কম্যুনিস্ট পার্টির সমালোচনাকে কমরেডসুলভ মনোভাবে' নিতে অস্বীকার করা

হয়েছে এবং 'সংগ্রামের জন্য বৈপ্লবিক পন্থার পরিবর্তে এক সংস্কারবাদী পন্থার সপক্ষে ওকালতি করা হয়েছে।' (২৪)

'অন্ধ্র কমরেডদের কাছে চিঠি'তে পলিটব্যুরো কেন্দ্রীয় প্লেনামের প্রস্তাবকে স্বীকার করে নিয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে তাকে কাজে লাগাতে ও পার্টির নিয়মানুবর্তিতা ও ঐক্য বজায় রাখার আবেদন জানান। (২৫) পরিবর্তে নাগি রেড্ডি ও তাঁর সহযোগীরা 'পার্টি সদস্যদের কাছে খোলা চিঠি' নামীয় পুস্তিকায় সি. পি. এম. নেতৃত্বের 'নয়া-সংশোধনবাদী লাইন', 'সুবিধাবাদী নীতি' 'ডাঙ্গে সংশোধনবাদীদের সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট' এবং 'পার্লামেন্টারী পথের প্রতি আসক্তি ও সংগ্রামী শক্তির বিরোধিতা' ইত্যাদি কার্যাবলীর নিন্দা করা হয়। (২৬) ফলে নাগি রেড্ডি, পুলা রেড্ডি, ভেঙ্কটেশ্বর রাও, কোলা ভেনকাইয়া প্রমুখ অন্ধ্র পার্টির নেতৃবৃন্দ পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হলেন। উক্ত প্রখ্যাত নেতৃবৃন্দের বহিষ্কার প্রসঙ্গে তদানীন্তন সাধারণ সম্পাদক পি. সুন্দরায়া মন্তব্য করেছিলেন যে এর ফলে অন্ধ্রে কমিউনিস্ট আন্দোলন যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং তার প্রভাব অন্যান্য প্রদেশগুলিতেও পড়বে। তাঁর এ মন্তব্য অচিরাৎ সত্য প্রমাণিত হয়। অন্ধ্র প্রদেশ পার্টির মোট ১৬,০০০ সদস্যের মধ্যে বহিষ্কৃত ও দলত্যাগীর সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ৮,০০০-এ। পশ্চিমবঙ্গের মোট ১৬,০০০ সদস্যের মধ্যে ৩,০০০ নকশালবাদী আন্দোলনে যোগ দেন এবং ৪,০০০ নিষ্ক্রিয় হয়ে যান। (২৭) পি. সুন্দরায়ার বিবৃতি অনুযায়ী (২৮) অন্যান্য রাজ্যে দলত্যাগীর সংখ্যা ছিল নিম্নপ্রকার :

রাজ্য	মোট সদস্যসংখ্যা (১৯৬৭)	দলত্যাগীর সংখ্যা
জম্মু ও কাশ্মীর	৩০০	৮০০
পাঞ্জাব	৬০০	১০০
দিল্লী	৭০০	১৫০
বিহার	২,৬০০	৩০০
উড়িষ্যা	৩০০	১৫০
মহারাষ্ট্র	২,৩০০	১৫০
তামিলনাড়	৮,৫০০	১,৩০০

সি. পি. আই (এম) থেকে নকশাল পন্থীদের এই বেরিয়ে যাবার ঘটনা হরশঙ্কর কাপুর-এর মতে চার বছর আগে সি পি. আই থেকে "মার্ক্সবাদী"দের বেরিয়ে যাবার ঘটনার প্রায় এক হুবহু পুনরাবৃত্তি। তিনি লিখেছেন, 'সেদিন সি. পি. আই (এম)-পন্থীরা আপসপন্থী সি. পি. আইয়ের আগড় ভেঙে বেরিয়ে

এসেছিলেন এবং অনেক পরিমাণে বিপ্লবী চিন্তার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আর মাত্র চার বছর পরে, সি. পি. আই (এম)-নেতৃত্ব নিজেই হয়ে পড়লেন আপসপন্থী এবং প্রাণপণে চেষ্টা করলেন কী করে বিপ্লবী চিন্তার অগ্রগতি রুদ্ধ করা যায়—যে অগ্রগতিকে অনিবার্য করে তুলেছিলো ভারতের আধা-ঔপনিবেশিক কাঠামোর দ্রুত বেড়ে চলা সংকট। আরো একবার মাথা চাড়া দিলো ভারতের কমিউনিস্ট নেতৃত্বের আধা ঔপনিবেশিক পেটি বুর্জোয়া চরিত্র—তার "এক পা আগে দুই পা পিছে" মানসিকতা, তার আপসপ্রেম, বুর্জোয়াদের সঙ্গে ক্ষমতা এবং লুঠের মাল ভাগাভাগি ক'রে নেওয়ার লোভ, যে-বিরোধের কিছুতেই মিটমাট হয় না তাকে মিটিয়ে নেওয়ার প্রবণতা, তার অনড় কর্তৃত্ববাদ। তবে, ১৯৬২-র তুলনায় এইবার তার আধা-ঔপনিবেশিক পেটি বুর্জোয়া চরিত্রের অভিব্যক্তিটা ছিলো অনেক বেশি মারাত্মক।...প্রাদেশিক স্তরে সামন্ত বুর্জোয়া প্রতিনিধিদের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগি করে নেওয়ার ফলে, এবং সংসদীয় পথে আরো অনেক কিছু পাবার স্বপ্নে ডুবে থাকায় সি. পি আই (এম) নেতৃত্বের পক্ষে খুবই কষ্টকর হয়ে দাঁড়ালো একই সঙ্গে তার আপসী নীতি "আঁকড়ে থাকা ও নকশালপন্থী বিক্ষুব্ধদের নিয়ন্ত্রণে রাখা। সুতরাং বিদ্রোহে অটল নকশালপন্থী অংশটিকে তারা পার্টি থেকে বহিষ্কার করলেন।" (২৯)

জুন ১০, ১৯৬৭-তারিখের বেতার প্রচার মারফত চীনা ভাষ্যকার সি পি. আই (এম)-এর নেতৃত্বকে কার্যত বাতিল করে দেয়। নেতৃবৃন্দ স্বভাবতই একে পার্টি ভাঙবার জন্যে আমেরিকার প্রচার হিসাবে ধরে নেন, অথবা বলেন যে সেটা হোল লিউ শাও চি গোষ্ঠীর মনোভাব, যা কখনোই চীনা কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য হতে পারে না। এর প্রায় তিন সপ্তাহ পরে সি. পি. আই (এম)-নেতৃবৃন্দ এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলেন যে, "নকশালবাড়ী সংগ্রাম বিষয়ে পিকিং রেডিও প্রচারিত মূল্যায়নের সবটুকুই আমাদের পার্টি প্রদত্ত মূল্যায়ন হতে পৃথক।" (৩০) কিন্তু জুলাই ৫ তারিখের 'পিপলস্ ডেইলি' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে (Spring Thunder Breaks Over India) নকশালপন্থীদের (কমিউনিস্ট পার্টির বিপ্লবী অংশ) কাজ ও পথকেই সঠিক বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এবং এই সঙ্গে সি. পি এম-কে 'আধুনিক সংশোধনবাদী' আখ্যায় আখ্যায়িত করা হয়। প্রাক প্লেনাম (১৯৬৮) কালে উপরোক্ত চীনা মূল্যায়ন পার্টির বিপ্লবী অংশের কাছে অবশ্যই ছিল যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। সংহতি ও নতুন দল গঠনের কাজেও উক্তের প্রেরণা ছিল সবিশেষ। তদুপরি উক্ত সম্পাদকীয় প্রবন্ধটিই সমকালে ও পরবর্তীকালে নকশালপন্থীদের চিন্তাচর্চায় ও নীতিনির্ধারক দলিলগুলি রচনার ক্ষেত্রে মুখ্য পথপ্রদর্শক হয়ে দাঁড়ায়। প্রবন্ধটির মন্তব্য ও বক্তব্য সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

(ক) কংগ্রেস শাসিত ভারত যদিও নামে মাত্র স্বাধীন কিন্তু কার্যত এখনও একটি আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-শাসনতান্ত্রিক দেশ ;

(খ) কংগ্রেস সরকার ভারতীয় সামন্ততান্ত্রিক রাজন্যবর্গেরা বৃহৎ জমিদারের, আমলাতান্ত্রিক মুৎসুদ্দি ধনিক সম্প্রদায়ের স্বার্থকেই রক্ষা করে :

(গ) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই সরকার তার সর্বময় প্রভু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অধীনে থাকতে থাকতেই পরিশেষে তার নতুন প্রভু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ও তারই পয়লা নম্বর দুষ্কর্মের সহচর সোভিয়েত শোধনবাদীচক্রের আওতায় গিয়ে পড়েছে ;

(ঘ) ভারতের জনগণের শত্রু চারটি : সাম্রাজ্যবাদ, সোভিয়েত সংশোধনবাদ সামন্ততন্ত্রবাদ, আমলাতান্ত্রিক মুৎসুদ্দি পুঁজিবাদ ;

(ঙ) এই শত্রুদের পরাজিত করার জন্য দীর্ঘকালীন সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে এবং গ্রামের ঘাঁটিগুলি থেকে লড়াই করে শত্রুকে ব্যতিব্যস্ত ও পর্যুদস্ত করে পরিশেষে শহরগুলিকে কব্জা করতে হবে ;

(চ) কৃষকই জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোটের এক বৃহত্তম অংশ, কারণ তারাই একান্তভাবে মনেপ্রাণে সাম্রাজ্যবাদ এবং তার দালালদের বিরোধিতা করে এবং তারাই হচ্ছে সর্বহারার সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য সংখ্যাহীন মিত্র এবং ভারতীয় সর্বহারারা এই কৃষকের সাথে একাত্ম হয়ে বিশাল গ্রামাঞ্চলে ভূমিকম্পের মত অভূতপূর্ব পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে এবং যে কোন পরাক্রমশালী শত্রুসেনাকে উদ্দীপনাময় জনযুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাস্ত করতে পারে ,

ছ) চৈনিক বিপ্লবের মত ভারতীয় বিপ্লবের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে : সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে প্রতিবিপ্লবকে খতম করতে হবে ; সশস্ত্র সংগ্রামের পথই ভারতের বিপ্লবের একমাত্র সঠিক পথ—এছাড়া অন্য কোন পথ নেই ;

(জ) (ভারতের,) তথাকথিত 'অকংগ্রেসী সরকারগুলি' প্রকাশ্যেই প্রতিক্রিয়াবাদী ভারত সরকারের সাথে হাতে হাত মিলিয়েছে। এই জোট হচ্ছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ও সোভিয়েত শোধনবাদের পোষা কুকুর এবং দেশীয় বৃহৎ জোতদার ও জমিদারগোষ্ঠীর এবং বুর্জোয়াদের দালাল। তারা যে 'পরীক্ষামূলক অকংগ্রেসী সরকার' বলে প্রচার করছে সেগুলো হচ্ছে এই সব জমিদার ও বুর্জোয়াদের হাতের যন্ত্র মাত্র ;

(ঝ) ভারতীয় জনগণের সর্বাত্মক মুক্তি অর্জন করতে হলে (১) কৃষককে সাহসিকতায় উদ্দীপ্ত করতে হবে, (২) বিপ্লবী শক্তির চেয়ে আপাত শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী ও প্রতিক্রিয়াশালীদের সশস্ত্র দমননীতির বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম

করে কৃষকের বিপ্লবী বাহিনীগুলিকে বিস্তৃত করতে হবে, এবং (৩) চেয়ারম্যান মাও-এর বিশেষ নির্দেশিত পথে জনযুদ্ধের সর্বরকম কলাকৌশল নমনীয়তা সহকারে আরোপ করে এবং অবিচলিতভাবে দীর্ঘকালীন সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ধাপে ধাপে বিপ্লবের জয়কে করায়ত্ত করতে হবে ;

(ঞ) যেমন একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গই দাবানল সৃষ্টি করতে সক্ষম তেমনি নিশ্চয়ই দার্জিলিং-এর ঐ স্ফুলিঙ্গ দাবানলের স্ফুলিঙ্গের ন্যায় ভারতব্যাপী বিশাল এক প্রচণ্ড অগ্নিবলয়ের সৃষ্টি করবে। (৩১)

১৯৬৭ সালের জুলাই মাস থেকে সি. পি. আই (এম)-এর বহিষ্কৃত ও দলত্যাগী সদস্যেরা সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা 'দেশব্রতী' এবং মাসিক ইংরেজি কাগজ 'লিবারেশন' প্রকাশ করতে থাকেন, মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল 'নয়াসংশোধনবাদী'দের (সি. পি. এম) বিরুদ্ধে আদর্শগত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া। ঐ বছরের নভেম্বর মাসে কয়েকটি প্রদেশের 'কমরেডরা' কলকাতায় এক সভায় মিলিত হন এবং সারা ভারত বিপ্লবীদের সমন্বয় কমিটি (All India Co-ordination Committee of the Revelutionaries).গঠিত হয়। (৩২) এই কমিটির ঘোষণাপত্রে বলা হয় যে কমরেড লেনিনের বিশ্লেষণ অনুযায়ী এদেশে এখন বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত কিন্তু সি. পি. আই (এম)-এর নয়াসংশোধনবাদী নেতৃত্ব জনগণ ও পার্টির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছেন; এরা শ্রেণী-সমঝোতা ও পার্লামেণ্টারী পথের মোহে রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকারের বিপ্লবের পথ পরিত্যাগ করেছেন। নিরপেক্ষ ব্যাখ্যার নামে তারা আমাদের দেশের নয়া-ঔপনিবেশিক চেহারা এবং এর আধা-সামন্ততান্ত্রিক আধা-ঔপনিবেশিক চরিত্র আর সেইসঙ্গে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কৌশল ও রণনীতি পরিত্যাগ করে ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে এদেশে স্বাধীন ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির বিকাশলাভ ঘটেছে এবং ভারতের বৃহৎ বুর্জোয়ারা তাদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চরিত্র এখনো হারায় নি আর এইভাবে তারা মাও ৎসে-তুঙের বিশ্ববিপ্লবের, বিশেষত এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বিপ্লবের পরিকল্পনাকে, যা অত্যন্ত সংহতভাবে প্রকাশ করেছিলেন কমরেড লিন পিয়াও, নস্যাৎ করেছে। বিশ্বের কমিউনিস্ট আন্দোলন সম্পর্কে তাদের নিরপেক্ষতার 'মধ্যপন্থা' কার্যত ক্রুশ্চেভের সংশোধনবাদকেই সমর্থন। এভাবেই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিশ্লেষণে টিটোবাদের বীজ বপন করা হোল, যা পরিণামে মাদুরাই প্রস্তাবে প্রকটিত। পার্টি পতাকার তলে দাঁড়িয়ে বারংবার বিপ্লবী কমরেডরা লড়াই করেছেন, এবং প্রত্যেকবারই তারা সংশোধনবাদের শিকার হয়েছেন। নকশালবাড়ী আজ ইতিহাসের এক নতুন বাঁক হিসাবে পার্টি এবং দেশের ক্ষেত্রে স্মরণীয়। এই

আন্দোলন আজ দেশের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। আজ শ্রমিকশ্রেণীর পুরোগামী হিসাবে আমাদের কর্তব্য হোল যথাসম্ভব উক্ত আন্দোলনকে নেতৃত্ব দেওয়া। তদুপরি কমিটির পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় যে (১) সমস্ত স্তরে জঙ্গী ও বিপ্লবী সংগ্রামকে, বিশেষ করে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বাধীন নকশালবাড়ী ধরনের কৃষক সংগ্রামগুলিকে গড়ে তুলতে ও সমন্বয় সাধন করতে হবে ; (২) অর্থনীতি-বাদকে প্রতিরোধ ও এই ধরনের সমস্ত সংগ্রামকে কৃষি বিপ্লবমুখী করার জন্যে শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য মেহনতী মানুষের জঙ্গী বিপ্লবী সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে, (৩) সংশোধনবাদ ও নয়া-সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন মতাদর্শগত সংগ্রাম চালাতে হবে। বর্তমানকালের মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ মাও ৎসে-তুঙের চিন্তাধারাকে জনপ্রিয় করে তুলতে হবে এবং এই প্রেক্ষিতে পার্টির বাইরের ও ভেতরের সমস্ত বিপ্লবী অংশকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে ; (৪) কমরেড মাও ৎসে-তুঙের চিন্তাধারার ভিত্তিতে ভারতের পরিস্থিতির সুনির্দিষ্ট বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে একটি বিপ্লবী কর্মসূচী ও কর্মকৌশল স্থির করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে (৩৩)। এবং এই ঘোষণা-পত্রের বক্তব্যে সেটাই ছিল প্রকৃত বিপ্লবী পার্টি গড়ার কাজে হাত দেবার একটি সময়।

কিন্তু উক্ত কমিটি অবশ্য সেই মুহূর্তেই পার্টি গড়ার কাজে হাত দেননি। এর কারণ ব্যাখ্যায় তাঁরা বলেছিলেন, 'পার্টি কেবলমাত্র গড়ার জন্যেই গড়া নয়, বিপ্লবের কাজ সমাধা করার জন্যেই তাকে গড়তে হয়, আর তা স্বীকার করলে, আমাদের এ কঠোর সত্যকেও মেনে নিতে হয় যে যথার্থ বিপ্লবী পার্টির জন্ম ও বিকাশ সম্ভব কেবলমাত্র বিপ্লবী শ্রেণীসংগ্রামের প্রাবল্য ও চাপে। শুধুমাত্র নীতিগত বিদ্রোহ বা সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে এ ধরনের কোন বিপ্লবী পার্টির জন্ম হতে পারে না। এমন কি নীতিগত সংগ্রামে বিপ্লবী শ্রেণীসংগ্রাম সংযুক্ত না থাকলে, তা আর কোন সংগ্রামই নয় (৩৪)।'

বর্ধমান প্লেনামের পর, নকশালবাড়ীর কৃষক আন্দোলনের প্রথম বার্ষিকীতে (মে ১৪, ১৯৬৮) সারা ভারত বিপ্লবীদের সমন্বয় কমিটি এক সভায় মিলিত হন এবং পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষিতে এই কমিটি নাম পরিবর্তন করে, নতুন নামকরণ করেন 'সারাভারত কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের সমন্বয় কমিটি (All India Co-ordination Committee of Communist Revolutionaries) এবং একটি নতুন ঘোষণাপত্রও প্রকাশ করেন। এই ঘোষণাপত্রের মূল বিষয়বস্তু হোল : (১) স্বাধীনতার পূর্বে ভারত ছিল বৃটেনের উপনিবেশ ; বর্তমানে সেই ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে কয়েকটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির

নয়া উপনিবেশে পরিণত হয়েছে। (২) বর্তমান যুগে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা চূড়ান্ত ধ্বংসের মুখে ; আধাঔপনিবেশিক, আধাসামন্ততান্ত্রিক ভারতে (ক) সাম্রাজ্য-বাদী নয়া উপনিবেশবাদী শক্তিগুলির ও জনগণের দ্বন্দ্ব, (খ) সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণীগুলি ও কৃষকশ্রেণীর দ্বন্দ্ব এবং (গ) মুৎসুদ্দি আমলাতান্ত্রিক পুঁজি ও শ্রমিকশ্রেণীর দ্বন্দ্ব তীব্র আকার ধারণ করেছে। (৩) ভারতীয় জনগণের প্রধান শত্রু হচ্ছে ; (ক) মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, (খ) সোভিয়েত সংশোধনবাদ (গ) ভারতের জমিদারশ্রেণী এবং (ঘ) মুৎসুদ্দি আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়াশ্রেণী। "এরা হচ্ছে চারটি পাহাড় যা আমাদের মেহনতী জনগণের পিঠের ওপর গুরুভার হয়ে চেপে রয়েছে।" (৪) উপরোক্ত চারটি শত্রুর 'প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ' শাসনের উচ্ছেদের ওপর 'জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের' সাফল্য নির্ভর করছে। সেই উদ্দেশ্যে (ক) শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে বিপ্লবের প্রধান শক্তি কৃষকশ্রেণীকে গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবী ঘাঁটি অঞ্চল তৈরি করতে হবে (খ) দীর্ঘকালীন সশস্ত্র লড়াই চালাতে হবে, (গ) গ্রামাঞ্চল থেকে শহরগুলিকে ঘিরে ফেলে এবং শেষে সেগুলিকে দখলের মাধ্যমে দেশব্যাপী চূড়ান্ত জয় অর্জন করতে হবে, (ঘ) সেই জয়লাভের উদ্দেশ্যে শ্রমিকশ্রেণীর ও কৃষকশ্রেণীর দৃঢ় মৈত্রীর ভিত্তিতে যে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হবে, তার মধ্যে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকশ্রেণী ছাড়াও পেটি বুর্জোয়া ও জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীকেও নিতে হবে, এবং (ঙ) ষড়যন্ত্রমূলক পদ্ধতির পরিবর্তে একমাত্র গণকর্মনীতির পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। (৫) ডাঙ্গে বিশ্বাসঘাতকেরা (সি. পি আই) আর নয়াসংশোধনবাদী (সি. পি. এম) সহ 'সব ঢং-এর সব ধাচের' সংশোধনবাদীরা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, সোভিয়েত নয়া সংশোধনবাদ ও দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের 'চাকর' এবং নিঃসন্দেহে ভারতীয় জনগণের শত্রু। (৬) নয়াসংশোধনবাদীদের সঙ্গে সংস্রব ছিন্ন করার পরিবর্তে যারা এখনও মনে করেন যে অন্তর্দলীয় লড়াই-এর সুযোগ আছে, তারা সংশোধন-বাদ বিরোধীদের মধ্যে নতুন করে মোহ সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করছেন। (৭) বর্তমান পৃথিবী দুটি শিবিরে বিভক্ত : (ক) মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী ও তার প্রধান সহযোগী সোভিয়েত নয়াউপনিবেশ-বাদীদের নেতৃত্বে একটি শিবির এবং (খ) অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক চীন ও মাও ৎসে-তুঙের নেতৃত্বে একটি শিবির। (৮) বর্তমান যুগ মাও ৎসে-তুঙের বিজয়ের যুগ, যখন সাম্রাজ্যবাদ চূড়ান্ত পতনের মুখে এবং সমাজতন্ত্র বিশ্বব্যাপী চূড়ান্ত বিজয়ের অভিমুখে এগিয়ে চলেছে। (৯) সেই কারণে এই যুগে মাও ৎসে-তুঙের চিন্তা-ধারাকে ভারতের নির্দিষ্ট অবস্থায় প্রয়োগ করে এবং নকশাল-বাড়ী ধাঁচের সংগ্রাম সংঘটিত করে তার মাধ্যমে একটা সাচ্চা কমিউনিস্ট

পার্টি গড়ে তুলতে হবে, কেননা, "বিপ্লবী পার্টি ছাড়া বিপ্লব জয়ী হতে পারে না।" (৩৫)

সারাভারত কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের এই সমন্বয় কমিটিতে অবশ্য নাগি রেড্ডি এবং তাঁর অন্ধ্র প্রদেশের সহযোগীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, যদিও সি. পি. আই (এম) থেকে দলত্যাগীদের মধ্যে তাঁরাই ছিলেন একক সংখ্যাধিক গোষ্ঠী। এতদ্-ব্যতীত নাগি রেড্ডি গোষ্ঠী বর্ধমান প্লেনাম পর্যন্ত কার্যত দলের মধ্যে থেকেই আদর্শগত সংগ্রাম চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর ছিল। অন্ধ্রের শ্রীকাকুলাম ইউনিট অবশ্য পূর্বেই সি. পি. এম থেকে বেরিয়ে আসার ডাক দেয়। প্রাদেশিক নেতৃত্ব অবশ্য এর বিরোধিতা করেন এবং তাঁরা ভেবেছিলেন যে দলের মধ্যে থাকার ফলে তাঁরা আরো বেশি সংখ্যক সদস্যদের নিজেদের গোষ্ঠীতে আনতে সমর্থ হবেন। তদুপরি এই গোষ্ঠীর সঙ্গে কয়েকটি মূল বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের নকশালবাদীদেব মতবিরোধ ছিল। বিশেষ করে পুলা রেড্ডি ভারতের অবস্থা বিষয়ে চীনা ব্যাখ্যা যথাযথ মেনে নিতে রাজী ছিলেন না। (৩৬) এতদ্‌সত্ত্বেও অন্ধ্র প্রদেশ বিপ্লবীদেব সমন্বয় কমিটি, সারাভারত কমিটির সঙ্গে যোগ দিতে আগ্রহী ছিল। কিন্তু ৭ ফেব্রুয়াবী ১৯৬৯-এ উক্ত সারাভারত কমিটির সভায় অন্ধ্র কমিটির সঙ্গে সম্পর্কে ছেদ ঘটানো হয়, যদিও কমিটির বাইরে অবস্থানকারী তাঁদের 'বন্ধু ও কমরেড' হিসাবে স্বীকাব করা হয়েছিল। অন্ধ্র কমিটিকে অন্তর্ভুক্ত না করার কারণ হিসাবে সাবাভারত কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের সমন্বয় কমিটির উক্ত তারিখেব প্রস্তাবে বলা হয়েছিল যে, প্রথমত অন্ধ্র সমন্বয় কমিটি চীনা কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন কবেনি, দ্বিতীয়ত শ্রীকাকুলাম আন্দোলন (শ্রীকাকুলামের 'গিরিজন সংঘম্' নামীয় সংগঠন ১৯৫৯ থেকে নিজেদের স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল গড়ার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিল) বিষয়ে তারা সক্রিয় সমর্থন জানাতে ব্যর্থ হয়েছে এবং তৃতীয়ত নির্বাচন বয়কটকে তারা সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করেনি এবং কমিটির সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাব সত্ত্বেও নাগি রেড্ডি ১৯৬৮-র অক্টোবর থেকে দু'মাসের মধ্যে বিধানসভা থেকে পদত্যাগ করেননি। সুতরাং সর্বভারতীয় সমন্বয় কমিটির মতে, চীনা কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি আনুগত্য, জনগণের সশস্ত্র সংগ্রাম এবং নির্বাচন বয়কট-এর প্রশ্নে মতভেদ থাকার কারণে অন্ধ্র কমিটির কখনোই সারাভারত সমন্বয় কমিটিতে থাকা সম্ভব বা উচিত নয়। (৩৭)

এই সময় থেকেই সারাভারত সমন্বয় কমিটির নেতৃবৃন্দের একাংশ বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার পরিকল্পনা স্থির করে ফেলেন। অবশ্য চারু মজুমদার অনেক আগে থেকেই পার্টি গড়ার কথা বলে আসছিলেন। ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯-এ

লিখিত 'কেন আমাদের এখনই পার্টি গড়া উচিত ?' নামীয় একটি প্রবন্ধে তিনি লেখেন, 'উত্তরপ্রদেশ, বিহার এবং অন্ধ্রে কৃষক-সংগ্রাম গড়ে উঠেছে একমাত্র মাও-ৎসে-তুঙের শিক্ষাব ওপর নির্ভর করে। কেবলমাত্র স্থানীয় উদ্দীপনার ওপর নির্ভর করে কোন বিপ্লবী কর্তৃত্ব এই সমস্ত সংগ্রামকে নিয়ন্ত্রণ বা উন্নততর স্তরে নিয়ে যেতে পারে না। পরিণামে সংগ্রাম উন্নততর স্তরে উপনীত হতে ব্যর্থ হয়। এই সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে তাই প্রয়োজন সমস্ত বিপ্লবীদের দ্বাবা স্বীকৃত একটি সর্বভারতীয় পার্টি এবং কেন্দ্র। ···সারাভারত কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের সমন্বয় কমিটি এই উদ্দেশ্য নিয়েই গঠিত হয়েছিল এবং এর প্রথম ঘোষণাতেই তা ব্যক্ত হয়েছিল। এই সমন্বয় কমিটিব নেতৃত্বে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বিপ্লবীরা নক্শালবাড়ীর পথে কৃষক সংগ্রাম সংগঠিত করাব চেষ্টা করেন এবং কোথাও কোথাও সার্থকও হন। এরই সূত্রে বিপ্লবীদেব দ্বারা স্বীকৃত একটি কেন্দ্র গড়া সম্ভব হয়েছে। এ-কারণেই আন্তর্জাতিক নেতৃত্ব একটি পার্টি গড়ার গুরুত্বেব কথা আমাদের বারংবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। আমরাও এখন উপলব্ধি করছি সমন্বয় কমিটির পক্ষে সংগ্রামকে সঠিক পথে পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ আর সম্ভব নয়। সুতরাং আমাদেব গড়া উচিত এক সর্বভারতীয় সংগঠন, এক বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি।' (৩৮) অন্যদিকে অন্ধ্র বাজ্য সমন্বয় কমিটির সদস্যেরা তখনই পার্টি গঠনে বাজী ছিলেন না। তাঁদের মতে, পার্টি গঠিত হয় বৈপ্লবিকসংগ্রামের মধ্যে দিয়েই এবং বিপ্লবী পার্টি গঠনের আগে বৈপ্লবিক কার্যক্রমের ওপর গুরুত্ব আরোপ করাই শ্রেয়। কিন্তু ৮ ফেব্রুয়াবী, ১৯৬৯-এর সারাভারত কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের সমন্বয় কমিটির সভায় গৃহীত প্রস্তাব চারু মজুমদারেব উক্ত বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি এবং অচিরাৎ পার্টি গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই প্রস্তাবে বলা হয় যে এই সমন্বয় কমিটি গঠিত হবার পর এক বছরেবও বেশি সময় কেটে গেছে এবং এই অল্প সময়ের মধ্যে সমন্বয় কমিটি সংশোধনবাদ ও নয়াসংশোধনবাদ সমেত সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল মতাদর্শকে তীব্র আঘাত হানতে পেরেছে আর কৃষি-বিপ্লবের আগুন ছড়িয়ে দিতে সমর্থ হয়েছে। এই সময়কালের মধ্যে কৃষি বিপ্লবের আগুন দক্ষিণে নক্শালবাড়ী থেকে শ্রীকাকুলাম ও উত্তরে মুশাহারি থেকে লখিমপুর খেরি পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। কেরালার বিপ্লবী কৃষকদের বিদ্রোহে সমস্ত ভারতবর্ষ কম্পমান। ছোটনাগপুবেব আদিবাসীরাও বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামের অংশভাক্ হয়েছে। নাগা, মিজো ও কুকিরা জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের এক নতুন স্তরে উন্নীত। প্রতিক্রিয়াশীল ভারত সরকার আমেরিকান ও সোভিয়েত সাম্রাজ্যবাদের দালালে পরিণত হয়েছে এবং ভারতীয় জনসাধারণের ওপর মহাভার হয়ে চেপে বসেছে। ফলে গ্রামে ও

শহরে, শ্রমিকশ্রেণী ও পেটিবুর্জোয়া ভারতীয় সাধারণ মানুষের প্রতিরোধ বাড়ছে এবং কৃষি-বিপ্লবকে এক নতুন উত্তরণে পৌঁছে দিচ্ছে, যার মূল বিষয় হোল আজকের ভারতের গণতান্ত্রিক বিপ্লব। বিপ্লবীদের মধ্যেও ক্রমে ঐক্য স্থাপিত হচ্ছে। সমন্বয় কমিটির দ্বারা ক্রমবর্ধমান সংগ্রামের রাজনৈতিক ও সংগঠনগত প্রয়োজন মেটা সম্ভব নয়। কারণ বিপ্লবী পার্টি ছাড়া বিপ্লবী নিয়মানুবর্তিতা আসতে পারে না, আর বিপ্লবী নিয়মানুবর্তিতা ছাড়া সংগ্রামকে উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। (৩১)

অন্ধ্রের নাগি রেড্ডির মতো পশ্চিমবঙ্গ সমন্বয় কমিটির অন্যতম সদস্য ও পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ পর্ষদের সাধারণ সম্পাদক পরিমল দাশগুপ্তও সেদিন পার্টি গড়ার বিরোধী ছিলেন। এবং এই বিষয়কে কেন্দ্র করেই তিনি সমন্বয় কমিটি থেকে বেরিয়ে আসেন। তাঁর মতে পার্টি গড়া এবং পার্টির কর্মসূচী নির্ধারণ করা দুটি ভিন্নধর্মী বিষয়। বিপ্লবের স্তর অনুযায়ী পার্টির কর্মসূচীর বদল ঘটে। গ্রামাঞ্চলে ঘাঁটি গড়া, কৃষক-সংগ্রাম, গেরিলা যুদ্ধ, এ সমস্তই পার্টির কর্মসূচীর অংশবিশেষ। এগুলিকে পার্টি গড়ার মাধ্যম ও বুনিয়াদ মনে করা ভুল। বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি গড়া হয় না কেবলমাত্র বিপ্লবের বিশেষ স্তরে কাজে লাগবার জন্যে; তাকে গড়া হয় সামাজিক বিপ্লবের চূড়ান্ত সার্থকতায় উপনীত হবার একমাত্র লক্ষ্য নিয়ে। উক্ত দুটি বিষয়ের পৃথক্‌করণ না করার মানসিকতা থেকেই এখনই পার্টি গড়ার বক্তব্যের উপস্থাপনা। ফলে, কৃষক-ভিত্তিক পার্টি, গেরিলা-ভিত্তিক পার্টি, এবং গ্রাম-ভিত্তিক পার্টির নানা প্রস্তাবনা দেখা যাচ্ছে; এই অভিমত মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ সম্মত নয়। পরিণামে পরিমল দাশগুপ্ত একটি প্রতিদ্বন্দ্বী সমন্বয় কমিটি গঠন করেন এবং এখনই পার্টি গড়ার বিরুদ্ধে তাঁর দলের বক্তব্য প্রকাশ করেন। এই বক্তব্যে বলা হয় যে চারুবাবু মাওবাদ পরিত্যাগ করে চে গুয়েভারা লাইন অনুসরণ করছেন। কারণ মাওবাদ অনুসারে জনগণ সংগঠিত হয় রাজনৈতিক কার্যকলাপের মধ্যে দিয়ে আর চে গুয়েভারার মতে জনগণ সংগঠিত হয় সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে। তদুপরি ঐ বক্তব্যে বলা হয় যে, চারুবাবুর গোপন সংগঠনের দ্বারা গেরিলা যুদ্ধকে উচ্চতম এবং একমাত্র বিপ্লবী সংগ্রাম হিসেবে চিহ্নিত করা, অর্থনীতিবাদের নামে তাঁর ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বিরোধিতা, শহরাঞ্চলে শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্যদের গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবী ঘাঁটি গড়ার জন্যে আন্দোলনের প্রতি তাঁর [illegible] ক্ষুদ্র দলে সংগঠিত মানুষের সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে তাঁর বিপ্লবের বাসনা, শ্রেণীসংগ্রাম ছাড়াই বিপ্লবী সংঘর্ষকে মদত দেওয়া ইত্যাদি সমস্তই চে গুয়েভারার লাইন। পরিমলবাবু এবং তাঁর সহযোগীরা

স্পষ্টত অভিযোগ করে যে চারুবাবু মার্ক্সবাদের বিচ্যুতি ঘটিয়েছেন। এবং উক্ত বিষয়সমূহের সংশোধন না করে কোন পার্টি গঠন করলে, তা পরিণামে সন্ত্রাসবাদী পার্টিতে পরিণত হতে বাধ্য। (৪০)

কিন্তু সারা ভারত বিপ্লবীদের সমন্বয় কমিটি শেষ পর্যন্ত চারু মজুমদারের 'অবিলম্বে পার্টি গড়ার' মতবাদকেই মেনে নেয়। এবং এক বিশেষ সম্মেলনে ২২ এপ্রিল, ১৯৬৯-এ মাও ৎসে-তুঙের চিন্তাধারায় প্রাণিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী)-র প্রতিষ্ঠা হয়। ১ মে, ১৯৬৯-এ কলকাতার ময়দানের জনসভায় কানু সান্যাল আনুষ্ঠানিকভাবে উক্ত পার্টি প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন। পরবর্তীকালে অকস্মাৎ এই পার্টি গঠনের সমালোচনা করে অসীম চ্যাটার্জী লেখেন, "ইতিহাস বল্‌ছে যে চটেরহাটসহ পশ্চিম দিনাজপুরের অন্যান্য এলাকায় চারুবাবুর যে লাইন পরাজিত হয়, সেই পরাজিত নৈরাজ্যবাদী লাইনের ভিত্তিতে সি. পি. আই (এম এল) গঠিত হয়েছিল অর্থাৎ মুখে 'নকশালবাড়ী লাল সেলাম' আওয়াজ রাখলেও আসলে নকশালবাড়ীর প্রকৃত ইতিহাস কাটছাঁট ক'রে, নকশাল বাড়ীর প্রকৃত শিক্ষাকে নাকচ ক'রে চক্রান্ত-মূলকভাবে সি. পি. আই (এম. এল.) গঠিত হয়েছিল। চারুবাবুর নকশালবাড়ী আর প্রকৃত নকশালবাড়ী কখনও এক ছিল না।" (৪১) কানু সান্যাল যদিও পরবর্তীকালে 'নকশালবাড়ী সম্পর্কে আরও বক্তব্য' নামীয় পুস্তিকায়, চারু মজুমদার এবং পার্টি গঠনের লাইনের সমালোচনা করেছেন, তথাপি উক্ত ১লা মে-র বক্তৃতায় তিনিই বলেছিলেন, 'অপরিমেয় গর্ব ও অন্তহীন আনন্দের সঙ্গে আমি ঘোষণা করতে ইচ্ছুক যে আমরা গঠন করেছি এক যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টি—ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী)। আমি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি যে মহান ভারতের জনগণ এই ঘটনাকে স্বাগত জানাবেন এবং উপলব্ধি করবেন যে এই পার্টি গঠন ভারতীয় বিপ্লবের পথে এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ আর এগিয়ে আসবেন পার্টির নেতৃত্বে সংগ্রামকে উচ্চতর পর্যায়ে নিয়ে যাবার প্রয়াসে।...আমাদের দেশে বিপ্লবী পরিস্থিতি এখন পূর্ণতাপ্রাপ্ত আর জনগণও বিপ্লব-মনস্ক এবং সেই সঙ্গে আছে মহান নেতা মাও ৎসে-তুঙ ও মহান চীনা কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি তাদের অগাধ আনুগত্য। এ-সমস্ত ঘটনাবলীর সুযোগে অনেক ব্যক্তি এবং গোষ্ঠী পেটি-বুর্জোয়া বিপ্লববাদের বুলি আওড়াচ্ছে। তারা যাই করুক বা না করুক, একটা জিনিস স্পষ্ট: বিপ্লবী পার্টির কর্তৃত্ব মেনে নিতে অস্বীকার করে তারা বিপ্লবের মূল কেন্দ্র থেকেই সরে যাচ্ছেন। এইভাবে ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় বিপ্লবী সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করার

কাজে বাধা সৃষ্টি করছেন। এটাই হচ্ছে বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্যে প্রতিবিপ্লবী ধারা। আমরা অবশ্যই এই ধারার বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাব এবং আমাদের পার্টির পতাকার নিচে সমস্ত সাচ্চা বিপ্লবীরা এসে দাঁড়াবেন।' (৪২)

সি. পি. আই (এম-এল) গঠনের সঙ্গে সঙ্গেই চীনা পার্টি তাকে স্বীকৃতি দেয় এবং পিপলস্ ডেইলি পত্রিকায় পার্টির প্রস্তাব ছাপা হয়। পিকিং রেডিও থেকেও পার্টিকে অভিনন্দন জানানো হয়; নাগি রেড্ডি প্রমুখ অন্যান্য গোষ্ঠীগুলিকে অবশ্য স্বীকার বা নিন্দা কিছুই করা হয় নি।

পার্টি গড়ার সময়ে যাঁরা সি পি আই (এম এল) এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁরা সকলেই যে চারুবাবুর সঙ্গে একমত ছিলেন এমন নয়। এদের সতর্ক করে, পার্টির পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, 'সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে লড়াই এখনো শেষ হয়নি। যতদিন আমাদের সমাজে শ্রেণীসংগ্রাম অব্যাহত আছে, ততদিনই তা চলবে। এই সংশোধনবাদ নানা রূপে আবির্ভূত হবে এবং পার্টির নেতৃত্বকে বিকৃত করতে চেষ্টা করবে।' (৪৩) কিন্তু ১লা মে-র ময়দানের জনসভায় যে অসিত সেন সভাপতিত্ব করেন তিনি সামান্যকালের মধ্যেই উক্ত পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করলেন। নীতিগতভাবে অসিতবাবু অবশ্য অস্বীকার করেননি যে বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত বা 'নকশালবাড়ীর আগুন' ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব। তা সত্ত্বেও নকশালবাড়ী প্রসঙ্গে চারুবাবুর সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য ছিল। শ্রীসেনের মতানুযায়ী নকশালবাড়ীর কৃষকদের লড়াই ছিল, জমির জন্যে লড়াই। এবং তারা উপলব্ধি করেছিলেন যে আইনের পথে অথবা দলিল পাওয়ার চেষ্টায় তা কখনোই সার্থক হতে পারে না। তার জন্যে প্রয়োজন শক্তি প্রয়োগের। তরাইয়ের বিপ্লবী কৃষকেরাও এটা উপলব্ধি করেছিলেন যে তাদের লড়াই কেবলমাত্র গ্রামীণ সামন্তপ্রভুদের সঙ্গেই নয়, সেই সঙ্গে শোষকশ্রেণীর স্বার্থ যারা রক্ষা করে, সেই অস্ত্রবলে বলীয়ান রাষ্ট্রের সঙ্গেও। এ কারণেই সেখানকার কৃষকেরা সশস্ত্র লড়াইয়ের জন্য তৈরি হচ্ছিলেন, আর লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে গড়ে তুলছিলেন তাদের সশস্ত্র লড়াইয়ের ক্ষমতা। শ্রীসেনের বক্তব্যানুযায়ী, নকশাল-বাড়ীর কৃষকদের জমির জন্যে এই লড়াইকে নকশালবাদীরা ব্যাখ্যা করলেন রাষ্ট্র-ক্ষমতা অর্জনের জন্যে সংশোধনবাদীদের অপপ্রয়াস হিসেবে। তাঁদের মতে জমির জন্যে লড়াই হোল এক ধরনের অর্থনীতিবাদ, যা বিপ্লবীমাত্রেরই পরিত্যাজ্য। তদুপরি তাঁরা বলেন যে অর্থনৈতিক দাবীতে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামও কার্যত সংশোধনবাদ ও অর্থনীতিবাদেরই প্রতিফলন। শ্রীসেন উক্ত তত্ত্বাবলীর বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন যে, সশস্ত্র-সংগ্রাম যে-অঞ্চলে ঘটেছিল,

সেখানকার কিছু কমরেড উক্ত পার্টির সঙ্গে জড়িত থাকার ফলে, পার্টির পেটি বুর্জোয়া চরিত্রের কিছুমাত্র বদল ঘটে নি। শ্রমিকশ্রেণী, ক্ষেতমজুর, ভূমিহীন কৃষক, এবং পেটি বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে থেকে পার্টির ক্যাডার সংগ্রহ করা উচিত ছিল; বিশেষ করে শ্রমিকশ্রেণী থেকে। রাজনৈতিক ও নীতিগত শিক্ষার মধ্যে দিয়ে তত্ত্ব ও কাজকে মিলিয়ে এরা শ্রেণীসংগ্রামকে তীব্রতর করে তুলতে পারতেন।

শ্রী সেন বলেছিলেন যে গেরিলা যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে সমস্ত কিছুর উপলব্ধি ও শিক্ষা সম্ভব, এ-তত্ত্ব যান্ত্রিক মতবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। চারু মজুমদারকে লক্ষ্য করেই তিনি বলেন যে, যদি কেউ ভেবে থাকেন যে তার বাস্তব অভিজ্ঞতাই সব এবং সেই অভিজ্ঞতাকে তিনি ভারতবর্ষের বিপ্লবের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করবেন, তা হলে তিনি যে সিদ্ধান্তে পৌঁছবেন, তা সর্বদাই মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ ও মাও ৎসে-তুঙের চিন্তার বিরোধী। যদি একমাত্র সশস্ত্র লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে আপনা-আপনি সঠিক বিপ্লবী পার্টি গড়ে ওঠা সম্ভব হোত, তবে ভারতবর্ষে অনেক আগেই বিপ্লব ঘটে যেত। তদুপরি বিপ্লবী পার্টির প্রধান শক্তি শ্রমিক-শ্রেণী এখনও সশস্ত্র সংগ্রামের বাইরে। একথা সর্বদাই স্মরণ রাখা কর্তব্য যে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সশস্ত্রসংগ্রাম ও সঠিক বিপ্লবী রাজনীতির দ্বারা পরিচালিত সশস্ত্রসংগ্রামের মধ্যে মৌলিক প্রভেদ আছে এবং পেটি-বুর্জোয়া বিপ্লবী-রোমান্টিকদের দ্বারা চালিত সশস্ত্রসংগ্রাম ও মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-মাও ৎসে-তুঙের চিন্তায় সমৃদ্ধ শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টি-পরিচালিত সশস্ত্রসংগ্রামের মধ্যে মৌলিক ও গুণগত প্রভেদ বর্তমান। শ্রীসেন আরো বলেন যে, ব্যক্তি হিসেবে জমিদার খতম বা তার ধনসম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে গরীবদের মধ্যে বিতরণ কখনোই শ্রেণীশত্রুকে শ্রেণী হিসেবে নিশ্চিহ্ন করার পন্থা হতে পারে না। (৪৪)

এতদ্‌সত্ত্বেও বৃহত্তর অর্থে নকশালবাদী রাজনীতিক্ষেত্রে চারু মজুমদারের লাইনই গৃহীত হয় এবং তদনুসারে, পার্টি বিভক্ত হয়ে যাবার আগে পর্যন্ত, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে তাকে ফলিত রাজনীতিতে প্রয়োগের জন্যে পার্টি-কর্মীরা প্রয়াসী হন। সি. পি. আই (এম এল)-এর রাজনৈতিক প্রস্তাবে বলা হয়েছিল (১) ভারতবর্ষ একটি আধা-ঔপনিবেশিক, আধা-সামন্ততান্ত্রিক দেশ। ভারত রাষ্ট্র হচ্ছে বৃহৎ জমিদার ও আমলাতান্ত্রিক মুৎসুদ্দি ধনিক সম্প্রদায়ের রাষ্ট্র এবং এর সরকার আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের লেজুড়। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির বিশেষ করে আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েত সংশোধনবাদ, 'এইড' সহায়তার উপর ভারতীয় অর্থনীতি অতিমাত্রায়

নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে আর এভাবে হাজার হাজার সহযোগের চুক্তি, অসম ব্যবসা-বাণিজ্য, এবং এইড-এর মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠন, খাদ্যের জন্য পি. এল. ৪৮০ ইত্যাদি আমাদের সমাজের আধা-ঔপনিবেশিক চরিত্রেরই প্রমাণ। অল্প কয়েকজন জমিদারের হাতে সমস্ত জমি কেন্দ্রীভূত হয়েছে; মেহনতী কৃষকের পরিশ্রমে উৎপাদিত ফসলের সমস্ত বাড়তিটাই এরা খাজনা হিসেবে নিয়ে নেয়; গ্রামীণ জনসংখ্যার শতকরা চল্লিশ ভাগেরই কোন জমি নেই, চূড়ান্ত শোষণ, গরীব কৃষকদের জমি থেকে ক্রমাগত উচ্ছেদ ও সামাজিক নিপীড়ন, যার মধ্যে 'হরিজন'দের পুড়িয়ে মারার মত মধ্যযুগীয় ঘটনাও বিদ্যমান, আর পশ্চাদপদ উৎপাদনের হাতিয়ার স্পষ্টই প্রমাণ করে আমাদের সমাজের আধা-সামন্ততান্ত্রিক চরিত্র। আমাদের দেশের ক্রমবর্ধমান কৃষক-সংগ্রাম আমাদের তত্ত্বকেই প্রমাণ করে যে এদেশের মূল দ্বন্দ্ব হোল সামন্ততন্ত্র এবং কৃষক জনসাধারণের মধ্যে। এই স্তরে ভারতবর্ষের বিপ্লব বলতে বোঝায় নতুন ধরনের গণতান্ত্রিক বিপ্লব—জনগণের গণতান্ত্রিক বিপ্লব—যার মূল বিষয়বস্তু হোল গ্রামাঞ্চলে সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদের জন্যে কৃষি বিপ্লব। (২) সাম্প্রতিককালে সংঘটিত আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে রায় দেয় যে সারা পৃথিবীতে এক বৈপ্লবিক পরিস্থিতি বর্তমান। ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকদের নিত্য নব অভ্যুত্থানের ফলে দেশগুলির প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণী সমাধানহীন দ্বন্দ্বের মধ্যে অবস্থান করছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রভাবিত সংশোধনবাদী দেশগুলিও এক গভীর সংকটের মধ্যে; ধনতন্ত্রবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়াসের বিরুদ্ধে জাতীয় অধীনত্বের বিরুদ্ধে এবং প্রলেতারিয়েত একনায়কত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যে সে-দেশগুলিতে বিক্ষোভ দানা বাঁধছে। অন্যদিকে সমাজতন্ত্রী চীনে সমাজতন্ত্রবাদ নির্মাণের জাদু অব্যাহত। মহান প্রলেতারীয় সাংস্কৃতিক বিপ্লব জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে প্রলেতারিয়েত একনায়কত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে আর সমাজতান্ত্রিক মানুষের জন্মসম্ভাবনার পরিবেশকে তৈরি করেছে। এদেশের গত আঠারো মাসের ঘটনাও আমাদের মতবাদকে সঠিকভাবে প্রমাণ করেছে যে ভারতবর্ষের বিপ্লবী পরিস্থিতি অত্যন্ত চমৎকার। এখন শাসকশ্রেণী, আগের তুলনায় গভীরভাবে আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক সংকটে জর্জরিত। সাম্রাজ্যবাদ ও জনগণের মধ্যে, সামন্তবাদ ও কৃষকদের মধ্যে, পুঁজি ও শ্রমিকের মধ্যে, এবং শাসকশ্রেণীর বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিদিনই দ্বন্দ্ব তীব্রতর হচ্ছে। এবং যেহেতু এখনো কৃষক জনগণের সামন্ততান্ত্রিক বেড়ি ছিন্ন হয় নি, যেহেতু আমেরিকান ও সোভিয়েত সাম্রাজ্যবাদ পরিচালিত বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আমাদের জনগণের

ওপর শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে আর পরিণামে তাদের ভারতীয় মুৎসুদ্দিরা, শ্রমিকশ্রেণী কৃষক ও পেটি-বুর্জোয়াদের ক্রমশ দরিদ্রতর ও বেকারে পরিণত করছে। আমাদের জনগণের শতকরা নব্বই ভাগ আর এই দারিদ্র্য ও অসহায়তা সহ্য করতে পারছে না এবং মৌলিক পরিবর্তনের জন্যে অধৈর্য হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে শাসকশ্রেণীর বিভিন্ন গোষ্ঠী ও দলগুলির মধ্যে অন্তর্বিরোধ ক্রমবর্ধমান। তাই ভারতের সর্বত্র জনগণ তাদের পিঠের ওপর চেপে বসা চার-পাহাড় সরাবার জন্যে এক সুতীব্র লড়াইয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই চার-পাহাড় হোল, আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ, সোভিয়েত সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ সামন্ততন্ত্র এবং মুৎসুদ্দি-আমলাতান্ত্রিক পুঁজি। নকশালবাড়ীতে যে সশস্ত্র কৃষক-সংগ্রাম শুরু হয়েছিল আজ তা শ্রীকাকুলাম, মুশাহারি ও লখিমপুর খেরিতে ছড়িয়ে পড়েছে এবং অন্যান্য নতুন অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ছে। গ্রামে গ্রামে এবং শহরাঞ্চলেও আমাদের জনগণের প্রতিরোধ সংগঠিত হচ্ছে এবং কৃষি-বিপ্লবের নতুন অভ্যুত্থানকে, যা গণতান্ত্রিক, বিপ্লবের মূল বিষয়, বহন করে আনছে। (৩) ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস হোল শ্রেণীসংগ্রামের লাইনের সঙ্গে শ্রেণী সমঝোতা ও বিশ্বাসঘাতকতার লাইনের, প্রলেতারীয় বিপ্লবের কর্মীদের সঙ্গে বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্বের লড়াইয়ের ইতিহাস। সুতরাং আজকের সবাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হোল মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ ও মাও ৎসে-তুঙের চিন্তাধারায় একটি বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলা। (৪) এই নবগঠিত বিপ্লবী পার্টি সম্পর্কে একথা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে এর বাম বা দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি ঘটতে পারে, কারণ ইতিপূর্বে ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর কোন পার্টি কখনো কৃষি-বিপ্লবে কৃষকের ভূমিকাকে এত গুরুত্বে বিবেচনা করেনি। চেয়ারম্যান মাও আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন: 'কারা আমাদের শত্রু? কারা আমাদের বন্ধু? এই প্রশ্নই বিপ্লবের পক্ষে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। পূর্বেকার চীনের বিপ্লবী সংগ্রাম যথেষ্ট সার্থক হতে পারেনি, তার প্রধান কারণ হোল, তারা প্রকৃত শত্রুদের আক্রমণ করার জন্যে প্রকৃত বন্ধুদের একজোট করতে পারেননি। বিপ্লবী পার্টিই হোল জনগণের পথপ্রদর্শক এবং কোন বিপ্লবই সার্থক হতে পারে না যদি বিপ্লবী পার্টি তাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। আমাদের বিপ্লব অবশ্যই সার্থক হবে এবং আমাদের জনগণকে কখনো ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে না, এ-সত্যকে নিশ্চিত করার জন্যে আমরা আমাদের বন্ধুদের সম্মিলিত করবো এবং নিশ্চিত শত্রুকে আঘাত হানবো। সত্যকার শত্রুদের মধ্যে থেকে সত্যকার বন্ধুদের খুঁজে নেবার জন্যে আমাদের চীনা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর আর্থনীতিক অবস্থা ও বিপ্লবের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে হবে।' কৃষকদের মধ্যে যারা সংখ্যাধিক, সেই

গরীব ও ভূমিহীন কৃষকদের, শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে যাদের মৈত্রীবন্ধন অচ্ছেদ্য, সঙ্গে মধ্য-কৃষক একত্রিত হলে ভারতীয় জনগণের বৃহত্তর অংশই সম্মিলিত হবে, এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লব অনিবার্যভাবে জয়ী হবে। বিপ্লবের নেতা হিসাবে শ্রমিকশ্রেণীর দায়িত্ব হোল বিপ্লবের প্রধান শক্তি কৃষকদের সংগঠিত করা এবং ক্ষমতা অধিকারের জন্যে সশস্ত্র সংগ্রামের দিকে এগিয়ে চলা। শ্রমিক-কৃষকের ঐক্যের ভিত্তিতে সমস্ত বিপ্লবী শ্রেণীর যুক্তফ্রন্ট গড়ে উঠবে। শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি হিসেবে কমিউনিস্ট পার্টি কৃষকদের সংগঠিত করবার প্রধান দায়িত্ব নেবে এবং ক্ষমতা অধিকারের জন্যে সশস্ত্রসংগ্রামের পথে এগোবে। এই কাজ সম্পাদনের জন্যে বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টিকে অবশ্যই অধ্যয়ন করতে হবে চেয়ারম্যান মাও-এর চিন্তাধারা, কেননা একমাত্র চেয়ারম্যান মাও-এর চিন্তাধারাই কৃষক জনসাধারণকে বিপ্লবী ফ্রন্টে এনে দাঁড় করাতে পারে এবং চেয়ারম্যান মাও-এর জনযুদ্ধের তত্ত্বই একমাত্র হাতিয়ার, যা দিয়ে আপাতদৃষ্টিতে দুর্বল বিপ্লবী শক্তি, আপাতদৃষ্টিতে শক্তিমান শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ এবং জয়ী হতে পারে। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে বিপ্লবী কৃষকের সংগ্রামের প্রধান কৌশল হোল গেরিলা যুদ্ধ। আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে চেয়ারম্যানের শিক্ষা, 'গেরিলা যুদ্ধই মূল কিন্তু সুবিধাজনক অবস্থায় প্রকাশ্য যুদ্ধের সুযোগ ছাড়া উচিত নয়।' পার্টির কর্তব্য কেবলমাত্র উক্ত কৌশলগুলি আয়ত্ত করাই নয়, সেইসঙ্গে কৃষি-বিপ্লবের মূল কার্যক্রমের পেছনে অন্যান্য বিপ্লবী শ্রেণীসমূহকেও সংগঠিত করা। (৪৫)

॥ দুই ॥

অনস্বীকার্য ও ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে সি. পি আই (এম. এল)-ই প্রথম সম্পূর্ণভাবে রাজনীতি ও পার্টি গড়ার কার্যক্রমে কৃষক ও কৃষিজীবী ভিত্তিক চিন্তা-ভাবনাকে অগ্রাধিকার দেয়। ১৭৬৩ সালে প্রথম কৃষক বিদ্রোহ 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহের' কাল থেকে বাংলায় ও ভারতবর্ষে বারংবার কৃষক বিদ্রোহ ঘটেছে, ১৮৭২-৭৩ সালের 'সিরাজগঞ্জ কৃষক বিদ্রোহের' আগে পর্যন্ত বিদ্রোহগুলির পেছনে কোন সাংগঠনিক প্রয়াস লক্ষিত হয়নি। এবং এই সংগঠনও কোনপ্রকার আকস্মিক ঘটনা নয়। এর পেছনে ছিল তাদের উনিশ শতকের কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাসের অভিজ্ঞতা। সুপ্রকাশ রায় লিখেছেন, '…সিরাজগঞ্জের কৃষক যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছিল তাহা ভারতের কৃষক-সংগ্রামের এক নূতন পথ নির্দেশ

করিয়াছে। ইহার পূর্বেও কৃষকগণ ঐক্যবদ্ধ হইয়া জমিদার মহাজন ও ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছিল। কিন্তু সিরাজগঞ্জের এই সংগ্রামের ক্ষেত্রেই কৃষকগণ সর্বপ্রথম কৃষক ঐক্যকে কৃষক-সমিতির মধ্যে (League) রূপায়িত করিয়াছিল। ইহা যেন পরবর্তীকালের নিখিল ভারত কৃষক সভারই অগ্রদূত স্বরূপ।'(৪৬) আর এই বিদ্রোহের ফলে প্রজা উচ্ছেদের নিরঙ্কুশ অধিকার দানকারী বিভিন্ন আইন রদ করে ইংরেজ শাসকদের বাধ্য করেছিল ১৮৮৫ সালের 'বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব-আইন' বিধিবদ্ধ করতে; ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং ১৮৫৯ সালের যে আইনের বলে জমিদারদের ইচ্ছেমত খাজনাবৃদ্ধি ও জমি থেকে কৃষকদের উচ্ছেদের অবাধ ক্ষমতাকে উক্ত আইন বহুলাংশে খর্ব করে। সঙ্ঘবদ্ধ কৃষক আন্দোলনের এই শক্তিই ১৯২০-২২ সালে খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের শরিক হয়। এর সামান্যকালের মধ্যেই বাংলার নদীয়া, নোয়াখালি, ত্রিপুরা প্রভৃতি জেলায় কৃষক সমিতি গঠিত হতে থাকে। এবং বিচ্ছিন্নভাবে হলেও কৃষক-আন্দোলন শ্রেণী আন্দোলন হিসাবে কিছুটা দানা বাঁধতে থাকে। ১৯২৬-২৭ সালে পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশের মত বাংলায়ও "ওয়ার্কার্স ও পেজেন্টস্ পার্টি' নামীয় কৃষক সংগঠন গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়। ১৯২৯ সালে কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের একাংশের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় 'নিখিল বঙ্গ প্রজা-সমিতি'। 'কৃষকদের মধ্যে সাংগঠনিক তৎপরতা বৃদ্ধির কারণ ছিল দুটি। প্রথমত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে শরিক হওয়ার ফলে কৃষকদের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি এবং দ্বিতীয়ত উনিশশো বিশের দিকে কৃষকদের অবস্থার দ্রুত অবনতি।' (৪৭) কিন্তু বাংলার কৃষকেরা ছিলেন অধিকাংশই মুসলমান এবং জমিদার মহাজনেরা অধিকাংশই হিন্দু। একারণেই কৃষক আন্দোলনের ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার আমদানি ঘটে। ১৯২৮ সালে আইনসভায় প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধনী বিতর্কের সময় অধিকাংশ হিন্দু সদস্যেরা ভোট দেন জমিদারের পক্ষে আর অধিকাংশ মুসলমান সদস্যেরা ভোট দেন প্রজার পক্ষে। ফলে অচিরাৎ প্রজা আন্দোলন মুসলিম আন্দোলনের রূপ নেয়। ১৯৪৫ সালের নভেম্বরে প্রকাশিত 'বাংলায় মুসলিম রাজনীতির পটভূমি ও পরিচয়' প্রবন্ধে প্রজা আন্দোলনের অন্যতম নেতা আবুল মনসুর আহমদ লেখেন, 'প্রজা আন্দোলন মুসলিম আন্দোলন। প্রমাণের যা কিছু বাকি ছিল, তাও প্রমাণিত হয়ে যাবে আগামী দু'চার বছরে। প্রজাস্বত্ব আইন, মহাজন আইন, প্রাথমিক শিক্ষা স্কীম, মাধ্যমিক শিক্ষা বিল প্রভৃতি যতগুলি গণকল্যাণের কাজ আইন-সভায় হলো, তার প্রায় সবগুলিকেই সমস্ত হিন্দু মেম্বর একযোগে বাধা দিলেন। প্রজা আন্দোলনের মত

এতবড় একটা গণ-আন্দোলনে হিন্দুরা কেন যোগ দিলেন না, জমিদারী উচ্ছেদের দাবীর মতো এতবড় একটা বিপ্লবী দাবীতে কংগ্রেসের মতো প্রগ্রেসিভ একটা দল কেন উৎসাহের সঙ্গে সহযোগিতা করলেন না, তার কারণ পাওয়া গেল ফ্লাউড কমিশনের তদন্তের সময়। এই কমিশনের কাছে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বড় বড় হিন্দু নেতা বললেন : জমিদারী প্রথার ওপর বাংলার কৃষি, বাংলার সাহিত্য এবং বাংলার অর্থ নৈতিক জীবনের কাঠামো প্রতিষ্ঠিত। এ প্রথা উঠিয়ে দিলে সে কাঠামো ভেঙে পড়বে এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সামাজিক জীবন বিপন্ন হবে।

এইবার ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে উঠলো। কেন প্রজা আন্দোলনে হিন্দু রাজনৈতিক নেতাদের সহানুভূতি ছিলো না, কেন অসাম্প্রদায়িক প্রগতিশীল গণ-প্রতিষ্ঠান কৃষক-প্রজা সমিতিতে হিন্দুরা উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় যোগ দিলেন না, এইবার সেটা বোঝা গেল। জমিদারী প্রথা উঠলে মুসলিম জনসাধারণের সঙ্গে হিন্দু চাষী-কুলেরও অর্থ নৈতিক মুক্তি আসবে, এটা ঠিক। কিন্তু হিন্দু সমাজের যে স্তর রাজনীতিতে নেতৃত্ব করেন, তাঁরা চাষী হিন্দুদের কেউ নন। এরা মধ্যবিত্তশ্রেণীর বর্ণহিন্দু মাত্র। জমিদারী প্রথা থেকে যে আট কোটির মতো টাকা বছরে প্রজাদের কাছ থেকে আদায় হয়, তার দশভাগের নয় ভাগই হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে বণ্টন হয়। কাজেই জমিদারী প্রথা উঠে গেলে এই মধ্যবিত্তশ্রেণীর অর্থ নৈতিক জীবনে বিষম ঝাঁকি লাগবে। কাজেই হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণী জমিদারী-প্রথা উচ্ছেদ করে অর্থ নৈতিক আত্মহত্যা করতে পারে না। আর এরাই হলেন হিন্দুদের রাষ্ট্রনেতা। কাজেই তাঁরা প্রজা-আন্দোলন ও প্রজা সমিতি থেকে দূরে থাকলেন।' (৪৮)

অবশ্য যে-মুসলমান নেতৃবৃন্দ প্রজা আন্দোলন গঠন করেছিলেন বা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁরাও কৃষকদের বন্ধু ছিলেন না। কারণ এই নেতাদের সঙ্গে কৃষক-প্রজার স্বার্থের কোন যোগ ছিল না। তারা প্রজা সমিতি বা কৃষক-প্রজা সমিতি গঠন করেছিলেন নিজেদের নির্বাচনী জয় ও অন্যান্য শ্রেণী স্বার্থ উদ্ধারের জন্যে। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে মুসলমান জমিদার-জোতদারদের দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত কৃষক-প্রজা সমিতি নির্বাচনী ইস্তাহারে বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী উচ্ছেদ, খাজনা হ্রাস, প্রভৃতি কার্যক্রম লিপিবদ্ধ করলেও নেতা ফজলুল হক সাহেব ঋণ সালিসী বোর্ড গঠন (১৯৩৮), প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৩৯), মহাজনী আইন (১৯৪০) ইত্যাদি কয়েকটি আইন পাস করা ছাড়া মূল সমস্যায় কিছুমাত্র হস্তক্ষেপের চেষ্টা করেননি। উনিশশো তিরিশের প্রথম থেকেই আন্তর্জাতিক সংকটের পরিণামে বাংলার কৃষকেরাও সংকটের মুখোমুখি হয় এবং তাদের মধ্যে সাংগঠনিক তৎপরতা বৃদ্ধি

পেতে থাকে। তাদের এই শ্রেণী-সংগঠনের চেতনাই 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা'র জন্মলাভ সম্ভবপর করে তোলে। পূর্বেকার নিখিল বঙ্গ কৃষক প্রজা সমিতির সঙ্গে উক্ত কৃষকসভার শ্রেণী পার্থক্য নির্দেশ করতে গিয়ে প্রথম বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনে (২৭-২৮ মার্চ, ১৯৩৭) এক লিখিত ভাষণে মুজফফ্‌র আহমদ বলেন, 'সকলেই জানেন কৃষক প্রজা সমিতির নাম প্রথমে শুধু নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি ছিল। প্রকৃত কৃষকগণেব সহিত উহার যোগাযোগ ছিল না বলিলেই চলে। অনেক প্রজাই কৃষক বটে, কিন্তু কৃষক মাত্রেই প্রজা নহে। যে সকল বড় বড় মধ্যস্বত্বভোগী কৃষকগণের শোষণের সহিত লিপ্ত রহিয়াছে তাহারাও প্রজা ব্যতীত আর কিছুই নয়। কাজেই প্রজা ও কৃষকের স্বার্থ সব সময় এক হইতে পারে না। নূতন আইনে কৃষকদের ভোটের অধিকার কিছু বাড়িয়াছে। তাই নির্বাচনের অল্পদিন পূর্বে নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি উহার নামের সহিত 'কৃষক' শব্দটিও জুড়িয়া দিয়াছে।...কৃষকদের সংগঠিত করিয়া তোলার কিংবা তাহাদের সংগ্রামের নেতৃত্ব করিবার কোনো উদ্দেশ্য যে নিখিল বঙ্গ কৃষক-প্রজা সমিতির ছিল এমন কোনো পারিচয় উহার কাজ হইতে পাওয়া যায় নাই।...কৃষকদের সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া তুলিয়া তাঁহাদিগকে তাঁহাদের দাবীদাওয়া পূরণের জন্য সংগ্রামেব পথে পরিচালনা করিবার উদ্দেশ্য যে নিখিল বঙ্গ কৃষক প্রজা সমিতির ছিল না তাহা এখন বেশ ভালোরূপেই বুঝিতে পারা যাইতেছে। কাজেই পৃথক বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা সংগঠনের যে অত্যধিক প্রয়োজন আছে, সে সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নই উঠিতে পারে না।' (৪৯)

কংগ্রেসের মধ্যেকার একটি শ্রেণী-সংগঠন হিসেবেই নিখিল ভারত কৃষক সভা ও বঙ্গীয় কৃষক সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলায় কংগ্রেসের মধ্যে জমিদার শ্রেণীর অপেক্ষাকৃত বেশি আধিপত্য থাকায় কৃষক সভার ওপর তাঁদের প্রভাব বিশেষ ছিল না। ফলে এই সংগঠনে বামপন্থী প্রভাবই ছিল বেশী এবং ১৯৪০-এর দিকে ত কার্যত কমিউনিস্ট পার্টির শাখা প্রতিষ্ঠান হিসেবে সংগঠিত হতে থাকে। 'জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনকে সমর্থন, জমিদার-মহাজন বিরোধী শ্রেণী-আন্দোলন গঠন এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন ও কৃষি বিপ্লব নিখিল ভারত কৃষক সভার নীতি এবং উদ্দেশ্য হিসেবে স্বীকৃত হয়।' (৫০) এইপ্রকার কার্যক্রম গ্রহণের ফলে জমিদার মহাজন প্রভাবিত কংগ্রেসের সঙ্গে কৃষক সভার সংঘাত দেখা দেয় অনিবার্যভাবেই। ১৯৩৯ সালে সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধ শুরু হওয়া, হিটলারের সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ, ইত্যাদির ঘটবার প্রেক্ষিতে কমিউনিস্ট পার্টির 'ফ্যাসীবাদ বিরোধী যুদ্ধ'

ও দেশরক্ষার স্লোগান আর কংগ্রেসের জাতীয় সংগ্রামের স্লোগান, কার্যত পরস্পর বিরোধী দুই শিবিরের লড়াই কৃষক সভাকেও নীতিগত লড়াইয়ে সামিল করে ; ফলে কংগ্রেসের সঙ্গে তার বিরোধও ১৯৪২-এ চরমে ওঠে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে সমগ্র ভারতে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের জন্য আন্দোলন জোরদার হয় ; ফলে বাংলার ভাগচাষীদের ওপর জমিদার-জোতদারদের আক্রমণ বাড়ে। মহামন্দার বছরগুলি থেকেই যথেষ্ট পরিমাণে জমি হস্তান্তর শুরু হয়েছিল ; ১৯৪০-এর মধ্যে মালিক-চাষীদের ক্রমবর্ধমান দখলীস্বত্ব হারানোর ফলে ভাগচাষীব সংখ্যা যথেষ্ট বদ্ধি পেয়েছিল। (৫১) ভূমি রাজস্ব কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে দ্রুত বর্গাদারদের সংখ্যাবৃদ্ধি বর্তমান কালের অন্যতম উদ্বেগের কারণ। বংশানুক্রমিক রায়তেরা দিনে দিনে যেভাবে তাদের মর্যাদা হারাচ্ছে এবং নিম্নমানের জীবনযাপনে বাধ্য হচ্ছে তা লক্ষণীয়। অনস্বীকার্য যে ভূমিস্বত্বেব আইনগুলো রায়তদের জমির মালিকানা দিয়েছে কিন্তু প্রকৃত চাষীদের বৃহত্তর অংশই জমির মালিকানার দ্বারা লাভবান হননি, সীমাহীন করের বিরুদ্ধে তাদের কোন রক্ষাব্যবস্থা নেই, যেমন নেই তাদের স্বত্বের কোন নিরাপত্তা। (৫২) মন্দাব সময় কালের মতই দুর্ভিক্ষের সময়েও (১৯৪৩) প্রচুর জমি মালিক-চাষীদেব হাত থেকে চলে যায় এবং তারা বর্গাদারে পরিণত হয়। সন্দেহ নেই, যে উক্ত জমিব ক্রেতাবা ছিল জোতদার ও ধনী চাষী সম্প্রদায়। দুর্ভিক্ষের সুযোগে এই জোতদাবেরা অধিকতর ধনী হয়ে ওঠে। অন্যদিকে এই জমিদার-জোতদাবদেব মাত্রাতিরিক্ত শোষণে বর্গাদার বা ভাগচাষীরা অর্ধাহারে অনাহারে দিনযাপনে বাধ্য হচ্ছিল। জমিতে বর্গাদারদের কোন অধিকার ছিল না ; ফসলের পঞ্চাশ শতাংশই তাকে তুলে দিতে হোত জোতদারদের হাতে, অথচ চাষের সমস্ত ব্যয়ভাব বহন কবতে হোত তাকেই। ফলে ক্ষেতের ধান ওঠবার পরও ফসলের অর্ধেক ঋণ শোধ ইত্যাদি মিলিয়ে চাষীর হাতই কেবল শূন্য হয় না, জোতদারের কাছে সে ঋণীই থেকে যায়। এবং আবার নতুন ঋণের জন্যে চাষীকে জোতদারেব দ্বাবস্থ হতে হয়।

বাংলার কৃষকদের অবস্থার এই প্রেক্ষিতে ১৯৪৬-৪৭ সালের 'তেভাগা আন্দোলন'। বঙ্গীয় কৃষক সভার নেতৃত্বে এই আন্দোলনের মূল দাবীগুলি ছিল: ( ) উৎপন্ন ফসলের তিন ভাগের দু'ভাগ চাই, (২) জমিতে ভাগচাষীকে দখলীস্বত্ব দিতে হবে (৩) শতকরা সাড়ে বারো ভাগের বেশি অর্থাৎ মণকরা ধানে পাচ সেরের বেশি সুদ নেই (৪) হরেক রকম আবহাওয়ার সহ বাজে কোন আদায় নেই (৬) রসিদ ব্যতীত কোন ভাগ দেওয়া নেই (৬) আবাদযোগ্য পতিত জমিতে

ফসল করতে হবে এবং (৭) জোতদারের পরিবর্তে ভাগচাষীর খামারে ধান তুলতে হবে। (৫৩) মুখ্যত এই দাবীগুলির ভিত্তিতে ভাগচাষী ও নির্যাতিত কৃষকেরা বাংলার উনিশটি জেলায় আন্দোলন সংগঠন ও পরিচালনা করেন। আধি ছাড়াও 'টংক' (সইয়া, 'সাজা, মকরাবাগা, ধানীখাজনা চুক্তিবর্গ, খাড়াভাগ অথবা গুলা ইত্যাদি নামেও বিভিন্ন জেলায় এই প্রথাকেই বোঝায়। প্রথায় একই প্রকারে ভাগচাষীরা শোষিত হতেন। এই প্রথা অনুসারে ফসল হোক বা না হোক, চাষীকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসল জোতদারকে দিতেই হোত। ১৯৪০ সালে ময়মনসিংহের এই প্রথা অনুযায়ী চাষী একর প্রতি ৭ থেকে ১৪ মণ ধান জোতদারকে দিতে বাধ্য থাকতেন। ফলে তেভাগা আন্দোলনের বিস্তারে সকল স্তরের নির্যাতিত কৃষকের দীর্ঘদিনের সঞ্চিত ক্ষোভই প্রকটিত হয় এবং কার্যত এই আন্দোলন পরিণত হয়েছিল কৃষকের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিরোধী, জমিদারপ্রথা-বিরোধী, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মুক্তি সংগ্রামে। কিন্তু নেতৃত্বের দুর্বলতা ও তাকে সংস্কারবাদী রাজনীতির মধ্যে সীমিত রাখবার প্রয়াসের ফলে, আন্দোলন শেষ পর্যন্ত বৈপ্লবিক রাজনৈতিক আন্দোলনের সহায়ক না হয়ে পরিণত হয়েছিল জঙ্গী অর্থনীতিবাদী সংস্কারবাদী আন্দোলনে। বদরুদ্দীন উমর লিখেছেন 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তখন সাধারণ সম্পাদক পূরণচাঁদ যোশীর নেতৃত্বে কংগ্রেস লীগের সাথে আপোষমূলক রাজনীতিকেই আকড়ে ধরেছিলো। সাম্রাজ্য-বাদের সাথে আপোষ ও চক্রান্তে লিপ্ত কংগ্রেস-লীগ নেতৃত্বের প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টি কোনো স্বাধীন ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেনি। সামন্ত-মুৎসদ্দি বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস-লীগকে পুরোপুরিভাবে জাতীয় বুর্জোয়াপার্টি আখ্যায় ভূষিত করে তারা সেই পর্যায়ে তাদের নেতৃত্ব স্বীকার করেই স্বাধীনতা আন্দোলনকে জোরদার করার নীতি অবলম্বন করেছিলো। সর্বোচ্চ পর্যায়ে কমিউনিস্ট পার্টির এই রাজনীতির ফলে তার প্রকাশ্য শ্রেণীসংগঠন কৃষক সভা কর্তৃক অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক আহ্বান দেওয়া সত্ত্বেও তেভাগা আন্দোলনকে সত্যিকার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণ-আন্দোলনের পথে চালনা করা তাদের দ্বারা সম্ভব হয়নি। এর ফলে অনেক সময় বাস্তবক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, কৃষকরা যেখানে সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত সেখানে মধ্যশ্রেণী থেকে আগত নেতা ও কর্মীরা কৃষকদের সংগ্রামের পথ থেকে সুকৌশলে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টায় নিযুক্ত থেকেছেন।' (৫৪)

এই মধ্যশ্রেণী সাধারণভাবে বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পুষ্ট জমিদারী ব্যবস্থার সঙ্গে ছিলেন গভীরভাবে সংযুক্ত। বৃটিশ আমলে এদেশে শিল্পোন্নয়ন নীতিগতভাবে

অবহেলিত হওয়ার ফলে বাংলার মধ্যশ্রেণী চাকরী ও পেশাগত প্রয়োজনে এই জমিদারী সংক্রান্ত কাজের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করতে বাধ্য হয়। ফলে উনিশ ও বিশ শতকে মধ্যশ্রেণীর তথাকথিত যাবতীয় উত্থান সত্ত্বেও, সামন্ত শোষণ ও সামন্ত অর্থনীতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সর্বদাই তার গাঁটছড়া বাঁধা থেকেছে। তদুপরি এ সত্য অনস্বীকার্য যে এদেশীয় সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি ও সংস্কৃতির ওপর বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অভিঘাতেই আধুনিক ভারতীয় মধ্যশ্রেণীর জন্ম। এবং শৈশবকাল থেকেই এই শ্রেণী পশ্চিমী মূল্যবোধে দীক্ষিত হয়েছিল। ফলে একদিকে এরা আমাদের বিশেষ ধরনের সামন্ততান্ত্রিক ঐতিহ্য থেকে উৎসারিত চরম প্রতিক্রিয়াশীল ধ্যানধারণাকে বহন করে চলছিল, এবং এর মূল এতই গভীরে ছিল যে আজ পর্যন্ত তা থেকে এই শ্রেণীর পরিত্রাণ মেলেনি। অন্যদিকে এরা একই সঙ্গে আধুনিক পশ্চিমী ধ্যানধারণার দাসত্বে বাঁধা পড়েছিল কারণ এরাই ছিল পশ্চিমের সবচেয়ে অগ্রসর সাম্রাজ্যবাদী দেশের প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাস। বাংলায় কংগ্রেসের কর্মসূচীর মধ্যে কোনদিন যে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের প্রশ্ন স্থান পায়নি, এটিই তার অন্যতম কারণ। পরন্তু তারা ভাগচাষী ও নির্যাতিত কৃষকদের ওপর জমিদার মহাজনের শোষণকে কায়েম রাখার সপক্ষেই উদ্যোগী হয়েছেন। ১৯২৮ সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধনের সময় বিধান পরিষদের কংগ্রেসী সদস্যেরা সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে কৃষক স্বার্থের বিপক্ষে ও জমিদারদের স্বার্থের পক্ষেই ভোট দিয়েছিলেন। এ-প্রসঙ্গে মুজফ্ফর আহম্মদ লিখেছেন, 'কংগ্রেস যাঁহাদের হাতে আছে তাঁহাদের অধিকাংশই কৃষকদের শোষণের সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছেন। এই কারণে কৃষকেরা সর্বদাই কংগ্রেসের লোকদিগকে সন্দেহের চোখে দেখিয়া থাকে।' (৫৫) অন্যপক্ষে তৎকালে মুসলীম লীগ সামন্ত-বুর্জোয়া সংগঠন হলেও তার রাজনৈতিক শক্তির মূল ভিত্তি ছিল কৃষকদের সমর্থন। একারণেই নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ অক্ষুণ্ণ রেখে যতটা সম্ভব কৃষকের স্বার্থরক্ষায় তারা বাধ্য হন। অবশ্য এর ফলে যে সাম্প্রদায়িক চরিত্র তারা উপস্থিত করেন, তা কৃষকের নবোদ্ভূত শ্রেণীচেতনাকে বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ করে। ময়মনসিংহের গফর গাঁয়ের জেলা লীগ সম্মেলনের (১২ জানুয়ারী, ১৯৪৬) গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়েছিল যে, 'যতদিন চিরস্থায়ী জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ না হইবে ততদিন মুসলিম জনসাধারণের অর্থনৈতিক আজাদী হাসিল হইবে না।' এ বক্তব্যের মধ্যে মূল সত্য প্রকটিত হলেও এর সাম্প্রদায়িক চরিত্র গোপন থাকেনি। এবং এমত রাজনৈতিক লড়াইয়ের মধ্যে কৃষকদের অবস্থার কিছুমাত্র উন্নতি তো হোলই না, পরন্তু তার রাজনৈতিক চেতনা ও সংগ্রামের ক্ষেত্রে বহুতর জটিলতা দেখা দিল।

১৯৪৭-এর আগস্টে ভারতবর্ষ যখন তথাকথিত রাজনৈতিক স্বাধীনতা পায় তখনকার কৃষি-অর্থনীতি সংকট-জর্জরিত অবস্থা কার্যত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শোষণ ও শাসনেরই পরিণাম। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বিশ্লেষণে ১৯৪৬-৪৭ সালের পূর্ববর্তী জমি-ব্যবহার ও শস্যফলনের যে চেহারা মেলে, তা হোল : (ক) একমাত্র উত্তরপ্রদেশ ছাড়া কোথাও নীট আবাদী এলাকা বাড়েনি ; অবশ্য একাধিক ফসল উৎপাদনকারী এলাকার বৃদ্ধি প্রায় ২০ শতাংশ হবার ফলে মোট আবাদী এলাকা কিছু বেড়েছে, যদিও জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে তা নগণ্য ; (খ) প্রধানত খাল সম্প্রসারণের ফলে সেচ এলাকা বেড়েছে ১০ শতাংশ কিন্তু ছোট সেচ-ব্যবস্থাধীন এলাকা প্রায় কিছুই বাড়েনি ; (গ) আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ১৯৪০ সালে ১৯১৯-২০ সালের তুলনায় যে সামান্য বেড়েছে, তা প্রধানত তুলা চাষের এলাকায়।(৫৬) অন্য একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত মোট ৪৫ বছরের মধ্যে মোট আবাদী এলাকা বেড়েছে প্রায় ১৮·৪ শতাংশ আর উক্ত সময়কালের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৩৭·৯ শতাংশ। অর্থাৎ মাথাপিছু উৎপন্ন হ্রাস পেয়েছে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৫১-৫৬) বিষয়টির সম্যক বিচার করে কৃষিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়। এখানে স্পষ্টত বলা হয়েছিল যে, আগামী পাঁচ বছরের জন্য সেচ ও বিদ্যুৎসহ কৃষির অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত। কারণ খাদ্য ও শিল্পের জন্যে প্রয়োজনীয় কাঁচামালের উৎপাদন ছাড়া শিল্পবিকাশের উচ্চগতি বজায় রাখা সম্ভব নয়। অবশ্য অনুন্নত অর্থনীতিতে কৃষি উৎপাদনের নিম্নমানের সঙ্গে শিল্পবিকাশের কোন প্রকৃত বিরোধ নেই। বলা চলে, উভয়ে পরস্পরের পরিপূরক। যা হোক, অর্থনীতির দিক থেকে এবং অন্যান্য দিক বিবেচনায়, প্রাথমিক কাজ হোল ভিত্তিতে অর্থনীতিকে শক্ত করা আর খাদ্য ও কাঁচামালের প্রাচুর্যের অবস্থা তৈরি করা। বিকাশের অগ্রগতির পথে এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। (৫৭) ফলে এই পরিকল্পনায় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়নের জন্যে ৩৫৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। কৃষিপণ্য উৎপাদনের লক্ষ্য ছিল নিম্নরূপ :

	১৯৫০-৫১	১৯৫৫-৫৬
খাদ্যশস্য (মিলিয়ন টন)	৫৪·০	৬১·৬
তুলা (লক্ষ গাঁইট)	২৯·৭	৪২·৩
পাট („ „)	৩৩·০	৫৩·৯
আখ (মিলিয়ন টন)	৫·৬	৬·৩
তেলবীজ („ „)	৫·১	৫·৫

কৃষি-উৎপাদনের ক্ষেত্রে এ পরিকল্পনায়, একমাত্র পাট ছাড়া, যথেষ্ট সাফল্য অর্জিত হয়। যেমন খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে ১৯৫৫-৫৬-র লক্ষ্য ছিল ৬১'৬ মিলিয়ন টন যা কার্যত উৎপাদিত হয় ৬৫'৮ মিলিয়ন টন। অর্থাৎ ১৯৫০-৫১ সালের তুলনায় ১৩'৩ মিলিয়ন টন অতিরিক্ত। কিন্তু যে সব অন্যান্য কাজের মাধ্যমে অথাৎ সেচসম্প্রসারণ, আবাদযোগ্য পতিতজমির পুনরুদ্ধার, ভূমিসংরক্ষণ, সার ইত্যাদি, কৃষি উৎপাদন বাড়াবার ক্ষেত্রে সাফল্যের প্রস্তাব করা হয়েছিল, তা প্রায় সবক্ষেত্রেই অপূর্ণ থেকে যায়। যেমন সেচের ক্ষেত্রে ১৯৫০-৫১ সালের মোট সেচের আওতাধীন জমি ৫০ মিলিয়ন একরকে বাড়িয়ে কমপক্ষে ৬৯'৭ মিলিয়ন একরে পৌছাবার লক্ষ্য ধার্য হয়। কিন্তু কার্যত পরিকল্পনা শেষে ৫৬'২ মিলিয়ন একরের বেশি বাড়ানো সম্ভব হয়নি। অথচ সেচের সুবন্দোবস্ত ছাড়া খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি অসম্ভব। এতদ্‌সত্ত্বেও যে কৃষিক্ষেত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি হয়েছিল, তার আসল কারণ প্রাকৃতিক আবহাওয়া। রোনাল্ড সেগাল বলেছেন, "তবু, সবটুকু বিচারে, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অর্জিত সাফল্যে দেশেব প্রয়োজনের তুলনায় রীতিমত ঘাটতি ছিল। এক অভূতপূর্ব ভালো আবহাওয়াব কারণেই উৎপাদন বৃদ্ধির বেশির ভাগটা হয়। কোরিয়ার যুদ্ধ ও তাব পববর্তী প্রতিক্রিয়াতে যে পণ্য বাজার জমে ওঠে, সেগুলিব সহায়তায় দেয় টাকাব বাকিটা দেওয়া সম্ভব হয়। যে কাঁচামাল ছিল তা থেকে পণ্য নির্মাণের হাবে উন্নতি হয়। কিন্তু সেচ, পতিত ভূমি উদ্ধার, উৎপাদিত সার, কাঁচা সার ও উন্নত বীজ বিতরণের কার্যসূচী দ্বারা উৎপাদনের যে সব নতুন উৎসের কথা ভাবা গিয়েছিল, তাতে কিন্তু সামান্যই বৃদ্ধি পায় উৎপাদন। সুশৃঙ্খল ও সুচিন্তিত কোন শস্য পরিকল্পনা ছিল না। আর অনুপস্থিত জমিমালিক—লোভী মহাজন-ঋণ জর্জরিত কৃষক—নিম্নতমের চেয়ে নিম্ন জীবনমানেব জমিহীন খেতমজুর, এই নিয়ে যে ধ্বংসমুখী, অবিবেকী গ্রামীণ কাঠামো গঠিত, তাকে সংস্কার কববাব চেষ্টা যৎসামান্যও হয়নি। আদ্যিকালের গ্রাম-ভারতের জীবনে গণতান্ত্রিক পরিকল্পনার প্রথম পরীক্ষা একটি ছোট্ট ঢেউও তুলতে পারেনি।" (৫৮)

১৯৫৬-র এপ্রিলে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ শুরু হয়, এ-পরিকল্পনায় যে চারটি মূল লক্ষ্য ছিল, তা হোল: (ক) জাতীয় আয় বাড়িয়ে দেশের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, (খ) দ্রুত শিল্পোন্নয়ন, বিশেষ করে ভারি শিল্প, (গ) চাকরীর সুযোগ-সুবিধা বাড়িয়ে তোলা এবং (ঘ) আয় এবং সম্পদেব অসমতা কমিয়ে আনা আর সেইসঙ্গে আর্থনীতিক ক্ষমতার আরো সুসম বণ্টন। প্রথম পরিকল্পনার তুলনায়, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বিনিয়োগের পরিমাণ

দ্বিগুণ করা হয়। এবং আনুপাতিকভাবে কৃষির তুলনায় শিল্পের ওপর গুরুত্ব আরোপিত হয়। এই পরিকল্পনায় যেখানে কৃষি ও গ্রামোন্নয়নের জন্যে ধার্য হয়েছিল ৫৬৮ কোটি টাকা, সেখানে শিল্প ও ধাতু-খাতে ধার্য হয়েছিল ৮৯০ কোটি টাকা। সংশোধিত কৃষিপণ্য উৎপাদনের লক্ষ্য ছিল নিম্নরূপ :

খাদ্যশস্য (মিলিয়ন টন)	৮০·৫
তুলা (মিলিয়ন গাঁইট)	৬ ৫
পাট („ „)	৫·৫
তেলবীজ (মিলিয়ন টন)	৭·৬

কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনার এই লক্ষ্যমাত্রা, বিশেষ করে খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে অপূর্ণই থেকে গিয়েছিল। পরিকল্পনাব শেষে খাদ্যশস্যেব উৎপাদন হয় ৭৮·০ মিলিয়ন টন, তুলা ৫·১ মিলিয়ন গাঁইট, এবং পাট ৪·০ মিলিয়ন গাঁইট। দ্বিতীয় পরিকল্পনা সামগ্রিকভাবেও তার লক্ষ্যমাত্রায় উপনীত হতে অপারগ হয়। এই পরিকল্পনাধীন পাঁচ বছরের সময়কালের মধ্যে পাইকারী মূল্য বৃদ্ধি পায় ৩০ শতাংশ। একমাত্র খাদ্যশস্যেই ২০ শতাংশ। শিল্পে ব্যবহার্য কাঁচা মালের ক্ষেত্রে ৪৫ শতাংশ। এভাবে গড়ে বছরে ৬ শতাংশ মূল্য বৃদ্ধি, বিদেশ থেকে অতিমাত্রায় পণ্য কেনার ফলে বৈদেশিক মুদ্রার প্রায় নিঃশেষিত অবস্থা দেখা দেয়, ফলে পরিকল্পনা কাটছাঁট করে সমূহ সর্বনাশের হাত থেকে দেশকে বাঁচানো হয়। এবং অবশেষে যদিও পরিকল্পনার ৪,৬০০ কোটি টাকা ব্যয়িত হয়, তথাপি মুদ্রাস্ফীতি তার প্রকৃত মূল্যকে কমিয়ে দেয়। এবং পরিকল্পনা-ধার্যের মাত্র চতুর্থ পঞ্চমাংশের লক্ষ্যে পৌছনো সম্ভব হয়। এবং জাতীয় আয় যদিও ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, কিন্তু ইতিমধ্যে জনসংখ্যা ১০·৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাওয়ায় তা শেষ পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়ায় ৯ শতাংশে। কৃষি-অর্থনীতির অচল অবস্থা প্রায় অপরিবর্তিত থেকে যায়।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার এই অভিজ্ঞতা থেকে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পবিকল্পনায় (১৯৬১-৬৬) কৃষিকে পুনর্বার অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জন ও শিল্পে ও রপ্তানির চাহিদা পূরণের জন্যে পর্যাপ্ত প্রাথমিক শস্য উৎপাদনকে গুরুত্ব দেওয়ার কারণ সমগ্রভাবে অর্থনীতির হার নির্ধারিত করার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক হোল কৃষি উৎপাদনের স্তর। এই পরিকল্পনায় কৃষি-উৎপাদনের লক্ষ্য ধার্য হয়েছিল ১০০,০০০,০০০ টন অথবা দ্বিতীয় পরিকল্পনায় উৎপাদনের চেয়ে শতকরা ৩০ ভাগের মত বেশি উৎপাদন। ফলে কৃষি সমষ্টি উন্নয়ন ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যয়ের পরিমাণ বেশিই ধার্য করা হয়। তুলনামূলকভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনার ব্যয়ের লক্ষ্য ধার্য হয় নিম্নরূপ : (৫১)

	দ্বিতীয় পরিকল্পনা (কোটি টাকার হিসাব)	তৃতীয় পরিকল্পনা (কোটি টাকার হিসাব)
কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন	৫৩০	১,০৬৮
বড় ও মাঝারি সেচ	৪২০	৬৫০
বিদ্যুৎ	৪৪৫	১,০১২
গ্রামীণ এবং ক্ষুদ্র শিল্প	১৭৫	২৬৪
পরিবহণ ও যোগাযোগ	১,৩০০	১,৪৮৬
শিল্প ও ধাতু	৯০০	১,৫২০
সমাজসেবা ও অন্যান্য	৮৩০	১,৩০০
বিবিধ	—	২০০
	৪,৬০০	৭,৫০০

প্রথম ও তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষি-র ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা সত্ত্বেও তা লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছতে সক্ষম হয়নি। এই ব্যর্থতার প্রেক্ষিতে ১৯৬৩ সালে ন্যাশনাল ডেভলপমেণ্ট কাউন্সিলের গৃহীত প্রস্তাবে পুনর্বার কৃষিকে 'অগ্রাধিকার' দেওয়া স্থির হয়। তাদের ধারণায় পরিকল্পনায় নীতিগতভাবে কোন ত্রুটি ছিল না, যেটি প্রয়োজন সেটা হোল কাজটিকে সার্থক রূপায়ণের জন্যে অধিক কর্মদক্ষতার। বক্তব্যটি যে অর্ধসত্য তা পরিকল্পনাগুলির ফলাফলের দিকে তাকালেই বোধগম্য হয়। তিনটি পরিকল্পনাকালে কৃষি ও গ্রামোন্নয়নের জন্যে রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগের ক্ষেত্রেই মোট ব্যয়ের পরিমাণ প্রায় ৩৭৫৭ কোটি টাকা; এছাড়া ব্যক্তিগত অংশেও ব্যয় হয়েছে বেশ কিছু টাকা। এর ফলে, সেচব্যবস্থায় জমি ও পুনরুদ্ধারপ্রাপ্ত জমির বৃদ্ধি হয়েছে বটে, কিন্তু তা সামান্যই। মোট উৎপাদনের ক্ষেত্রেও এই বৃদ্ধির পরিমাণ আশাপ্রদ নয়।

প্রকৃত প্রস্তাবে কৃষি-উৎপাদনের সঙ্গে বহু প্রাসঙ্গিক সমস্যা গভীরভাবে সংযুক্ত; এগুলি হোল, জাতীয় অর্থনীতির কৃষিনির্ভরশীলতার অবস্থা, কৃষির ওপর নির্ভরশীল জনসংখ্যার অনুপাতে কৃষকের মাথাপিছু উৎপাদন, জমির উৎপাদনী ক্ষমতার অবস্থা, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সঙ্গে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির হারের তুলনা। এবং এইসঙ্গে কৃষকের জীবনযাত্রার উন্নতি। বিষয়টির সম্যক অনুধাবনের জন্যে শাসক গোষ্ঠীর, পরিকল্পিত ভূমি সংস্কার সংক্রান্ত নীতি ও কৃষি উৎপাদনের দিকে দৃষ্টিপাত প্রয়োজন। সেচব্যবস্থা, সার, বীজ ও চাষের যন্ত্রপাতি নিজেরা মিলে কৃষি-উৎপাদনে কোন অলৌকিক কাণ্ড ঘটাতে পারে না। বিশেষ সামাজিক, আর্থনীতিক এবং শাসনব্যবস্থার প্রেক্ষিতে বিষয়টি কার্যকর হয়। এ কারণেই

প্রথম পরিকল্পনাতেই 'উন্নয়নের ক্ষেত্রে সাংগঠনিক ও কাঠামোগত বিষয়কে' গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। ভূমি সংস্কার আইন, পঞ্চায়েত ও গ্রামীণ প্রশাসনিক সংস্থাসমূহ, এবং সমষ্টি উন্নয়ন আন্দোলনকে ব্যাপক 'কাঠামোগত পরিবর্তনে'র লক্ষ্য হিসাবে গণ্য করা হয়। এবং এ কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য ছিল না 'কেবলমাত্র বর্তমান আর্থনীতিক সংস্থাগুলিকে আরো কর্মক্ষম করে তোলা বা অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া। যা প্রয়োজন, তা হোল ব্যবস্থার পরিবর্তন, যার ফলে অধিকতর কর্মদক্ষতাই অর্জিত হবে না, সেইসঙ্গে আসবে সাম্য এবং ন্যায়পরতা।' (৬০)

এই কাঠামোগত পরিবর্তনের কার্যক্রমের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল ভূমি সংস্কার। এই ভূমি-সংস্কার সংক্রান্ত প্রশ্নের সঙ্গে কৃষকজীবন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। পরিকল্পনায়ও নীতিগতভাবে এ-সত্যকে স্বীকার করে নিয়ে বলা হয়েছিল, 'লক্ষ লক্ষ ছোট কৃষকের ওপর এ-দেশের কৃষি উৎপাদন নির্ভরশীল। এই সমস্ত ছোট কৃষকের প্রচেষ্টার গভীরতা এবং কৃষিকাজের ক্ষেত্রে তাদের পরিচালন পদ্ধতির কার্যকারিতাই একর পিছু অধিক উৎপাদনের সহায়ক হবে।' (৬১) এ-পরিকল্পনায় আরো বলা হয়েছিল যে 'সম্ভবত জাতীয় বিকাশের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা বুনিয়াদী প্রশ্ন হোল জমির মালিকানা ও কৃষিকার্যের ভবিষ্যৎ। ভূমি-সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান কিভাবে করা হয় তারই ওপর অধিক পরিমাণে নির্ভর করে অর্থনৈতিক ও সংগঠনের ছকের ভবিষ্যৎ। আজই হোক বা কালই হোক, ভূমি-সংক্রান্ত নীতি ও আদর্শ সামাজিক অন্যান্য বিভাগের নীতিকে প্রভাবিত না করে পারে না।' (৬২) তদুপরি ভূমি নীতির কার্যকারিতার ফলশ্রুতি প্রসঙ্গে উক্ত প্রথম পরিকল্পনায় বলা হয়, 'বর্তমানে এবং আগামী বৎসরগুলিতে একটি ভূমি-নীতি যে পরিমাণে সম্পদ ও আয়ের অসমতা হ্রাস করবে, শোষণের অবলুপ্তি ঘটাবে, প্রজা ও শ্রমিকের জন্যে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে এবং সর্বোপরি গ্রামীণ জনসংখ্যার বিভিন্ন অংশের মধ্যে সামাজিক মর্যাদা ও সুযোগসুবিধার সমতা আনার প্রতিশ্রুতি দেবে, সে পরিমাণে ভূমি-নীতির ব্যবস্থাগুলির উপযোগিতা বিবেচিত হবে।' (৬৩) পরবর্তী পরিকল্পনাগুলির (দ্বিতীয় এবং তৃতীয়) মাধ্যমে নকশালবাদী আন্দোলনের (১৯৬৭) পূর্বকাল পর্যন্ত পরিকল্পনায় গৃহীত শর্তগুলি কতদূর পূরণ হয়েছে এবং কৃষকজীবনের বাস্তব অবস্থা কি দাঁড়িয়েছিল, তার আলোচনা এখানে কর্তব্য।

প্রাক স্বাধীনতা যুগে ভারতবর্ষে কৃষি অর্থনীতির উন্নয়নে প্রযোজ্য দুটি মত লক্ষ্য করা যায়। অর্থবিজ্ঞানের পরিভাষা অনুযায়ী একটিকে বলা যায় কাঠামোগত

দৃষ্টিভঙ্গি ও অন্যটি প্রায়োগিক বা প্রাযুক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি। কাঠামোগত দৃষ্টিভঙ্গির বক্তব্যানুযায়ী সমকালে প্রচলিত আধা সামন্ততান্ত্রিক কৃষি সম্পর্কের আমূল পরিবর্তন ব্যতীত কৃষির যথার্থ কোন উন্নতি অসম্ভব। প্রচলিত সমস্ত ভূমিব্যবস্থা, ভূমিবন্টনব্যবস্থা এবং উৎপাদনের প্রচলিত পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন সর্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। ভূমিব্যবস্থার পুনর্গঠন ও অসচ্ছল জমির খণ্ডবিচ্ছিন্ন দশার কুফল রোধের জন্যে জোতজমির পুনর্বন্টনব্যবস্থার প্রশ্নকে অগ্রাধিকার দিয়েই কৃষির ব্যাপক উন্নতির উদ্দেশ্যে উৎপাদন পদ্ধতিতে আধুনিককালের উপযোগী করতে অগ্রসর হতে হবে। প্রাযুক্তিক বা প্রায়োগিক দৃষ্টিভঙ্গির মতে কৃষিতে প্রযুক্ত সমস্ত বিজ্ঞানের অনুশীলন ও প্রয়োগের দ্বারাই কৃষির উন্নতি সম্ভব। বৃটিশ প্রশাসকদের মধ্যে এই প্রাযুক্তিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রাবল্য ছিল। ১৯২৬ সালে তাঁরা 'কৃষির উন্নতি ও গ্রামীণ জনগণের কল্যাণ ও সমৃদ্ধির' প্রয়োজনে রয়াল এগ্রিকালচারাল কমিশন নিয়োগ করেন। কিন্তু এই কমিশনকে তাদেব দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী পূর্বেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে 'প্রচলিত ভূমি মালিকানা এবং প্রজাগৃহ সম্পর্কে কিংবা ভূমি রাজস্ব ও সেচকরের ব্যাপারে কোন সুপারিশ করা চলবে না।' ইতিপূর্বে যদিও বৃটিশ সরকার, কৃষক অসন্তোষের চাপে প্রজাস্বত্বের নিরাপত্তার জন্যে 'বেঙ্গল রেণ্ট অ্যাক্ট, ১৮৫৯' পাস করতে বাধ্য হন, তথাপি অনস্বীকার্য যে এই আইনেব কার্যকারিতা প্রধানত জমিদারদের অধস্তন প্রজাদের স্বত্বেব ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ ছিল। অর্থাৎ এর দ্বারা কৃষি অর্থনীতির বনিয়াদী কাঠামো বা ভূমিব্যবস্থাব ক্ষেত্রে শ্রেণীসম্পর্ক অটুটই থেকে যায়। কার্যত প্রাযুক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি কৃষি এবং কৃষকের সম্পর্ককে সামগ্রিকভাবে বিচার করে না। এবং এ দৃষ্টিভঙ্গি তাদের ঔপনিবেশিক শোষণের যে মূল উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ করেছিল তা হোল ভারতবর্ষকে শিল্পে অনগ্রসর করে রেখে, কৃষি উপনিবেশ হিসাবে কৃষি উৎপাদন বাড়িয়ে চলা।

কাঠামোগত পরিবর্তনের পরিকল্পনায় ভূমি সংস্কারকেই প্রাথমিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। কৃষককে কৃষির উন্নতির জন্যে উন্নততর পদ্ধতি ও কলাকৌশল প্রয়োগে সহায়তা করার কাজটি পরবর্তী কার্যক্রম হিসাবে বিবেচিত। কারণ প্রচলিত ভূমিব্যবস্থায় জমির খণ্ড বিচ্ছিন্ন মালিকানা বৃহত্তর উৎপাদন ব্যবস্থার পরিপন্থী। প্রকৃত চাষী এবং রাষ্ট্রের মধ্যে বহু মধ্যস্বত্বভোগীর উপস্থিতি বর্তমান; চাষী প্রতিমুহূর্ত জমিদার ও জোতদারের দ্বারা জমি থেকে উৎখাত হবার ভয়ে শঙ্কিত; অতিমাত্রায় খাজনার ভার রায়তকে বহন করে চলতে হয়; দেনা ও তার সুদের দায়ে প্রকৃত কৃষক, মহাজনদের দাসে পরিণত হয়েছে, এতদ্‌ব্যতীত

জমিদারদের প্রাপ্য তো তাকে মেটাতেই হয়; তদুপরি কৃষিপণ্যের দামের ওঠা পড়ার ফলে কৃষকেরা দিনে দিনে সর্বস্বান্ত হচ্ছে; ফলে উন্নততর চাষের চিন্তা তাদের পক্ষে বাতুলতামাত্র। ১৯৪৭ সালে জে. সি. কুমারাপ্পা-র নেতৃত্বে যে 'কংগ্রেস অ্যাগরেরিয়ান রিফর্মস কমিটি' গঠিত হয় তা নিম্নলিখিত সুপারিশ করে: (ক) ভারতের কৃষি অর্থনীতিতে কোন মধ্যস্বত্বভোগী থাকবে না এবং জমির মালিকানা হবে প্রকৃত চাষীর; (খ) খাজনায় জমি নেওয়া চাষীর এবং রিজিওন্যাল ল্যাণ্ড ট্রাইবুনাল দ্বারা নির্ধারিত ন্যায্য মূল্যে, সে জমি কিনে নেবার অধিকার থাকবে। জমি কেনার জন্যে অর্থ সাহায্য করবে যোগ্য আর্থনীতিক সংস্থা। কমিটি জমি থেকে কৃষককে উচ্ছেদ বন্ধ করার এবং ল্যাণ্ড ট্রাইবুনাল কর্তৃক অবিলম্বে বর্গাদারের স্বত্ব নথিভুক্ত করার বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বনের সুপারিশ করেন। (গ) সে যে শ্রেণীর কৃষকই হোক না কেন, তার ওপর অতিমাত্রায় খাজনা ধার্য ও অন্যায় দোহন বন্ধ করতে হবে। ল্যাণ্ড ট্রাইবুনালই ন্যায্য খাজনা নির্ধারণ করবেন এবং খাজনা, ফসলের পরিবর্তে অর্থে দেওয়ার নিয়ম চালু করতে হবে। (ঘ) কৃষি ঋণ প্রসঙ্গে কমিটি মনে করেন যে পণ্যের চড়া দাম সত্ত্বেও কৃষক জনসাধারণের দেনা বেড়েই চলে। সে কারণে কমিটির সুপারিশ যে, কৃষকের দেবার ক্ষমতা ও দেনার মধ্যে সমতা আনবার জন্যে কাটছাঁট করতে হবে; কৃষি মজুরের ক্ষেত্রে দেনা সম্পূর্ণ মকুব করতে হবে। মহাজনদের নাম অবশ্যই রেজিস্ট্রি করা আবশ্যক এবং তাদের নিয়ন্ত্রণ করাও কর্তব্য।' (৬৪) কমিটির সুপারিশ অনুধাবনে এ-সত্য স্পষ্ট যে যথার্থ কৃষকের দ্বারা পরিচালিত একটি কৃষি-ব্যবস্থা যার পুরোভাগে থাকবে একদল সর্বোচ্চ জোতে চাষবাসকারী কৃষক, ছিল কমিটির লক্ষ্য। মালিক-শ্রমিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বৃহদাকার ধনতান্ত্রিক কৃষি সে লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

কিন্তু এই কৃষি-সংস্কার কমিটির সুপারিশগুলি যখন প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সরকারী ভূমিনীতি হিসাবে প্রকাশিত হোল, তখনই সুপারিশ ও নীতির মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য ধরা পড়ল। প্রথমত, কমিটির বক্তব্যে কৃষকের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছিল, যে প্রকৃত কৃষিকাজে অংশগ্রহণ করে এবং কায়িক শ্রম দান করে, সেই কৃষক। সর্বোচ্চ জোত রাখার ব্যাপারেও কৃষক মালিক ও অকৃষক মালিকের মধ্যে বৈষম্যমূলক ব্যবহারের সুপারিশ ছিল; তাতে বলা হয়েছিল যে কৃষক-মালিক অবাধে এই জোত রাখার অধিকার ভোগ করতে পারবে, কিন্তু অকৃষক মালিকের ক্ষেত্রে এটি ছিল শর্তসাপেক্ষ; যদি প্রজার হাতে লাভজনক জোতের পরিমাণ বেশি থাকে, তাহলে অকৃষক-মালিককে

সর্বোচ্চ জোত রাখার অধিকার দেওয়া যেতে পারে। এই ব্যবস্থা কার্যকর হলে জমি থেকে প্রজা উচ্ছেদের পাইকারি হার কমার সম্ভাবনা থাকতো। কিন্তু প্রথম পরিকল্পনার ভূমিনীতিতে জমি পুনর্গ্রহণের ব্যাপারে কৃষক মালিক ও অকৃষক মালিকের মধ্যে উক্ত ধরনের কোন পার্থক্য রাখা হয়নি। বরং আবার প্রজাকে দখলীস্বত্ব দেবার ব্যাপারটিকে মালিকের জমি পুনর্গ্রহণের অধিকারের শর্তসাপেক্ষে রাখা হোল। অর্থাৎ মালিকের জন্যে জমি পুনর্গ্রহণের অধিকারকে অগ্রাধিকার দেওয়া হোল। এইভাবে সমগ্র প্রজাশ্রেণীকে সম্পূর্ণ অথবা আংশিক-ভাবে উচ্ছেদের বিপদের মুখেই ফেলে '.. হোল। পরিণাম বিচারে দেখা গেল যে ব্যক্তিগত চাষের জমি পুনর্গ্রহণের অজুহাতে ব্যাপকভাবে প্রজা উচ্ছেদ করা হয় এবং কার্যত জমির কেন্দ্রীভবন অবস্থা একেবারেই হ্রাস পায়নি বা সামান্যই পেয়েছে। ফলে গ্রামাঞ্চলে উদগ্র শ্রেণীবৈষম্য ও অর্থনৈতিক অসমতা একই-ভাবে বিদ্যমান রইল অথবা তার তীব্রতা অধিকতর হোল।

কৃষি-সংস্কার কমিটির সুপারিশ ও সরকারী ভূমিনীতির দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রভেদ জমি ইজারা দেওয়ার ব্যাপারে। নাবালক বিধবা অথবা অশক্ত ব্যক্তির ক্ষেত্র ছাড়া জমি সাবলেট করার বিরুদ্ধেই মত দিয়েছিল কমিটি। কিন্তু পরিকল্পনার ভূমিনীতিতে, জমি ইজারা দেবার প্রথাকেই মেনে নেওয়া হয়, ফলে গ্রামাঞ্চল থেকে শহরাঞ্চলে মানুষের চলে যাবার প্রবণতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হোল। কার্যত এই ছোট জোতের মালিকদের অন্য আয়ের সন্ধানে শহরে যাওয়া আর বড় জোতের মালিকদের শহরে বাস করার মধ্যে ফলগত কোন ফারাক নেই। ফলে জমিদার প্রজা সম্পর্কের মধ্যে সামন্তবাদী শোষণের ব্যবস্থাই পাকা হোল।

তৃতীয়ত, কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী, 'প্রজা বলতে তাদেরই বোঝায়, যারা আইনসঙ্গতভাবে অন্যের মালিকানাধীন জমি চাষ করে।' পরিকল্পনার ভূমি-নীতিতে এই সংজ্ঞা গৃহীত হলে অধিক সংখ্যক ভাগচাষী কোর্ফাপ্রজাও প্রজার সংজ্ঞায় পড়তেন এবং স্বত্বের নিরাপত্তা লাভ করতেন। কিন্তু পরিকল্পনায় প্রজার সংজ্ঞায় এমন ফাঁক রেখে দেওয়া হোল যাতে চাষী উচ্ছেদের কোন বাধাই রইলো না।

এর ফলে : (১) জমি থেকে অকৃষক স্বার্থের অবলুপ্তি হয়নি। মোট জমির বিপুল অংশ প্রাক্তন জমিদারদের এবং বড় বড় জোতদারদের হাতে কেন্দ্রীভূত থেকে গেছে। এবং এর ফলে জমিদার-প্রজা শোষণযন্ত্র আজও থেকে গেছে। (২) মাত্র বিশেষ কয়েক ধরনের প্রজাই স্বত্বের নিরাপত্তা ও মালিকানা স্বত্বলাভ করেছেন। (৩) প্রকৃত চাষীর হাতে জমি আজও বাস্তবায়িত হয়নি। (৪)

ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সীমার কার্যকারিতা হস্তান্তর বন্ধ করার যথোপযুক্ত বন্দোবস্ত না থাকায়, প্রকৃতপক্ষে ব্যর্থ হয়েছে। সর্বোচ্চ সীমা নির্দিষ্ট করার কেন্দ্রীয় লক্ষ্য ছিল জমির পুনর্বণ্টন এবং পুনর্বণ্টনের মাধ্যমে জমির কেন্দ্রীভবন অবস্থা ঘোচানো এবং গ্রামাঞ্চলে অসাম্যের অবসান ঘটানো। এই লক্ষ্য আজও অপূর্ণ রয়ে গেছে। গ্রামাঞ্চলে ক্রমোচ্চ শ্রেণী বিভাগের শিখরদেশে থেকে গেছে: (ক) বড় বড় প্রাক্তন জমিদার—এরা ব্যাপকভাবে প্রজা উচ্ছেদ করে নিজ চাষ ইত্যাদি নানা ছলনায় প্রচুর জমি বজায় রাখতে পেরেছে। এদের কিছু অংশ ক্ষতিপূরণের টাকা দিয়ে কিছুটা ধনতান্ত্রিক চাষ প্রবর্তন করেছে। কিন্তু আগেকার জমিদার প্রজা সম্বন্ধ ব্যাপকভাবে বর্তমান এদের জমিতেও। (খ) ধনী চাষী—কৃষকদের উপরের স্তরের সামান্য কিছু অংশ নতুন ভূমি-আইনে নিজেদের অবস্থা সংহত ও উন্নত করতে সমর্থ হয় এবং মালিকানা স্বত্ব কিনে নিতে পারে। (গ) অধস্তন প্রজা—অসংখ্য ছোট কৃষক। এদের অবস্থা কিছুমাত্র উন্নত হয়নি। শুধু জমিদারের জায়গায় সরকারকে খাজনা দিতে হয় এটুকই পরিবর্তন হয়েছে। দরিদ্র অবস্থার জন্যে সরকারী সুযোগ সুবিধার কিছুই এরা ভোগ করতে পারে না। (ঘ) কোর্ফাপ্রজা, ভাগচাষী, খেতমজুর—এঁরা হলেন একেবারে নীচের তলার মানুষ। জমিতে এঁদের কোন স্বত্ব নেই, অথচ এঁরাই হলেন প্রকৃত চাষী। (৬৫)

পরিকল্পনা কমিশনের ভূমি-সংস্কার প্যানেলের প্রজাস্বত্ব কমিটি (the tenancy Committee of the Panel on Land Reforms of the Planning commission) প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ভূমিনীতির ফলাফল সম্পর্কে যে অভিমত প্রকাশ করে, তা এখানে উল্লেখ্য: 'কেবলমাত্র কয়েকটি রাজ্যে ভূমিনীতি কার্যকরভাবে কাজে পরিণত করা হয়। কয়েকটি রাজ্যে এখনও কার্যকর করা হয়নি। অন্য কয়েকটি রাজ্যে যে আইন তৈরি করা হয়েছে তা আকাঙ্ক্ষিত রিলিফ দিতে পারেনি। অন্ধ্রে প্রজারা এখনও স্বত্বের ব্যাপারে নিরাপত্তা লাভ করেনি। মাদ্রাজে কয়েকটি এলাকা বাদ দিলে এখনও প্রজার স্বত্ব নিয়মিত করা হয়নি; প্রজা উচ্ছেদ মাত্র সেদিন স্থগিত হয়েছে। ত্রিবাংকুর কোচিনে বর্গাদাররা এখন পর্যন্ত প্রজা হিসাবে স্বীকৃতি পায়নি। খাজনার উচ্চহার, যা কোন কোন ক্ষেত্রে মোট উৎপন্নের অর্ধেকের বেশি, এখনও অব্যাহত আছে। আমাদের এরূপ বিশ্বাস করার যুক্তিসংগত কারণ আছে যে উড়িষ্যাতে যদিও আইনত খাজনার হার হ্রাস করে মোট উৎপন্নের এক চতুর্থাংশ করা হয়েছে, তবু খাজনার প্রচলিত হার মোট উৎপন্নের অর্ধেক, আজও রেওয়াজ হয়ে রয়েছে।

একথা অনেকগুলি রাজ্যের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। পাঞ্জাব এবং পেপস্থ রাজ্যে কয়েকটি গ্রামে আমাদের তদন্তে প্রকাশ পেয়েছে যে, আইনত উচ্ছেদ নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও প্রজাদের জমি থেকে উচ্ছেদের সংবাদ পাওয়া গেছে বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে। এ প্রতীয়মান হয় যে বোম্বাইতে ১৯৪৮-৫১ সালের মধ্যে সংরক্ষিত প্রজার (protected tenants) সংখ্যা ১৭ লক্ষ থেকে হ্রাস পেয়ে ১৩'৬ লক্ষে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ ২০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। এই একই সময় তাদের হাতে জমির পরিমাণ ১৮ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। সম্প্রতি হায়দ্রাবাদ সরকার কর্তৃক পরিচালিত একটি তদন্তে প্রকাশ—১৯৫১-১৯৫৫ সাল এই চার বছরের মধ্যে বেশ বড় রকম প্রজা উচ্ছেদ হয়েছে। সংরক্ষিত প্রজা এবং তাদের হাতে জমি কমার হার ৫০ শতাংশ থেকে ৫৯ শতাংশ। ··বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তথাকথিত "স্বেচ্ছায় জমি প্রত্যর্পণের পরিণামেই প্রজারা জমিহারা হয়েছেন।" প্রজাস্বত্ব আইনগুলির ব্যর্থতা সম্পর্কে কমিটির মত হোল : 'আইনগুলিতে এমন সব ফাঁক ও ফাঁকি রেখে দেওয়া হয়, যা আইনগুলিকে বহুলাংশে অকার্যকর করে দেয়।' (৬৬)

এই প্রকার বহু তথ্যেই প্রমাণিত যে স্বাধীনতা লাভের বহু বছর পরেও কৃষি-সংকট কিছুমাত্র কমেনি, বরং বৃদ্ধি পেয়েছে। জমিদারী ও মধ্যস্বত্ব বিলোপ, জমির সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেওয়া, খাজনা নির্দিষ্ট করা, উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীন ও দরিদ্র চাষীদের মধ্যে বণ্টন, কৃষিঋণ কাঠামোর সংস্কার, সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা ইত্যাদি আইনগত ব্যবস্থাসমূহের দ্বারা কৃষি-কাঠামোতে কোন মৌলিক পরিবর্তন আসেনি। কৃষকের অবস্থা দিনে দিনে নিঃস্বতর হচ্ছে। জমিদার, জোতদার এবং মহাজনেরা একসঙ্গে কৃষি-সংস্কার আইনগুলির প্রয়াসকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করেছে আর ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রধানেরা কৃষিক্ষেত্রে ধনতান্ত্রিক বিকাশের সমস্ত পথকে রুদ্ধ করার প্রয়াসে এবং কোন কোন রাজ্যে আধাসামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের পুনরুজ্জীবিতকরণে বদ্ধপরিকর। জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির ফলে জমির ওপর চাপ ক্রমবর্ধমান ; খাজনার হারও বাড়ছে। এদেশে শিল্পবিকাশের হার মন্থর হবার কারণে ভূমিহীন চাষী ও দরিদ্র চাষীর কোন বিকল্প কর্মসংস্থান সম্ভব নয় ; ফলে প্রাক-ধনবাদী আর্থনীতিক বাধ্যবাধকতা এবং ধনবাদী শোষণের দ্বিবিধ চাপে তারা নিষ্পিষ্ট।

১৯৬১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী ভারতবর্ষের কৃষিকাজের সঙ্গে জড়িত মোট জনসংখ্যার ২৩ শতাংশ বা ৩১,০০০,০০০ জন খেতমজুর। এই ভূমিহীন ও ও দরিদ্র কৃষকের অবস্থা নিরীক্ষণের জন্যে ১৯৫০-৫১ এবং ১৯৫৬-৫৭ সালে

সরকার কর্তৃক দুটি অনুসন্ধান কমিটি নিয়োজিত হয়। এদের মতে চাষীদের দারিদ্র্য ক্রমবর্ধমান। উক্ত মোট সংখ্যার ১৬,৩০০,০০০টি খেতমজুর পরিবার দিনমজুরির উপর নির্ভরশীল। ১৯৫৬-৫৭ সালে এদের মধ্যে ৭৩ শতাংশ দৈনিক হারে কাজ পেত এবং কতদিন তাদের কাজ চলবে তারও কোন নির্দিষ্ট সময়-সীমা ছিল না। বাকি ২৭ শতাংশের অবশ্য কাজ থাকতো একটা নির্দিষ্ট সময়কালের জন্যে। এদের মধ্যে নাবালক মজুরের সংখ্যা ছিল ১৯৫০-৫১ সালে ২,০০০,০০০ এবং ১৯৫৬-৫৭ সালে ৩,০০০,০০০ জন। বয়স্ক পুরুষের মজুরি (নগদে ও খাদ্যে) ১৯৫০ সালে ছিল ১'০৯ এবং ১৯৫৬ সালে তা কমে গিয়ে দাঁড়ায় মাত্র '৯৬ পয়সায়। এবং নারী ও নাবালকদের মজুরি এর তুলনায় যে কম ছিল, তা অনুমেয়। সরকারের দ্বিতীয় অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্টে প্রকাশ যে ১৯৫০-৫১ থেকে ১৯৫৬-৫৭ সালের মধ্যে এই খেতমজুর পরিবার পিছু আয় কমে যায় প্রায় ১১ শতাংশ। ১৯৫০-৫১ সালে এদের পরিবার পিছু আয় ছিল বার্ষিক ৪৪৭ টাকা এবং খাদ্যদ্রব্যের যথেষ্ট মূল্যবৃদ্ধি সত্ত্বেও ১৯৫৬-৫৭ সালে ঐ আয় কমে গিয়ে দাঁড়ায় ৪৩৭ টাকায়। ফলে খেতমজুরদের পরিবারের পক্ষে বেঁচে থাকাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল সমস্যা। কৃষি-অনুসন্ধান কমিটির বক্তব্যে, ১৯৫৬-৫৭ সালে গড় ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৬১৭ টাকা, অর্থাৎ একটি খেতমজুর পরিবারের আয়ের চেয়ে ১৮০ টাকা বেশি।

কৃষি-সংস্কার কমিটি ১৯৫০ সালে বলেন, 'কৃষি-সংস্কারের যে কোন পরিকল্পনায় খেতমজুরের সমস্যা বাদ দেওয়াই হয়েছে এতকাল, তার মানে দাঁড়ায়, দেশের কৃষি-ব্যবস্থার এক রক্তাক্ত ক্ষতের আরামের কোন ব্যবস্থা না করা।' প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের চাপে রাজ্য সরকারগুলি খেতমজুরদের জন্যে ন্যূনতম মজুরির হার চালু করার আইন পাস করে। কিন্তু খেতমজুরেরা সাধারণভাবে নিম্নবর্ণ ও হরিজন সম্প্রদায়ের মানুষ; তাঁরা সামাজিক অসাম্য ও আর্থনীতিক শোষণের শিকার হিসাবে দিনযাপনে অভ্যস্ত। তাদের আইনগত অধিকার ইত্যাদি যারা জানে, তাদেরও তা প্রয়োগ করার উপায় জানা নেই। যারা ন্যূনতম মজুরির কথা জানে এবং তার জন্যে দাবী করেছিল, তাদের এমনকি দিনমজুরির সাময়িক কাজও জোটেনি। পরিণামে তারা সেইমত দাবী প্রত্যাহার করে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছে তাদের পুরোন সম্পর্কে। (৬৭) প্রকৃতপ্রস্তাবে জমিদারী প্রথার বিলোপ সাধারণ দরিদ্র বা ভূমিহীন কৃষকের অবস্থার কোনই পরিবর্তন আনতে পারেনি। 'তার মূল কারণ তিনটি। (১) কাগজে-কলমে সরকারের কাছে জমি ছেড়ে দিলেও, বড়ো ও মাঝারি জমি-

মালিকেরা সেই সমস্ত জমির কার্যকর মালিকানা দখল ক'রে রেখেছে আইন ফাঁকি দেওয়ার হরেকরকম উপায়ে। এটা প্রমাণিত হয়ে গেছে যে সরকার এই সমস্ত বেআইনী কার্যকলাপকে বাধা দেবার মতো শক্তি ধরে না। (২) আইনত জমি হাতে পেলেও, অনাহারক্লিষ্ট, ঋণ-প্রপীড়িত দরিদ্র কৃষকের পক্ষে তা ধরে রাখা সম্ভব হয় না। (৩) যে-কাঠামোয় গরিবরা অসহায়ভাবে গরিব ও অসংগঠিত, সেখানে গরিবকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে সরকারের প্রায় যে কোন পদক্ষেপই যে অবশেষে সাহায্য করবে ধনীদের, এটা অবধারিত, দু'একটি বিশেষ উদাহরণ দিলে এটা বোঝা যাবে। গরিব কৃষকদের সহজ পরিশোধ্য স্বল্পমেয়াদী ঋণ দেবার উদ্দেশ্য নিয়ে স্থাপিত হয়েছে কিছু কৃষি-ঋণ সমিতি ('ক্রেডিট সোসাইটি')। কিন্তু এর প্রত্যেকটি নিয়ন্ত্রণ করছে গ্রামীণ ধনীসম্প্রদায় বা তাদের এজেন্টরা। ফলত ঐ সব সমিতি গরিব কৃষককে (শস্য অথবা সার, অথবা ঋণদানকারী) মহাজনদের কবল থেকে বাঁচাতে পারে না। ঐ-অর্থের বেশির ভাগটাই গিয়ে পড়ে ধনীদের (অর্থাৎ বড়ো ও মাঝারি জমিদারদের) হাতে। তারা ঐ অর্থকে কাজে লাগায় নিজেদের চাষবাসকে আরো উন্নত করতে বা বাড়াতে; অথবা ঐ টাকাটাই প্রচণ্ড চড়া সুদে ধার দেয় (টাকা বা সার বা শস্য হিসাবে) দরিদ্রতম কৃষকদের। ঐ দরিদ্র কৃষকদের জন্যেই নাকি 'ক্রেডিট সোসাইটির' টাকা, অথচ প্রতিপত্তি না থাকায় তারা ঐ টাকা প্রায় ছুঁতেই পারে না। খালের জল নিয়েও ধনীরা ঠিক একইভাবে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে: বঞ্চিত হয় গরীব কৃষকেরা। অথচ অন্যান্য উপকরণ থেকে বঞ্চিত হবার ফলে ঐ-জলে গরীব কৃষকদের প্রয়োজনটাই সবচেয়ে বেশি। মুনাফাবাজ দালালদের উৎখাত করার উদ্দেশ্যেই স্থাপিত হয়েছে স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশনগুলি; অথচ সেগুলি প্রায় সেই দালালদের মাধ্যমেই বাণিজ্য চালায়। ফলে জন্ম হয়েছে একটা ভয়ঙ্কর প্রক্রিয়ার, যা ধনীকে ক্রমাগত ধনী করছে, গরীবকে করছে আরো গরিব।' (৬৮)

ভূমি-সম্পর্কের ক্ষেত্রে সংস্কারের কর্মসূচী ব্যর্থ ও বিপর্যস্ত দেখে সরকার ষাটের দশকে নিবিড় কৃষিউন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করেন। এই কর্মসূচীতে উচ্চফলনশীল বীজ গুরুত্ব পায়। পাঞ্জাব হরিয়ানায় এই প্রকল্প যথেষ্ট কার্যকর রূপ নেয় এবং উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়। আর মুখ্যত এ-সাফল্যকে কেন্দ্র করে 'সবুজ বিপ্লবে'র প্রচার চলতে থাকে। কিন্তু এই প্রচার যে নিতান্তই ফাঁকা বুলি, তা বুঝতে বেশি সময় লাগেনি দেশের সাধারণ মানুষের; কারণ 'সবুজ বিপ্লব' বলতে বোঝায় বর্তমান আধাসামন্ততান্ত্রিক কৃষিকে যন্ত্র চালিত বৃহদায়তন পুঁজিতান্ত্রিক

কৃষিতে রূপান্তরিত করা। কিন্তু এই পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশ ঘটাবার জন্যে প্রয়োজন পাশাপাশি বড় বড় প্লট জমি, সেচের জন্যে অপর্যাপ্ত জল, ভাল জাতের সার, এবং বহু সংখ্যক উচ্চ শক্তি সম্পন্ন ট্র্যাক্টর। তদুপরি প্রয়োজন কৃষিজাত পণ্যাদির জন্যে লাভজনক খোলাবাজার, অথবা শিল্পজাত ভোগ্য পণ্যগুলির দাম কম হওয়া', যার ফলে কৃষিজাত পণ্যের দাম আপেক্ষিকভাবে বেশি হবে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে ঘটনাটি সম্পূর্ণ উল্টো। অর্থাৎ পাশাপাশি বড় প্লট অনেকগুলো পাওয়া অসম্ভব কারণ ভূমির অতি খণ্ডিত চেহারা আজ পর্যন্ত বর্তমান; দেশের অধিকাংশ জায়গাতেই সেচের ব্যবস্থা না থাকায় পর্যাপ্ত জল পাওয়া অসম্ভব; সারের ঘাটতি তো আছেই; আর ট্রাক্টরের উৎপাদন ও স্থায়িত্ব বিষয়ে বেশি কিছু না বলাই শ্রেয়। সুতরাং বর্তমান অবস্থায় ধনী 'কৃষক উক্ত পুঁজিতান্ত্রিক চাষের জন্যে উৎসাহিত হবে বা দায় বহন করবে, এমন ভাবাও বাতুলতা। এতদ্‌সত্ত্বেও পাঞ্জাব ও হরিয়ানার 'সবুজ বিপ্লবে'র নামে ভূমিতে যে সামান্য পরিমাণ পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশ লক্ষ্য করা যায়, তার কারণ সেখানকার বিশেষ রায়তওয়ারী স্বত্ব ব্যবস্থা যা ভারতের অন্যরাজ্যে সাধারণভাবে বর্তমান নয়।

কিন্তু এর পরিণাম কি? 'সবুজ বিপ্লবে'র অন্যতম কেন্দ্র পাঞ্জাবে ছোট চাষী, লীজ নেওয়া চাষী ও প্রজাচাষীর অর্থনীতিক দুরবস্থা বেড়েছে। গ্রামাঞ্চলে শ্রেণীবৈষম্য প্রকটতর হয়েছে। বহু ভূস্বামী এবং বিত্তবান চাষী জমি পুনর্গ্রহণের পণ ধরায় চাষীদের খাজনার বোঝা বেড়ে গেছে। যে সমস্ত বড় ও মাঝারি চাষীর জোতজমির আয়তন ২৫ একর বা তার বেশি, তাদের পক্ষেই মূলধনগঠন সামান্যাংশে হলে সফল হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে কৃষি জমির মাত্র ১২ থেকে ১৫ শতাংশ সবুজ বিপ্লবের আওতায় এসেছে এবং বাকি ৮৫ শতাংশ জমিতে এখনো পুরোন কৃষিপদ্ধতি চলছে। অর্থাৎ বড় বড় জোত জমির মালিকেরা সামান্য পরিমাণ জমিতেই আধুনিক কৃষিব্যবস্থা চালু করেছেন, এবং বাকি বৃহদাংশ প্রজাবিলি করেছেন। চাষী উচ্চহার খাজনায় এই সমস্ত জমি চাষ করছে।

সর্বোপরি স্মরণীয় যে আমাদের দেশে শিল্পক্ষেত্রেও পরিবর্ধমান উৎপাদন চক্রের কোন সুদৃঢ় ভিত্তি নেই; শিল্পায়নের গতি অতীব মন্থর। ফলে কৃষিক্ষেত্রের উদ্বৃত্ত শিল্পে নিয়োগ সম্ভাবনা সীমাবদ্ধ। জমির মূল্য এবং খাজনা বৃদ্ধি ক্রমাগত ঘটছে। অ-অর্থনৈতিক এবং অর্থনৈতিক চাপ এই দুটির যৌথতায় মজুর-চাষী কিংবা চাষী-মজুর অত্যধিক খাজনায় ইজারা গ্রহণ করে, উৎপন্নের বড় অংশও জমিদার, মহাজন, জোতদার, ধনীচাষী কুক্ষিগত করতে পারে। যেহেতু এই মজুর-চাষীরা পারিবারিক শ্রমের সাহায্যে চাষ করে এবং মাথাপিছু ভোগকে

সর্বনিম্নস্তরে (দারিদ্র্য-সীমারও নিচে) নিয়ে যেতেও পিছপা নয়, সেই হেতু জমিতে প্রান্তিক শ্রমের উৎপাদন শূন্য করেও এরা মোট উৎপাদন একর পিছু বাড়াতে সক্ষম। এদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পুঁজিবাদী চাষ কম অর্থকরী। ফলে আধাসামন্ততান্ত্রিক, প্রাকধনবাদী শোষণ-সম্পর্কের অবসান-সম্ভাবনা সুদূর পরাহত। পণ্য অর্থনীতির প্রসার, মুদ্রার বিকাশমান ক্ষেত্র, ব্যবসা-বাণিজ্যের বৃদ্ধি এই সামন্ততান্ত্রিক শোষণকে পুঁজিবাদী শোষণের সঙ্গে অন্তর্গ্রথিত করে এক বিচিত্র অন্তর্বর্তী উৎপাদন সম্পর্ক সৃষ্টি করেছে। প্রধানত সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতিক-কাঠামোয় চাপিয়ে দেওয়া পুঁজিবাদী বাজার সম্পর্ক ধনতন্ত্রের বিকাশের গতিকেই রুদ্ধ করেছে। একথা বলা হয়তো ভুল হবে না যে স্বাধীনতা পরবর্তী ভূমি-সংস্কার আইনগুলি সামন্ত-শোষণের অবসান না ঘটিয়ে বরং সামন্তবাদী শোষণ ব্যবস্থার সঙ্গে রফা করতেই সমুৎসুক ছিল; লাতিন আমেরিকার লাতিফানদিয়ার মালিকেরা যেভাবে পুঁজিপতি জমিদারে পরিণত হয়েছে, লেনিন কথিত সেই প্রুশীয় পদ্ধতিতে কৃষিতে ধনতন্ত্র বিকাশের ধারাকেই এদেশের সরকার প্রচ্ছন্ন সমর্থন জানিয়েছেন।

'ভারতীয় কৃষির এই অচল অবস্থা অবিশ্বাস্য হলেও অত্যন্ত বাস্তব। এর প্রত্যক্ষ কারণগুলি আমরা বিশ্লেষণ করলাম। কিন্তু শেষ বিচারে ভারতবর্ষের সুনির্দিষ্ট বাস্তব পরিস্থিতিতে নিয়ন্ত্রণকারী সাম্রাজ্যবাদীদের নয়া-ঔপনিবেশিক চক্রান্তই হোল এর মূল কারণ। এই পলিসির লক্ষ্য হলো, অনুন্নত দেশগুলিতে বিশেষ করে ঐ সমস্ত দেশের কৃষিব্যবস্থায়—আধাসামন্ততান্ত্রিক অচলাবস্থার মূল পরিস্থিতিকে জিইয়ে রাখা যাতে করে সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের অর্থ-পুঁজি ও উন্নততর প্রযুক্তিবিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে এই পশ্চাদপদ অর্থনীতিকে নিজেদের বিপুল সুবিধার্থে নিয়ন্ত্রণ করে চলতে পারে।' (৬৯)

পশ্চিমবঙ্গ এবং ভারতবর্ষের উপরোক্ত কৃষি-অর্থনীতিও কৃষি-সম্পর্কের প্রেক্ষিতে নকশালবাড়ীর কৃষক-সংগ্রামের সূত্রপাত। হিমালয়ের এই তরাই অঞ্চলে গরীব এবং ভূমিহীন চাষীর সংখ্যা ৭০ শতাংশ মাঝারি কৃষক ২০ শতাংশ এবং ধনী কৃষকের সংখ্যা ১০ শতাংশ। ১৯৬৭-র মার্চে শিলিগুড়ি মহকুমার কৃষক কনভেনশনের ডাকে নকশালবাড়ী আন্দোলনের মূল বক্তব্যগুলি ছিল। (১) গ্রামের সমস্ত ব্যাপারে কৃষক কমিটিগুলির কর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠা, (২) জোতদার ও গ্রামীণ প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রতিরোধ চূর্ণ করতে সশস্ত্র এবং সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে এবং (৩) জোতদারের একচেটিয়া জমির মালিকানা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে, সেই জমিগুলি কৃষক কমিটি মারফত কৃষকদের মধ্যে বিলি করতে হবে। (৭০)

পার্টি গড়ার আগে, পরে এবং প্রায় সমস্ত ভারতে আন্দোলন চলাকালীন অবস্থায় সি. পি. আই. (এম. এল.) দলের মুখ্য বক্তব্য ছিল এগুলিই। ১৯৬৮ সালে 'বিপ্লবী পার্টি গড়ার কাজে হাত দিন' নামীয় প্রবন্ধে চারু মজুমদার লেখেন, 'চেয়ারম্যান আমাদের শিখিয়েছেন যে একটা আধা-সামন্ততান্ত্রিক, আধা-ঔপনিবেশিক দেশে জনতার ব্যাপক অংশ হচ্ছে কৃষক এবং এই কৃষকের ওপর তিন পাহাড়ের শোষণ ও শাসন—যেমন সাম্রাজ্যবাদ, শাসনতন্ত্র এবং আমলাতান্ত্রিক পুঁজি—চলে এবং তাই এই কৃষক শ্রেণী বিপ্লবের জন্য অত্যন্ত আগ্রহী। তাই শ্রমিকশ্রেণীকে জনযুদ্ধের মারফত জয় হাসিল করতে হলে এই কৃষকশ্রেণীর উপব নির্ভর করতে হবে। চেয়ারম্যান আমাদের শিখিয়েছেন যে এই কৃষকশ্রেণীই হচ্ছে বিপ্লবের প্রধান শক্তি এবং কৃষকশ্রেণীকে জাগ্রত এবং সশস্ত্র করার উপরই বিপ্লবের সাফল্য নির্ভর করে। শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টির দায়িত্ব কৃষকদেব মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে পড়ে থেকে গ্রামাঞ্চলে সশস্ত্র সংগ্রামের এলাকা গড়ে তোলা। এই কৃষকসমস্যার গুরুত্ব না বোঝার ফলেই পার্টির মধ্যে বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি দেখা দেয়। এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লব মূলতঃ কৃষি-বিপ্লব।' (৭১) নকশালবাড়ী বিদ্রোহের অব্যবহিত পরে ১৯৬৭-র ৫ জুলাই তারিখে 'পিপলস্ ডেইলি' পত্রিকার বিখ্যাত সম্পাদকীয়তেও এই মর্মে পথের নির্দেশ ছিল: ভারতীয় বিপ্লব কোন পথে এগোবে। এই মৌলিক প্রশ্নটির ওপরেই নির্ভর, করছে বিপ্লবের সাফল্য বা ব্যর্থতা এবং পঞ্চাশ কোটি ভারতীয় জনতার ভবিষ্যৎ, ভারতীয় বিপ্লবকে অবশ্যই গ্রহণ কবতে হবে কৃষকদের ওপর নির্ভর করবার, গ্রামাঞ্চলে ঘাঁটি এলাকা স্থাপন করার গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার এবং সর্বশেষে শহর দখল করার পথ।' ঐ বছরের নভেম্বর মাসে সি পি এমের বহিষ্কৃত ও দলত্যাগী সদস্যদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত 'বিপ্লবীদের সারাভারত সমন্বয় কমিটি'র কর্মসূচীতেও ঘোষিত হয়েছিল, যে (ক) সর্বস্তরের জঙ্গী ও বিপ্লবী সংগ্রামগুলিকে এবং বিশেষ করে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বাধীন নকশালবাড়ীর ধাঁচের কৃষক সংগ্রামগুলিকে গড়ে তুলতে এবং সমন্বয় সাধন করতে হবে; এবং (খ) অর্থনীতিবাদকে রোখাব জন্যে এবং সংগ্রামগুলিকে কৃষি বিপ্লবের অভিমুখী করার জন্য সর্বস্তরের শ্রমিক-শ্রেণী ও মেহনতী জনগণের জঙ্গী বিপ্লবী সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে। (৭২) ১৯৬৮ সালের ১৪ মে উক্ত কমিটি তার নাম পরিবর্তন করে নতুন নামকরণ করে কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের সারাভারত সমন্বয় কমিটি। এই কমিটি তার ঘোষণা পত্রে বলে যে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে বিপ্লবের প্রধান শক্তি কৃষকশ্রেণীকে গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবী ঘাঁটি তৈরি করতে হবে, দীর্ঘকালীন সশস্ত্র লড়াই চালাতে হবে। গ্রামাঞ্চল

থেকে শহরগুলিকে ঘিরে ফেলে এবং শেষে সেগুলিকে দখলের মাধ্যমে দেশব্যাপী চূড়ান্ত জয় অর্জন করতে হবে। (৭৩) সি. পি. আই (এম. এল.)-র রাজনৈতিক প্রস্তাবেও কৃষি-বিপ্লবকেই প্রাথমিক ও প্রধান কার্যক্রম হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে বলা হয় যে ভারতবর্ষের বিপ্লবের বর্তমান পর্যায় হোল এক নতুন ধরনের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব, যার প্রধান বিষয়বস্তু হোল কৃষি-বিপ্লব ও গ্রামাঞ্চলে সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ। (৭৪) এবং এই তত্ত্ব ও রাজনৈতিক কার্যক্রমকে সফল করার জন্যে সি. পি. আই (এম. এল)-এর ক্যাডার ও নেতারা চারু মজুমদার নির্দেশিত যে একমাত্র পন্থা অবলম্বন করেন, তা হোল শ্রেণীশত্রু অর্থাৎ প্রতিক্রিয়াশীল বৃহৎ জোতদারদের ছোট ছোট গেরিলা স্কোয়াডের মাধ্যমে গোপনে বা প্রকাশ্যে খতম করা। এর ফলে অন্ধ্রপ্রদেশ গ্রুপের সঙ্গেই যে এদের মতপার্থক্য আরো বৃদ্ধি পেল তাই নয়, সেই সঙ্গে পশ্চিমবাংলার যে ট্রেড-ইউনিয়ন কর্মীরা মনে করতেন যে শ্রমিকশ্রেণীকে সংগঠিত না করে বিপ্লব করা অসম্ভব, তাদের পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হয়। ১৯৭০ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত পার্টি কংগ্রেসের কর্মসূচীতেও কৃষি-বিপ্লবকেই এদেশের বিপ্লবের অন্তর্বস্তু হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

পরবর্তীকালে নকশালবাড়ী আন্দোলন প্রসঙ্গে অসীম চ্যাটার্জীও লেখেন, 'ভারতীয় কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস নির্ণায়করূপে দেখিয়ে দেয় যে, নকশালবাড়ীর কৃষক অভ্যুত্থান কোন আকস্মিক ঘটনা নয়; কোন ব্যক্তিবিশেষের সৃষ্টি নয়। নকশালবাড়ীর সংগ্রাম ভারতীয় বিপ্লবের পথের মৌলিক প্রশ্নে দুই লাইনের সংগ্রামের ফলশ্রুতি। তেলেঙ্গানায় একদা সশস্ত্র কৃষক অভ্যুত্থানের যে মশাল জ্বলে উঠেছিল, দীর্ঘ ১৬ বৎসরের লাগাতার প্রচেষ্টায় দার্জিলিং জেলার কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের নেতৃত্বে আবার তা নতুন করে নকশালবাড়ীতে প্রজ্বলিত হয়েছে। রাজনীতিগতভাবে নকশালবাড়ীর কৃষক সংগ্রাম তেলেঙ্গানার কৃষক সংগ্রামেরই ধারাবাহিকতা বহন করছে। আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় অভিজ্ঞতা কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের অনেক সচেতন করেছে। তাই যান্ত্রিক পার্টি শৃঙ্খলার বাঁধনে নকশালবাড়ীকে আটকে রাখা যায় নি। শোধনবাদী নেতৃত্ব তথা যান্ত্রিক শৃঙ্খলার নাগপাশ ছিন্ন করে সশস্ত্র কৃষিবিপ্লবের লাল পতাকাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে নকশালবাড়ীর কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা ন্যায়সঙ্গত বিদ্রোহ করেছেন এবং দৃঢ় মতাধিষ্ঠান গ্রহণ করেছেন। নকশালবাড়ীর সংগ্রাম টিকে রয়েছে কিনা একমাত্র তার উপর নকশালবাড়ীর তাৎপর্য নির্ভর করে না, নকশালবাড়ীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য হোল এই যে দীর্ঘ ১৬ বছর পর এই সংগ্রাম ভারতীয় বিপ্লব কোন পথে

অগ্রসর হবে এই মৌলিক প্রশ্নটি সজোরে কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের সামনে উপস্থিত করেছে এবং শোধনবাদের শিকল ছিঁড়ে ফেলে ভারত কাঁপানো সশস্ত্র কৃষক-সংগ্রামের ঝড় উঠিয়ে সশস্ত্র কৃষি বিপ্লবের পথ নির্দেশ করেছে। এই কারণে নকশালবাড়ির প্রকৃত শিক্ষা কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ।' ।৭৫

উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলি ও তথ্যাদি থেকে এ-সত্য প্রমাণিত যে সি. পি আই (এম-এল)-ই প্রথম ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি যাঁদের একমাত্র কর্মসূচী ছিল গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে বিপ্লব সংগঠিত করা এবং পরবর্তী পর্যায়ে এ-পথেই সমস্ত ভারতবর্ষে অভ্যুত্থান ঘটানো। তাঁদের ধারণায় শ্রমিকশ্রেণী অর্থনীতিবাদের পাঁকে নিমজ্জিত; তার ফলে নিজেদের বিপ্লবী সত্তা তারা হারিয়েছে এবং বিপ্লবের নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতাও আর তার নেই। সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে কব্জা করে ফেলেছে প্রতিক্রিয়াশীল ও সংশোধনবাদীরা; সুতরাং ওগুলোতে অংশ গ্রহণ করা অর্থহীন। একারণেই তাঁদের মতে, 'সশস্ত্র কৃষি বিপ্লবের জয়লাভের মধ্যেই শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির একমাত্র পথ। এই বিপ্লবী সংগ্রামে ভূমিহীন ও দরিদ্র কৃষকই প্রধান পরিচালিকা শক্তি, অগ্রণী বাহিনী। কারণ এরা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পেরেছেন যে জোতদার জমিদারী (সামন্ততান্ত্রিক) শোষণ থেকে মুক্তির এটাই একমাত্র পথ।।৭৬ এই কার্যক্রম সফল করার জন্যে তারা 'গ্রামে চলো' স্লোগান তোলেন এবং অনেক পার্টি কর্মীকে পশ্চিম বাংলায় বিভিন্ন গ্রামে বিপ্লবের আবহাওয়া কি এবং গ্রামাঞ্চলের কোন অংশ বিপ্লবের সহায়ক বা বিরোধী তা যথাযথ নিরূপণের জন্য রিপোর্ট তৈরি করার কাজে লাগান। এ-বিষয়ক নির্দেশ প্রসঙ্গে চারু মজুমদার লেখেন, 'প্রাপ্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রত্যেক দু'তিন মাস অন্তর শ্রেণী বিশ্লেষণ করতে হবে। এই বিশ্লেষণ করতে হবে তিনটি সূত্রের ভিত্তিতে, (১) শ্রেণী ভিত্তিক, (২) কাজ করতে আগ্রহী এবং (৩) লড়াইতে আগ্রহী। এই ভিত্তিতেই কেবলমাত্র সঠিক শ্রেণী বিশ্লেষণ সম্ভব। কারণ যখন প্রথমবার এই বিশ্লেষণ করা হবে, তখন অনেক মাঝারি কৃষককেও গরীব কৃষকের সঙ্গে একই পর্যায়ে ফেলা সম্ভব। এই ভুলগুলি উক্ত সূত্রগুলির সহায়তায় পরের বারের বিশ্লেষণে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব।' (৭৭) এই নির্দেশে অনেক পার্টি কর্মীরাই গ্রামে কাজ শুরু করেন এবং কয়েকটি রিপোর্টও তৈরি হয়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার তিনটি গ্রাম সম্পর্কে একটি সমীক্ষায় দেখানো হয় যে গ্রামে যে সামান্য কয়েক ঘর জোতদারের বাস, তারাই গ্রামীণ অর্থনীতির নির্ধারক; স্বভাবতই এরা ঘোরতর কমিউনিস্ট বিরোধী এবং 'স্বাধীন দুনিয়া'র 'গণতন্ত্রের' প্রচারক। ধর্মের ভিত্তিতে গ্রামের সাংস্কৃতিক জীবনও এরাই পরিচালনা করেন। আর আছেন অল্পজমির

মালিক-কৃষক অথবা মাঝারি কৃষক, যাদের পরিবার-প্রতি জমির পরিমাণ ৫ থেকে ১৫ বিঘা; এদের আকাঙ্ক্ষা ধনী কৃষক হবার, কিন্তু কালক্রমে তার কোন আশা না থাকায় এরা ক্ষুব্ধ। এতদ্‌সত্ত্বেও বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি এরা যথেষ্ট আস্থাশীল নন। একারণেই তারা বিপ্লব বিরোধী না হলেও নিরপেক্ষই থাকতে চান। গ্রামের অন্য অংশ আধা প্রলেতারিয়েত যাদের জমির পরিমাণ ১ থেকে ৫ বিঘা পর্যন্ত; জমির জন্যে লড়াইয়ে এরা অংশ গ্রহণ করেছেন বারংবার, কিন্তু নেতৃত্বের অভাবে বা ভুল পথে পরিচালিত হবার জন্যে ব্যর্থ হয়েছেন। তাই এরা বিপ্লবের প্রতি বিশ্বস্ত এবং বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা বিষয়েও সচেতন। কিন্তু সর্বাধিক বিপ্লব সচেতন অংশ হোল গ্রামীণ প্রলেতারিয়েতরা, বিপ্লবী প্রচারে তারাই সবচেয়ে বেশি সাড়া দেন। (৭৮) মুর্শিদাবাদের গ্রাম বিষয়ক অন্য একটি সমীক্ষায় দেখা যায় যে গ্রামাঞ্চলে অদ্যাবধি সামন্ততান্ত্রিক শোষণ-ব্যবস্থা অব্যাহত। এই শোষণ ব্যবস্থার চারটি বিশিষ্ট রূপ হোল: (১) জমির খাজনার (শস্যে অথবা নগদ টাকায়) মাধ্যমে শোষণ (২) ক্ষেতমজুরদের মজুরি থেকে শোষণ অর্থাৎ তাকে বিনামজুরি বা যৎসামান্য মজুরিতে কাজ করানো, (৩) বিভিন্ন প্রকার কর আদায়ের মাধ্যমে শোষণ, এবং (৪) অতিমাত্রায় চড়া সুদ আদায়ের দ্বারা শোষণ। গরীব ও মাঝারি কৃষকেরা জোতদারদের এইপ্রকার শোষণে জর্জরিত, ফলে তাদের শ্রেণী ঘৃণাও প্রবল এবং সামন্ততান্ত্রিক শোষণের উচ্ছেদে তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সংগঠনের শুরু থেকেই তাদের এ-বিষয়ে আগ্রহ এবং তারা উপলব্ধি করেছে যে বিপ্লব ছাড়া তাদের মুক্তির অন্য পথ নেই। ভূমিহীন চাষীদের ওপর তাদের অপরিসীম প্রভাব এবং এই ভূমিহীন চাষীদের সঙ্গে এক সারিতে দাঁড়িয়ে তারা লড়াই করবে। (৭৯)

॥ তিন ॥

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী)-র কর্মসূচীতে (১৯৭০ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত পার্টি কংগ্রেসে সর্বসম্মতিতে গৃহীত) বলা হয়, 'আমাদের দেশ, কৃষক জনসাধারণের দেশ; তারাই আমাদের দেশের জনসংখ্যার শতকরা ৭৫ ভাগের বেশি। এরাই আমাদের দেশে সব থেকে শোষিত হচ্ছেন। এরা বেঁচে রয়েছেন আধপেটা খেয়ে সীমাহীন দারিদ্র্যের মধ্যে। ভারতের আধা সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতিতে শতকরা ৮০ ভাগ জমি গিয়ে কেন্দ্রীভূত হয়েছে শতকরা ২০ ভাগ ভূস্বামীদের হাতে অর্থাৎ রাজা-রাজড়া, জমিদার আর ধনী কৃষকদের হাতে। অপরদিকে গ্রামাঞ্চলের লোকসংখ্যার শতকরা ৮০ ভাগ যে ভূখা

কৃষকশ্রেণী, সেই কৃষকশ্রেণীর হাতে হয় মোটেই জমি নেই নয়তো খুব অল্পই জমি রয়েছে। ভূমিহীন ও দরিদ্র কৃষকরা সারা বছরে যতটুকু ফসল তোলে তার শতকরা ৫০ থেকে ৯০ ভাগই খাজনা হিসেবে জমিদারদের দিয়ে দিতে হয়। এই রক্তচোষা মহাজনী পুঁজি কৃষকদের নিংড়ে নিঃশেষিত করে দিচ্ছে। কৃষককে উচ্ছেদ করাটা আজকের দিনের একটা প্রথায় দাঁড়িয়েছে। তপশীলী জাতিগুলির ওপর সামাজিক নিপীড়ন, হরিজনদের হত্যা করাও এর অঙ্গীভূত, আজও সমানভাবে চলেছে, যা মধ্যযুগীয় বর্বরতার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। আধা-সামন্ততান্ত্রিক ভূমি-সম্পর্ক আমাদের দেশকে পরিণত করেছে একটা স্থায়ী মন্বন্তরের দেশে। এর ফলে প্রতি বছর কোটি কোটি লোক না খেতে পেয়ে মারা যায়। আমাদের দেশের প্রধান প্রধান দ্বন্দ্বগুলি হচ্ছে একদিকে সাম্রাজ্যবাদ ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ এবং অন্যদিকে আমাদের জনগণের দ্বন্দ্ব, সামন্তবাদ ও ব্যাপক জনগণের দ্বন্দ্ব, পুঁজি ও শ্রমিকশ্রেণীব দ্বন্দ্ব এবং শাসকশ্রেণীগুলির মধ্যেকার দ্বন্দ্ব। অল্প কথায় বলতে গেলে এই সমস্ত প্রধান দ্বন্দ্বগুলির মধ্যে জমিদারদের ও কৃষকশ্রেণীব মধ্যেকার দ্বন্দ্বটি অর্থাৎ সামন্ততন্ত্র ও ব্যাপক ভারতীয় জনগণের মধ্যেকার দ্বন্দ্বটিই বর্তমান পর্যায়ের মুখ্য দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের সমাধানই ভারতীয় জনগণকে অন্যান্য দ্বন্দ্বগুলির সমাধানের পথেও নিয়ে যায়।' (১৩-১৭)

এই প্রেক্ষিতে সি. পি. আই (এম এল) স্থির করেছিল যে দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধ হোল ভারতীয় বিপ্লবের পথ আর 'শ্রেণীসংগ্রাম অর্থাৎ খতম অভিযান'ই গেরিলা যুদ্ধের ভিত্তি ও সশস্ত্র সংগ্রামের প্রধান রূপ। উক্ত পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত সাংগঠনিক রিপোর্টে বলা হয় 'শ্রেণীশত্রু খতম শ্রেণীসংগ্রামের উচ্চতর রূপ এবং গেরিলা যুদ্ধও জনগণের জনযুদ্ধের সূচনা। · এবং একথা উপলব্ধি কর: . পারি যে, শ্রেণীসংগ্রাম অর্থাৎ খতমের লড়াইই আমাদের সামনে সমস্ত সমস্যাকে সমাধান করতে পারে ও লড়াইকে উচ্চতর স্তরে নিয়ে যেতে পারে, আমাদের জনগণের চেতনাকে উচ্চতর স্তরে তুলতে পারে'। অন্ধ্রের শ্রীকাকুলামে এই খতমের তত্ত্ব প্রথম কার্যকর করা হয়। সি. পি. আই (এম-এল)-এর অন্ধ্রপ্রদেশ সংগঠনী কমিটি ১৭ মে, ১৯৬৯-এ যে 'ঘোষণাবাণী' প্রচার করেন তাতে বলা হয়; 'আজকের যুগ সামন্তশ্রেণীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র কৃষক অভ্যুত্থানের যুগ। এই সশস্ত্র কৃষক সংগ্রাম রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করার সংগ্রাম। আজকের শাসকশ্রেণীকে উৎখাত না করতে পারলে ভারতবর্ষের কৃষকশ্রেণীর মুক্তি অসম্ভব। সেজন্যে এই প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণীকে উৎখাত করতে হবেই। এই শাসকশ্রেণী তাঁদের মতে, সামন্ত-তান্ত্রিক রাজকুমার ধনী জমিদার ও আমলা মুৎসুদ্দি পুঁজিপতিদের প্রতিনিধি ও

স্বার্থরক্ষাকারী। সুতরাং সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে হবে; জমির ওপর সামন্ততান্ত্রিক অধিকার খতম করতে হবে। এবং কৃষককে জমি দখল করতে হবে, তাহলেই জনগণের সব সমস্যার সমাধান হবে। এই কাজ, অর্থাৎ এক শ্রেণীর হাত থেকে অপর এক শ্রেণীর রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করা সম্ভব একমাত্র বন্দুকের নল দ্বারা। নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করার তত্ত্ব যাবা প্রচার করেন তারা জনগণের সঙ্গে প্রবঞ্চনাই করেন। কারণ, নির্বাচন ব্যবস্থা শাসক-শ্রেণীর শাসন ও শোষণ রক্ষা করার একটা আবরণমাত্র। এই কথাটা কৃষকশ্রেণী বুঝতে পেরেছেন বলেই, চতুর্দিকে বিপ্লবী কৃষকশক্তিগুলি সশস্ত্র হচ্ছেন। সশস্ত্র বিপ্লবী কৃষকগণের গেরিলা কৌশলের মাধ্যমে জনযুদ্ধ করাই একমাত্র রাস্তা। এই জনযুদ্ধের প্রধান কাজ গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবী ঘাটি স্থাপন, গণফৌজ গঠন এবং শেষে শহর ঘেরাও ও দখল। আর এই বিপ্লবী সংগ্রামে ভূমিহীন ও দরিদ্র কৃষকই প্রধান পরিচালিকা শক্তি, অগ্রণী বাহিনী। কারণ এরা বুঝতে পেরেছেন যে জোতদার-জমিদারী (সামন্ততান্ত্রিক) শোষণ থেকে মুক্তির এটাই একমাত্র পথ। বিপ্লবী কৃষকগণের নির্দিষ্ট কার্যক্রম হোল: (১) জোতদার-জমিদারশ্রেণী জনসাধারণকে শোষণ করে যে বিশাল সম্পত্তি জমা করেছে, তা বাজেয়াপ্ত করা, (২) জোতদারের জমির ফসল ধান বাজেয়াপ্ত করা, (৩) প্রজাপীড়ক অত্যাচারী জমিদার-জোতদারকে খতম করা। শ্রেণীশত্রুর দালালদের শাস্তি দেওয়া, (৪) শ্রেণীশত্রুর রক্ষাকারী ঘৃণ্য পুলিসদলকে খতম করা; (৫) জনযুদ্ধে জয়লাভ করার জন্যে গেরিলাবাহিনী ও গণমুক্তি ফৌজ তৈরি করা, এবং গ্রামাঞ্চলে কৃষক সংগ্রাম সমিতি ও শাসনব্যবস্থার জন্য একটি বিপ্লবী সংস্থা গঠন করা।' (৮০)

ঐ বৎসরের ১৫ জুন শ্রীকাকুলাম জেলা সংগঠনী কমিটি, পঞ্চাদ্রি কৃষ্ণমূর্তির হত্যার পরই যে ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেন, তা থেকে জানা যায় যে জনযুদ্ধ শুরু হবার দিন থেকে উক্ত ঘোষণাপত্রের প্রকাশের দিন পর্যন্ত যোদ্ধারা ১২ জন শ্রেণীশত্রু ও তাদের দালালদের খতম করেছেন; আর সেইসঙ্গে নিহত হয়েছেন ৩৩ জন পুলিস কর্মচারী। (৮১) এ-প্রসঙ্গে চারু মজুমদার লেখেন, 'আমাদের পার্টি দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকের নেতৃত্বে যে খতম অভিযান (battle of annihilation) শুরু করেছে, তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে এলাকায় এলাকায় রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার পথে। ছড়িয়ে দিতে হবে সেই খতম অভিযান সারা ভারতবর্ষে, প্রতিটি রাজ্যে। স্বনির্ভরতায় দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষক রাজনৈতিক সচেতন হয়ে উঠবে, বিকাশ পাবে তার সৃজনী ক্ষমতা গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে।' (৮২)

এই খতম অভিযান ও গেরিলা যুদ্ধ প্রসঙ্গে সি. পি. আই (এম. এল)-এর তাত্ত্বিক নেতা চারু মজুমদার যে চারটি মূল প্রশ্নের উপস্থাপনা করেন, সেগুলি এখানে উল্লেখ করা কর্তব্য। ভূমিকা হিসাবে নকশালবাড়ি সংগ্রামের অভিজ্ঞতা, তাঁর মতে, এভাবে বিচার্য (১) কৃষক জমি বা ফসলের জন্যে এ সংগ্রাম করেনি, সংগ্রাম করেছে রাষ্ট্র ক্ষমতার জন্য; (২) কৃষক সশস্ত্র সংগ্রাম করেছে প্রতিবিপ্লবী রাষ্ট্রযন্ত্রের সশস্ত্র আক্রমণের বিরুদ্ধে; (৩) কৃষক ঐ সশস্ত্র আক্রমণের জন্য নির্ভর করেছে তার নিজে গড়া অস্ত্রের উপর এবং সেই অস্ত্রের সাহায্যেই সে আগ্নেয়াস্ত্র কেড়ে নিয়েছে; (৪) কৃষক এই সংগ্রামের জন্য অন্যের উপর নির্ভরশীল ছিল না, সে নিজের পায়ের উপব দাঁড়িয়েই এই সংগ্রাম করেছে; (৫) এ সংগ্রাম গড়ে উঠেছে একমাত্র সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই; (৬) সংশোধনবাদেব বিরুদ্ধে এই সংগ্রাম কবা যায় একমাত্র চেয়ারম্যান মাও-এর চিন্তাধারা দিয়ে এবং কৃষক জনসাধাবণ কর্তৃক এই চিন্তাধাবাকে গ্রহণ কবে এবং কার্যকরী করে। নকশালবাড়ি সংগ্রামের পর ঘটেছে শ্রীকাকুলাম; এই সংগ্রাম প্রমাণ করেছে যে কৃষক দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারে একমাত্র গেরিলা যুদ্ধ মারফত। এই গেরিলা যুদ্ধ স্বীকার কবে নিলে চাবিটি প্রধান প্রশ্ন স্বভাবতই উপস্থাপিত হয়।

প্রথম প্রশ্ন হোল, গেরিলা যুদ্ধ কোথায় শুরু কবা যায়। গেরিলা যুদ্ধ করা যায় একমাত্র পাহাড় বা জঙ্গল এলাকায়, এরকম একটা ভ্রান্ত ধাবণা প্রচলিত আছে। কিন্তু মাও-ৎসে-তুঙের তত্ত্ব অনুযায়ী, জনযুদ্ধ করা যায় একমাত্র জনতার ওপব নির্ভব করেই. গেবিলাযুদ্ধ যেহেতু কৃষকের জনযুদ্ধ সেহেতু যেখানে কৃষক আছে, সেখানেই গেরিলাযুদ্ধ শুরু কবা যায়। এবং ভারতবর্ষের কৃষকশ্রেণী সমতল অঞ্চলে গেরিলা যুদ্ধ কবে প্রমাণ করে দিয়েছে যে, সমতলভূমিতেও গেরিলা যুদ্ধ সম্ভব।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হোল গণআন্দোলন ও গণসংগঠন ছাড়া গেরিলাযুদ্ধ সম্ভবপর কিনা। গেরিলা যুদ্ধের জন্যে গণআন্দোলন বা গণসংগঠন, কোনটাই যে অপবিহার্য নয়, কৃষকশ্রেণী তার সংগ্রামের মারফত একথা প্রমাণ করেছেন। যা অপরিহার্য, তা হোল বিপ্লবী রাজনীতি অর্থাৎ চেয়ারম্যান মাও-এর চিন্তাধারার প্রচার ও প্রসার। পার্টির গোপন সংগঠনের দ্বারাই এই প্রচার ও প্রসার সম্ভব। রাজনীতিকে অগ্রাধিকার দিয়ে গোপন সংগঠনেব মারফত স্কোয়াড গড়ে এবং শ্রেণীশত্রুর বিরুদ্ধে তাকে প্রয়োগ করে গেরিলাযুদ্ধ এবং জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করাও সম্ভব। গেরিলা 'অ্যাকশনে'র বিস্তৃতি ব্যাপক জনতাকে সংগ্রামের অংশীদার কবে তোলে। গণসংগঠন বা গণআন্দোলন প্রকাশ্য আন্দোলন ও অর্থনীতিবাদী

আন্দোলনের ঝোঁক বাড়ায়, বিপ্লবী কর্মীদের শত্রুর সামনে তুলে ধরে এবং সহজেই শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হয়। একারণেই প্রকাশ্য গণসংগঠন বা গণআন্দোলন গেরিলা যুদ্ধের বিকাশ ও বিস্তৃতির পক্ষে বাধাস্বরূপ।

গেরিলা যুদ্ধের জন্যে কার ওপর নির্ভর করতে হবে, এটা হোল তৃতীয় প্রশ্ন। চারুবাবুব মতে, একমাত্র দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকের উপব নির্ভর করেই গেরিলা যুদ্ধের বিকাশ ও বিস্তৃতি সম্ভব; অন্য কোন শ্রেণীই এই সংগ্রাম পরিচালনা করতে পারে না, কারণ দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকের মধ্যেই সামন্তশ্রেণীর বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা সঞ্চিত রয়েছে। বিপ্লবী রাজনীতিতে, কৃষক জনতার রাষ্ট্রক্ষমতা প্রতিষ্ঠার রাজনীতিতে উদ্বুদ্ধ করে দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকের এই শ্রেণীঘৃণাকে উদ্দীপ্ত করে তোলা যায়। তাদের এই শ্রেণীঘৃণা সংগ্রামে অবিচলতা আনে এবং তারাই পারে সমগ্র কৃষকশ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ করে বিপ্লবী জোয়ার সৃষ্টি করতে। দেখা গেছে, যেখানেই মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় সংগ্রামে নেতৃত্ব কবার প্রচেষ্টা করেছেন, সেখানেই গেরিলা যুদ্ধেব বিকাশলাভ ঘটেনি, সংগ্রামের লক্ষ্যবস্তু লঙ্ঘিত হয়েছে, শ্রেণীসংগ্রামের সঙ্গে গেবিলা যুদ্ধকে সংযুক্ত কবা যায়নি, অস্ত্র সংগ্রহের অভিযানের নামে হাস্যকব বন্দুক কেনার ঝোঁক বেড়েছে, পুলিসেব আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি কবা যায়নি; এমনকি আত্মরক্ষাও করা যায়নি। বড় বড় 'অ্যাকশনে'র ব্যর্থতা হতাশা সৃষ্টি করেছে। এখানে বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা ও দায়িত্ব প্রসঙ্গে চারুবাবু বলেছেন যে তাদের মাও ৎসে-তুঙের লেখা বারংবার পড়ে; তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে, কৃষক ও অন্যান্য সমস্ত বিপ্লবীদেব মধ্যে এই লেখাগুলির প্রচারের মধ্যে দিয়ে তাদেব শিক্ষাগ্রহণে আগ্রহী কবে তুলতে হবে এবং পৃথিবীর দেশে দেশে যে বিপ্লবী যুদ্ধ চলছে, তার অভিজ্ঞতা কৃষকদের মধ্যে প্রচাব ও প্রসারিত করতে হবে; আব এই কাজেব মধ্যে দিয়েই বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীরা দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকদের সঙ্গে একাত্ম হতে পাববেন এবং বিপ্লবী চরিত্র অর্জনে সক্ষম হবেন।

গেরিলা যুদ্ধ কিভাবে শুরু করা যায়, এই চতুর্থ প্রশ্নের উত্তরে চারুবাবুর বক্তব্য হোল, ভারতবর্ষের বিপ্লবী কৃষক সংগ্রাম এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছে যে একমাত্র গ্রামাঞ্চলে সামন্তশ্রেণীগুলিকে খতম করার মধ্যে দিয়েই গেরিলা যুদ্ধ শুরু করা যেতে পারে। এই শ্রেণীশত্রুকে নির্মূল করার অভিযান পরিচালনা করা যায় একমাত্র দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষককে গ্রামাঞ্চলে সামন্ত শ্রেণীগুলির প্রভুত্ব ধ্বংস করে কৃষকের রাজত্ব কায়েম করার রাজনীতিতে উদ্বুদ্ধ করে। তাই শ্রেণীশত্রুকে খতম করা হোল শ্রেণীসংগ্রামের উন্নত রূপ এবং গেরিলা কৌশলে এই খতম

করার কাজটিই হোল গেরিলা সংগ্রামের প্রাথমিক স্তর। শ্রেণীশত্রুকে খতম করার অর্থ শুধু ব্যক্তিকে খতম করা নয়; তার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিপত্তিকেও খতম করা। ভারতবর্ষের বিপ্লবী কৃষক সংগ্রাম একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছে যে শ্রেণীশত্রুকে নির্মূল করার অভিযান থেকে বিচ্যুত হলে গেরিলা সংগ্রামীদের মধ্যে রাজনীতির অগ্রাধিকার নষ্ট হয়ে যায় এবং এমনকি গেরিলা ইউনিটের নৈতিক অধঃপতনও ঘটে। মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় অথবা গ্রামগুলির মধ্য কৃষক বা অন্যশ্রেণীর কৃষক কেউই এই সংগ্রামের নেতৃত্ব করতে পারে না; কারণ কারোরই শ্রেণীঘৃণা তত তীব্র নয়, যত তীব্র দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকের। তাই একমাত্র শ্রেণীশত্রু নির্মূল করার অভিযানের মাধ্যমে দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষক জনতার ওপর নেতৃত্ব কায়েম করতে পারে। (৮৩)

এই খতম অভিযানের প্রাথমিক উদ্দেশ্যে ছিল গ্রামাঞ্চলে সামন্ততান্ত্রিক প্রভুত্বকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করা এবং বদলে কৃষকদের কর্তৃত্বকে প্রতিষ্ঠা। পার্টি মনে করেছিলেন যে ব্যক্তিগতভাবে জমিদার-জোতদারকে আক্রমণ ও খতম ছাড়া এ-উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া অসম্ভব। কারণ, পূর্বেই বলা হয়েছে যে তাদের মতে শ্রেণীশত্রুকে খতম করার অর্থ শুধু ব্যক্তিকে খতম করা নয়, তার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিপত্তিকেও খতম করা। এবং শ্রেণীশত্রুকে খতম করা হোল শ্রেণীসংগ্রামের উন্নতরূপ এবং গেরিলা কৌশলে এই খতম করার কাজটিই হোল গেরিলা সংগ্রামের প্রাথমিক স্তর। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল এই অভিযানের দ্বারা গ্রামাঞ্চলে সামন্ততান্ত্রিক গোষ্ঠীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে 'সন্ত্রাস' সৃষ্টি করা। 'আমাদের রাজনীতিং সারবস্তু হোল শ্রেণীশত্রুদের খতম করা, আহত করে বা আঘাত করে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া নয়, কারণ কেবলমাত্র খতমই পারে শত্রুদের আত্মবিশ্বাস নষ্ট করতে।' (৮৪) তদুপরি এই খতম অভিযানের দ্বারা আঞ্চলিকভাবে সামন্ততন্ত্রের ধারক বাহকদের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার হয়; গ্রামাঞ্চলে এ-কাজে নকশালবাদীদের রাজনীতি প্রায়শই সার্থক। কয়েকটি খতমের ফলেই জোতদার-মহাজন প্রমুখ সামন্ততন্ত্রের ধ্বজাবাহীরা গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে অথবা নকশালবাদীদের সমর্থকে পরিণত হয়েছে। এমনকি কোথাও কোথাও নিহত জোতদার মহাজনের পরিবারবর্গ পুলিসের কাছে অভিযোগ করতেও সাহস পায়নি। এইভাবে গড়ে উঠেছে নকশালবাদীদের ভাষায় 'মুক্তাঞ্চল'। এ-প্রসঙ্গে চারু মজুমদা বলেছেন 'একবার শ্রেণীশত্রুর হাত থেকে এলাকাকে মুক্ত করতে পারলে (কাউকে মেরে, কেউ পালিয়ে গেলে) অত্যাচারী রাষ্ট্রযন্ত্রের চোখ কানা হয়ে যাবে। তার ফলে পুলিস জানতে পারবে

না কে গেরিলা আর কে গেরিলা নয়, এবং কে নিজের জমি চাষ করে এবং কে জোতদারের জমি চাষ করে।' (৮৫) তৃতীয়ত, চারুবাবু আশা করেছিলেন যে এই অভিযানের প্রচারের মধ্যে দিয়ে গ্রামীণ দরিদ্র মানুষ সমবেত হবেন এবং তাদের মধ্যে থেকেই তৈরি হবে নেতৃত্ব। কারণ দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকদের মত শ্রেণীঘৃণা মধ্যবিত্ত বা বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, মধ্য কৃষক বা অন্য শ্রেণীর কৃষকদের মধ্যে কখনো সঞ্চারিত হতে পারে না। তদুপরি চারুবাবুর 'আক্রমণ' সম্পর্কে বক্তব্য হোল, 'প্রথমে কয়েকটা বাড়ি চড়াও হওয়া এবং অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা কষ্টকর হতে পারে, সুতরাং তাকে খুন করার ওপরই কেবলমাত্র বেশি জোর দেওয়া ভালো, পরবর্তী সময়ে যখন জনগণ জেগে ওঠে এবং বিভিন্ন কাজে অংশ নেয়, আক্রমণগুলো নিয়মিত আরও সহজ, আরও জোরদার হয়, তখন শত্রুকে তার ঘাটিতেও খুন করা এবং তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা যায়। অবস্থার ক্রমে এত উন্নতি হবে যে একটি গেরিলা কাজের শেষে গেরিলারা নিজেরাই জনগণের কাছে বক্তৃতা করতে, এই কাজের গুরুত্ব বোঝাতে এবং হাতে অস্ত্র নিয়ে জ্বালাময়ী বক্তৃতার মাধ্যমে তাঁরা জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে পারবেন।' (৮৬)

পূর্বেই বলা হয়েছে যে এই তত্ত্ব ও নীতির প্রথম প্রয়োগক্ষেত্র ছিল শ্রীকাকুলাম। প্রথম 'গেরিলা অ্যাকশন' শুরু হয় বাথাপুরমে এবং পরে তা পদমপুর, বুপড়িবাঙ্কা, আকুপল্লি, এবং গাকড়াভদ্রে ছড়িয়ে পড়ে। পার্টি দাবী করেন যে প্রত্যেক গেরিলা অ্যাকশন-এর ফলে জনসমর্থন বৃদ্ধি পেতে থাকে; শ্রীকাকুলামের সশস্ত্র কৃষক সংগ্রাম সম্পর্কে শ্রীকাকুলাম জেলা কমিটি যে রিপোর্ট (২৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯) পেশ করেন তাতে বলা হয়েছিল যে, বিভিন্ন গ্রাম থেকে জঙ্গী কৃষকেরা গেরিলা স্কোয়াডে যোগ দেবার জন্যে এগিয়ে আসছেন। স্কোয়াড-গুলি খুবই সক্রিয় এবং তাদের সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ছে। স্কোয়াডগুলির সংগঠনে আমরা বহু নতুন পরিবর্তন করেছি। বন্দুক ধারণ করার পর আমাদের জনগণের মধ্যে প্রচণ্ড উৎসাহের সঞ্চার হয়েছে।...বন্দুক ধারণ করার এবং জনযুদ্ধের ডাক দেবার পর এজেন্সি এলাকায় ভয়ে পুলিসের বুক কাঁপতে থাকে। গেরিলাদের হাতে যখন পুলিস মরতে শুরু করে তখন পুলিসের মনোবল ভেঙে চুরমার হয়ে যায়।...সংগ্রাম এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথে বর্তমান অবস্থা অত্যন্ত আশাজনক। আমাদের আন্দোলনের বর্তমান পরিস্থিতির এবং সংগ্রামের আগে ও মধ্যে আমরা যে অবস্থার সম্মুখীন হয়েছি, সেই অবস্থার আমরা পর্যালোচনা করেছি। এর ভিত্তিতে আমরা আমাদের সংগ্রামের কৌশল নির্ধারণ করছি এবং সংগ্রামের পথে এগিয়ে যাচ্ছি। অত্যন্ত অল্পকালের মধ্যে

আমরা বহু জয় অর্জন করেছি।' শ্রীকাকুলাম কৃষক সংগ্রামের পথ ও পদ্ধতি সম্পর্কে এই রিপোর্টে আরো বলা হয়েছিল, 'যে পথ আমরা অনুসরণ করছি তা হোল জনযুদ্ধের পথ। বর্তমানে যে পদ্ধতি আমরা গ্রহণ করেছি তা হোল গেরিলা যুদ্ধের পদ্ধতি। আমরা জানি যে বিপ্লবী গ্রাম্য ঘাটি এলাকা গঠন করা এবং শেষকালে শহরগুলি দখল করা হচ্ছে প্রাথমিক কাজ যা জনযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে সম্পন্ন করতে হবে। একমাত্র গ্রামে গ্রামে সশস্ত্র শ্রেণীসংগ্রাম তীব্র করে তুলেই এবং এইভাবে শ্রেণীশত্রুদের খতম করেই তবে আমরা কৃষকদের চেতনা বাড়িয়ে তুলতে পারি।' (৮৭)

নকশালবাদীদের তথ্যানুযায়ী দেখা যায় যে মার্চ (১৯৬১) মাসের মধ্যে উক্ত অঞ্চলের ৫০০ থেকে ৭০০ বর্গমাইলের সমস্ত শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়ে এবং জঙ্গল ও রাজস্ব-বিভাগের পদস্থ কর্মচারীরা এই এলাকায় ঢুকতে অপারগ হয়, পুলিস দলবদ্ধভাবে ছাড়া ঢুকতে ভয় পেত এবং ভীত জমিদার ও ধনী কৃষকেরা তাদের সঙ্গে কিছুমাত্র সহযোগিতা করছে না। ইতিপূর্বেই অবশ্য এই অঞ্চলে গণ-আদালতে বিচার করে কয়েকজন জমিদারকে খতম করা হয়েছে; পুলিশসহ এই অঞ্চলে মোট খতমের সংখ্যা তখন গিয়ে দাঁড়িয়েছিল ১৫০ জনে। (৮৮) উক্ত 'মুক্ত এলাকা' তখন শাসন করছিলেন রায়তাঙ্গা (কৃষক) সংগ্রাম সমিতি। চারুবাবু মার্চের প্রথমে শ্রীকাকুলামে আসেন এবং আশা প্রকাশ করেন যে এই জেলাই ভারতবর্ষের ইয়েনানে পরিণত হবে এবং এখান থেকেই বিপ্লবের আগুন ছড়িয়ে পড়বে অন্যান্য এলাকায়। (৮৯) কিন্তু শ্রীমজুমদারের এ-আশা সফল হবার আগেই পুলিস অ্যাকশন জোরদার হয় এবং মে-মাসে এই বিপ্লবের প্রধান নেতা পঞ্চাদ্রি কৃষ্ণমূর্তি নিহত হন। নভেম্বর ডিসেম্বরে আরো চারটি এনকাউন্টারে নিহত হন দলের প্রখ্যাত ১৩ জন নেতা। ১৯৭০ এর আগস্টের মধ্যেই পার্টির শ্রীকাকুলাম শাখার সম্পাদক তেজেশ্বর রাও ও অন্যান্য ১,৬৪০ জন কর্মী গ্রেপ্তার হন এবং কার্যত পার্টি (সি. পি. আই এম. এল) এক গুরুতর আঘাত পায়। পার্টির পক্ষ থেকেও এ তথ্য স্বীকার করা হয়েছিল। (৯০) এতদসত্ত্বেও, পার্টির মতে চারুবাবুর নির্দেশিত পথে কৃষক সংগ্রাম অব্যাহত থাকে। চীনের কমিউনিস্ট পার্টিও শ্রীকাকুলামে অনুসৃত পার্টির পথকে সমর্থন করে লিখেছিলেন, 'শ্রীকাকুলামের মত বিপ্লবী এলাকা ক্রমেই অধিক সংখ্যায় ভারতের বিশাল ভূখণ্ডে আবির্ভূত হচ্ছে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী)-র নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা নিঃসন্দেহে জয়ের পর জয় অর্জন করবেন।' (৯১)

১৯৭০-এর ১লা জানুয়ারী সংখ্যা 'দেশব্রতী' পত্রিকায় চারু মজুমদার লেখেন, '১৯৬৯ সালে ভারতবর্ষের কৃষক-জনতা বড় বড় জয় অর্জন করেছেন, বিরাট বিরাট এলাকায় তাদের সংগ্রামকে ছড়িয়ে দিয়েছেন, জনতার মনে এনেছেন আত্মবিশ্বাস। তারা সংগ্রামকে ছড়িয়ে দিয়েছেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে, আসাম থেকে পাঞ্জাব, অন্ধ্রে, উড়িষ্যায়—ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেকটি রাজ্যে।' তিনি আরো বলেন যে 'তারা নির্ভর করেছেন চেয়ারম্যানের চিন্তাধারার উপর, প্রতিটি অত্যাচারের বদলা নেওয়ার জন্য গড়ে তুলেছেন তাদের নিজস্ব গেরিলা বাহিনী। হত্যা করার একচেটিয়া অধিকার তারা কেড়ে নিয়েছেন শাসকশ্রেণীর কাছ থেকে, প্রতিটি আক্রমণের বদলা নেওয়ার জন্য তারা সক্রিয় হয়ে উঠেছেন।' (৯২)

১৯৬৯ সালের ২ সেপ্টেম্বর মেদিনীপুর জেলার গোপীবল্লভপুরে পশ্চিমবঙ্গে সি. পি আই (এম. এল) জনৈক 'শ্রেণীশত্রু খতমে'র (ধরমপুর গ্রামে) দ্বারা সশস্ত্র কৃষক আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটায়। 'দেশব্রতী'র (২৩ এপ্রিল ১৯৭০) রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৬৯-এর মধ্যে ডেবরা গোপীবল্লভপুর অঞ্চলে তাঁরা ২২ জন শ্রেণীশত্রুকে খতম করেন। ১৯৭০ সালের এপ্রিলের মধ্যে এই খতমের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ৬৯ এ। এই ডেবরা ও গোপীবল্লভপুর বিহার ও উড়িষ্যার সীমান্তে অবস্থিত এবং এর জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশই আদিবাসী। গোপীবল্লভপুরের মালক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের পূর্বপুরুষেরা 'পাইক বিদ্রোহে' অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং সে ঐতিহ্যের ধারা তারা অদ্যাবধি মানসিকতায় বহন করেন। নকশালবাদী রাজনীতি ও কর্মকাণ্ডের মধ্যে তাঁরা নিজেদের বিপ্লবী ঐতিহ্যের ধারা খুঁজে পেয়েছিলেন। এ অঞ্চলের নেতা সন্তোষ রাণা উক্ত সম্প্রদায়েরই লোক। এখানকার অন্য নেতা ছিলেন অসীম চ্যাটার্জী। ডেবরা অঞ্চলে নেতৃত্ব দেন স্থানীয় কোর্টের উকিল ভবদেব মণ্ডল এবং ছাত্রনেতা অশোক মাইতি। ডেবরাতে আন্দোলন শুরু হয় ১ অক্টোবর, ১৯৬৯-এ। ইতিপূর্বে ১৯৬৮তে স্থানীয় সি. পি. এম নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা পার্টি থেকে বেরিয়ে আসেন এবং নকশালবাড়ি আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত হন। কিন্তু চারুবাবুর 'খতমের রাজনীতি' তত্ত্ব হিসাবে তাদের কাছে পৌঁছাবার আগে পর্যন্ত এ-আন্দোলন তেমন দানা বাঁধেনি। সি. পি আই (এম-এল)-এর ডেবরা থানা সংগঠনী কমিটির রিপোর্টে বলা হয়, 'গোপীবল্লভপুর বহরাগোড়া ডেবরার যৌথ নেতৃত্বে তৈরি হোল ডেবরায় কেন্দ্রীয় গেরিলা দল। আঞ্চলিক গেরিলাদলগুলোও তৈরি হোল। কেন্দ্রীয় পার্টি ও গেরিলা ইউনিটের পরিচালনায় অঞ্চলগুলোর গেরিলা ইউনিটের ভিত শক্ত করা

হোল। ১লা অক্টোবর আমরা আমাদের এই লড়াই শুরু করার কর্মসূচী নিলুম। লক্ষ্য, জোতদার খতম করে সর্বস্ব বাজেয়াপ্ত করা।' (১৩) ইতিপূর্বে পার্টির 'বাংলা বিহার উড়িষ্যা সীমান্ত এলাকার আঞ্চলিক কেন্দ্রীয় সংগঠনী কমিটি' কৃষক জনতার উদ্দেশ্যে যে ইস্তাহার প্রচার করেন, সেখানেই বিপ্লবী কৃষকদের কর্মসূচীতে বিবৃত হয়েছিল : '(১) অত্যাচারী জমিদার জোতদারদের খতম করা হবে এবং তাদের বিশাল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে ; (২) জোতদারদের জমির ফসল, ধান বাজেয়াপ্ত করা হবে ; (৩) শ্রেণীশত্রুর দালালদের শাস্তি দেওয়া হবে ; (৪) শ্রেণীশত্রুর রক্ষাকারী ঘৃণ্য পুলিসদলকে খতম করা হবে ; (৫) জনযুদ্ধে জয়লাভ করার জন্যে গেরিলাবাহিনী ও গণমুক্তিফৌজ তৈরি করা হবে। (১৪)

উক্ত মতাদর্শের ভিত্তিতে ডেবরা অঞ্চলের লড়াই অনেকটা অগ্রসর হয়। জোতদার তাদের দালাল এবং কয়েকজন পুলিস 'খতম' হয়। যথেষ্ট সংখ্যক কৃষকেরা এই লড়াইয়ে অংশ গ্রহণ করে। জোতদার শ্রেণীর কয়েকজনের বাড়িতে হানা দিয়ে তাদের বন্দুক কেড়ে নেওয়া হয় ; ফসল বাজেয়াপ্ত করে, তা কৃষকদের মধ্যে বিলি করার কাজ চলতে থাকে। জমিদারেরা অনেকেই এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। আর ছোট জোতদারেরা কার্যত আত্মসমর্পণ করে এবং কৃষকদের সমস্ত সিদ্ধান্তই মেনে নেয়। ফলে কৃষকের ঋণ মকুব হয়, বন্ধকী জমি সে ফিরে পায় এবং সর্বোপরি তাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ক্ষেত মজুরেরা পূর্বের তুলনায় প্রায় পাচ গুণ বেশি মজুরি পেতে থাকে। এবং লক্ষণীয় যে ক্ষেতমজুরেরা এই মজুরি কেবলমাত্র জমিদার ও বড় জোতদারদের কাছ থেকেই আদায় করতো ; অন্যপক্ষে যে মধ্যকৃষক তাদের আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়, তারা উক্ত বাড়তি মজুরি দেবার হাত থেকে রেহাই পেয়েছিল। (১৫) স্থানীয়ভাবে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস-পত্রের দামও তারা বেঁধে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন।

গোপীবল্লভপুরে এই আন্দোলন গড়ে তুলতে প্রধানত সহায়তা করেন কলকাতা থেকে আগত একদল ছাত্র ; এরাই চারু মজুমদারের তত্ত্ব ও আদর্শের বাহন হিসাবে গ্রামে যান। চারু মজুমদার ছাত্র যুবকদের কাছে আহ্বান জানিয়ে লিখেছিলেন, 'ছাত্র যুবক সম্প্রদায়ের দায়িত্ব হচ্ছে, চেয়ারম্যানের চিন্তাধারা অধ্যায়ন করা, আত্মসমর্পণের পথ বর্জন করে শ্রমিক ও কৃষকের সাথে একাত্ম হওয়া। ভারতবর্ষের শতসহস্র শহীদ আজ আহ্বান জানাচ্ছেন তাঁদের কাছে। আজ দিন এসেছে এই রক্তের ঋণ শোধ করবার, দিন এসেছে সাম্রাজ্যবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল শোষকশ্রেণীকে ধ্বংস করার। তাই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী) বিপ্লবী আহ্বান জানাচ্ছেন যুবছাত্রদের কাছে : 'দৃঢ়

আত্মবিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে যাও ওই শ্রমিক এবং দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকের কাছে; কারণ তারাই পারে এই লাঞ্ছনা, এই অবমাননার অবসান ঘটাতে। অতএব ছাত্র যুবকদের কাছে আজ পার্টির একটিই আবেদন—শ্রমিক এবং দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকের সাথে একাত্ম হও, একাত্ম হও, একাত্ম হও।' ১৬) সীমান্ত এলাকায় (ডেবরা গোপীবল্লভপুর) যে ছাত্র যুবকেরা গিয়েছিলেন, তাঁরা চারুবাবুর নির্দেশিত নিম্নোক্ত নীতিগুলো মেনে চলেন: '(১) ভূমিহীন ও দরিদ্র কৃষকের ঘরে থাকতে চেষ্টা করবে; (২) ওরা যা খাবে, তাই খাবে; না দিলে খাবে না, (৩) ভূমিহীন ও দরিদ্র কৃষকের সাথে কায়িক শ্রমে অংশগ্রহণ করবে; (৪) সাধ্যমত আশেপাশের শহরে, বড় রাস্তায় বা দোকান ইত্যাদিতে আসবে না; (৫) 'লাল বই' এবং 'তিনটি লেখা' ছাড়া অন্য বই নিয়ে যাবার প্রয়োজন নেই, (৬) নিরাপত্তার জন্যে কাছে টাকা পয়সা রাখার দরকার নেই। তা না হলে জনগণের ওপরে নির্ভরতার বদলে টাকা পয়সার ওপর নির্ভরতা বাড়বে।' (১৭) ওদের রিপোর্টে বলা হয়েছে যে ছাত্র-যুবকদের গ্রামাঞ্চলে পাঠাবার মূল উদ্দেশ্য ছিল, তাদের দিয়ে চেয়ারম্যানের চিন্তাধারার প্রচার ও প্রসার এবং এর মাধ্যমে বিপ্লবী শ্রেণীগুলি থেকে যে সমস্ত কর্মী আসবেন, মূলত ক্ষেতমজুর গরিব চাষী, তাদের গোপন সংগঠনের মাধ্যমে সংগঠিত করে সশস্ত্র উপায়ে ক্ষমতা দখলের দিকে এগোন। এই কার্যক্রমের সাফল্য বিষয়ে উক্ত রিপোর্টে বলা হয়: সীমান্ত এলাকায় চেয়ারম্যানের চিন্তাধারায় বিশেষ করে জনযুদ্ধের তত্ত্ব, জনসাধারণের লাইন ও তিনটি লেখার সামগ্রিক, গভীর প্রচার ও প্রসার। ফলশ্রুতি হিসেবে কিছু গ্রামাঞ্চলের বিপ্লবী শ্রেণীগুলির প্রতিক্রিয়াশীল, বিশেষভাবে সংশোধনবাদী চিন্তা থেকে মুক্তি ও কিছু বিপ্লবী কৃষককর্মীর জন্ম হোল। কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে ছাত্র-যুব আন্দোলনের সংযোগ। ফলশ্রুতি হিসেবে যুব-ছাত্র আন্দোলনে সশস্ত্র কৃষক সংগ্রামের চিন্তা ও কিছু বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীর জন্ম।' (১৮)

গেরিলা বাহিনীর হাতে পর পর সামন্ত শোষক ও তাদের দালালেরা খতম হবার ফলে গোপীবল্লভপুর এলাকায় 'শ্বেত সন্ত্রাসের স্থলে লাল সন্ত্রাসের' সৃষ্টি হয়। 'দেশব্রতী'র নিজস্ব প্রতিনিধির বিবরণ অনুযায়ী, যুগযুগান্তরের সামন্ত শাসন ভেঙে পড়েছে। সামন্ত শোষকেরা অনেকেই এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে; অনেকে গেরিলা বাহিনীর কাছে নতি স্বীকার ও আত্মসমর্পণ করেছে; বাকিরা হয়ে পড়েছে সন্ত্রস্ত ও হতবল। ফলে সেখানে কৃষক জনতার হাতে ক্ষমতা এসেছে এবং তার সঙ্গে অনিবার্যভাবে এসেছে কতকগুলো প্রশাসনিক দায়িত্ব। বিন্দুপ্রমাণ ও প্রাথমিক স্তরের হলেও, এমনকি অস্থায়ী হলেও, এ যে কৃষকরাজ এবং কৃষকের

রাজনৈতিক ক্ষমতার ভ্রূণরূপ তাতে সন্দেহ নাই। শ্রেণীশত্রুরা একথা বুঝতে পেরেছে বলেই, সাধারণ প্রশাসন রাজ্যের পুলিস এবং জোতদারশ্রেণীর ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীর উপর নির্ভর না করে সেখানে তারা পাঠিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের আধা মিলিটারী ফৌজ ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেল্‌স···তদানীন্তন যুক্তফ্রন্ট সরকারের এই ই. এফ আর বাহিনী পাঠানোর ফলে গেরিলা বাহিনীর কার্যকলাপ যথেষ্ট বাধাপ্রাপ্ত হয়; তদুপরি পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার পুলিস বাহিনীর মধ্যে যোগাযোগ সাধিত হবার ফলে তাঁরা ত্রিমুখী আক্রমণের সামনে পড়েন। এ-সময়েই এ-সময়েই চারু মজুমদার এ-অঞ্চল পরিদর্শন করেন এবং আন্দোলনকে ছড়িয়ে দিতে ও গরিব ও ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে থেকে অধিক সংখ্যক ক্যাডার সংগ্রহ করে আরো গেরিলা বাহিনী গড়ে তুলতে নির্দেশ দেন। বিপ্লবী কৃষক সংগ্রামীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'তারা (রাজ্যসরকারগুলির সাথে মিলে ইন্দিরা গান্ধীর সরকার। নির্দেশ দিয়েছে প্রতিটি ক্ষেত্রে কৃষকবিদ্রোহীদের হত্যা করার। শ্রেণীস্বার্থে উন্মত্ত এই শাসকশ্রেণী আজ যুদ্ধ ঘোষণা করেছে সমস্ত দেশের বিপ্লবী জনতার বিরুদ্ধে। চেয়ারম্যান আমাদের শিখিয়েছেন প্রতিবিপ্লবী হিংসার একমাত্র জবাব বিপ্লবী হিংসা। ওদের প্রত্যেকটি আক্রমণের বিরুদ্ধে আমাদের পাল্টা আক্রমণ করতে হবে; তবেই আমরা পারব ওদের আক্রমণের মোকাবিলা করতে। বিপ্লবী কৃষক সংগ্রামীদের তাই আরও দৃঢ়ভাবে সংগ্রামের পথ গ্রহণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে চেয়ারম্যানের শিক্ষা, "বন্দুকের নল থেকেই রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্ম হয়" ওরা আমাদের হত্যা করতে চায়। হত্যাকারীকে বাঁচিয়ে রাখার অর্থ মৃত্যু। ওদের নির্মূল করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে গেরিলা যুদ্ধের পদ্ধতিতে বিপ্লবী হিংসার পথ গ্রহণ করুন।···আজকের দিনের প্রত্যেকটি বিপ্লবী কৃষক সংগ্রামীর কাছে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)'র আহ্বান—প্রতিটি আক্রমণের বদলা নিন এবং ঢেউ-এর মত সংগ্রাম ছড়িয়ে দিন। আত্মরক্ষার এই একমাত্র পথ, একমাত্র পরিচিত পথ; অন্য কোন পথ নেই। এই পথেই কৃষকের বিপ্লবী সেনাবাহিনী গড়ে উঠবে। কারণ, কখনো ভুলবেন না, ভারতবর্ষে আজ আপনারাই একমাত্র বিপ্লবের শক্তি, প্রগতির শক্তি এবং বিপ্লবের অগ্রগতিকে কেউ রোধ করতে পারবে না। (১০০)

চারুবাবুর নির্দেশে সামনে, আঞ্চলিক কমিটি খড়গপুর, সাকরাইল, কেশপুর ও চাকুলিয়া থানা এলাকায় গ্রামাঞ্চলে কৃষক-সংগ্রামকে ছড়িয়ে দেন। এবং এই বিস্তৃতিকরণের মধ্যে দিয়ে তাঁদের বক্তব্য, তাঁরা চারটি শিক্ষা লাভ করেন (১) গেরিলা অ্যাকশনের দ্বারা শ্রেণীশত্রু খতমই জনসাধারণকে জাগ্রত করার

একমাত্র পথ এবং এর মধ্যে দিয়েই সঠিক বিপ্লবীকে চেনা যায়; (২) গেরিলা অ্যাকশনের সার্থকতার জন্যে গেরিলা স্কোয়াড সবসময়ে দোদুল্যমান মানবিকতা-সম্পন্ন লোকদের পরিত্যাগ করবে, (৩) যাদের মধ্যে সংশোধনবাদী মনোভাব এখনো রয়েছে, তাদের কখনো গেরিলা স্কোয়াডে নেওয়া চলবে না এবং প্রথম পর্যায়ে মাঝারি কৃষকদেরও এই স্কোয়াডের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত নয়; (৪) গেরিলা বা গেরিলা স্কোয়াড কখনো তীর-ধনুক বা অন্য কোন দূর থেকে নিক্ষেপ করার উপযোগী অস্ত্র বহন করবে না, কারণ অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে যাদের হাতে ঐ প্রকার অস্ত্রাদি থাকে, তারাই সবচেয়ে আগে ভয় পায়। (১০১) এই অভিজ্ঞতাগুলির প্রসঙ্গে চারুবাবু পরে বিস্তৃত বক্তব্য উপস্থিত করেন, যা শেষপর্যন্ত আন্তঃপার্টি বিতর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়ায় এবং অসীম চ্যাটার্জী ও সন্তোষ রাণা চারুবাবুর বিরুদ্ধেই মত প্রকাশ করেন।

১৯৭০ সালের মে মাসে কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)'র প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। এই কংগ্রেসে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত 'রাজনৈতিক সাংগঠনিক রিপোর্টে' বলা হয়, 'ভারতীয় পরিস্থিতিতে এক নূতন বস্তুর আবির্ভাব ঘটেছে, যাতে জনগণের বিজয় সূচিত হচ্ছে সি. পি. আই (এম. এল)-এর নেতৃত্বে কৃষকদের সশস্ত্র সংগ্রামে। এক বছরের মধ্যেই লড়াই বহুদূর ছড়িয়ে পড়েছে—ছড়িয়ে পড়েছে আসাম থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত—এবং ভারতবর্ষের বারটির বেশি রাজ্যকে প্লাবিত করেছে এবং ইতিমধ্যেই ইতিহাসের একটি চালিকা শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ·নির্বাচন বয়কট, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদরূপে সোবিয়েত কোঅর্ডিনেশনের আমলে দুই লাইনের লড়াই তীব্র হয়েছিল। কমরেড চারু মজুমদারের নেতৃত্বে এইসব প্রশ্ন নিয়ে যে তীব্র লড়াই চলে, তা বিপ্লবী কর্মীদের মধ্যে আরও শক্তি ও দৃঢ়তা আনে যার ফলে মুশাহারি ও লখিমপুর খেরীর মত নতুন নতুন এলাকায় তত্ত্ব ও নীতি হিসাবে স্বীকার করে বলা হয়, একমাত্র গেরিলা যুদ্ধই পারে শত্রুর বিরুদ্ধে জনগণের সমগ্র শক্তিকে সমাবেশ ও প্রয়োগ করতে, ভাইস চেয়ারম্যান লিন পিয়াও-এর নির্ভুল তত্ত্বকে অধ্যয়ন ও নির্দিষ্টভাবে প্রয়োগ করিতে পারে, শ্রেণীশত্রু খতম শ্রেণীসংগ্রামের উচ্চতর রূপ এবং গেরিলা যুদ্ধ ও জনগণের জনযুদ্ধের সূচনা। এই সঠিক তত্ত্বকে উপলব্ধি ও নিয়মিতভাবে প্রয়োগ করতে পারি এবং একথা উপলব্ধি করতে পারি যে, শ্রেণীসংগ্রাম অর্থাৎ খতমের লড়াই-ই আমাদের সামনে সমস্ত সমস্যাকে সমাধান করতে পারে ও লড়াইকে উচ্চতর স্তরে নিয়ে যেতে পারে, আমাদের জনগণের চেতনাকে উচ্চতর স্তরে তুলতে পারে...খতমের লড়াই মানুষকে শুধু যে

জমিদার শ্রেণীর ও তার রাষ্ট্রের নিপীড়ন থেকেই মুক্ত করে তাই নয়, পশ্চাৎপদ ধ্যানধারণাগুলির বেড়ি থেকেও তাদের মুক্ত করে এবং তাদের মন থেকে স্বার্থবুদ্ধি, গোষ্ঠীস্বার্থ, স্থানীয় সংকীর্ণতা, নীতিভেদ, ধর্মীয় কুসংস্কার ইত্যাদির মত বিষাক্ত আগাছাগুলিকে দূর করে দেয়। এইভাবে খতম অভিযান পারে মানুষের মহিমা ও গরিমার পূর্ব হাওয়া বইয়ে দিতে।' (১০২)

১৯৭০ সালের মার্চ মাসে কলকাতায় এবং এর সামান্য কিছুকাল পর থেকে অন্যান্য শহরাঞ্চলে পার্টি নেতৃত্ব থেকে কোনরকম নির্দেশ ব্যতিরেকেই নকশালপন্থীরা তাদের অতিধ্যাতে 'সাংস্কৃতিক বিপ্লব' শুরু করেন এবং গ্রামে পরীক্ষিত 'খতমের অভিযান' এখানেও প্রবর্তিত হোল; এই সঙ্গে হিংসাশ্রয়িতার মাধ্যমে তাঁরা এই 'প্রতিক্রিয়াশীল' শিক্ষাব্যবস্থা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বাতিল করতে বদ্ধপরিকর হলেন। নেতৃবৃন্দ প্রথমে কিছুই বুঝতে পারেন নি, তারপর হঠাৎ এই আন্দোলনকে স্বাগত জানালেন। এবং এই আন্দোলন থেকেই শুরু হোল সি. পি. আই (এম)-এর সঙ্গে উত্তরোত্তর সংঘর্ষের পর্ব। চারু মজুমদার বার'বার বলেছিলেন বিপ্লবী কর্মী, ছাত্র এবং যুবকদের গরীব ও ভূমিহীন কৃষকদের সঙ্গেই এ্কাত্ম হবার কথা। শহরের অ্যাকশন কখনোই গ্রামের সংগ্রামের বিকল্প নয়, পারপূরক মাত্র। অথচ পার্টি কংগ্রেসে চারুবাবু এই অ্যাকশনের বিষয় উল্লেখ করে বললেন, সশস্ত্র কৃষক সংগ্রামের ফলশ্রুতিতেই কলকাতার বিপ্লবী যুবকদের লড়াই শুরু হয়েছে। কলকাতার শ্রমিকশ্রেণীও সংগ্রাম শুরু করেছে। তিনি আশা প্রকাশ করেছিলেন যে ভারতের অন্যান্য শহরেও শ্রমিকশ্রেণীও বিপ্লবী আন্দোলন শুরু করবেন; এটা ঘটতে বাধ্য আর এর ফলে শহরের অবস্থায় আসবে আমূল পরিবর্তন। (১০৩)

শ্রমিকদের মধ্যে পার্টির কাজ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে একবার যদি শহরের শ্রমিকেরা বিপ্লবী রাজনীতিতে উদ্বুদ্ধ হয়, তাহলে তারা শিল্পাঞ্চলে এক ভয়ঙ্কর সংগ্রাম শুরু করবে এবং এমনকি শ্রেণীশত্রুও তাদের দালালদের 'খতম' করতে শুরু করবে। "কিন্তু যেহেতু মাও-সে-তুঙের চিন্তা তাদের শেখাবে যে কৃষকেরা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের লড়াই শুরু করেছে গ্রামাঞ্চলে, কারণ সেখানে শত্রুরা দুর্বল, ফলে তারা গ্রামাঞ্চলে গিয়ে উক্ত লড়াইয়ে সামিল হবে। আমাদের পার্টির সংগঠনতাকে এই লাইনেই অনুপ্রেরণা ও শিক্ষা দেবে।' (১০৪) দেশের ছাত্র-যুবকদের প্রতি তাঁর বক্তব্য ছিল: 'তারাই বিপ্লবী রাজনীতি অর্থাৎ চেয়ারম্যানের চিন্তাধারায় শিক্ষিত হয়ে ব্যাপক জনতার মধ্যে, বিশেষ করে ভূমিহীন ও দরিদ্র কৃষক জনতার মধ্যে চেয়ারম্যানের চিন্তাধারাকে ছড়িয়ে দিতে

পারেন এবং তাদের সাথে একাত্ম হয়ে ভারতবর্ষের গ্রামে গ্রামে কৃষকের বিপ্লবী ঘাঁটি তৈরির কাজে এগিয়ে যেতে পারেন। তাঁরা শিক্ষিত, তাই দেশের অশিক্ষিত মানুষের কাছে চেয়ারম্যানের চিন্তাধারার শিক্ষা পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব তাঁদের সবচেয়ে বেশি।...সাম্রাজ্যবাদীরা ও প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণী ছাত্র-যুবকদের এই বিপ্লবের সম্ভাবনাকে অঙ্কুরে বিনাশ করতে চেয়েছে এবং সামনে তুলে ধরছে কলেজ ইউনিয়নের টোপ। কলেজ ইউনিয়নগুলো যুবক ও ছাত্রদের শিক্ষার কোন সমস্যার সমাধান করতে পারে না, শুধু তাই নয়, এই ইউনিয়নগুলোয় অংশ গ্রহণ করে এই শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুব ছাত্রদের বিদ্রোহকে নেতৃত্ব দিতে অক্ষম হয়। এগুলো মূলত বিপ্লবী ছাত্র সমাজের সামনে একটা অর্থনীতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী তুলে ধরে। তাই কলেজ ইউনিয়নগুলো ছাত্র-যুবকদের বিপ্লবী প্রতিভাকে নষ্ট করে, শ্রমিক-কৃষকের সাথে একাত্ম হওয়ার পথে এগুলো তোলা বিরাট বাধা। (১০৫) তদুপরি এই একাত্মতার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পেয়ে তুমি নিজেকে যথার্থই গর্বিত ও ভাগ্যবান বলে মনে করবে এবং তাদের প্রতি শ্রদ্ধাবান হবে। আর এটা যখন পারবে, তখনি তুমি বিপ্লবীর প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছ বলে মনে করবে।' (১০৬) গ্রাম থেকে ফিরে ছাত্র-যুবকেরা স্ব-স্ব এলাকার, স্কুলে কলেজে 'রেড-গার্ড-স্কোয়াড' গঠন করবে। এই রেড-গার্ডরাই পরে ভাবতের জন-মুক্তি বাহিনীতে পরিণত হবে; রেড গার্ড-স্কোয়াডের আশু কর্তব্য হবে রাজনৈতিক প্রচার, গরীব ও ভূমিহীন কৃষক এবং শ্রমিকদের সপক্ষে ছাত্র যুবকদের সংগঠিত করা। এবং সবশেষে, চারুবাবুর বক্তব্য, তোমরা যদি এই কর্তব্যকর্ম সচেতনভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পার, তবে আমি তোমাদের নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে ১৯৭১ সালের প্রারম্ভকালের মধ্যেই, যদি ১৯৭০-এ সম্ভব না হয়, বাংলার সুদীর্ঘ সমতলে জনগণের মুক্তি ফৌজ মার্চ করবে।'

কলকাতার নকশালপন্থীদের কার্যকলাপ নানাভাবে বিস্তৃত হয়। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে কারখানায় লাল পতাকা তোলার চেষ্টা চলে এবং প্রায় সর্বক্ষেত্রেই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংঘর্ষের একটা ঘটনা ঘটতে থাকে। 'কাশীপুর গান এণ্ড শেল ফ্যাক্টরী'তেও এরা লাল পতাকা উড্ডীনে সমর্থ হন। কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের রাজনীতির স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রমে মাও-এর রচনা অন্তর্ভুক্ত করার জোরদার দাবী এদের দ্বারা উত্থিত হয়। 'চীন বিরোধী' চলচ্চিত্র প্রদর্শনী বন্ধ করতে হয় এদেরই আন্দোলনের ফলে। এবং যে-মুহূর্ত থেকে বিরোধীদের বাধাদান সংগঠিত হোল, সেই মুহূর্ত থেকেই এরা হিংসার আশ্রয় নিতে শুরু করেন। (১০৭)

শহরে অকস্মাৎ এই অ্যাকশন শুরু হবার কারণ প্রসঙ্গে বহুতর মতবাদ বর্তমান। তবে সাধারণভাবে ধরে নেওয়া হয় যে, গ্রামাঞ্চলে জোরদার পুলিশী অ্যাকশন শুরু হবার ফলে যে ছাত্র-যুবকেরা গ্রামাঞ্চলে গরিব ও ভূমিহীন চাষীর সঙ্গে একাত্ম হতে গিয়েছিলেন, তারা শহরে ফিরে আসতে বাধ্য হন। তাদের পক্ষে শহরে অ্যাকশন করা, তুলনামূলকভাবে ছিল সহজ। শহরে আত্মগোপন করাও ছিল তাদের কাছে গ্রামের তুলনায় সহজ। তদুপরি শহরে পার্টির নির্দিষ্ট কার্যক্রম তাদের বিপ্লবী রোমান্টিকতাকে প্রয়োগের যথেষ্ট সুযোগ দেয়নি। তাই অধৈর্য হয়ে, তারা নিজেরাই নিজেদের কার্যক্রম স্থির করে নিলেন এবং গান্ধীর মূর্তি ভাঙার প্রয়াস, আমেরিকান ও সোভিয়েত সাহিত্যের বহ্নিউৎসব ইত্যাদি কার্যাবলীকে তাঁদের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করেন। এদের প্রাথমিক আক্রমণের লক্ষ্য ছিল আমেরিকা পরিচালিত শিক্ষাসংস্থাগুলি, যা অচিরেই পরিবর্তিত হয়েছিল সমস্ত শিক্ষায়তনের প্রতি আক্রমণে। সাধারণভাবে এরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হঠাৎ উপস্থিত হয়ে অফিসঘর তছনছ করে, জাতীয় নেতাদের ছবি ভেঙেচুরে, পুলিশ আসবার আগেই স্থানত্যাগ করতেন। এ-প্রসঙ্গে শশাঙ্ক লেখেন, 'কৃষকের বিপ্লবী লড়াইয়ের অনুপ্রেরণায় পেটি বুর্জোয়া পরিবার থেকে আগত যুবকদের প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষা পদ্ধতির প্রতি আক্রমণ অসামান্য ও অকল্পনীয়। যতদূর জানি, পৃথিবীর কোন দেশের বিপ্লবের ইতিহাসে এর কোন নজীর নেই। পেটি বুর্জোয়া যুবক ও ছাত্ররাই এই প্রতিক্রিয়াশীল উপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার শিকার এবং তারা যুবক বলেই এর বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক বিপ্লবী পতাকা তুলে ধরেছে।' (১০৮)

১৯৭০-৭১ সাল জুড়ে এইসঙ্গে কলকাতা এবং আশেপাশের অঞ্চলে গান্ধী, বিদ্যাসাগর প্রমুখদের মূর্তি ভাঙা শুরু হয়। অচিরাৎ এ-কাজকে রাজনীতিক-ভাবে সমর্থন জানান সি. পি. আই (এম এল)-এর নেতৃবৃন্দ। চারু মজুমদার লেখেন, 'গত কয়েক মাস ধরে কলকাতা ও বাংলাদেশের ছাত্র যুবকেরা গান্ধী ও বুর্জোয়া নেতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। তারা মূর্তি ভাঙার উৎসব পালন করছেন। ...কিন্তু ছাত্র যুবকদের এই সংগ্রাম একক বা স্বয়ংসম্পূর্ণ সংগ্রাম নয়। এই সংগ্রাম অবশ্যই চীনের মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মত প্রতিক্রিয়াশীল সংস্কৃতির সমস্ত ইমারতকে (Superstructure) ভেঙে দেওয়ার জন্য শুরু হয়নি বা সেই পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না। এই সংগ্রাম চলছে কারণ সশস্ত্র কৃষি বিপ্লব এই বাংলাদেশে এক বাস্তব সত্য হিসাবে বেরিয়ে এসেছে। কৃষকের সশস্ত্র বিপ্লবী সংগ্রামের আঘাতে ভিত (base) ভাঙছে, যার ফলে

ইমারতও যা খাচ্ছে এবং খাবেই। ভিত ভাঙার প্রতিক্রিয়া থেকেই আসছে ইমারতের উপর এই আক্রমণ, আবার ইমারতের উপর এই আক্রমণ ভিত ভাঙার প্রক্রিয়াকে সাহায্য করছে। এই কৃষি বিপ্লবের প্রয়োজনের তাগিদেই, ছাত্র যুবকেরা চঞ্চল হয়ে উঠেছেন এবং তারা আঘাত হানছেন সেইসব মূর্তির উপর যারা কৃষক জনতার সশস্ত্র বিপ্লবকে চিরদিন শান্ত করতে চেয়ে এসেছে শান্তি ও সংস্কারের বাণী শুনিয়ে। তাই ছাত্র যুবকদের এই সংগ্রাম সশস্ত্র কৃষক সংগ্রামেরই অঙ্গ।' (১০৯) চারুবাবুর এই বক্তব্য প্রকাশের কয়েকদিন পরেই (২০ আগস্ট, ১৯৭০) পার্টির অন্যতম নেতা সরোজ দত্ত একটি প্রবন্ধে মূর্তিভাঙার বিরুদ্ধাচরণ-কারীদের তীব্র ভাষায় নিন্দা করে লিখলেন, 'মূর্তি ভাঙার লড়াই হচ্ছে আসলে দু'মূর্তির লড়াই এবং দুই মূর্তির লড়াই হচ্ছে আসলে দুই রাজনীতির লড়াই, দুই শ্রেণীর লড়াই।' (১১০) এই মূর্তি ভাঙার রাজনীতির প্রসঙ্গে পার্টিতে ভাঙন দেখা দেয়। সেন্ট্রাল কমিটি ও পলিটব্যুরোর সদস্য সুশীতল রায়চৌধুরী (পূর্ণ ছদ্মনামে) একটি বিবৃতি প্রচার করেন, যার মুখ্য বক্তব্য ছিল, বিপ্লবী রাজনীতির পক্ষে যেহেতু গান্ধী ও গান্ধীবাদ বাধাস্বরূপ, সেহেতু তার মূর্তিভাঙা চলতে পারে কিন্তু বুর্জোআ গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরের রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর প্রমুখ বুর্জোআ বুদ্ধিজীবীদের মূর্তিভাঙা অনুচিত; শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্কারের জন্যে অবশ্যই আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে, কিন্তু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কাগজপত্র নষ্ট করা বা আসবাবপত্র ভাঙা বা প্রেসিডেন্সি কলেজের ল্যাবরেটরি নষ্ট করা অনুচিত। চারু মজুমদার উক্ত বক্তব্যকে অগ্রাহ্য করে বলেন যে, তার বক্তব্যকে স্বীকার করলে মেনে নিতে হয় যে ভারতীয় বুর্জোআদের একাংশ ছিল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী। এটা পার্টিকংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবের বিরোধী, কারণ সেখানে ভারতীয় বুর্জোআদের চরিত্র নির্ধারণ করা হয় 'মুৎসুদ্দিরূপে'। যদি গভীর ঘৃণায় ছাত্রেরা আজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভাঙচুর করে, তবে সে কাজে কোন বিপ্লবীরই বাধা দেওয়া উচিত না। (১১১)

স্কুল-কলেজে হানা দেওয়া, মূর্তি ভাঙার মধ্যে দিয়ে, শহরাঞ্চলে পার্টির শ্রেণীশত্রু খতমের কার্যক্রম গৃহীত হয়। পার্টির কলকাতা জেলা কমিটি ঘোষণা করে যে অন্ধ্র প্রদেশে সি. পি আই (এম এল)-র নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের হত্যার বদলা নেওয়ার জন্যেই এখানে পুলিশ, সেনানায়ক, পুঁজিপতি, ও চোরাকারবারীদের খতম করা হবে। সম্ভবত কলকাতা জেলা কমিটির এই পুলিশ খতমের কার্যক্রমে চারুবাবুর সম্মতি ছিল না। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা সীমান্ত এলাকা কমিটির একটি আন্তঃপার্টি দলিল থেকে জানা যায় যে চারুবাবু এই পুলিশ হত্যার নিন্দা

করেছিলেন। তাঁর মন্তব্য ছিল, 'এই পুলিশ খতম শ্রেণীঘৃণা বাড়িয়ে তোলার বদলে কমিয়ে দেবে ; মূল কথা হোল শ্রেণীশত্রু খতমের প্রচার বাড়াতে হবে।' (১১২) কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, পার্টির হিসেব অনুযায়ী, জুন মাসের (১৯৭০) মধ্যেই পাঁচ জনকে খতম করা হয়, যার মধ্যে চারজন ছিলেন পুলিশ (কনস্টেবল) বা ইনফরমার একজন 'সি. পি. আই (এম) পুলিশ এজেন্ট'। (১১৩) সি. পি. আই (এম. এল) কর্মীদের মধ্যে শহরাঞ্চলে এই খতম বিষয়ে যতই মতান্তর থাক না কেন, যে মুহূর্তে পার্টি শহর ও গ্রামের অ্যাকশনকে একই কাজের অন্তর্ভুক্ত বলে ঘোষণা করলেন, তখন থেকেই কলকাতায় ও জেলা শহরগুলিতে এই 'খতমের কার্যক্রম' বিস্তৃতি লাভ করল। ফলে ১৯৭০ সালের মধ্যে বেশ কিছু পুলিশের লোক খতম হোল এবং প্রায় ৪০০ জন জখম হলেন। আর যেহেতু ট্রাফিক কনস্টেবলরাই নিরস্ত্র দাঁড়িয়ে থাকতেন রাস্তায়, সেহেতু তাঁরাই এদের শিকারে পরিণত হলেন ; ফলে অচিরাৎ সরকার এই কনস্টেবলদের হাতে অস্ত্র তুলে দিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ১৫০ জন পুলিশের লোক 'খতম' হন, তাদের মধ্যে পদমর্যাদায় কেউই ইনস্পেক্টর-এর উঁচু পদের ছিলেন না। এর ফলে পুলিশ বিভাগেও প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। কলকাতায়, কৃষ্ণনগরে এবং বহরমপুরে পুলিশ কনস্টেবলরা নকশালবাদীদের বিরুদ্ধে প্রায় জেহাদ ঘোষণা করে। ১৯৭০-এর শেষে সি. পি. আই (এম. এল)-প্রচারিত এক পুস্তিকায় ('পুলিশদের প্রতি') তাদের সরাসরি বলা হয় যে হয় সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা কর, অথবা নকশালবাদীদের হাতে মৃত্যুবরণের ঝুঁকি নাও। কারণ বিপ্লবীরা পুলিশ কর্মচারীদের খতমের কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে।

পরিণামে স্বভাবতই পুলিশ বিভাগ তৎপর হয়ে ওঠে। এবং সম্ভবত প্রশাসন ও পুলিশ বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সম্মেলনে, নকশাল দমনের সমস্ত ভার পুলিশ বিভাগের ওপরেই অর্পণ করা হয়। সুতরাং কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় পাওয়া যেতে লাগল নকশালদেব মৃতদেহ এবং ধরপাকড় ও অত্যাচার চূড়ান্তে উঠল। এসময় পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত রাজনৈতিক পার্টি এক আশ্চর্য নীরবতা অবলম্বন করেন। যে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি অন্ধ্রের নকশালবাদীদের হত্যার নিন্দায় মুখর ছিলেন, তারাও পশ্চিমবঙ্গের হত্যাকাণ্ডে কিছুমাত্র বিচলিত হলেন না।

এদিকে সি. পি. আই. (এম. এল.)-এর রাজনৈতিক প্রসারলাভে সি. পি. আই. (এম)-এর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় স্বাভাবিকভাবেই এবং প্রথমোক্ত পার্টির জন্মকালেই উভয় পার্টির মধ্যে যে তিক্ততা জন্ম নেয়, তা ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

প্রথম দিকে দলগতভাবে উভয় পার্টির ছাত্র সংগঠনের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। দ্বিতীয় যুক্তফ্রণ্ট সরকারের পতন ও একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্বেও জ্যোতি বসু নতুন সরকার গঠনে রাজ্যপাল কর্তৃক আহূত হন না, ফলে পার্টির মধ্যে থেকে পুনর্বার পার্লামেণ্টারী রাজনীতির পথ গ্রহণ না করার চাপ সৃষ্টি হয়। সি. পি. (এম)-নেতৃবৃন্দ এই চাপের কাছে মাথা না নোয়ালেও, পার্লামেণ্টারী রাজনীতির বিরোধী দলত্যাগী সি. পি. (এম)-দের সংগঠন সি. পি. আই. (এম. এল) স্বাভাবিক কারণেই তাঁদের কাছে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ হিসেবে সামনে এসে দাঁড়ায়। সুতরাং পুনর্বাব যাতে সি. পি. (এম)-এ ভাঙন না ঘটে এবং যথারীতি দলত্যাগ ও সি. পি আই. (এম. এল)-এ যোগদান সম্ভব না হয়, সেকারণেই উক্ত তিক্ত সম্পর্ককে সংঘর্ষেব স্তরে নিয়ে যাওয়া রাজনীতিগত-ভাবেই, তার পক্ষে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। এবং এরই অনিবার্য পরিণামে সমস্ত পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে খুনের রাজনীতি বিস্তৃত হতে থাকে। এমনকি যে কামাখ্যা বন্দ্যোপাধ্যায় একদা নকশালবাড়ি আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক ছিলেন, তিনিও দলত্যাগ করে সি. পি. (এম)-এ যোগ দেওয়ায় নকশালবাদীদেব হাতে খতম হন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীব বিবৃতি অনুযায়ী ১৯৭১-এর মার্চ থেকে আগস্ট মাসের মধ্যে নকশালবাদীরা ২১ জন সি. পি. (এম) ক্যাডারকে খতম করে এবং বদলে সি. পি. (এম)-ও সমপরিমাণ নকশালকে হত্যা করে। এ সময়ে উভয় দলের মধ্যে মোট ১২৩টি সংঘর্ষ হয়, এর মধ্যে বলা হয়, ৬৮টি বাধায় সি. পি. (এম) কর্মীরা এবং বাকী ৫৫টি নকশালবাদীরা। (১১২) এর কয়েক মাসের মধ্যে পুলিশ ও সি. পি. (এম)-এর যুগপৎ আক্রমণে সি. পি. (এম. এল)-এর ক্যাডাররা মরতে থাকে অনেক বেশি সংখ্যায়। ১৯৭০ সালের মার্চ থেকে ১৯৭১-এর আগস্ট পর্যন্ত মোট ১৮ মাসে পশ্চিমবঙ্গে ১,৩৪৫ জন সি. পি. আই. (এম. এল.)-এর ক্যাডার নিহত হয়। এবং সি. পি. (এম) ক্যাডার নিহত হয় ৩৬৮ জন (পি. সুন্দরায়ার হিসেব অনুযায়ী এই সংখ্যা মাত্র ২০৬ জন)। (১১৫) বারাসাত (১৯ নভেম্বর ১৯৭০), ডায়মণ্ডহারবার (২৬ জানুয়ারী ১৯৭১) এবং কোন্নগর (১ জুন ১৯৭১) এর গণহত্যার বিষয় তো সর্বজন বিদিত কিন্তু বরানগর কাশীপুরের গণহত্যাকাণ্ড (১২-১৩ আগস্ট ১৯৭১) উক্ত সমস্ত কিছুকে অতিক্রম করে। 'যুগান্তর' পত্রিকা তার সম্পাদকীয়তে (১৫।৮।৭১) লেখেন, 'বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা ধরে কাশীপুর-বরানগর অঞ্চলে যা হয়েছে তাতে রাজনৈতিক খুনোখুনি একটা নতুন স্তরে উঠল। এখানে-ওখানে দুয়েকজন খুন-জখম নয়, অথবা বারাসাতের ঘটনার মতো গোপনে

পাইকারী খুন করে লাশ পাচার করা নয়, একবারে প্রকাশ্য রাজপথে ধরে ধরে কোতল করা এবং একটা বড় অঞ্চল জুড়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে তাণ্ডব চালিয়ে যাওয়া। এটাকে কি বলা হবে? রাজনৈতিক খুনোখুনি? দাঙ্গা? গণহত্যা? পশ্চিমবঙ্গে যেসব বীভৎস কাণ্ড গত কয়েক মাস যাবৎ চলছে সেগুলির মধ্যেও এমন ঘটনার নজীর পাওয়া যবে না।' ফ্রন্টিয়ার ১৮।৯।৭১ তারিখে লেখেন, 'শুক্র ও শনিবার এই দু'দিনের মধ্যে ১৫০ জনেরও বেশি তরুণকে খুন করা হয়। অন্যেরা, যারা তরুণ নন, তাদেরকেও মরতে হয়। যাতে কোন ভুল না হয় সেজন্য—যে বড় রাস্তাটা বরানগর থানাকে অন্যান্য অংশের সাথে যুক্ত করেছে, সেই কুঠিঘাট রোডের উপর তখুনি তৈরি করা একটা মঞ্চের গায়ে নিহত লোকদের একটা তালিকা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। ঘণ্টায় ঘণ্টায় সেই তালিকায় নতুন নাম যোগ হতে থাকে। তালিকায় গোটা অঞ্চলের একটি মাত্র অংশই অন্তর্ভুক্ত ছিল। কেবল শুক্রবারেই এই তালিকায় ৬০টা নাম ওঠে। এবং শেষে মৃতের সংখ্যা যখন আর গোনা সম্ভব হচ্ছিল না তখন তালিকাভুক্ত করা বাদ করে দেওয়া হয়।' (১১৬) এই অব্যাহত খুন-জখমের এবং পুলিশী অত্যাচারের বাধাহীন উন্মত্ততার উল্লাসের মধ্যে নকশালবাদী শহুরে তরুণেরা ক্রমশ ক্ষীণবল এবং হতাশ হয়ে পড়ছিলেন; দলের বহুলাংশ তখন জেলে অথবা নিহত। এই সময়ে ১৯৭১ সালের শেষে চারু মজুমদার শহরে অ্যাকশন বন্ধ করতে নির্দেশ দেন: 'এখনই আমরা কলকাতা ও অন্যান্য শহর দখল করতে পারি না এবং তা সম্ভবও নয়। সুতরাং শহরাঞ্চলের পার্টি সদস্যেরা সরাসরি ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে লিপ্ত হবেন না।' (১১৭) কার্যত ১৯৭২ সালের মধ্যেই নকশালবাদী আন্দোলনের ধারা প্রায় স্তব্ধ হয়ে পড়ে।

কিন্তু গ্রামাঞ্চলে সার্থক কৃষক অভ্যুত্থান ঘটাতে না পারলেও, ৭০-এর দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করে তুলতে না পারলেও, ভারতীয় রাজনীতি ও সমাজের যে ব্যাখ্যা ও কার্যক্রমের ভিত্তিতে তাবা সংসদীয় পথ পরিত্যাগ করার ও নয়া গণতান্ত্রিক তত্ত্ব অনুযায়ী সশস্ত্র সংগ্রামের ডাক দিয়েছিলেন, তার সুনির্দিষ্ট প্রভাব যে পশ্চিমবঙ্গের সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস চিন্তা, সাহিত্য এবং শিল্পচর্চায় বর্তমান এবং সুদূরপ্রসারী এ-বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ কম।

নির্দেশিকা

(১) ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)-র কর্মসূচী, ১৯৭০ সালে যে মাসে অনুষ্ঠিত পার্টি কংগ্রেসে সর্বসম্মতিতে গৃহীত। নং ২৭

(২) Editorial, People's Daily, July 5, 1967

(৩) হরেকৃষ্ণ কোঙার, ভারতের কৃষি-সমস্যা, পৃ. ৭৭

(৪) Biplab Dasgupta, the Naxlilte Movement, p-9

(৫) Charu Majumdar, It is Time To Build up a Revolutionary Party, Liberation Miscellany. No 1, pp. 62-63

(৬) 32 Political Organizational Report of the CPI(M) Central Committee, December 23-29, 1968. p. 286

(৭) Mohan Ram, Maoism in India, p 78

(৮) Ideological Resolution Communist Party of India (Marxist), 1968, p. 4

(৯) Ibid, p.8

(১০) Ibid, pp. 9-10

(১১) Ibid, p. 11

(১২) Ibid, p. 25

(১৩) Ibid, p 31

(১৪) Ibid, pp. 28-29

(১৫) Ibid, p. 32

(১৬) Ibid, pp. 33-34

(১৭) Ibid, p. 35

(১৮) Ibid, pp. 49-50

(১৯) Ibid, p. 53

(২০) The Betrayal, Liberation, May, 1968, pp. 7-14

(২১) Letter to Andhra Comrades, Communist Party of India (Marxist), p. 1

(২২) Andhra Plenum Rejects the New-Revisionist, Ideological Draft, 1968, p. 3

(২৩) Ibid, p. 59

(২৪) To be or not to be with them, Liberation, May, 1968, pp. 12-13

(২৫) Letter to Andhra Comrades, p. 42
(২৬) T. Nagi Reddy and Others, Open Letter to Party Members, 1968, p. 23
(২৭) Political-Organizational Report, CPI(M), Quoted in Biplab Dasgupta, the Naxalite Movement, 1974, p. 30
(২৮) The Statesman, Calcutta, June 29, 1968
(২৯) হরশঙ্কর কাপুর, আজকের ভারতবর্ষ : পটভূমি ও যাত্রাপথ, বিশেষ ক্রোড়পত্র, প্রস্তুতিপর্ব, জানুয়ারী-এপ্রিল, ১৯৭৫, পৃঃ ৩৮
(৩০) People's Democracy, July 2, 1967
(৩১) তরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সংক্ষেপিত, নকশালবাদী রাজনীতির বিভিন্ন ধারা, প্রত্যয়, শারদ-সংখ্যা ১৩৮৪ পৃঃ ৩২-৩৩
(৩২) The Co-ordination Committe of the Revolutionaries of CPI(M)—The nature and object, Liberation, May 68, pp. 17
(৩৩) Declaration of the Revolutionaries of the Communist Party of India (Marxist). Liberation, December, 1967, pp 3-6
(৩৪) Liberation, May '68, p. 19
(৩৫) Ibid, June, '68, pp. 7-10. তরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃঃ ৩৪-৩৫
(৩৬) Biplab Dasgupta, op. cit. p. 30
(৩৭) Liberation, March, 69, pp. 8-9
(৩৮) Charu Mazumdar, 'Why must we form the Party Now', Liberation, March 1969, pp. 10-11
(৩৯) Liberation, March 1969, pp. 3-7
(৪০) Sankar Ghosh, The Naxalite Movement, pp. 55-6
(৪১) অসীম চ্যাটার্জী, নকশালবাড়ীর প্রকৃত শিক্ষাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরুন, পৃঃ ২৩
(৪২) Liberation, May 1969, pp. 119-20
(৪৩) Quoted in Biplab Dasgupta, op. cit. p. 33
(৪৪) Quoted in Sankar Ghosh, op. cit. pp. 67-68
(৪৫) Liberation, May 1969, pp. 4-16
(৪৬) সুপ্রকাশ রায়, ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, পৃঃ ৩৫৭-৮
(৪৭) বদরুদ্দীন উমর. চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাঙলাদেশের কৃষক, পৃঃ ২৭
(৪৮) বদরুদ্দীন উমর কর্তৃক উক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত। পৃঃ ২৯-২৯

(৪৯) তদেব, পৃ: ৩২-৩৩
(৫০) তদেব, পৃ: ৩৪
(৫১) Report of the Land Revenue Commission. Bengal, part II, p. 120
(৫২) Ibid, part I, pp. 38-9
(৫৩) বদরুদ্দীন উমর, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ: ৬২
(৫৪) তদেব, পৃ: ১৮
(৫৫) বদরুদ্দীন উমর কর্তৃক উদ্ধৃত, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ: ১০২
(৫৬) First Five-year Plan, pp. 154-5
(৫৭) Ibid, p. 44
(৫৮) Ronald Segal, The Crisis of India, pp. 196-7
(৫৯) Ibid, p. 219
(৬০) First Five year Plan, p. 29
(৬১) Ibid, p. 234
(৬২) Ibid, p. 184
(৬৩) Ibid, p. 184
(৬৪) Report of the Congress Agrarian Reforms Committee, pp. 7-12
(৬৫) সুশীতল রায়চৌধুরী, ভারতের কৃষি-অর্থনীতির অবস্থা, শারদীয় দেশব্রতী, ১৩৭৪, পৃ: ১৬৩-৪
(৬৬) পূর্বোক্ত প্রবন্ধে উদ্ধৃত, পৃ: ১৬৪-৫
(৬৭) Ronald Segal, op. cit. pp. 209-11
(৬৮) হরশঙ্কর কাপুর, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃ: ৩-৪
(৬৯) তদেব, পৃ: ৮-৯
(৭০) Mohan Ram, op. cit. p. 67
(৭১) দেশব্রতী, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৭৫, পৃ: ৩-৪
(৭২) Liberation, December 1967, p. 4
(৭৩) Ibid, June 1968, p. 8
(৭৪) Liberation, May 1969, p. 5
(৭৫) নকশালবাড়ীর প্রকৃত শিক্ষাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরুন, পৃ: ৬-৭
(৭৬) যে ঘোষণা সারা অঙ্গে বিপ্লবী লড়াইয়ের জোয়ার এনেছে, দেশব্রতী, আগস্ট ১৪, ১৯৬৯
(৭৭) Charu Mazumdar, To the Comrades, Liberation, January, 1979
(৭৮) Biru Mandal, Class Analysis of three villages in the South of 24 parganas, Liberation, April-May. 1969.
(৭৯) A Peasant Organizer, An Investigation into the

Nature and Forms of Exploitation : A Report of Class Analysis of A Village, Liberation June, 1969.

(৮০) দেশব্রতী, ১৪ আগস্ট, ১৯৬৯

(৮১) Carry Forward the Guerrilla War, Liberation, August 1969

(৮২) ৭০-এর দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করুন, দেশব্রতী, ২২জানুয়ারী, ১৯৭০

(৮৩) চারু মজুমদার, ভারতের বিপ্লবী কৃষক সংগ্রামের অভিজ্ঞতার সারসঙ্কলন করে এগিয়ে চলুন, দেশব্রতী, ৫ ডিসেম্বর, ১৯৬৯, পৃঃ ৬-৭

(৮৪) Revolutionary armed peasant struggle in Debra, West Bengal, Liberation, December, 1969

(৮৫) গেরিলা 'অ্যাকশন' সম্পর্কে কয়েকটি কথা, দেশব্রতী, ১৫ জানুয়ারী, ১৯৭০

(৮৬) তদেব।

(৮৭) যে রিপোর্ট পার্টির প্রস্তাব রচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে, দেশব্রতী, ২১ আগস্ট, ১৯৬৯

(৮৮) Biplab Dasgupta, op. cit. p. 49

(৮৯) Charu Mazumdar, Srikakulam will it be the Yenan of India ? Liberation, March 1969

(৯০) Liberation, March 1970

(৯১) দেশব্রতী, ২৯ জানুয়ারী, ১৯৭০

(৯২) নতুন বছর আসছে আরও বড় জয়ের প্রতিশ্রুতি নিয়ে, দেশব্রতী, ১ জানুয়ারী, ১৯৭০

(৯৩) দেশব্রতী, ২০ নভেম্বর, ১৯৬৯

(৯৪) দেশব্রতী ৪ ডিসেম্বর, ১৯৬৯

(৯৫) Sankar Ghosh, op. cit. p. 80

(৯৬) দেশব্রতী, ২১ আগস্ট, ১৯৬৯

(৯৭) বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সীমান্ত কৃষক সংগ্রামের বিকাশ, অগ্রগতি ও অভিজ্ঞতা—একটি রিপোর্ট, দেশব্রতী, ২৩ এপ্রিল, ১৯৭০।

(৯৮) তদেব

(৯৯) দেশব্রতী, ১১ ডিসেম্বর, ১৯৬৯

(১০০) বিপ্লবী কৃষক সংগ্রামীদের প্রতি, দেশব্রতী, ১১ ডিসেম্বর, ১৯৬৯

(১০১) New Successes of Peasant Armed Struggle in India, Liberation, March 1970

(১০২) "শ্রেণীসংগ্রাম অর্থাৎ খতম অভিযান চালিয়েই আমরা আমাদের সমস্ত সমস্যার সমাধান করব।" পার্টি কংগ্রেসে সর্বসম্মতিতে গৃহীত রাজনৈতিক-সাংগঠনিক রিপোর্ট

(১০৩) Charu Mazumdar, On the Political-Organizational Report, Liberation, May. June. 1970

(১০৪) Charu Mazumdar, Party's Tasks Among the Workers, Liberation, March 1970

(১০৫) চারু মজুমদার, ছাত্র-যুবকদের কাছে পার্টির আহ্বান, দেশব্রতী, ২১ আগস্ট, ১৯৭১

(১০৬) Charu Mazumdar, A few words to the revolutionary students and youth, Liberation, March 1970.

(১০৭) Sankar Ghoh, op. cit. p. 112

(১০৮) শশাঙ্ক, মূর্তি ভাঙার সপক্ষে, পূর্বোক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ: ১১৪

(১০৯) 'কৃষকের বিপ্লবী সংগ্রামের সাথে মিলিত হোন', অনীক

(১১০) মূর্তিভাঙা প্রসঙ্গে, অনীক, পূর্বোক্ত সংখ্যা।

(১১১) Sankar Ghosh, op. cit. p. 115

(১১২) The Present Party Line and a summing up of our experience, Bengal-Bihar-Orissa Border Region Committee of the CPI (M. L.)

(১১৩) Liberation, May-July 1970, Quoted in Sankar Ghosh, op. cit, p. 117

(১১৪) The Statesman, October 29, 1971

(১১৫) Sankar Ghosh, op. cit. p. 129

(১১৬) ভারতীয় গণতন্ত্রের (?) স্বরূপ, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ: ১১

(১১৭) Charu Mazumdar, A Note on Party's work in Urban Areas, Liberation, July 1971-January 1972, Quoted in Sankar Ghosh, op. cit. p. 133

দ্বিতীয় অধ্যায়

॥ এক ॥

রাজনৈতিকভবে ব্যর্থ হলেও, অনস্বীকার্য যে ১৯৬৭ থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিক্ষেত্রে সি পি. আই (এম)-ই ছিল একমাত্র দল, যার আবেদনে বৃহত্তর কৃষকসমাজ ও শহরে মধ্যশ্রেণী ব্যাপকভাবে সাড়া দিয়েছিলেন, অথবা তাঁদের রাজনৈতিক কার্যকলাপেব দ্বারা ভীষণভাবে নাড়া খেয়েছিলেন। স্কুল-কলেজের ছাত্ররা, শহরের মধ্যশ্রেণীর যুবকেরা, এবং সি. পি. (এম)-এর বামপন্থী অংশ, সমকালীন সামাজিক হতাশা থেকে পরিত্রাণের পথ খুঁজে পেয়েছিলেন নকশালপন্থীদের চিন্তায় ও রাজনীতিতে। পশ্চিমবঙ্গে মধ্যশ্রেণীর মধ্যে সি. পি. (এম)-এর সমর্থক-সংখ্যাই ছিল সর্বাধিক; পার্টির যুক্তফ্রন্ট সরকারে অংশগ্রহণ করার ফলে তারা বহুলাংশেই ক্ষুব্ধ হন। এবং সাংবিধানিক পথে যে কোন বিপ্লবী কর্মসূচীব রূপায়ণ সম্ভব নয়, এ-সত্যও তাঁদের অবিদিত ছিল না। এমত রাজনীতিক প্রেক্ষিতে সি. পি. আই (এম. এল) যুক্তফ্রন্ট সবকাবকে কংগ্রেসেরই সগোত্র হিসেবে চিহ্নিত করলেন এবং বললেন যে তাঁরা বৃহৎ পুঁজির স্বার্থের সঙ্গে নিজেদের সংযুক্ত করেছেন, তাঁরা বিদেশী ব্যবসায়ীদের পশ্চিমবঙ্গে অবাধ ব্যবসায়েব সুযোগ দিচ্ছেন, মধ্যশ্রেণীর আহার, শিক্ষা, চাকরি এবং 'সংস্কৃতি' বিষয়ে কোন প্রস্তাব নেই, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের জন্যে কোন সহায়তা তাঁরা আনতে পারেননি, এবং সর্বোপরি কংগ্রেস সরকারের মতই মধ্যশ্রেণীর ন্যায্য দাবিকে তাঁরা দমনমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে স্তব্ধ করে দিচ্ছেন। '......যুক্তফ্রন্টের নীতি, জনগণের শত্রুদের তাঁর আওতায় এনে ফেলেছে। যুক্তফ্রন্টের অস্তিত্বে ভীত হবার পরিবর্তে, যারা কার্যত প্রতিবিপ্লবী ভূমিকাই পালন করছে, কায়েমী স্বার্থ, অপরাধীরা এবং সি. আই. এ-র দালালরা এই সংগঠনকে তাদের নিজেদের বলে মনে করছে। তারা জানে, যে, যদিও এই সংগঠন জনগণের স্বার্থ পালনের ভান করছে, তাদেরই স্বার্থ সংরক্ষণ করছে।' (১) এইপ্রকার তত্ত্ব ও নীতিগত বিরোধে সি. পি. আই (এম.এল) সর্বদাই যুক্তফ্রন্টের চরিত্র উদ্‌ঘাটনে প্রয়াসী হয়েছে। প্রচার, বিক্ষোভ এবং সশস্ত্র কৃষক সংগ্রামের দ্বারা যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বারংবার তাঁরা

বিব্রত করেছেন আর এভাবেই তাঁরা শহরের সংগ্রামী মধ্যশ্রেণীর এক বিরাট অংশকে তাঁদের সপক্ষে টেনে নিতে পেরেছিলেন। তদুপরি যে পুলিশ ও পুলিশ-রাজের বিরুদ্ধে বামপন্থী পার্টিমাত্রেরই সমালোচনা ছিল, তাদের বিরুদ্ধে সরাসরি লড়াইয়ে নেমে পড়ে ও তাদের পার্টির বিরুদ্ধে অ্যাকশনে নামতে বাধ্য করে, সি. পি. আই (এম. এল) জনমানসে তাদের ভাবমূর্তিকে অঙ্কিত করতেও সমর্থ হয়েছিলেন। এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ ১৯৬৯-এর দুর্গাপুরের লড়াই। এখানে ছাত্র ও পুলিশের সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে যে বিপর্যস্ত অবস্থা ঘটে, তারই পরিণামে কলেজের ছাত্রদের মধ্যে থেকে সি. পি. আই (এম. এল) এর এক বৃহৎ সংখ্যক ছাত্রক্যাডারের সৃষ্টি হয় এবং উক্ত অঞ্চল পার্টির শক্ত ঘাঁটিরূপেও প্রসিদ্ধি পায়।

এইভাবে শহরের শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী সংযোগে না প্রতিক্রিয়ায় নকশালপন্থী আন্দোলনের ফলে মানসিকভাবে নাড়া খেয়েছিলেন; যে বামপন্থী আন্দোলন-গুলির সঙ্গে এতকাল তাঁরা নিজেদের সংযুক্ত রেখেছিলেন, তাদের কোনটিই এমন করে তাদের সামাজিক অস্তিত্বের ভিত ধরে টান দেয় নি, হতাশা বা আশা নিয়ে একটা স্থিরতায় এতকাল তাঁরা বসবাস করছিলেন। সাহিত্য-শিল্প প্রভৃতি উপরিতলগত (Superstructure) বিষয় যেহেতু আজও এই মধ্যশ্রেণীরই হাতে, যেহেতু এই মানসিক নাড়া খাওয়ার ব্যাপারটা কোন না কোন ভাবে, অর্থাৎ সমর্থনে বা বিরোধিতায় বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রতিভাত হয়। এতদ্‌ব্যতীত যে ছাত্র যুবকেরা সরাসরি এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে একাংশের সাহিত্যটা তো ছিলই। এই দেশব্যাপী ঘটনা তাঁকে আরো উৎসাহিত করে সাহিত্যের মাধ্যমে তাঁর অভিজ্ঞতা প্রকাশে। এইভাবে আত্মবিশ্বাস ও সজ্ঞান সাহিত্যচর্চায় এদের একাংশ নিয়োজিত হয়। অন্যদিকে প্রতিষ্ঠিত লেখকদের মধ্যেকার সমাজসচেতন অংশের লেখায় নকশাল-পন্থীদের সংগ্রাম ও আত্মদান প্রতিফলিত হল, যদিও লেখকদের ব্যক্তিগত রাজনৈতিক ভাবনাই প্রায়শই সেখানে বিচারের মাপকাঠি হিসেবে গণ্য। এটি প্রধানত কমিউনিস্ট (সি. পি. আই, সি. পি. আই (এম), সি. পি. আই (এম. এল) লেখকদের বক্তব্য স্মরণ রেখেই বলা হল। এতদ্‌ব্যতীত অন্যান্যেরা সাধারণভাবে মধ্যবিত্ত মানসিকতাকেন্দ্রিক নীতিগত বিবেচনাকেই প্রশ্রয় দিয়েছেন।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে নকশালবাদী নেতৃবৃন্দ যে উদাসীন ছিলেন না, তার প্রমাণ মেলে তাঁদের বিভিন্ন মন্তব্যে ও বক্তব্যে। প্রকৃতপ্রস্তাবে দেশের

সশস্ত্র সংগ্রাম ও সাহিত্য-সংস্কৃতি, তাঁদের বিবেচনায় ছিল একই কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। চারু মজুমদার বলেছেন, 'খণ্ডন করাটাই হলো বিপ্লব। যেদিন থেকে আমাদের দেশের ছাত্র যুবকরা বুর্জোয়া সংস্কৃতি.র বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন সেদিন থেকেই আমাদের দেশের বিপ্লবী সাহিত্য ও সংস্কৃতির সৃষ্টির কাজ শুরু হয়ে গেছে। আমাদের দেশে বিপ্লবী সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছে না এমন ধারণা পোষণ করাটা ভুল।' (২) বাংলা ভাষায়, কার্যত ১৯৬৭ সাল থেকেই নকশালপন্থী ও তাঁদের সমর্থকদের এই বিপ্লবী সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষিত হয়। বিষয় হিসেবে তাঁরা বেছে নিয়েছিলেন কৃষক ও মধ্যশ্রেণীর সংগ্রামী অংশকে। এঁদের সার্থকতা ও ব্যর্থতার বিষয়টি সাহিত্য বিবেচনায় অবশ্যই গ্রাহ্য, কিন্তু বিষয়ভাবনা ও বিন্যাসে এঁরা নিজেদের রাজনৈতিক বিশ্বাসে অটল ছিলেন, এ-বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। এই সাহিত্যসৃষ্টির মূল বক্তব্য হোল 'সশস্ত্র না হওয়া যেমন দাসত্বকে স্বীকার করে নেওয়া তেমনি বিপ্লবী শ্রেণীহিংসার সাহিত্য যাঁরা রচনা করবেন না, তাঁরা দাস সাহিত্যই রচনা করবেন। বিপ্লবী সাহিত্য তাই বিপ্লবী হিংসার অনিবার্য অঙ্গ। বিপ্লবী সাহিত্য সর্বহারা শ্রেণীর বিপ্লবী শ্রেণী লাইনের সাহিত্য। বিপ্লবী জনগণের মতাদর্শ ও বিপ্লবী অভ্যুত্থানের আশ্চর্য দলিল। বিপ্লবী জনগণের বিপ্লবী সাহিত্য সমাজতান্ত্রিক উপাদানে ভরা সর্বহারা শ্রেণীর মতাদর্শের মর্মবস্তু। নতুন মানুষ তৈরির সাহিত্য। নতুন স্বপ্নজাগার বাস্তব সাহিত্য। সর্বহারা শ্রেণীর স্বার্থ, সংগ্রাম, ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও আন্তরিকতা-সম্পন্ন প্রাণবন্ত সংলাপ। বিশ্ব সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অঙ্গীভূত।' (৩)

এইপ্রকার রাজনীতিক চিন্তাভাবনা নিয়ে মুখ্যত মধ্যশ্রেণীর তরুণেরা যে দ্রুত সাহিত্য সৃষ্টিতে তৎপর হন, তার কারণ উক্ত রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীতেই বর্তমান। ইতিমধ্যেই প্রচলিত সাহিত্যভাবনা ও প্রতিক্রিয়ার নগ্ন আত্মপ্রকাশে তাঁরা হতাশ হয়েছিলেন। প্রাত্যহিক ব্যক্তিজীবনেও তাঁরা প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থায় কোন আশার আলো দেখতে পাচ্ছিলেন না। স্বভাবতই জীবনের তাগিদেই তরুণেরা-যুবকেরা সমকালীন হতাশা থেকে মুক্তি পেতে চাইছিলেন অন্য এক বিশ্বাসে ও অঙ্গীকারে। সমকালীন বামপন্থী রাজনীতির প্রতি আস্থা আর তাঁরা কিছুতেই রাখতে পারছিলেন না। কারণ এ-রাজনীতিও তাঁদের ধীরে ধীরে পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের সাধারণ পথের দিকে ঠেলে দিচ্ছিল। এ-সময়ে নকশালবাদী রাজনীতি, মাওৎসে-তুঙের চিন্তাধারা তাঁদের গভীরভাবে আকৃষ্ট করে। তদুপরি সম্প্রতিকালে এদেশে এটাই প্রথম রাজনীতিক আন্দোলন, যা শহরের পার্টি অফিস ও রাস্তা ছেড়ে সরাসরি তাঁদের ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং বলা চলে ঘরের এসব ডান-বাঁ

বাঁচিয়ে অতি সাবধানী জীবনকে বহুলাংশে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে; অস্তিত্বের মূল ধরে টান দেয়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে একদা যে কৃষকসমাজ গ্রামে গ্রামে নির্বাসিত ছিলেন এবং কৃষক-চরিত্র নিয়ে কখনো শহরে এসে দাঁড়াতে পারেন নি, এবার তাঁরা প্রথম সরব হবার সুযোগ পান এবং নিজের ন্যায্য দাবি জানানার জন্যে উঠে দাঁড়ায়। ক'লকাতা ও শহরাঞ্চলের যে মধ্যবিত্ত ছাত্র-যুবকেরা 'গ্রামে চলো' ডাকে সাড়া দিয়ে গরীব ও ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে কাজ করতে গিয়েছিলেন, তাঁরা যদিও পরবর্তী সময়ে শহরাঞ্চলে ফিরে আসতে বাধ্য হন, তবু গ্রামের অভিজ্ঞতা তাঁদের নানাভাবে প্রাণিত করেছিল। সহিষ্ণু, আত্মসর্বস্ব, স্বার্থপর শহুরে মধ্যশ্রেণীর পরিবর্তে যে তাজা সঙ্ঘবদ্ধ সংগ্রামী মানুষের অস্তিত্ব তাঁরা দেখে এলেন, সে অভিজ্ঞতাই কার্যত বাংলা সাহিত্যে মুখ্যত তাঁদেরই লেখায় প্রতিফলিত হয়। সাহিত্য-বিচারে তা কতখানি সার্থক-অসার্থক, তার মূল্যায়ন এখনই বহু কারণেই সম্ভব নয়।

এইভাবে রাজনীতি ও সাহিত্যের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ ঘটলো নকশালবাদী আন্দোলনের ফলে। এবং বলা চলে উক্ত রাজনীতিই নতুন চিন্তার সাহিত্যের জন্ম দিল। তদুপরি বাংলা সাহিত্যে পূর্বকালীন রাজনৈতিক ভাবনায় প্রাণিত কবিতা গল্প-উপন্যাসে যে-মধ্যবিত্তই প্রায়শ শ্রেণীচেতনার ধারক ও বাহকরূপে চিত্রিত হয়ে এসেছেন (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' ইত্যাদিকে ঐতিহ্য না বলে ব্যতিক্রম ধরাই শ্রেয়), তাঁরা এই ধারার গল্পে প্রায়শ অনুপস্থিত হয়ে গেলেন। এই প্রথম কৃষক ও শ্রমিকেরা তাঁদের অবাস্তব ও প্রেক্ষিতহীন অস্তিত্ব পেরিয়ে শ্রেণী-প্রতীকী হিসেবে তাজা রক্তমাংসের শরীর নিয়ে এসে দাঁড়ালেন। এবং লক্ষণীয় যে বাংলায় ইতিপূর্বে কবি বা সাহিত্যিকেরাই রাজনীতিক পার্টির সঙ্গে নিজেদের সংযুক্ত করেছেন, পার্টি-পরিচালিত আন্দোলনের ধারাপথে কোন সাহিত্যিক জন্মলাভ করেননি, অন্যদিকে নকশালবাদী আন্দোলনে কোন ছাত্র-যুবক সাহিত্যিক হিসাবে যোগ দেননি, আন্দোলনই এঁদের বেশির ভাগকে লেখার দিকে টেনে এনেছে।

নকশালবাদী আন্দোলনের তাত্ত্বিক ভাবনা ও শহরাঞ্চলে ৭০-৭১ এর হত্যাকাণ্ডের বীভৎসতা অনেক প্রতিষ্ঠিত শিল্পী-সাহিত্যিককে নানা প্রতিক্রিয়ায় আঘাত করেছিল।[৫] সামাজিক চিন্তাভাবনার স্তর ভেঙে এঁদের প্রতিক্রিয়া অবশ্যই বিভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। এঁদের মধ্যে কেউ এর তাত্ত্বিক দিকটি বিষয়ে অবহিত হয়ে এদের দিকে সমর্থনের হাত বাড়ালেন, কেউ দেখলেন

মানবিক সমস্যাকে, কেউ বা নিজেদের প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র ঢাকতে সরাসরি মিথ্যে গল্প ফেঁদে নকশালবাদীদের নরকের কীট প্রতিপন্ন করতে উৎসাহী হলেন। তথাপি অনস্বীকার্য যে এই আন্দোলন প্রায় সকলকেই কোন না কোন ভাবে ভাবিত করেছিল। অবশ্য ভাবিত না হয়েও তাঁদের উপায় ছিল না, কারণ সমকালে ভারতের রাজনৈতিক জীবনে এর চেয়ে প্রভাবসৃষ্টিকারী আন্দোলন আর ঘটেনি। মহাশ্বেতা দেবী লিখেছেন, 'এ-দেশের কয়েক দশকের জীবন-যাত্রায় সেটাই (নকশালবাদী আন্দোলন) ছিল সর্বাধিক উল্লেখ্য এবং প্রাণিত হবার মত ঘটনা।' কারণ,…'অত্যাচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধেই নকশালবাড়ির কৃষকশ্রেণী একদিন সংগঠিত শক্তি নিয়ে বিদ্রোহের পক্ষে নামেন। সে-আন্দোলন, একই প্রকারে বঞ্চিত-শোষিত কৃষককে অন্ধ্রে, কেরলে, তামিলনাড়ু, বিহার ও ওড়িশায় প্রেরণা যুগিয়েছিল। নকশালবাড়ি আন্দোলন নামে যা অভিহিত, তাকে বহু নামে আখ্যাত করা হয়েছে, এবং সমগ্র ব্যাপারটির মুকাবিলা।কিভাবে করা হয়েছে তা সকলেই জানেন। ঘটনাটিকে অতিবাম-বিচ্যুতি, কেতাবী ও অত্যুৎসাহী তরুণদের ফ্রাস্ট্রেশন, অন্যান্য শক্তি ও প্রসাদপুষ্ট ব্যাপার, যাই বলা হোক না কেন, কিছু সত্য থেকে যাচ্ছে। যে যে কারণ থেকে এই আন্দোলন উদ্ভূত, তা অক্ষুণ্ণ আছে, অব্যাহত। এই মতবাদী তরুণরাই অহিংস ভারতে প্রথম হিংসার রাজনীতি আনল, এ বলেও ভারতের মানচিত্র থেকে কিছু কিছু চিহ্ন মুছে ফেলা যাচ্ছে না। নিরস্ত্র চাষীর উপর শোষণ অব্যাহত। জোতদারগণ বেনামে দেশের প্রায় সকল কর্ষণযোগ্য জমি কয়েক হাজার পরিবারের মালিকানায় রেখেছেন, অন্য নামে চক্রবৃদ্ধি সুদের নিষ্পেষণ ও বেঠবেগারী আদায় চলেছে। গ্রাম-ভারতের চেহারা শ্মশান-সদৃশ। খরায় ও গ্রীষ্মে আদিবাসী ও অন্যান্য তথাকথিত অ-বর্ণহিন্দু জাতি শুকনো নদীর বুক খুঁড়ে জল খোঁজেন, ভাতের ফ্যান ও আমানি বিক্রি হয়, পালামৌয়ের আদিবাসীরা চীনা ঘাসের বীজ ছাড়া অন্য খাদ্য প্রায়শ পান না।…এই একবার দেখা গেল আন্দোলনের চেহারা ও প্রবৃত্তি নিয়ে যত গণ্ডগোল, দমনে তত দক্ষতা। কি কি কারণে তৃণভূমে ক্ষণিক হলেও আগুন জ্বলেছিল, সে বিষয়ে সকলেই নীরব। কিন্তু প্রশাসন নীরব থাকলেই কি সত্য নেগেটেড হয়?' (৪) প্রখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক বিনয় ঘোষের ১৯৬৯-এর পূর্ববর্তী লেখার দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে পরবর্তীকালের দৃষ্টিভঙ্গীর যে মেরুপ্রমাণ বৈপরীত্য, তাও যে কার্যত এই আন্দোলনেরই প্রভাবে, এ-সত্য তিনি নিজেও অস্বীকার করেননি। (৫) বাংলায় গণনাট্যের অন্যতম পথিকৃৎ বিজন ভট্টাচার্যের 'চলো সাগরে' নাটকে নকশালবাদীর অন্যতম নায়ক হিসেবে উপস্থাপনা

তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর পূর্ববর্তী নাটক 'দেবী গর্জন' (আশ্বিন, ১৩৭৬) প্রায় সর্বাংশে উক্ত আন্দোলনেরই পটভূমি ও সূচনাকালের প্রতিরূপ।

এবম্প্রকারে সম্পূর্ণত একটি রাজনৈতিক আন্দোলন বাংলা সাহিত্যকে সরাসরি প্রভাবিত করে, যা ইতিপূর্বে সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যে এত স্পষ্টত ঘটে নি। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী সাহিত্যসৃষ্টি ও সাহিত্য-আন্দোলনের একটি ধারা তিরিশের কাল থেকে অব্যাহত ছিল। যদিও স্বীকার না করে উপায় নেই যে উক্ত সাহিত্যের ধারা বাংলা সাহিত্যে কোন ঐতিহ্য সৃষ্টি করতে পারে নি। দু-একজন প্রতিভাবান লেখকেরা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো দাঁড়িয়ে আছেন মাত্র। তদুপরি উক্ত সাহিত্য-ধারার সামগ্রিক সুস্থ মূল্যায়ন অদ্যাবধি অনুপস্থিত। ফলে যে তরুণেরা মুখ্যত নকশালবাদী সাহিত্যের স্রষ্টা ও পথপ্রদর্শক, তাঁরা কার্যত কোন সাহিত্যিক পটভূমি পান নি। একমাত্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপরই কেউ কেউ সামান্য নির্ভরশীল হয়েছিলেন। অন্যথায় ফর্ম ও কনটেন্টের ক্ষেত্রে প্রায় সকলেই ছিলেন স্ব-নির্ভর। এমন কি অভিজ্ঞ কথাশিল্পী মহাশ্বেতা দেবীকেও গল্প বা উপন্যাসের ফর্ম নিজে হাতেই গড়তে হয়েছে। এতদ্‌ব্যতীত নকশালবাদী লেখকদের পক্ষে অন্য বড়ো সমস্যা ছিল পূর্বতন প্রগতিসাহিত্যের চরিত্রনির্ধারণ। আর সমকালের পটভূমিকায় তা ছিল বহুলাংশে দুরূহ। 'বিপ্লবী জনগণের লেখক শিল্পীদের পক্ষে বিবৃতি'তে তাঁরা বলেছিলেন, সাহিত্যে প্রগতিশীলতা সম্পর্কে আমাদের শিথিল ধারণা, প্রগতিশীলতার সুনির্দিষ্ট শ্রেণীগত ব্যাখ্যা ও আত্যন্তিক বিশ্লেষণ প্রায়ই অনুপস্থিত বললেই হয়। তার ফলে জটিল ধারণা জন্ম নিয়েছে যে প্রগতির নাম করে যত কিছু রচনা হচ্ছে যেন তা সবই প্রগতিশীল। প্রগতির অর্থ এমন সহজ সরল হয়ে গেছে যে অতীব জনবিরোধী রচনার সঙ্গে কিছু সহজলভ্য প্রগতি অর্থবহ সংলাপ অথবা শব্দ যুক্ত করে দিলেই তা অনায়াসে প্রগতিশীল হয়ে যায়। বিশেষ করে নাট্যে ও কবিতায় এর ভয়াবহ প্রয়োগ রীতিমত সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে। এর সঙ্গে আরও একটি সাহিত্যে ধারণা প্রবাহিত হচ্ছে, যা প্রগতিশীল তাই বিপ্লবী।...সাহিত্যে প্রগতি আমরা তাকেই বলি যে একটি নির্দিষ্ট সমাজব্যবস্থায় যে সাহিত্য সেই যুগের নির্দিষ্ট সমাজ দ্বন্দ্বগুলিকে সার্থকভাবে প্রতিফলিত করতে পারে এবং নূতন দ্বন্দ্বে উত্তীর্ণ করে দিতে সাহায্য করতে পারে। আজকের কথাই ধরা যাক। যেহেতু আজকের প্রধান দ্বন্দ্ব সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে ব্যাপক জনগণের দ্বন্দ্ব, আবার রয়েছে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ, সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদ ও মুৎসদ্দী একচেটে আমলা-পুঁজির বিরুদ্ধে লড়াই, তাই আমাদের সাহিত্যের সংগ্রাম প্রধানত এই শত্রুগুলির

বিরুদ্ধেই। মূল দ্বন্দ্বকে আঘাত করলেই সেই আঘাত এই দ্বন্দ্বগুলির ওপর এসেও আঘাত করবে। দ্বন্দ্বের বিকাশ ঘটবে। রূপান্তরের পথ ধরে। আজকের প্রগতি সাহিত্যের রূপরেখা খুঁজতে হবে শ্রেণীসংগ্রামের এই জটিল বিশাল রূপভাণ্ডের মধ্যে।'(৬)

এই দৃষ্টিকোণ থেকে প্রচলিত বামপন্থী সাহিত্যের সমালোচনাও করা হয়। এবং এদের মতে, উক্ত বামপন্থী লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে গণসংগ্রামের কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই, অথচ তাঁরা লিখে চলেছেন। সেগুলো পড়লেই বোঝা যায় যে প্রকৃতপক্ষে এঁরাও গণসংগ্রামকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে চলেছেন একটু অন্যভাবে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীসুলভ মূল্যবোধে সমৃদ্ধ এই বুদ্ধিজীবী সমাজ সাংস্কৃতিক বিপ্লবের গভীর তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারেন নি। তাই ঘটনা ঘটানোয় এঁরা শুধু জানেন মৃত ঘটনাগুলোর মধ্যে থেকে কতকগুলো শুকনো তত্ত্বকে, মৃতদেহের মধ্যে কৃমি খুঁটে বার করার মতো, টেনে বার করে জনগণকে তার দ্বারা বিভ্রান্ত করতে।(৭) নয়ন সেন লেখেন, 'সমাজকে নতুন চিন্তা দিতে গেলে নিজেকে পাল্টাতে হয়। আর নিজেকে পাল্টানো কখনই সম্ভব নয় যদি না দেশের কৃষকশ্রমিকের সঙ্গে একাত্ম হতে পারা যায়। অসীম রায় থেকে শুরু করে দেবেশ রায়, দীপেন বাঁড়ুজ্জে, এমনকি মানিক পর্যন্ত এ দোষে দুষ্ট। আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শেষের কিছু রচনায় শ্রেণীসচেতন মনে হয়। যেমনটি কবি সুকান্ত। সুকান্ত মানিকের পক্ষে বোধ হয় এর বেশি করা সম্ভব ছিল না। কারণ আমাদের দেশে তখন যারা পার্টির কর্ণধার ছিলেন, তারা ছিলেন এক একটা মস্তোবড়ো হিপক্রিট্। পার্টিকে তারা কখনই প্রয়োগের ভেতরে আনতে দেননি। যার ফলে real conditions of men's existence বলতে এরা কিছু হতাশাগ্রস্ত মানুষকেই দেখেছেন। নতুনের বেড়ে ওঠাকে এঁরা দেখতে পাননি। তাই স্বাভাবিক কারণেই দেবেশ রায় প্রমুখদের বক্তব্য মাঝে মধ্যে দুর্বোধ্য ঠেকে। এঁরা বলেন একে ইনটেলেক্ট। আসলে এটা ধোঁয়া।

'ভাষা বা সাহিত্য যখন সকলের বোধগম্য হয় না, একে অন্যের যোগাযোগের মাধ্যম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, তখন বুঝতে হবে—সে সাহিত্য মৃত্যুর দিকে এগুচ্ছে। এও এক ধরনের অ্যাবস্ট্রাক্ট সাহিত্য। এর চূড়ান্ত নজির কমলকুমার মজুমদার, অমিয়ভূষণ মজুমদার এঁরা। এঁরা কি প্রতিক্রিয়াশীল নন?...

'কাজেই ফর্ম এবং কনটেন্ট যে কোনো দিক থেকেই দেখতে গেলে কমলকুমার মজুমদার, অমিয়ভূষণ মজুমদার এদের লেখাগুলিকে প্রশংসা করা যায় না। বরং সোজা কথায় সোজাভাবে বললে যা দাঁড়ায় তার অর্থ—এগুলো এক

জাতীয় মনোবিকৃত পাগলের প্রলাপ ছাড়া আর কিছু নয়।···কেননা এটাই বাস্তব যে ভারতবর্ষের মূল জনগণ কৃষক শ্রমিক জনতা। এবং আজকের দুনিয়ার মূল সুর বিপ্লব। আমরা বিপ্লবী জনযুদ্ধের মধ্যে বাস করছি। আমাদের লেখাও তাই মূল জনগণবিরোধী হতে পারে না। কমলকুমার মজুমদারের 'অন্তর্জলী যাত্রা' বা 'নিম অন্নপূর্ণা'য় কোন্ কৃষক শ্রমিক জনতার কথা বলা হয়েছে বা কোন বিপ্লবকে মদৎ দিয়েছে?···এই প্রসঙ্গে দেবেশ রায় সম্পর্কেও দু'চারটে কথা বলা দরকার বলে মনে করছি। দেবেশ রায় নাকি ভয়ানক মার্কসিস্ট লেখক।·· এ ঘটনার (১৯৭১-এর বরানগরের গণহত্যা) কিছুদিন পরই বের হোল 'মানুষ রতন' গল্প। নয়া সংশোধনবাদের···মুখপত্র 'পরিচয়'-এ। লেখক· ·দেবেশ রায়।··· অদ্ভুত। এক ডিসপ্যাশনেট ভঙ্গিতে গল্পটি লেখা যেটা নাকি ওঁর স্বভাবজাত। এই কি মার্কসবাদীর গল্পের ফর্ম? ভারতবর্ষের কোন কৃষক-শ্রমিকের ভাষায় দেবেশ রায় এ গল্প লিখলেন? কাদের জন্য? গল্পটি শুরু করেছিলেন সাংবাদিক স্থূলভাবে কিন্তু শেষে দেবেশ রায় কোন বক্তব্য রাখলেন না। অর্থাৎ তাঁর নিজের তো জানা নেই কী বলা দরকার। তাই আমরা দেখি অ্যাবস্ট্রাক্ট ছবির মতো ক খ গ ঘ চ ছ জ ঝ।· শেষ বিচারে সেই অ্যাবস্ট্রাক্ট ফর্ম। Dissociated content শ্রমিক-কৃষক থেকে শুধু বিচ্ছিন্নই নয়, বিশ্বাসঘাতকতা। নির্দ্বিধায় আমরা একে বলতে পারি প্রতিক্রিয়াশীল।

'কিন্তু যখন ভারতবর্ষে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী চিন্তার অবতারণা হ'য়েছে, দুনিয়ার ইতিহাসে রুশবিপ্লবের মতো মহান ঘটনা ঘটে গেছে তখনও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর ইত্যাদিরা পথের পাঁচালী, আরণ্যক, অপরাজিত কিংবা কবি, হাঁসুলি বাঁকের উপকথা, নাগিনী কন্যার কাহিনী লিখে কি করে বিখ্যাত হন? কোন কৃষক-শ্রমিক জনতার কথা এরা লিখলেন? ভারতবর্ষের ইতিহাস তো কৃষকসংগ্রামেরই ইতিহাস। যারা ভারতের মূল জনগণ তাদের কথা ভাষায় প্রকাশ করতে এরা সমর্থ হলেন না। কারণ আমরা এই যে সব লেখক বুদ্ধিজীবীদের জানি এঁরা সকলেই ছিলেন ব্রিটিশের ঔরসজাত। যেভাব অর্থ খ্যাতি বিতরণ ক'রে ব্রিটিশ এঁদের চাকর করে রেখেছিল। রামমোহন ঈশ্বরচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ হয়ে আজকের বিষ্ণু দে অন্নদাশঙ্কর রায় বিমলচন্দ্র ঘোষ সুভাষ মুখুজ্যে সত্যজিৎ রায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সমরেশ বসু পর্যন্ত সকলেই সেই চাকরবংশের ধারাবাহিকতা।' (৮)

শিল্পী-সাহিত্যিকদের এই জনগণের সঙ্গে একাত্ম হওয়া ও তাদের ভাষা শেখার ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন মাওৎসে-তুঙ, তাঁর ইয়েনান

ফোরামের শিল্প ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তব্যে। এখানে তিনি বলেন যে আমাদের শিল্পী ও সাহিত্যিকেরা অবশ্য তাঁদের স্ব-স্ব ক্ষেত্রে শিল্প-সাহিত্যের সৃষ্টির কাজেই ব্যাপৃত থাকবেন, কিন্তু তাঁদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হবে জনগণকে সঠিকভাবে জানা। ইতিপূর্বে তাঁরা এটা করতে পারেননি, ফলে তাঁদের অবস্থা দাঁড়িয়েছিল সেই বীরদের মতো, যারা কোনদিন তাদের বীরত্ব প্রকাশের সুযোগ পায় না। তাঁরা জানতেন না তাঁরা কি বলছেন অথবা কাদের জন্যে বলছেন ; নিজের বিষয় এবং পাঠক, উভয়ের কাছেই তাঁরা ছিলেন বাইরের লোক। শ্রমিক, কৃষক, সৈন্য ও ক্যাডারদের কাউকেই তাঁরা ভালো করে জানতেন না। তাদের ভাষা তাঁরা বুঝতে পারতেন না ; জনগণের সমৃদ্ধ ও মধুর ভাষ্য তাঁরা আয়ত্ত করতে পারেন নি। ফলে যে ভাষায় তারা লিখেছেন, তা হয়ে দাঁড়িয়েছিল জনগণের কাছে দুর্বোধ্য ও অপরিচিত। তাই আমাদের শিল্পী সাহিত্যিককে শ্রমিক-কৃষক-সেনাদের বৃহত্তর জনসমাজের ভাবনা ও অনুভূতির সঙ্গে একাত্ম হতে হবে। এর জন্যে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন জনতার ভাষা শেখার নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাওয়া। (১০) এই মূল তত্ত্বের ভিত্তিতে বচিত 'গণসাংস্কৃতিক ফ্রন্ট'-এর পক্ষ থেকে প্রচারিত 'সাংস্কৃতিক ইস্তাহারে' বলা হয়, 'এই সংস্কৃতির (ওপরতলার বাবুশ্রেণীর সংস্কৃতি) বিরুদ্ধে একটা পাল্টা বিপ্লবী জাতীয়সংস্কৃতি গড়ে তোলা একান্ত জরুরী—যে সংস্কৃতি এদেশের মূল জনগণের (শ্রমিক-কৃষক) সংস্কৃতির উপাদান নিয়ে গঠিত হওয়া আবশ্যক। এই সংস্কৃতি মূল জনগণের (শ্রমিক-কৃষক) জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, এই কারণেই এই সংস্কৃতি জাতীয় সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতি শুধুমাত্র প্রতিবাদ নয়, প্রতিরোধ ও সশস্ত্র লড়াইকেন্দ্রিক, এই কারণেই এটা বিপ্লবী।…আজকের বিপ্লবী শিল্পী-সাহিত্যিক-বৈজ্ঞানিক-শিক্ষক-ছাত্র প্রমুখ সকলকে শ্রমিক-কৃষকের সঙ্গে একাত্ম হতে হবে।' (১১)

এই তাত্ত্বিক বক্তব্য উপস্থাপনার প্রেক্ষিতে অন্যত্র অভিমত প্রকাশ করা হয় যে নকশালবাড়ির ঘটনার পর থেকে বাংলা তথা ভারতবর্ষে শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নতুন বিপ্লবী ঐতিহ্যের সৃষ্টি হয়েছে। এবং দ্বান্দ্বিকনিয়মেই তা আজ ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হচ্ছে। পুরোন শিল্প-সাহিত্যের নতুন মূল্যায়নও করা হচ্ছে। অন্ধ্রের দিগম্বর কভুলু, ওড়িশার অবধূত গোষ্ঠী এবং বাংলায় বিভিন্ন পত্রপত্রিকাকে কেন্দ্র করে এই প্রচেষ্টা বেড়ে উঠেছে। কবিতা, নাটক, গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রে তাঁদের এই মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী যেমন স্বল্পাংশে হলেও প্রকটিত, তেমনই প্রগতিশীল সাহিত্যের ক্ষেত্রে শিল্প-সাহিত্য এবং রাজনীতি অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। সাহিত্য অবশ্যই রাজনীতি বহির্ভূত হতে পারে

না। শুদ্ধ শিল্পচর্চাও কার্যত এক শ্রেণীর রাজনৈতিক প্রয়োজনই মেটায়। কারণ উপরিকাঠামোর জগতে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আমাদের দেশে বর্তমানে যে সমস্ত রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মতাদর্শগত প্রতিফলন ঘটছে, যাদের শ্রেণী-স্বার্থময় রূপময় প্রতিবিম্ব পড়ছে সংস্কৃতিতে ; তা হচ্ছে আধাঔপনিবেশিক, আধা-সামন্ততান্ত্রিক, একচেটিয়া মুৎসুদ্দি ও আমলাপুঁজি, সাম্রাজ্যবাদ ইত্যাদির জটিল-কুটিলনীতির প্রতিফলন। এরাই দখল করে আছে সংস্কৃতির ভাবাদর্শগত বেষ্টন। সাহিত্য-শিল্পে এদেরই অধিকার ও উপাদানসমূহ আধিপত্য বিস্তার করে আছে নানা বেশে, নানা সম্পর্কে, নানা বাঁধনে। যেমন বিষয় নির্বাচনে, বিষয়ের অন্তর্বস্তুতে বিষয়ের সঙ্গে রীতিগত ঐক্যে, অর্থ ও ব্যাখ্যানগত প্রশ্নে, নন্দনতাত্বিক ও আঙ্গিকের ব্যবহারে, সুন্দর অসুন্দরের প্রশ্নে, সঠিক বেঠিক ও নতুন পুরাতনের দ্বন্দ্বে, চরিত্র নির্বাচন ও তার শ্রেণী-নির্ভরতা, বিপ্লবী আদর্শ, বীর নায়ক নির্মাণ ইত্যাদি আরও অসংখ্য সাহিত্য-সামগ্রী সম্পর্কে এদের আধিপত্য সুদৃঢ় হয়ে আছে।

সুতরাং সমকালীন এই বহু বাধার বেড়াজাল অতিক্রম করে 'বিপ্লবী সাহিত্য' রচনা বহুলাংশেই দুরূহ; শ্রেণী-চেতনা বা মূল্যায়ন সঠিক থাকা সত্বেও তা 'বিপ্লবী সাহিত্য' নাও হয়ে উঠতে পারে। প্রাগুক্ত 'লেখক-শিল্পীদের বিবৃতি'তে বলা হয়েছে, 'অবিকশিত শ্রেণীযুদ্ধের কোন স্তরে প্রগতি সাহিত্য নানান রূপে আত্মপ্রকাশ করতে পাবে। পক্ষালম্বনের ক্ষেত্রে সেই সাহিত্য জনগণের পক্ষে থেকেও জনগণের বিপ্লবীকরণের কাজ নাও করতে পারে। সাধারণত দেখা যায় সঠিক শ্রেণী অবস্থান সত্বেও সেই সাহিত্য শুধুমাত্র শ্রেণীগত সমস্যা উন্মোচনেই নিবদ্ধ থাকল। আবার কোন ক্ষেত্রে সেই সাহিত্য প্রতিবাদরূপেও আত্মপ্রকাশ করতে পারে। এমনকি প্রতিরোধ স্তরেও উন্নীত হতে পারে, কিন্তু শ্রেণীগত ঐতিহাসিক দায়িত্ব, শ্রেণীগত মুক্তির অপরিহার্য অঙ্গ বিপ্লবী যুদ্ধের প্রতিফলন ঘটায় না। বিপ্লবী যুদ্ধের অবিচ্ছেন্ত অনিবার্য হয়ে ওঠে না। তখনই এই সাহিত্য বিপ্লবী সাহিত্য সৃষ্টির দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হয়ে সংস্কারবাদী স্থিতাবস্থার সাহিত্যের পরিণামে আবদ্ধ হয়ে যায়। যেহেতু শিল্প সাহিত্য রাজনীতির অধীন, এর জন্যে রাজনীতিই দায়ী। কিন্তু যদি আমাদের দেশে বিপ্লবী যুদ্ধের শ্রেণী লাইনের সঙ্গে সংসদীয় গণতান্ত্রিক লড়াইয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী যুদ্ধ বিরাজ করতে থাকে, চূড়ান্ত বিচারে তখন এই সাহিত্য সংশোধনবাদী সাহিত্যে পরিণত হতে বাধ্য কারণ এই সংস্কারবাদী স্থিতাবস্থার সাহিত্য বিপ্লবী যুদ্ধের প্রধান প্রবণতাকে পিছনে ঠেলে দেয় কিন্তু বিপ্লবী সাহিত্যের সত্য আরও গভীরে নিহিত। বিপ্লবী

সাহিত্য বিপ্লবী যুদ্ধের ব্যাপারী। বিপ্লবী সাহিত্য বিপ্লবী শ্রেণী হিংসার সাক্ষী। বিপ্লবী সাহিত্য বিপ্লবী ক্রোধ ও ঘটনার স্বরলিপি। বিপ্লবী সাহিত্য জনগণের বিপ্লবী যুদ্ধের আবেগে ভরা আক্রমণের অস্ত্র। সশস্ত্র সাহিত্য। বিপ্লবী সাহিত্য জনগণের চূড়ান্ত বিপ্লবী সত্যকেই প্রকাশ করে থাকে। বিপ্লবী সাহিত্যে শ্রেণী সংগ্রামের সর্বোচ্চ রূপের নিবিড়তম ভাষ্য, প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট স্তরে নির্দিষ্ট সমাজ ব্যবস্থায় এই সত্য নিহিত থাকে।' (১২)

ফলে সাহিত্য সৃষ্টিতে সর্বহারা শ্রেণীর শ্রেণীসংগ্রামের সর্বোচ্চ রূপের সাহিত্য এবং অথবা বিপ্লবী জনগণ ও বিপ্লবী যুদ্ধের সাহিত্যকে এরা একমাত্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। অন্যথায়, যাঁরা বলেন সব সময়ই সাহিত্য ও শিল্পের কাজ হল বাস্তবের স্বরূপ প্রকাশ করা, তাঁরা কার্যত সাহিত্যে নৈরাশ্যবাদই প্রচার করেন। আর এদের মতে, এ হল বিপ্লবী যুদ্ধের অভিমুখী না করে সাহিত্যকে থামিয়ে রাখা বা বিরুদ্ধে দাঁড় করানো। অর্থাৎ গতিহীন সংস্কারবাদী মেরামতি সাহিত্য করা, যার নাম প্রগতিশীলতা। এবং তথাকথিত এই প্রগতিশীলতা বর্তমানকালের সাহিত্যকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সৃষ্ট ও প্রভাবিত গল্প উপন্যাসের আলোচনা বর্তমান গ্রন্থের পরবর্তী অধ্যায়গুলির বিষয়বস্তু।

॥ দুই ॥

বাংলার গণনাট্য আন্দোলনের উদ্ভব ও বিকাশের ব্যর্থতার জন্যে নকশালবাদী সমালোচকেরা সমকালীন কমিউনিস্ট পার্টিকেই দায়ী করেন। এদের বিবেচনায় শ্রমিক কৃষক ও শোষিত জনগণের শ্রেণীস্বার্থকে সামনে রেখে, শ্রেণীসংগ্রামের মতাদর্শকে কঠোর নিষ্ঠার সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মধ্যে দিয়ে তদানীন্তন কমিউনিস্ট পার্টির যে বিপ্লবী ভূমিকা পালন করার রাজনৈতিক দায়িত্ব ছিল তা পূর্ণ হয়নি। আর এই রাজনৈতিক দুর্বলতাই কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত গণনাট্য সঙ্ঘ ও তার সৃষ্ট গণসংস্কৃতি সংগ্রামে অনিবার্যভাবেই প্রতিফলিত হয়েছে। বিপ্লবী ঘৃণা বিপ্লবী হিংসা ও বিপ্লবী ক্রোধের অভাবই এই যুগের শুরু থেকেই গণনাট্য আন্দোলনের বিশিষ্টতা হিসেবে চিহ্নিত হতে থাকে। তাই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে প্রধান দ্বন্দ্ব, সেই দ্বন্দ্বগুলিকে এগিয়ে নেওয়ার মধ্যে দিয়ে সাংস্কৃতিক কর্তব্য পালন করার যে দায় ছিল গণনাট্যের, তা সফল হয়নি। যদিও 'নবান্ন'ই প্রথম নাটক, যা থিয়েটারকে জনগণের সঙ্গে, বিশেষ করে কৃষকের সঙ্গে যুক্ত করে।

কার্যত বিষয়টি ব্যাখ্যাত হয়েছে এইভাবে: ১৮৭২ সালের ৭ই ডিসেম্বর ন্যাশনাল থিয়েটারে 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে যে সামন্তবাদ-সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আপোসহীন সংগ্রামী থিয়েটারের জন্ম হল, তা থেকেই প্রকৃত গণনাট্যের যাত্রা শুরু। এই নাটকের প্রকাশনা ও অভিনয়ের ওপর সাম্রাজ্যবাদের বহুমুখী আক্রমণই এর সঠিক ভূমিকার প্রমাণ। ১৮৭৫ সালের আগস্টে উপেন্দ্রনাথ দাসের 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটকে সাম্রাজ্যবাদী শাসককে কলঙ্কিত করার অপরাধে ১৮৭৬ সালে অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন রচিত হয়। এই আইনের বলে শ্রেণী শত্রুর বিরুদ্ধে মঞ্চ সংগ্রামের উজ্জ্বল ভূমিকা কণ্ঠরুদ্ধ হয় এবং থিয়েটারের মঞ্চকে গীতিনাট্য, পৌরাণিক, ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে হারিয়ে যেতে দেখা যায়। থিয়েটারের যে একটা সংগ্রামী ভূমিকা আছে, শ্রেণীদ্বন্দ্বকে অগ্রসর করাবার দায়িত্ব আছে, বিশেষ করে ঔপনিবেশিক ও সামন্ততান্ত্রিক দেশে, যেখানে সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই একই সঙ্গে চলবে, সেই রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক সংগ্রামকে মঞ্চ থেকে একেবারে দূর করে দিলেন যাঁরা তাঁদের অন্যতম হচ্ছেন নট-নেতা গিরিশচন্দ্র ঘোষ। মঞ্চের সঙ্গে জনতার সম্পর্ক ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে একসময় শূন্য হয়ে গিয়েছিল।

থিয়েটারের দর্শকেরা ছিলেন সাধারণভাবে উচ্চবিত্ত শহুরে পেটিবুর্জোআ শ্রেণী। থিয়েটারের কর্মকর্তারাও ছিলেন ঐ একই শ্রেণীভুক্ত। আর ওদের স্বার্থ জড়িত ছিল ধনিকশ্রেণী ও শাসকশ্রেণীর সঙ্গে। ফলে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে, সামন্তবাদের সঙ্গে ভারতীয় জনগণের যে দ্বন্দ্ব, তা কখনো বাংলা মঞ্চে সার্থকভাবে প্রতিফলিত হয়নি। গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌলা' ও 'মীরকাশিম' জাতীয় নাটকে জাতীয় চেতনা সামান্যভাবে প্রতিফলিত হলেও, সময় ও দায়িত্বের তুলনায় তা ছিল নগণ্য। তাঁর 'প্রফুল্ল' নাটকে শহুরে পেটি বুর্জোআ শ্রেণীর নিজস্ব স্বার্থের অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং 'বলিদান' নাটকে মধ্যবিত্ত পরিবারের অর্থ নৈতিক ভাঙনের চিত্র উপস্থাপিত হলেও কোথাও সেই বেদনা-ঘৃণার রাস্তা দেখাতে পারে নি, এমন কি সব যন্ত্রণার জন্যে যে শ্রেণীস্বার্থ দায়ী তাকেও আভাসিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। অর্থাৎ যে গভীর অন্তর্দৃষ্টি থাকলে সমাজের গভীরে প্রবেশ করে সমাজের আন্তর সত্যকে উদ্ঘাটিত করা সম্ভব ছিল, এই সব নাট্য নেতারা তা এড়িয়ে গেছেন। প্রকৃত গণনাট্য থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্যান্য নাট্যকার ও মঞ্চ প্রযোজকদের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রও প্রকৃত গণনাট্যবিরোধী নাট্য রচনা ও নাট্য প্রযোজনায় নিমগ্ন হন। এবং মঞ্চকে আক্রমণকারীর ভূমিকা থেকে সরিয়ে আনেন। ধর্ম, পুরাণ, তত্ত্ব, হিংসা-অহিংসার প্রশ্ন, কায়েমী স্বার্থ ও পেটি বুর্জোআ ও সামন্ততান্ত্রিক শিক্ষা

সংস্কৃতির মধ্যে ন্যায় অন্যায়ের দ্বন্দ্ব, রাজতন্ত্র ও প্রভুদের বীরত্ব, প্রেম ও ক্ষমতার দ্বন্দ্বের ইতিহাসকে প্রকৃত মর্যাদা দিয়ে প্রচার করা শুরু হয়।

'সাম্রাজ্যবাদের পদানত এই ভারতবর্ষে গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস হিংসা অহিংসার প্রশ্নে অহিংসাই পরম ন্যায় এমনতর নীতিধর্মের পুনঃ পুনঃ প্রচারের একটা স্তরে আমরা নবান্নকে পাই। তাই নবান্নে আমরা কৃষকদের যতটা আক্রান্ত হতে দেখি, মার খেতে দেখি, ততটা রুখে দাঁড়াতে দেখি না। আক্রমণের ভূমিকায় দেখি না। মারমুখী হতে দেখি না। শত্রুর প্রতি ঘৃণায়, ক্রোধে ফেটে পড়তে দেখি না। পরোক্ষভাবে বলা যায় কৃষককে মারমুখী হতে না দেওয়ার মধ্যে দিয়ে নবান্ন যেমন কৃষক জনতার বৈপ্লবিক শক্তির নৈতিকতাকে পিছনে টেনে ধরেছে, তেমনি সাম্রাজ্যবাদী শাসক ও শোষকশ্রেণী এবং তার দাসানুদাস বুর্জোয়া, জমিদার, জোতদার, মহাজন শ্রেণীর স্বার্থকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে।...কৃষকের ন্যায়সঙ্গত শ্রেণীঘৃণাকে আড়াল করে ভুয়ো প্রতিরোধের ধুয়ো তুলে নবান্ন একদিকে যেমন কৃষককে বিদ্রোহী হতে বাধা দিয়েছে, অন্যদিকে তেমনি কৃষকের বিদ্রোহের ইতিহাসকে ঠেকিয়েছে। ইতিহাসের শিক্ষাকে দূরে নিক্ষেপ করেছে এবং যুগ যুগ ধরে শোষণের প্রশ্নটিকে অক্ষত রেখেছে। নীলদর্পণের প্রকৃত গণনাট্যের ধারাটিকে উপেক্ষা করে নবান্ন ইতিহাসের নির্দেশকেই উপেক্ষা করেছে।' (১৩)

অনস্বীকার্য যে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' ও মীর মশাররফ হোসেনের 'জমীদার দর্পণ'এর তুলনায় বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন'কে আপসপন্থীই মনে হয়। প্রথমত নবান্নে বৃটিশ অত্যাচার বা শাসনের কোন অস্তিত্বই নেই এবং দ্বিতীয়ত নীলদর্পণের তোরাপের চরিত্রে গ্রামীণ শোষিত-অত্যাচারিত মানুষের যে চিত্রণ, তার কোন বংশধরকে নবান্নে দেখা যায় না। কুঞ্জ রাগের মাথায় ভুল বুঝে ছোট ভাইয়ের মাথা ফাটায় কিন্তু শত দুঃখেও কখনো সমাজের দুষমনদের মাথা ফাটাবার কথা ভাবে না। 'দেবী গর্জনে' অবশ্য বিজন ভট্টাচার্য 'নবান্নের' ফাঁকগুলোকে ভরাট করতে পেরেছেন। প্রতিরোধ এখানে শুধু কথা নয়, বাস্তব হয়ে উঠেছে, এবং প্রতিরোধের প্রস্তুতিও দীর্ঘ সময়ের। এ-নাটকের গঠন অনেক আঁটোসাটো, কেননা গ্রামের সামন্ততান্ত্রিক শোষণ-ব্যবস্থার অনেক গভীরে যেতে পেরেছেন নাট্যকার।...আজ মনে হয়, মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে 'দেবীগর্জন' 'নবান্নে'র চেয়ে অনেক বেশি গণনাট্যের কাছাকাছি, কারণ শ্রেণীসংগ্রাম ও তার অবধারিত পরিণতির ছবিটি এখানে শুধু বাস্তবই নয়, অনেক বেশী বিশ্লেষণাত্মক।' (১৪)

উক্ত 'দেবী গর্জন' নাটকটি যদিও ১৯৬৭-র পূর্বেকার রচনা (প্রথম অভিনয় ২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬); তথাপি কৃষকদের ওপর জোতদারের শোষণ ও তার

পরিণামে সম্মিলিত কৃষকদের আক্রমণে জোতদারের ধর্মগোলা লুঠ ও তার নিহত হবার ঘটনাবলীর রূপায়ণে নাটকটি সর্বাংশে পরবর্তীকালের নকশালবাদী নাটক-গুলির পূর্বসূরী হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে। নাটকের কাহিনীটি এই প্রকার: জমিদারী-প্রথার বিলোপ সাধনের পর মধ্যস্বত্বভোগী প্রভঞ্জন বেনামীতে সমস্ত জমি খণ্ড খণ্ড করে নিজের তহশীলভুক্ত করে ফেলে। পঞ্চায়েতী শাসন-ব্যবস্থা বানচাল করে অবাধ নিষ্ঠুরতায় সামন্ততান্ত্রিক শাসন চালু করল পুরোদমে; কৃষিঋণ আর কর্জধানের সুদ যোগাতে গিয়ে সর্বস্বান্ত দরিদ্র ভুঁইচাষীর দল। তাদেরই জমির সোনার ফসলে প্রভঞ্জনের ধর্মগোলা ভর্তি আর তারা রইল নিরন্ন উপবাসী। শুধু আর্থিক শোষণই নয়, প্রভঞ্জনের কামনা কুটিল দৃষ্টি চাষীদের ভাঙাচোরা অন্দর-মহলকেও করে তুলল সদাশঙ্কিত। বর্ষীয়ান সর্দারের নবযৌবনা পুত্রবধূ, রত্না একদিন প্রভঞ্জনের জৈবিক বাসনা মেটাতে গিয়ে তারই খোলান থেকে হল নিরুদ্দিষ্টা। আঘাতের প্রত্যভিঘাত আছেই। কালের এই অমোঘ বিধানের হাত থেকে প্রভঞ্জনও রেহাই পেল না। সমস্ত চাষী-সমাজ, বুড়ো সর্দারের ছেলে মংলা আর ভুঁইচাষী সঞ্চাবিয়ার নেতৃত্বে সঙ্ঘবদ্ধ হল এই সামন্ততান্ত্রিক শোষণ শাসনের বিরুদ্ধে। এবং জোতদার প্রভঞ্জনের ধর্মগোলা আক্রমণের ডাক দেয়। 'সঙ্গে সঙ্গে সমবেত জনতা ধর্মগোলার উদ্দেশে ধাবমান হয় সমস্বর ধ্বনি করে,— "ধর্মগোলা"। এগিয়ে এসে রুখে দাঁড়ায় প্রভঞ্জনের লাঠিয়াল দল। লাঠিতে লাঠিতে মোকাবিলা হয়। কিন্তু উন্মত্ত জনতার আক্রমণের মুখে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় প্রভঞ্জনের প্রতিরোধ শক্তি। সমস্বরে জিগির তুলে জনতা তখন ধর্মগোলা আক্রমণ করে। বিপদ বুঝে ত্রিভুবন (প্রভঞ্জনের অনুচর ও দালাল) আগেই পালিয়েছে। অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে দেখে প্রভঞ্জনও পালাবার চেষ্টা করে। সিঁড়ি ধরে ত্রস্ত পদক্ষেপে সে নিজের বাড়ির দিকে ছুটে যায়। কিন্তু সামনেই প্রতিরোধ। সিঁড়ি ধরে ওঠবার মুখেই টাঙ্গি হাতে এগিয়ে আসে ফুলরা। এই শয়তানকেই খুঁজছিল সে আগে থেকে। ভয় পায় প্রভঞ্জন। পিছু হটে নেমে আসে খামারবাড়ির উঠোনে। এদিকে মংলার বাবা সর্দারের ইঙ্গিতে জনতা তখন চারিদিক অবরোধ করে পালাবার সমস্ত ক'টি পথ বন্ধ করে দিয়েছে। বল্লম, টাঙ্গি, রামদা, কুঠার যে যা পেয়েছে, হাতে নিয়ে ব্যূহ রচনা করেছে। প্রভঞ্জন ডানদিকের চোরাপথ ধরে পালাতে চেষ্টা করে। আবছা অন্ধকারের ভেতর থেকে ঝিলিক দিয়ে ওঠে একটি বল্লম। কঠিন প্রহরা। প্রভঞ্জন তখন বাঁদিক দিয়ে পালাবার পথ খোঁজে। কিন্তু এখানেও অনিবার্য আর একটি বল্লম। এগুলেই গিঁথে ফেলে দেবে। প্রভঞ্জন তখন পেছন দিকে পথ

খোঁজে। কিন্তু সর্বত্রই কঠিন প্রতিরোধ। উদ্যত বল্লম, টাঙি, কুঠার, রামদা— বহুবিধ শস্ত্রের দৃঢ় বেষ্টনী। কোন পথ নেই পালাবার। অপেক্ষা করে প্রভঞ্জন অনন্যোপায় হয়ে। ওদিকে ধর্মগোলা অবরোধ পর্বও শেষ হয়। …এইবার শুধু একটি কঠিন কর্তব্য। হাত বাড়িয়ে শস্ত্র খোঁজে মহাবলী। ঘুগর‍্যা মংলার হাতে টাঙি এগিয়ে দেয়। একটি মুহূর্ত মাত্র। দৃপ্তভঙ্গীতে দুহাতে মংলা ঘুরিয়ে ধরে টাঙি প্রভঞ্জনের মাথার ওপর। আশেপাশের সমস্ত অস্ত্রগুলি ঝিলিক দিয়ে ওঠে শত্রুকে লক্ষ্য করে।'

বিজন ভট্টাচার্যের পরবর্তী নাটক 'চলো সাগরে'-র (প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ১৯৭০) চারটি নাটিকার (যদিও তা একসূত্রেই গাঁথা) তৃতীয়টির বিষয়বস্তু বিন্যস্ত হয়েছে নকশালবাড়ির সশস্ত্র আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। এখানে মাইকেল বিলহন সোমরা প্রমুখেরা উক্ত অঞ্চলের ভূমিহীন কৃষকদেরই প্রতীক, যারা অবশেষে পরিণত হয়েছে চা-বাগিচা শ্রমিকে। মাইকেল, তার সঙ্গী জনৈক নরসিং রাজবংশীর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছে, 'নিবাস নকশালবাড়ি। চা-বাগানে কাম করত। গত চা-বাগিচা শ্রমিক,আন্দোলনের সময় সাহেবের প্রতিবাদী হইয়ে হটাবাহার হইয়েছে। পরথম ছিল ভূমিহীন চাষী, দুই বছর অন্ত হয় বর্গাদার, ই বছর জোতদার উয়াক উঠবন্দী করাইছে। জমি কেড়ে লিয়ে এক তাঁবেদার দিয়া ক্ষেতি করাইছে।' অন্য চরিত্র সোমরাব বাড়ি ছিল 'বাংলা-বিহার বর্ডার সীমানা'। চিত্তরঞ্জন কারখানার প্রয়োজনে একদিন বুলডোজার দিয়ে তাদের বাড়ি ঘর মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়। প্রতিবাদে তারা অনেক মারে, অনেক মরে। তারপর একদিন 'বাপদাদামায়ের স্মরণে তিন-তিনটা মাটির পিদ্দিম' জ্বালিয়ে এক চা-বাগিচার ঠিকাদারের সাথে পাড়ি দেয়। 'তা সিখানেও যুদ্ধ, ইখানেও যুদ্ধ। আমার কপালে সুখটা নাই। ইউনিয়ন করলম। মোর্চা বনাইলাম, তো আমাকে দেগে দিল হটাবাহার। ছাড়লম বাগিচা, ধরলম জমিন, তো ফিরভি সেই উঠবন্দী—দুনিয়ার হটাবাহার। মনটো খুব দুখাইল। দুনিয়ার আমি ঠিকই বটে, কিন্তক আমার কোন দুনিয়া নাই। ভাবতে ভাবতে মনটাক সমঝাইলম—ই একটা মস্ত ঠকবাজি। আমার দুনিয়াটাক আমাকই বনাইতে হবে।'

অঞ্চল জুড়ে সশস্ত্র আন্দোলন শুরু হয়েছে ; কমরেড প্রভাত মজুমদারের নেতৃত্বে। আর মিলিটারিও মাঠে নেমে পড়েছে, 'গোলি চালাও মারনেকে লিয়ে' আদেশ নিয়ে। এ সময়ে রাজনৈতিক কর্মীদের এক মিটিং-এ বিপ্লবী ৩ (ক)-কে বলতে শুনি, 'আদিবাসী ভূমিহীন চাষী ও বর্গাদারদের জমির লড়াই আজ জন-

গণতান্ত্রিক আন্দোলনের দিকে প্রাগ্রসর হয়ে একটা বৈপ্লবিক গুণগত বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি করেছে। এই অবস্থায় জনসাধারণের সংগ্রামকে দাবিয়ে রেখে রাজনৈতিক আন্দোলনের গলা টিপে মারলে শুধু জনসাধারণের উপরেই নয়—বৈপ্লবিক আন্দোলনের উপরও আমাদের বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়।' বিপ্লবী ৩ নং বলেছেন, 'শোধনবাদীদের চোখ দিয়ে পোড়াবাড়ির ভূমিহীন চাষী ও ক্ষেতমজুরদের জমির লড়াইকে বিচার করে আমাদের রাজনৈতিক হঠকারী সাব্যস্ত করলে পার্টি নেতৃত্বের উপর—যাঁরা অনিবার্যভাবে জনসাধারণের রাজনৈতিক আন্দোলনকে পিছন থেকে ছুরি মারছেন, তাঁদের প্রতিও—আর আমাদের আস্থা রেখে চলা সম্ভব হবে না।' উত্তরে বিপ্লবী ২ নং বলেছেন, 'কমরেড কিছু মনে করবেন না। এই বৈপ্লবিক চেতনা—যেটা লাগাতার রাজনৈতিক আন্দোলনের ভিতরে থেকে অনেক আয়াসে বহুদিন ধরে আয়ত্ত করতে হয়—পোড়াবাড়ি, জঙ্গলবাড়ির এই সহজ সরল আদিবাসীরা সেই চৈতন্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে রাজনৈতিক বিপ্লবের ডাক দিয়েছে, একথা আমি অন্তত স্বীকার করি না। এতে করে আমার মনে হয়—দেশের বড় বড় জোতদার ও ক্ষমতাসীন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি, ভূমিহীন চাষী ও বর্গাদারদেব এই ন্যায্য জমির লড়াইকে বানচাল করবার সুযোগ পাবে।' বিপ্লবী ৩ নং তৎক্ষণাৎ এই ব্যাখ্যাকে 'সংশোধনবাদ' বলে অভিহিত করে।

১৯৬৮-তে 'তরাই অঞ্চলের কৃষক আন্দোলনের রিপোর্টে' কানু সান্যালের বক্তব্যের নাট্যরূপ যেন উক্ত সংলাপগুলি। কৃষকদেব সশস্ত্র আন্দোলন শুরু করা বিষয়ে সি. পি. আই (এম. এল)-এর সঙ্গে সি. পি. আই (এম) এবং অন্ধ্রের নাগি রেড্ডি-গোষ্ঠীর সঙ্গে মতভেদের বিষয়টি বহু আলোচিত। উক্ত রিপোর্টে কানু সান্যাল লিখেছেন, 'তরাইয়ের কৃষকদের সশস্ত্র সংগ্রাম জমির জন্যে নয়, রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের জন্যে।…বুর্জোয়া দলগুলিও সংবাদপত্র থেকে শুরু করে তথাকথিত মার্কসবাদী দল পর্যন্ত সকলেই একই কথা বলছেন যে জমির জন্যে তরাইয়ের কৃষকদের আন্দোলন ন্যায়সঙ্গত কিন্তু কৃষকদের সশস্ত্র করে তোলা ও অন্যদের বন্দুক ছিনিয়ে নেওয়া, আসলে তাদের ভুল পথেই টেনে নিয়ে যাওয়া।' (১৫) আর ১৯৬৯ সালে নাগি রেড্ডি স্বয়ং এক সাংবাদিক সম্মেলনে সি. পি. আই (এম. এল)-এর সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্যের বিষয়টি বিবৃত করেন। তাঁর মতে, সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে জনযুদ্ধ শুরু হয় সরকারী অত্যাচার এবং জমিদারের গুণ্ডার আক্রমণের প্রতিরোধ থেকেই। জনগণের এই প্রতিরোধ থেকেই প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে উঠবে। অথচ, তাঁর মতে, সি. পি. আই (এম. এল) যেখানে গণআন্দোলনের অস্তিত্ব নেই, সেখানেও তারা প্রতিরোধ

বাহিনী গড়তে চায়। তদুপরি জনযুদ্ধ সর্বদাই আক্রমণাত্মক হওয়ার পরিবর্তে প্রতিরোধাত্মক হয়। আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে জনগণ জমিদারের গুণ্ডা বা সরকারের আক্রমণকে প্রতিরোধ করবে, যার মাধ্যমে ভবিষ্যতে তারা তৈরি করতে পারবে জনগণের সশস্ত্র বাহিনী। (১৬) 'চলো সাগরে' নাটকের বিপ্লবী ২নং-কে বলতে শুনি, 'স্থান-কাল-অবস্থা অস্বীকার করে অতিবিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী নির্দেশে দেশের জনসাধারণের মহা অকল্যাণ করা হবে। তাই আপনাদের কাছে আজ আমার এই বক্তব্য যে, জমির লড়াইকে গণতান্ত্রিক সংগ্রামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখুন। জমির লড়াইকে রাজনৈতিক লড়াইয়ের পর্যায়ে নিয়ে যাবার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত জনসাধারণকে রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করুন।'

এরপর জোতদারের লোকেরা পথ দেখিয়ে নিয়ে আসে সশস্ত্র সান্ত্রীদের। লড়াইয়ে পরাজিত আদিবাসীরা পালিয়ে আশ্রয় নেয় জঙ্গলে। তাদের ফেলে যাওয়া ঘরের আঙিনায় সৈনিকেরা তাঁবু গাড়ে। বিভিন্ন এলাকার সংগ্রামী জনতার সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আর এই যোগাযোগ রক্ষার গুরুত্বপূর্ণ কালে স্বভাবতই এগিয়ে আসে নেতা প্রভাত মজুমদারের স্ত্রী কালিন্দী। তারপর একসময় বন্দুকের গুলির আওয়াজ। কর্মীরা কাঁধে করে তাড়া তাড়া পোস্টার বয়ে নিয়ে যায়। আর অন্যদিকে মাইকেল বিলহন, সোমরা ও অন্যান্য কুলি-কামনরা কালিন্দীর মৃতদেহ বহন করে আনে। প্রভাতদা'র পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। তাঁর জ্ঞানকাণ্ডের সমস্ত শিরা উপশিরা যেন ছিন্নভিন্ন। এর পরই শোনা যায় তাঁর আত্মকথন. 'এ হয় না কালিন্দী, তুমি সামনে থাকতে আমি সেদিনও চিনতে পারিনি, আজও চিনতে পারছি না। তুমি জঙ্গলে যাও। লড়াইয়ের এখনও অনেক বাকি।'

নকশালবাড়ির কৃষক আন্দোলনের রাজনৈতিক চিত্রণ মেলে অমল গুপ্তের 'রক্তের রং' (১৯৬৮) নাটকে। (১৭) জোতদার দৌলত রায়কে জোর করে বানিয়ে দেওয়া হয় 'জাতীয়তাবাদী সোসালিস্ট পার্টি'র নেতা এবং সমাজতন্ত্রবাদের বুলি তাকে মুখস্থ করিয়ে দেওয়া হয়। আর সে তখন চিৎকার করে গলা ফাটায়, 'খুন করে ফেলেগা, চাষাগুলোকে ঠাণ্ডা করে ফেলেগা, দেখ লেগা হাম দৌলত রায় হ্যায়, জে. এস. পিকা নেতা'। আর আসেন কলকাতা থেকে একদল মন্ত্রী। 'তারা আরো মজার লোক। কমিউনিস্ট পার্টির মুখোশ এদের মুখে। আমাদের সমিতির সংগঠন, তার ভালোমন্দের জন্যে কথায় কথায় জীবনটাই এরা বিসর্জন দিয়ে ফেলেন'· বড় বড় মন্ত্রী তো, কাজেই চোখ বড় বড় করে বলেন, 'যুক্তফ্রন্ট সরকার, জমি চাইছ, সে কি, তোমরা যে সব উগ্রপন্থী হয়ে গেছ কমরেড।'

উত্তরে কৃষক অর্জুন বলে, 'কমরেড কানু সান্যাল, কমরেড জঙ্গল সাঁওতাল আর আমরা সব এখানে নাকি আমেরিকার গুপ্তচর হয়ে গেছি। আর ওদিকে কৃষক ল্যাংড়া মন্ত্রী হলেন। মন্ত্রী হয়েই দশটা কৃষক মেয়েকে বাচ্চাসহ গুলিতে শুইয়ে দিয়ে সাচ্চা কমিউনিস্ট সাজলেন গিয়ে কলকাতায় বিধান সভায়। খুব শিগগির, খুব শিগগিরই রাইফেলগুলো চাই আমাদের সব্বার হাতে। আমাদের হাতের টিপগুলোও ওরা দেখুক। ভোটের বাক্সের দালালরা দেখুক জমির লড়াই-এর সময় কখন হয়।' অন্যদিকে তখন জে. এস পির মুখোশ এঁটে দৌলত রায় কৃষকদের জমি কাড়তে ব্যস্ত। তার পেছনে থাকে গুণ্ডা ও পুলিশ। কিষাণ যখন বলে, '১৯৫১-এর পার্টির রণকৌশলগত লাইনে পরিষ্কার নির্দেশ ছিল ভারতের মত বিশাল দেশে যেখানে শতকরা ৮০ ভাগই কৃষক আর অর্থনৈতিক অবস্থা আধা-সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-ঔপনিবেশিক, সেখানে চীনের অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া কৃষকদের সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধই হচ্ছে বৈপ্লবিক আন্দোলনের একমাত্র অস্ত্র', তখন নেতা একে 'হঠকারীবাই পার্টি লাইনকে এভাবে বিকৃত করেছে' বলে ওদের প্রতি আক্রমণ চালান। এই একাঙ্ক নাটকে এভাবেই উপস্থাপিত হয়েছে সি. পি. আই (এম) ও সি. পি আই (এম. এল)-এর সমকালীন রাজনৈতিক বিরোধ ও বিতর্ক। এরপর জোতদার দৌলত রায় গুণ্ডাবাহিনী নিয়ে আক্রমণ করেছে কিষাণ মাঝিদের। কিন্তু সশস্ত্র প্রতিরোধে তারা পরাজিত হয়।

উৎপল দত্ত রচিত ও অভিনীত 'তীর' নাটকটিতে (পাণ্ডুলিপি, প্রথম অভিনয়. ১৯৬৮) নকশালবাড়ির কৃষকদের সশস্ত্র আন্দোলন ও তার প্রেক্ষাপট উপস্থাপিত হয়েছে। নকশালবাড়ি আন্দোলনের অন্যতম মূল বক্তব্য 'অস্ত্র চাই; কান্না, নয়, প্রার্থনা নয়, যন্ত্রণার প্রকাশ নয়, অস্ত্র চাই' নাটকের চরিত্রদের মুখে বারংবার উচ্চারিত হয়। আর এ-আন্দোলনের ফলে দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর বা গোষ্ঠীর মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তা বোঝাবার জন্যে যে একটি বিজ্ঞপ্তি ধরনের দৃশ্য সাজানো হয়েছে, তাতে ধনিক, মন্ত্রী, বিদেশী পুঁজিপতি, অভিজাত, সংবাদপত্র-মালিক ইত্যাদি 'বিদ্রূপভাজন' ও 'ঘৃণিত' ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে 'সরকারী' পার্টির প্রতিনিধিকেও রাখা হয়েছে এবং পরপর কয়েকটি খোপে এদের আবদ্ধ উপস্থিতির পেছনে যে পরিকল্পনা আছে তার লক্ষ্য এটাই বোঝানো যে 'নয়া সংশোধনবাদী' 'সরকারী' পার্টিও আসলে ওদেরই দলভুক্ত; তারা মুখে বিপ্লবের কথা বললেও আসলে পুঁজিপতিদেরই পোষকতা করছে; মাওবাদী তত্ত্বের প্রতি যে আস্থা ও বিশ্বাসে নকশালবাদীরা শ্রেণীচরিত্র নির্ধারণ করেছেন বা সশস্ত্র

কৃষক আন্দোলনের পথে এগিয়েছেন, তার যথাযথ উপস্থাপনায় নাট্যকার এখানে সোচ্চার। নাটকে বনের মধ্যে দেবী কমরেড যেখানে মার্ক্সবাদ ও মাওবাদের ক্লাস নিচ্ছে, সেখানে একটি চরিত্র বলছে, 'যাদের হাতে পৃথিবীর সবচেয়ে মারাত্মক অস্ত্র আছে, তাদের সঙ্গে নিরস্ত্র হয়েও লড়াই করা যায়, জেতা যায়, উপযুক্ত অস্ত্রের বা অবস্থার জন্যে অনন্তকাল অপেক্ষা করার দরকার হয় না। ভিয়েতনামে মানুষগুলো লড়ছে কি করে?' শ্রেণীশত্রুদের প্রতি তীব্র ঘৃণা ও ক্রোধের প্রকাশ এ-নাটকে স্পষ্টতই প্রতিফলিত। এই নাটকেই আছে, কারিগরের রাগ ও ধৈর্যচ্যুতির ফলে তীরের ফলাগুলো ঠিক সমান হচ্ছিল না, সে ফলার তিনটে কোণাকে তিনজন শ্রেণীশত্রুর—জোতদার সত্যবান সিং, তার ছেলে জীমূতবাহন ও পুলিশের—তিনটি মাথা ভেবে নিয়ে খুবই ক্রুদ্ধ মেজাজে পিটিয়ে যাচ্ছিল, ফলে অবশ্য ফলার ধারগুলো বেঢপ হয়ে পড়ছিল। তবু এই তীরের ওপর নিভর করেই নকশালবাড়ির কৃষকেরা 'মুক্ত অঞ্চল' প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন আর শেষ দৃশ্যে পুলিশ পক্ষের পরাজয় উক্ত আন্দোলনের পরিণাম হিসেবে উপস্থাপিত হয়। অবশ্য ইতিপূর্বে জোতদার সত্যবান সিং-এর নেতৃত্বে সম্মিলিত কৃষকদের বিরুদ্ধে আক্রমণের পরিকল্পনা রচিত হয়েছে, সায়গন থেকে মিলিটারি এক্সপার্ট এসেছে, পুলিশ অফিসারের তথাকথিত বীরত্বের অনেক ঘটনা ঘটেছে। দেখানো হয়েছে জোতদার সত্যবানের নানা কুকীর্তির চিত্র ; যথা সে তার কর্মচারী বৃন্দবাবুকে দিয়ে কৃষকদের পাওনা টাকা ফাঁকি দিয়ে ঋণের অঙ্ক বাড়িয়ে তাদের জমিজমা ঘরবাড়ি কেড়ে নিয়েছে, যে রত্নেশ্বরী তাকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছে, মামলা করে তার ভিটেমাটি দখল করতে সত্যবানের বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা নেই, ইত্যাদি। এই সত্যবানের রক্ষিতা মিমোশ্বরী আবার বিপ্লবীদের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ রেখে চলে। নাটকের অন্যতম প্রধান চরিত্র খুকরা টুডু এখানে নাটকের সূত্রধার, যে একই সঙ্গে চরিত্র এবং চরিত্রাভিনয়ের বাইরে এসে ঘটনার সঙ্গে দর্শককে সংযুক্ত করেছে।

জোছন দস্তিদারের নাটক 'আজকের স্পার্টাকাস' (পাণ্ডুলিপি ; প্রথম অভিনয় কাল ; ১ আগস্ট, ১৯৭৭) শহরাঞ্চলে নকশালবাদী রাজনৈতিক কার্যকলাপের প্রেক্ষিতে লিখিত। মধ্যশ্রেণীর দুই শিক্ষিত যুবক আনন্দ ও অনিরুদ্ধ একই বিশ্বাসে ও চেতনায় আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিল। পুলিশের নিষ্ঠুরতম অত্যাচারের মধ্যেও আনন্দ বলছে, 'চোখ মেলে গোটা দেশটার দিকে তাকান। দেখবেন দেশের ৬৫ ভাগ মানুষ না খেয়ে আছে। কোটি কোটি ছেলে বেকার। তাদের সামনে কোনও ভবিষ্যৎ নেই। মা অভাবে নিজের

ছেলেকে বিক্রী কোরছে। বাপ বিষ খাইয়ে সবাইকে শেষ করে দিচ্ছে। তারপর তারা পার্টির নির্দেশে একের পর এক খুন করে; ইনফরমার সন্দেহে স্কুল মাস্টার প্রফুল্ল মাইতি থেকে শুরু করে চোরকারবারী ভগবতীপ্রসাদ পর্যন্ত। পার্টির প্রতি আনন্দের আনুগত্য শেষ পর্যন্ত অটুটই থেকে যায়; কিন্তু অনিরুদ্ধের মনে এই 'খতমের' রাজনীতি বিষয়ে কি-কেন প্রশ্ন ওঠে। তাই আনন্দ যখন তাকে জিজ্ঞাসা করে, 'আমি জানতে চাই প্রফুল্লবাবু পুলিশে খবর দিয়েছিল কিনা।' তখন অনিরুদ্ধ বলেছে, 'তুই যে ভাবে খবর দেওয়ার কথা ভাবছিস, আমি বলবো উনি ধরাবার ইচ্ছেয় খবর দেননি, উনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন ছেলেগুলো যদি পুলিশের ভয়ে সৎপথে অর্থাৎ ওনার বিশ্বাসে যেটা সৎপথ, সেই পথে ফিরে আসে ··উনি যদি সত্যিই ইনফর্মারই হোতেন, তাহলে মানব প্রলয়ের মৃত্যুর খবর শুনে উনি ঐ রকম আঁতকে উঠতেন না, বারবার আক্ষেপ করে বলতেন না যে তিনি শিক্ষক হয়ে তাঁরই নিজেব ছাত্রদের মৃত্যুর কাবণ হয়ে দাঁড়িয়েছেন।' সেণ্ট জোসেফ স্কুলে আগুন লাগাবাব প্রসঙ্গে সে বলেছে, 'পরে ভেবেছি বাধা দিলে সত্যি আমি ভালো কাজ করতাম। মধ্যবিত্ত বাপ-মাকে জিজ্ঞাসা করিস কত কষ্ট কবে তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হয়। তাদের আশা কি? যদি ছেলেটা পাস করে একটা চাকবী পায়, তাদের খুঁড়িয়ে চলা সংসারটা হয়তো দাঁড়াতে পারবে।' পবিণামে অনিরুদ্ধ পার্টি কর্তৃক বিশ্বাসঘাতক, পুলিশের ইনফরমাররূপে চিহ্নিত হয়েছে। এবং তারই এক কমরেড তাকে খতম করেছে। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তেও সে বলেছে, 'তোমরা বিপ্লব করবে? কে তোমাদের শত্রু, কে তোমাদের মিত্র, তোমরা জানো না। কাকে সঙ্গে নিতে হবে, কাকে বাদ দিতে হবে, সে ধারণা তোমাদের নেই। যে পথে পার্টি চলেছে, দেশের এতবড় মেশিনারী সবাইকে টিপে মারবে। ··ভবঘুরে ছেলেদের একটা অংশ যে লড়াইয়ে থাকবে আমিও স্বীকার করি। কিন্তু ওদের পরীক্ষা কবাব কোন চেষ্টা নেই, সচেতন করার জন্যে শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই। এ-পথে এস্ট্যাবলিশমেণ্ট হাজার বেনোজল ঢুকিয়ে দেবে। সেদিন তারা মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে, সেদিন আমি-তুমি ভেসে বেরিয়ে যাবো।' তারপর আনন্দ পুলিশেব হাতে ধরা পড়েছে। আর সে-মুহূর্তে সে স্পষ্ট উচ্চারণ করেছে, 'আমি মরতে পারি, কিন্তু আবারও আমি ফিরে আসবো।'

কিন্তু এই ট্র্যাডিশনাল বাম-আশাবাদের সমাপ্তি সত্ত্বেও এই নাটকে কার্যত গুরুত্ব পেয়েছে অনিরুদ্ধের সমালোচনা। এবং সর্বোপরি জাতীয়তাবাদের আওতায় বেড়ে ওঠা আনন্দের মায়ের হাহাকার। ছেলের জামায় রক্তের দাগ

আর খুন করা দেখে মা কান্নায় ভেঙে পড়ে বলেছেন, 'আমার সব যেন শেষ হয়ে গেল। আমার এতদিনের কষ্ট করে বড় করা গাছ ফুল দেবার আগেই ঝরে পড়ে গেল।' তারপরও অবশ্য মায়ের আশা থাকে, যে ছেলেকে দূরে পাঠিয়ে দিয়েছেন, 'সে গাছে ফুল ফুটবেই'। তুলনামূলকভাবে আনন্দ, যে বিশ্বাস-চেতনা থেকে নকশালপন্থী হয়, 'খতম' করে, তা যেন বহুলাংশে অব্যাখ্যাতই থেকে যায়।

মনোরঞ্জন বিশ্বাস-এর নাটক 'পদাতিক' (প্রকাশকাল ?) এক গ্রাম বাংলার কাহিনী, যেখানে সামন্তব্যবস্থার প্রতিনিধি জোতদারের শোষণে জর্জরিত কৃষকেরা একদিন প্রবল আক্রোশ ও 'শ্রেণী ঘৃণায়' বিদ্রোহ করেছে। যে মৌলিক সমস্যা ও সঙ্কটের কার্য কারণসূত্রে নকশালবাদী রাজনীতির জন্ম ও অগ্রগতি, সেই গরীব ও ভূমিহীন কৃষক জীবনের চিত্রণের মধ্যে দিয়ে নাট্যকার দেশের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার দিকে বৃহত্তর জনসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন। অন্য একটি নাটকের চতুর্থ প্রচ্ছদে নাট্যকার নিজেই তার 'জবানবন্দী'তে লিখেছেন, 'জমির সমস্যা না বুঝলে কেউ ভারতীয় বিপ্লবকে বুঝতে পারবেন না। নকশাল-বাড়ীর সশস্ত্র বিপ্লবী কৃষক যুদ্ধকে না বুঝলে কেউ বিপ্লবের কাজ করতে পারবেন না। শিল্প সাহিত্যেও বিপ্লবকে আয়ত্ত করতে পারবেন না।' (১৮) এ নাটকের ঘটনাবলীর বিন্যাস এই প্রকার : কোন এক পৌষ সংক্রান্তির বিকেলে ভাগচাষী কান্ত সর্দারের বউ যখন নতুন ধান ঘরে উঠবে এই আকাঙ্ক্ষায় সমস্ত উঠান জুড়ে লক্ষ্মীর পা আঁকছে, মঙ্গলঘট বসাবার আয়োজন করছে, তখনি এসে দাঁড়ায় ক্ষেতমজুর ভীম। দুদিন তার খাওয়া জোটেনি ; সারাদিন তাকে খাটিয়ে জোতদারের গোমস্তা তাকে মজুরী না দিয়ে তাড়িয়েছে। এখন ও কান্ত-র কাছে 'একপালি' চাল কর্জ চায়। কিন্তু এ-বাড়িতেও তখন চাল বাড়ন্ত. এরা অপেক্ষা করছে কখন বাড়ির কর্তা কান্ত-র বাবা তারক সর্দার মাঠ থেকে ধানের গাড়ি নিয়ে আসবে। এমন সময়ে দুঃসংবাদটা আনল রামু। সে কান্তকে বলে, 'গাড়ি বুঝাই দিয়ে ধান আনচেলাম। আমি ছেলাম ধানের মাতায়, তোর বাপ হাঁকাচ্চেলো গাড়ি · খামার ছেড়ে গাড়ি যেই রাস্তা ধরেচে, অমনি কুথিকে কেষ্ট হালদারের নোক এসে গাড়ির মাথা চেপে ধরে বল্লে···ধান নিয়ে যাচ্চ যে বড়··· দাদন খেয়েচো···শুধ্‌তি হবে না···। তোর বাপ বল্লে, সে আমি পরে হিসেব মতন মাপজোপ করে ঠিক দিয়ে আসব। তা বলে কি···দিনা পাওনা উসুল না হলি এক কণা ধানও নিয়ে যেতি পাবা না···সেরেস্তায় চল। বাবুর হুকুম···।' খবর পেয়ে কান্ত ছোটে জোতদারের বাড়ি।

ওদিকে তখন জোতদার বৈষ্ণব হালদারের গোলাবাড়িতে ভাগচাষী অধর, নগেন, লতিকের ধান মাপা চলছে। এবং যথা নিয়মে ওজনে ও মিথ্যে দাদনের হিসেবে চাষী নিজের ভাগ বলতে কিছু পায় না। আরো দেনা থেকে যায় মহাজনের কাছে। আর তারক সর্দার দাদন না নেওয়া সত্ত্বেও দাদনের মিথ্যে হিসেবের দায়ে খালি হাতে পথে নেমে আসে। অধর বলে, 'মানুষটা পাগল হয়ে যাবে। আমরাও যাব। তবু আমাদের দাদন শোধ হবে না। জান ছেলে মেয়ে শুধু কানচে খাই খাই করে। বৌটো হাত গুটিয়ে বসে আছে রান্নাঘরে। কি চড়াবে তার ঠিক নেই। তাদের পেচ দিয়ে ধানগুন্ন নিয়ে এইচি। আনতি দেবে না। বস্তা আঁকড়ে ধরে থাকে। বৌটারে নাতি মেরে ফেলে দিয়ে এইচি। কুন কতা কানে নিইনি। কিনা দিনা শোধবো। হল না। আমার দাদনের দিনা শোধ হল না। যে দিনা আমার সেই দিনাই রয়ে গেল। আরও জড়িয়ে মলাম।' নগেন জোতদারের হিসেব সম্পর্কে বলে, 'কিন্তু এযে মিথ্যে। আমি য্যাতোবার এই কাগজের প্যানে চেয়ে চেয়ে দেকি আমার মনে নেয় আমি যেন যমের প্যানে চেয়ে আছি।' অধর বলে, 'এ যমের হাত পিকে আমাদের নিস্তার নেই। ঘরের মদ্দি যম বসে আচে বাঁচব কেমন করে!' এরপর দাদন ইত্যাদির মিথ্যে হিসেব দেখিয়ে জোতদার চাষীর সমস্ত ধান নিয়ে নেওয়া নিয়ে উভয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটি ও পরিণামে জোতদার চাষীদের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। তারপর এক কর্মচারীকে বলে, 'নগেন অধর, লতিকের নামে তিনশো টাকা করে কর্জ লিখুন। গেল দু'সনের পিছনের তারিখ দিয়ে। দাদনের দরুন লিখুন আরও এক বিশ ধান। গেল সনের ভাদ্দর মাসের তারিখ দিয়ে (অশ্বিনী লিখলেন)। কালই সদরে গিয়ে কোর্টে তিন চারটে ধারায় নালিশ ঠুকে দেবেন। বড় দারোগার আসার কথা আছে তাকে বলে সব ঠিক করে রাখব।' এভাবেই গ্রামাঞ্চলে গরীব ও ভূমিহীন চাষীর ওপর শোষণ-শাসন বজায় রাখবার জন্যে জোতদার-পুলিশ সম্মিলিত হয়। গ্রামাঞ্চলে তখন জোতদারের আড়ৎ আক্রমণ করে ধানচাল লুঠ করে গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দেবার কাজ শুরু হয়ে গেছে।

কান্ত যখন জোতদারের বাড়িতে এসে পৌঁছয় বাবার খোঁজে এবং সমস্ত ধান কেড়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে, তখনই জমিদারের গুণ্ডারা তাকে আক্রমণ করে বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে যায়। এবং তাকে খুন করে। যে-চাষীরা এই খবর কান্তর বাবা তারক সর্দারকে দিতে এসেছিল তাদের একান্ত আপনজনের মৃত্যুতে, তারা সেদিন কাঁদেনি। লক্ষণ বলেছিল, 'আমরা জানি,

আমরা জানি অত্যাচার কি, উৎপীড়ন কি, দুঃখ কি…যন্ত্রণা কি…। তাই আপনাকে বলব আমরা কেউ কাঁদব না। আমরা কান্নাকে প্রতিশোধের আগুন করে তুলব। আমরা চোখের জলকে ঘৃণার আঘাত করে তুলব যতদিন পর্যন্ত না হত্যাকারীকে আমরা সম্পূর্ণ নির্মূল করতে পারছি।' প্রতিশোধের কঠিন প্রতিজ্ঞায় বীর স্বামী কান্তর স্ত্রী আশা সিঁথির সিন্দুর মোছে না। 'লাল পার্টি'র কর্মী হিসেবে যোগ দেয় সংগঠনে। পার্টির মাধ্যমে সংগঠিত হয় গ্রামের কৃষকেরা। জোতদারের অত্যাচারের অবসান ঘটাবার একমাত্র প্রতিজ্ঞায়॥ তারপর একদিন তারা আক্রমণ করে জোতদার বৈষ্ণব হালদারের গোলাবাড়ি। বৈষ্ণবকে বেঁধে রাখে থামের সঙ্গে। তাকে কি শাস্তি দেওয়া হবে এই আলোচনার মধ্যেই আশা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার গলা টিপে ধরে। আর তখনি ঘটনা-স্থলে এসে যায় পুলিশ। গর্ভবতী আশাকে পুলিশ বেওনেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারে। কান্তর ভাই পার্টির কর্মী নবকে মারতে মারতে রক্তাক্ত অবস্থায় পুলিশ নিয়ে যায় বাড়িতে তার বাবা তারক সর্দারের সামনে। তখনো সে চিৎকার করে বলছে, 'গরীবির পার্টি লাল সালাম—লাল পার্টি লাল সালাম—কমিউনিস্ট পার্টি লাল সালাম।' পর পর তার বুকে বেঁধে তিনটে গুলি। আর তখনি, একের পর এক দুই পুত্র, পুত্রবধুর হত্যায় শোকার্ত তারক সর্দার উঠে দাঁড়ায়, 'ইবার আমরা মারব। তবে শোন—শোনরে রক্তখেকো পিচাশের দল—তুরা আমার ছেলেদের রক্ত খেইচিস—আমার বউমার রক্ত খেইচিস্—আমার সংসার ভেঙে ছারখার করিছিস, ইবার তোদের বুকির রক্তে শেষ প্রতিশোধ নোব'।

মনোরঞ্জন বিশ্বাসের অন্য নাটক 'রণক্ষেত্রে আছি' (ডিসেম্বর ১৯৭৬) চার নকশালবাদী যুবকের (শঙ্কু, অনুপ, নিখিল ও দ্রোণাচার্য) শিক্ষাজগৎ, শ্রমিক-কৃষকের বাস্তব জীবনযাপনের অভিজ্ঞতা থেকে অর্জিত বিশ্বাস, অঙ্গীকার, সংশয় ও অপরাজেয় সংগ্রামের কাহিনী। অনুপ ছাত্র আন্দোলনের জঙ্গী কর্মী; নিখিল ওর বন্ধু, কিন্তু ওদের আন্দোলনে তার সমর্থন ছিল না। তাই ছাত্রদের দাবীর প্রেক্ষিতে অনুপ যখন প্রিন্সিপালকে ঘেরাও করার কথা বলে, তখন নিখিলই ওকে বাধা দিয়েছে। তারপর যখন নিখিলের চোখের সামনে অনুপের দাদা তপন নকশালবাদী রাজনীতিতে যোগদানের অপরাধে পুলিশের গুলিতে নিহত হল, 'সেই রাত থেকে সেই যে নিখিল বদলে গেল, তার ভয় ভেঙে গেল। দিনে দিনে দুঃসাহসী হয়ে উঠল সে।' অনুপ অন্ধকার কারাকক্ষে বসে বলে চলে, 'তারপর থেকে দুজনে একসঙ্গে ছাত্র ফ্রন্টে কাজ করছি—ছাত্রদের দাবী দাওয়া নিয়ে ছাত্রদের ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেছি, প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই

চালিয়েছি—বিপ্লবী প্রচার চালিয়েছি···কিন্তু ইতিমধ্যে—হঠাৎ একদিন আমাদের ইউনিয়ন প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারীকে পুলিশ ডেকে ক্লাসরুম থেকে এ্যারেস্ট করিয়ে দিলেন প্রিন্সিপাল। কার্যকরী সমিতির এগারজন ছাত্রকে কলেজ থেকে বের করে দেবার আদেশ দিলেন। ছাত্রেরা আগুনের মতন জ্বলে উঠল। আমরা ঘেরাও করলাম প্রিন্সিপালকে। ধর্মঘট সুরু হল, পুলিশ এল, ব্যারিকেড তৈরি হল, নিখিল ছুটে গিয়ে কলেজের মাথায় লাল ঝাণ্ডা উড়িয়ে দিয়ে এল।' শম্ভু ছিল শ্রমিকফ্রন্টের নেতা। সে দেখেছে আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে কেমন করে বিশুর মত একজন সংগ্রামী নেতা তৈরি হয়। নিজের মধ্যবিত্ত মানসিকতার জন্যে সে হয়তো চাইত বিশুরা যেন সামনে না আসে। কারখানায় স্ট্রাইক চলছে ; সেদিন ম্যানেজারকে ঘেরাও করা হবে স্থির ছিল। সেদিনই বিশুর বিয়ে হয় কমলার সঙ্গে। এই অজুহাতে শম্ভু বিশুকে 'পার্টির সিদ্ধান্তে'র অজুহাতে কারখানায় আন্দোলনে সামিল হওয়া থেকে সরিয়ে রাখে। ফুলশয্যার রাতে কমলা মনে মনে স্বপ্ন দেখে, 'আমি নিজের হাতে (ঘর) সাজাবো। একপাশে একটা তক্তপোষ, দুধের মতন সাদা বিছানা ধবধব করবে···দড়ির আলনায় পাট পাট করে সাজিয়ে রাখবো কাপড় চোপড়···এককোণে একটা ছোট জলচৌকির ওপর চিক চিক করবে বাসন কোসন ···রোজ সন্ধ্যেবেলা পা ধুয়ে শুদ্ধ কাপড় পরে পিদুম জ্বালবো·· সারা ঘর ঘুরে ঘুরে সন্ধ্যে দেখাব···মনে মনে বলব···মাগো আমার ঘরের সব আঁধার আলো করে দাও সব আলো করে দাও···।' এদিকে বিশু তখন ভাবতে থাকে, 'আমাকে অত বোকা ভেবনা মিছরিলাল। বিশু মজুমদার অত কাঁচা ছেলে নয়। আসলে তোমরা আমাকে ভয় কর। আমি বুঝিনে না। অনেক ঘাটের জল খেয়ে তবে এখানে এসে ঠেকেছি। আমি জানি শম্ভুবাবু আমাকে এড়াতে চান। আমি যে বলেছিলাম মণ্টু দাসকে ওরা তুলে নিয়ে গেছে···আমরাও ওদের এক দালালকে তুলে নিয়ে যাব···তাতেই শম্ভুবাবু ভয় পেয়ে পিছিয়ে গিয়েছিলেন। জঙ্গী লড়াই দেখলেই উনি পাশ কাটাতে চান। সব শালা নেতাকে আমি চিনি। পার্টির নাম করে আমাকে সরিয়ে দেওয়া·· আমি বুঝি না না ?' তারপর কমলা ঘুমিয়ে পড়তেই বিশু ছুটে চলে যায় কারখানার সামনে। সেখানে তখন মিটিং চলছে। শম্ভু বক্তৃতা করছে।

এ-সময়েই রাইফেল উঁচিয়ে পুলিশ ছুটে আসে। গুলি চালায়। শম্ভুর মনে তখনো সংশয়। বলে, 'আজ হয়ত কারুর মনে হতে পারে শোষক শ্রেণীর এই ঘৃণ্য আক্রমণের জবাবে আমরা বোধহয় অসহায়···কোন উপযুক্ত জবাবই

দিতে পারছি না। কিন্তু তারা শুনে রাখুন, সমাজ পাল্টাবার ইতিহাস হচ্ছে রক্তদানের ইতিহাস।' তখনই বিশু প্রশ্ন তুলেছে, 'রক্ত নেবার ইতিহাস' নয় কেন?' তারপরই সে ডাক দেয়, 'কমরেডস, পুলিশ আক্রমণ চালিয়েছে—ভয় পাবেন না। শক্ত হয়ে দাঁড়ান। হাতের কাছে যে যা পাবেন তাই নিয়ে রুখে দাঁড়ান। লোহার বড় ডাণ্ডা, রেঞ্জ যা কিছু আছে তাই দিয়ে আক্রমণ করুন।' বিশু নিজেও ঝাঁপিয়ে পড়ে। পুলিশের হাত থেকে রাইফেল ছিনিয়ে নেয়। এরপরই পুলিশ বিশুদের বস্তি আক্রমণ করে। স্ত্রী কমলার সামনে বিশুকে হত্যা করে। আর সে-মুহূর্তে সারা সিঁথিতে বিশুর রক্তমাখা কমলা আলোকিত স্বপ্নের ঘরের কথা ভুলে দর্শকদের দিকে হাত বাড়ায়, 'না—নাঃ—নাঃ—নাঃ—ঘর না —ফুলশয্যা না—একটা অস্ত্র (টোপর ফেলে দিল ছুঁড়ে) একটা অস্ত্র— (দর্শকের দিকে চেয়ে) আমাকে কেউ একটা অস্ত্র দেবেন?'

দ্রোণাচার্য জেনেছিল গ্রামীণ কিষানের মেয়ে দুখীকে। রাইফেল হাতে সে আশ্রয় নিয়েছে দুখীদের বাড়িতে। দুখীর দাদা নগরবাসী ওকে আশ্রয় দিতে চায় না। দুখী কিন্তু ওকে কিছুতেই ঘর থেকে বেরুতে দিল না। দ্রোণ তখন বলেছে, 'আমাকে কেন ধরিয়ে দেবেন? আমাকে ধরিয়ে দিয়ে তো আপনাদের কোন লাভ নেই…আমি আপনাদেরই মতন একজন। আমরাও বড় গরীব। আমার বাবা সারা বছর জমিতে খাটেন। তবু সারা বছর আমাদের ঘরে ভাত নেই—আমাদের কোন জমি নেই। আমার বাবার ইচ্ছে ছিল আমি লেখাপড়া শিখি—আমি পাসও করেছিলাম। কলেজেও গিয়েছিলাম। আমার কেবলই মনে হচ্ছে—আমরা এত গরীব কেন—আমাদের এত অভাব কেন?…এমন সময় আমাদের সামনে এসে ডাক দিলেন—আমাদের পার্টি—গরীবের পার্টি—স্বপ্ন দেখালো—বললে অস্ত্র হাতে উঠে দাঁড়াও। সংগঠিত হও। জনগণকে জাগ্রত কর…দরিদ্র কৃষকের মধ্যে বাহিনী গড়ে তোল। এ-লড়াই লড়ে গরীব কৃষক। তাদের লড়াই।' তারপর দুখী ওর রাইফেলটা লুকিয়ে রাখে। নগরবাসী ওকে চলে যাবার পথ দেখায়। এক রাতের এই ঘটনা দুখীর মনটাকে দারুণভাবে পালটে দেয়। কোম্পানীর সঙ্গে ওর বিয়ের তারিখ ঠিক ছিল; কিন্তু ও বিয়ে করতে অস্বীকার করে। ফলে কোম্পানী সে-রাতের ঘটনা পুলিশকে জানিয়ে দেয়। পুলিশ এসে কেবল ওর ঘর থেকে রাইফেল বের করেই ক্ষান্ত হয় না, ওকেও গুলি করে হত্যা করে। এ-কথা বলতে বলতে অন্ধকার কারাকক্ষে দ্রোণ বলে, 'বিপ্লবের ঝড়ো হাওয়া দুখীবালাকে উড়িয়ে নিয়ে গেছে…নিয়ে গেছে তপু বিশু নিখিলকে। সেই ঝড়ো হাওয়া ডাক পাঠিয়েছে আজকে এই অন্ধকার

রাত্রির সেলে। বল…বল তোরা কি উত্তর দিবি তার। যদি বাঁচতে চাস… তো বিপ্লবের জন্তেই বাঁচ…মরতে হয় মর বিপ্লবের মধ্যেই।'

নিখিলকে ইন্টারোগেশনে নিয়ে গিয়ে হত্যার ভয় দেখিয়ে পুলিশ তার কাছ থেকে সংগঠন, পরিকল্পনা ইত্যাদি জেনে নিয়ে আবার সেলে পুরে দেয় অন্তদের একই ভয় দেখিয়ে কথা আদায় করতে সাহায্য করার জন্তে। তারপর পুলিশ যখন আবার ফিরে আসে, তখন সকলে একযোগে পুলিশ অফিসারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। অফিসারের গুলিতে দ্রোণ নিহত হয়। অনুপ শঙ্কু নিখিল সেল থেকে বেরিয়ে যায়। জেলের ভিতরে তখন পাগলা ঘন্টি, চিৎকার, গুলির শব্দ শোনা যায়। আর তখনই শোনা যেতে থাকে কমলার কণ্ঠস্বর, 'আমাকে কেউ একটা অস্ত্র দেবেন ? একটা অস্ত্র…আমায় একটা অস্ত্র দিন…একটা অস্ত্র দিন…।'

অমল রায়ের একাঙ্ক নাটক 'আট জোড়া খোলা চোখ' (অভিনয়) বারাসাতের গণহত্যাকে কেন্দ্র করে। ২০শে নভেম্বর ১৯৭০-এর সকালের খবরের কাগজ থেকে জানা যায় যে আগের দিন রাত্রে বারাসাত মহকুমার (চব্বিশ পরগনা) কয়েক মাইল জুড়ে এগার জন ব্যক্তির গুলিবিদ্ধ মৃতদেহ পাওয়া গেছে। এরা সকলেই নকশালপন্থী ছিলেন। এদের আটজনকে নিয়ে এই নাটক। নাটকটির নাম নেওয়া হয়েছে নবারুণ ভট্টাচার্যের অতিখ্যাত কবিতা 'এই মৃত্যু-উপত্যকা আমার দেশ নয়' থেকে এবং ঐ কবিতার বিভিন্ন অংশ নাটকটিতে বারংবার উচ্চারিত হয়েছে। বলা চলে, মূল বক্তব্যের বাহন হিসেবেই যেন কবিতাটি ধরে আছে সমগ্র নাটকটিকে। কবিতাটির কয়েকটি লাইন: 'যে পিতা সন্তানের লাশ সনাক্ত করতে ভয় পায়/আমি তাকে ঘৃণা করি—/যে ভাই এখনও নির্লজ্জ স্বাভাবিক হয়ে আছে/আমি তাকে ঘৃণা করি—/ যে শিক্ষক বুদ্ধিজীবী কবি ও কেরানী প্রকাশ্য পথে এই হত্যার প্রতিশোধ চায় না/ আমি তাকে ঘৃণা করি—/আটজন মৃতদেহ/চেতনার পথ জুড়ে শুয়ে আছে/আমি অপ্রকৃতিস্থ হয়ে যাচ্ছি/আট জোড়া খোলা চোখ আমাকে ঘুমের মধ্যে দেখে/ আমি চিৎকার করে উঠি…এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না/এই জল্লাদের উৎসবমঞ্চ আমার দেশ না/এই রক্তস্নাত কসাইখানা আমার দেশ না।'(১১)

বারাসাত হত্যাকাণ্ডে নিহতদের যে আটজনকে নিয়ে এই নাটক, তাদের মধ্যে যতীন দাস ছিলেন টেক্সম্যাকোর বয়লারের শ্রমিক এবং ১৯৬৪ সালে পার্টি ভাগ হবার পর সি পি এম এ যোগ দেন, কিন্তু তিনি 'পার্টির কাজকর্মে-চালচলনে' সন্তুষ্ট থাকতে পারেননি, এমন সময় 'তরাইয়ের জঙ্গলে কৃষকের হাতুয়ার ফলায়

জেগে উঠল তেলেঙ্গানা কাকদ্বীপ হাজং বিদ্রোহের উত্তরাধিকার' এবং তিনি খুঁজে পেলেন তাঁর পথ ; শঙ্কর চ্যাটার্জী ইউনিভার্সিটিতে প্রাণীতত্ত্বে এম এস. সি-র ছাত্র ছিলেন ; স্বপন পাল বি. এস. সি পড়তেন ; সমীর মিত্র লিখতেন কবিতা ও গান, নিজের 'মধ্যবিত্ত বাবা-মার চোখের জল মোছাতে সমাজটাকে পাল্টাবার কাজে আত্মনিয়োগ' করেছিলেন ; আর অরুণ দাস ছিল মাত্র ক্লাস নাইনের ছাত্র।

নাটকে শ্রমিক যতীন বলেছেন, 'গত কয়েক বছরে আমাদের হয়ত মাইনে বেড়েছে, কিন্তু আমাদের ঘরের অভাব ঘোচেনি, প্রতিদিন আমরা—মজুরেরা গরীব থেকে আরো গরীব হচ্ছি। আসলে যতদিন বড়লোকেব রাজত্ব থাকবে, জোতদার-মহাজন আর মিল মালিকদের রাজত্ব থাকবে, ততদিন আমাদের ওপর শোষণ চলবে, অত্যাচার চলবে—সে সরকারে যেই থাকুক না কেন! তাই বন্ধুগণ আজ যদি আমাদের বাঁচতে হয় তবে এই পচাগলা সমাজ ব্যবস্থাটাকে পাল্টে দিতে হবে, মালিকরাজের জায়গায় কায়েম করতে হবে চাষী মজুরেব রাজ। আব তার পথ বিপ্লবেব পথ—সশস্ত্র সংগ্রামেব পথ। ভোটে মন্ত্রী বদল হয়, কিন্তু শোষণেব অবসান হয় না। বুলেটেব জবাব ব্যালটে দেওয়া যায় না, তা' বুলেটেই ফিরিয়ে দিতে হয়। কেউটে সাপকে হরিনাম শুনিয়ে বৈষ্ণব বানানো যায় না। লাঠিব ঘায়ে তাব মাথাটা গুঁড়িয়ে দিতে হয়। মার্ক্স বলেছেন—"বলপ্রয়োগই বিপ্লবেব ধাত্রী।" লেনিন বলেছেন—"সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া শোষিতশ্রেণীব মুক্তি নেই।" স্তালিন বলেছেন—"বিপ্লব কবতে হলে তিনটে জিনিস দবকাব—প্রথমতঃ অস্ত্রশস্ত্র, দ্বিতীয়তঃ অস্ত্রশস্ত্র, তৃতীয়তঃ এবং বাববার বলছি, অস্ত্রশস্ত্র।" আমাদেব যুগের লেনিন চেয়াবম্যান মাও তাইতো বলেছেন—"বন্দুকেব নল থেকেই বাজনৈতিক ক্ষমতা বেরিয়ে আসে।" বন্ধুগণ—আজ নকশালবাড়ি থেকে শ্রীকাকুলাম পর্যন্ত বিপ্লবের যে স্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠেছে, আমাদের তাকে দাবানলে পরিণত করতে হবে।' যতীন কানাইয়েব সঙ্গে অন্য সকলেই শ্রমিকদের সঙ্গে কাজ করতে থাকে, 'মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে আসা বিপ্লবীদের শ্রমিকদের সঙ্গে একাত্ম হবার' একান্ত আকাঙ্ক্ষায়। শঙ্কর গ্রামেব কৃষকদের মধ্যে কাজ করতে আগ্রহী। চলে যেতে চায় গ্রামাঞ্চলে। পোস্টার লেখা, শ্রমিক সংগঠন, নানা কাজের মধ্যে এদের আত্মনিয়োগ ; সংগঠনও বাড়তে থাকে ; এর মধ্যে একের পর এক গ্রামে আন্দোলনের অংশভাগ এদের অন্য কমরেডদের মৃত্যুর খবর আসতে থাকে। এদিকে গুণ্ডা, অন্তদলীয় নেতা ও পুলিশ একযোগে এদের ওপর আক্রমণ চালাতে তৎপর হয়। তারপর ১৯শে

নভেম্বর ওরা বিকেল পাঁচটায় কার্যক্রম ঠিক করতে মনুমেণ্টের নিচে সমবেত হল। খবর ফাঁস হয়ে যায়। পুলিশ যথা নিয়মে ওদের ঘিরে ফেলে। তারপর থানা লকআপে ওদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার ও অবশেষে গুলি করে ওদের হত্যা করা হয়।

শহরাঞ্চলে নকশালপন্থীদের নিহত হবার জন্য নাটক অমল রায়ের 'পঙ্কজ দত্ত আসছেন' (অভিনয়), পঙ্কজ দত্ত কবি, সাংবাদিক এবং নকশালবাদী আন্দোলনেব অন্যতম শীর্ষ নেতা। তাঁকে ধরিয়ে দেবার জন্যে পুলিশ কয়েক হাজার টাকা পুরস্কারও ঘোষণা করেছে। তারপর একসময় রাজা বসন্ত রায় রোড থেকে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তারও করেছে। তারপর ভোরবেলায় ময়দানে তাঁকে গুলি করে মেরেছে। কিন্তু সে-সত্য পুলিশ কখনো স্বীকার করেনি, বরং তাঁকে ফেরার বলেই প্রচার করা হয়েছে। কোন কোর্টে বিচারাধীন চাব নকশালপন্থী বন্দী ও বন্দিনীর সামনে রিপোর্টেও এই কথা বলে চলছিলেন পুলিশ অফিসার, এমন সময়ে কোর্টে পঙ্কজ দত্ত এসে দাঁড়ান। তিনি বাবংবার বলতে থাকেন, আমিই ফেরারী পঙ্কজ দত্ত, আমাকে গ্রেপ্তার করুন। এসময় বিচারক ও জুরীদের চাপে পড়ে পুলিশ অফিসার বলতে বাধ্য হন যে তিনিই পঙ্কজ দত্তকে ভোরবেলায় ময়দানে নিয়ে গিয়ে খুন করেন। এরপর পঙ্কজ দত্ত নামীয় অভিনেতা নিজের মাথার উইগ খুলে ফেলে মেকাপ মুছতে মুছতে বলে, 'এই কথাটাই আপনাদেব মুখ দিয়ে বলাতে চেয়েছিলাম।'

অমল রায়ের ব্যঙ্গ নাটক 'লাসবিপনি'-র (অভিনয়) ম্যানেজিং ডিরেক্টব শ্রীপতিরাম পতিতুণ্ড আসল মৃতদেহই বিদেশে চালান দেন, কখনো ভেজাল দেন না। সঙ্গে যে গাইডটি আছেন, তিনি 'একজন স্বাধীন বুদ্ধিজীবী, একজন মেরুদণ্ডহীন—বাঞ্চৎ'। উক্ত আসল মৃতদেহগুলি তাদের নিজেদের আগমার্ক প্রমাণ করার জন্য একের পর এক রঙ্গমঞ্চে উঠে এসেছে। প্রথম, দরিদ্রচাষী রমজান তার চাষের সমস্ত ধান জোতদার শিব মুখুজ্জের গোলায় তুলে দিতে অস্বীকার করায়, জোতদার তাকে 'চীনের চর' থেকে 'পাকিস্তানী গুপ্তচর' বানিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। তারপর আটমাস পরে সে যখন জেল ছাড়া পায়, তখন তার ঘর 'গোরস্থান' হয়ে গেছে। 'দু'দুটো ছাওয়াল না খাত্তি পেয়ে মরেছে, বিবিটা যে কোথায় চলি গেল' কেউ জানে না। এদিকে রমজানও একদিন 'একডা পয়সা, বড় খিদে গো' করে করে রাস্তায় ধুঁকে ধুঁকে মরে। দ্বিতীয় জন কারখানার শ্রমিক হারাণচন্দ্র মাঝি। প্রোডাক্শন বোনাসের দাবীতে শ্রমিকের আন্দোলন শুরু করলে মালিক কারখানার লকআউট ঘোষণা করে। আসলে

দালাল নেতারা মালিকের টাকা খেয়ে এই আন্দোলনের ডাক দিয়েছিল। কারণ 'প্রচুর মাল জমে রয়েছে বাজারে, মালের চাহিদাও কমছে, তাই কারখানা বন্ধ রেখে মালের দাম চড়িয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে জমানো মাল' বাজারে ছাড়লে মালিকের লাভ ষোল আনা। নেতারা শান্তিপূর্ণ আন্দোলন, কাগজে কাগজে বিবৃতির পথ দেখান আর শ্রমিক হারাণের হাতে ধরিয়ে দেন চাঁদা তোলার কৌটো। পরিণামে হারাণও একদিন লাস হয়। গ্র্যাজুয়েট বেকার সুমিত মিত্রও হতাশায় একদিন লাস হয়। তারপর 'থানার লকআপে খুন' 'জেলের ভেতরে খুন' 'লালবাজারে খুন', 'চতুর্দিকে লাসের ঢেউ', ল'সবিপনি জমজমাট। দর্শকেরা হাসতে থাকে। এইসময় পতিতুণ্ডর খোলস ভেঙে অভিনেতা বেরিয়ে এসে বলতে থাকে, 'হাসবেন না। এটা হাসির নাটক নয়। মানুষের পেটের খিদে আর জোয়ান ছেলেদের বুকের রক্ত নিয়ে আমরা ভাঁড়ামো করতে আসিনি এখানে। আমরা আশ্চর্য হয়ে দেখলাম—আপনাদের এখনও হাসি আসে, এখনও আপনারা হাসতে জানেন—যখন গ্রাম থেকে উচ্ছেদ হওয়া চাষী শিয়ালদা স্টেশনে মরে পড়ে থাকে, কিংবা ছাঁটাই শ্রমিকের বুকের ফুসফুস ফেটে মুখ দিয়ে রক্ত উঠে আসে কিংবা পাশের বাড়ির ছেলেটাকে যখন দেওয়ালের সামনে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মারা হয়, তখনও আপনাদের ঠোঁটে হাসি লেগে থাকে, তখনও কী অদ্ভুত সহিষ্ণু প্রশান্তিতে ভরে থাকে সারা বুক, আমরা আশ্চর্য হয়ে যাই—এদেশে কি কেউ বেঁচে আছে? আমরা অবাক হয়ে ভাবি—এখনও মানুষ আছে এই উলঙ্গের নিরন্নের দেশে?'

লোকনাথ চট্টোপাধ্যায়ের একাঙ্ক 'বিক্ষুব্ধ সৈকত' (২০) মাছমজুরদের কাহিনী। এদের নৌকো নেই, জাল নেই, উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে এদের সম্পর্ক কেবলমাত্র শ্রমদানের। পেটের দায়ে এদের জাল, জমি, যায় ভিটে মাটি পর্যন্ত মহাজনের 'গব্বে' চলে গেছে। জাত ব্যবসা ছেড়ে এরা এখনও মহাজনের গোলামী করছে। আর এদের ছেলেরা গিয়ে ঢুকছে চটকলে বা অন্য কোথাও। যখন এরা মাছ ধরতে বেরিয়ে পড়ে তখন কারো ঘরে মেয়ে, কারো ঘরে বউ থাকে অসুস্থ। কিন্তু তার জন্যে যে এরা ঘরে থাকতে পারে না, তাই নয়, বাড়ির আপনজনেরা মারা গেলেও তা এরা জানতে পারে অনেক পরে, মরা মুখ দেখাও আর এদের হয়ে ওঠে না। তারপর যেদিন মাছ নিয়ে ফেরে, সেদিন সবই উজাড় করে দিতে হয় মহাজনকে, নিজেদের দেনা যেমন ছিল, তেমনি থেকে যায়, অথবা বেড়ে চলে। দিনের পর দিন এরা উপযুক্ত মজুরী থেকে বঞ্চিত হতে থাকে। কিন্তু এরাও একদিন মাথা তুলে দাঁড়ায়। ডাক দেয় সমস্ত মাছ-

মজুরদের, 'আজ সব জায়গাতেই ন্যায্য দাবীর ঝড় উঠেছে, কারখানায় শ্রমিকেরা লাল পতাকা ওড়াচ্ছে। চাষীরা জমিতে গাঁথছে লাল নিশান। আমরাও এখানে ওড়াব লাল পতাকা। আমার সঙ্গে চল সব, আমরা ওদের সমুদ্দুরের পানে যাওয়া বন্ধ করবোই।' স্বভাবতই এ-অবস্থায় মহাজন রিভলবার উঁচিয়ে দাঁড়ায়। বাধা দেয়। হঠাৎ একজন মাছমজুর (শামুদ্দি) তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং গলা টিপে তাকে হত্যা করে। অন্য একজন (আলিবদ্দি)বলে, 'বলে দাও আমরা স্বাধীন, আমরা মুক্ত। গলা ছেড়ে তুমি জানিয়ে দাও এবার থেকে জাল নৌকো আমাদের, লাল খেরো খাতার হিসাব আমরা শেষ করেছি।'

ইন্দ্রনীল সেনের একাঙ্ক 'জলে ওঠার দিন' (২১) খরাজনিত দুর্ভিক্ষের ভয়ঙ্কর পরিবেশে গ্রামের গরীব কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের কাহিনী। অভাবে দারিদ্র্যে গ্রামের লোকেরা যখন 'চাট্টি ভাত দাও গো' বলে কেঁদে ফিরছে অথবা ঘাস-পাতা খেয়ে মরছে, তখন জোতদার জনার্দনের গোলায় মজুদ চাল-ধান গ্রামের বাইরে পাচারের ষড়যন্ত্র চলতে থাকে। গ্রামের তরুণ শিক্ষক ন্যায়বত্ন বংশের ছেলে অজিত বুভুক্ষু কৃষকদের নিয়ে জোতদারের বাড়িতে আসে, অনুরোধ করে গোলা থেকে ধানচাল বের করে দিয়ে গাঁয়ের লোকদের বাঁচাতে। জোতদার তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। এবং থানায় খবর পাঠায়। কিন্তু পুলিশ আসার আগেই অজিতের নেতৃত্বে কৃষকেরা জোতদারের বাড়ি আক্রমণ করে এবং জনার্দনের মৃত্যুদণ্ড দেয়। এবং সেদিনই জনার্দনের ছেলে জয়ন্ত শহরে ছাত্র-মিছিলে পুলিশের হাতে প্রাণ দিয়েছে। এদিকে খবর এসেছে শত্রু আসছে, সঙ্গে গাড়ী, বন্দুক এবং পোষা গুণ্ডার দল। এরা এখন তৈরি হচ্ছে রাস্তায় গাছের গুঁড়ি ফেলে গরুর গাড়ি রেখে ব্যারিকেড তৈরি করে। এদের কাছে তখন 'যতক্ষণ জীবন ততক্ষণ লড়ছি।' অজিত বলেছে, 'মৃত্যুর মুখে লাথি মেরে আমরা শুরু করেছি শেষ লড়াই। ভেবে দেখ তোমরা, অনাহারে মৃত্যু ছিল সুনিশ্চিত। সে মৃত্যু কাপুরুষের। আমরা কি মেনে নেব তাকে?' সকলের বলিষ্ঠ হাত তখন আকাশের দিকে উদ্যত, 'না-না-না —।'

সমীর মজুমদার রচিত 'বাঘের ডাক' (থিয়েটার ক্যাম্প অভিনীত) নাটকটি বাদা অঞ্চলের কৃষকদের ওপর মহাজনদের অত্যাচার ও তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ, এর কাহিনী। এখানে মহাজনেরা সর্বাংশে জঙ্গলের রাজত্বই চালায়। হঠাৎ দেখা গেল সেখানে একটা বুদ্ধিমান বাঘের আবির্ভাব ঘটলো, যে বেছে বেছে মহাজনদেরই হত্যা করে। আর মাঝে মাঝে অঞ্চলটাতে ত্রাস সঞ্চারের জন্যে জেগে ওঠে বাঘের ডাক। কিন্তু এই বাঘটাকে কিছুতেই খুঁজে না পাওয়ায়,

ভীত মহাজন ভূষণ মণ্ডলদের রক্ষা করবার জন্যে আসে পুলিশ, আসে তপেশ্বর বাবার বেশে সি. আই. ডি। এদিকে এক একজন মহাজনের নিধনে সাধারণ মানুষ এক একবার স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। কিন্তু সাধারণ শোষিত মানুষের স্বস্তিতে তো প্রশাসনের স্বস্তি আসতে পারে না। তাই মহাজনদের বাঁচাতে আমেরিকা থেকে শিকারী এসে ঘুম পাড়ানো গুলি চালিয়ে এক বাঘকে খাঁচায় পোরে। মহাজনেরা কতকটা নিশ্চিন্ত হয়। ভূষণ মণ্ডল লালসার হাত বাড়ায় তিরির দিকে। কিন্তু সত্যিকারের মহাজনখেকো বাঘ লখিন্দরকে ঘুম পাড়াতে পারেনি কোন ঘুম পাড়ানো গুলি। অতএব তার অমোঘ ছোরা বিদ্ধ হয় ভূষণের বুকে। তপেশ্বরবাবা এ-সুযোগ নিতে দেরী করেনি। কৌশলে গ্রামীণ মানুষের কাছ থেকে লখিন্দরকে বিচ্ছিন্ন করে, গ্রামবাসীদের দিয়েই তাকে ফাঁদে ফেললেন। আহত লখিন্দরের ওপর আঘাত হানলেন তপেশ্বরবাবা। বিচ্ছিন্নভাবে সংগ্রাম যে সম্ভব নয়, এ-সত্য যেমন লখিন্দর উপলব্ধি করে, তেমন গ্রামীণ মানুষেরাও চিনতে ভুল করে না তাদের সংগ্রামী সাথীকে আর সেইসঙ্গে চিনতে পারে তাদের শ্রেণীশত্রুকে। আর তখনি গ্রামীণ মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে তিরি, তপেশ্বরবাবা তথা শোষকশ্রেণীর রক্ষকের প্রতি হাতের অস্ত্র তুলে ধরে।

এই ‘বাঘের ডাক’ প্রসঙ্গে পম্পু মজুমদারের ‘শিকার’ নাটকের কাহিনী উল্লেখ্য। এখানে গ্রামবাসীদের মধ্যে একটা বাঘ শিকারের তোড়জোড় চলছে। কারণ বাঘ মানুষের শত্রু। ফাঁদে ফেলে লাঠি পিটিয়ে তাকে মারতে হবে। কিন্তু কোথায় বাঘ? গ্রামীণ শোষিত মানুষের মনে জিজ্ঞাসা। জিজ্ঞাসা উত্তাল হয়। অবশেষে মোড়ল হরিপদ শোষক মহাজনের দিকে আঙুল তুলে তাকে বাঘ বলে চিহ্নিত করে।

সমর দত্ত-র ‘জিওরদানো ব্রুনো’ নাটকের ব্রুনো উপাখ্যানের মধ্যে দিয়ে চিত্রিত হয়েছে নকশালবাদী সশস্ত্র বিপ্লব-বিশ্বাসী তরুণ সংগ্রামের কাহিনী। সংগ্রামের বিপ্লবী ভাই বিক্রম শাসকশ্রেণীর জল্লাদদের হাতে নিহত হবার পর সে কারখানায় শ্রমিক হিসেবে যোগ দেয়। এখানে শ্রমিক আন্দোলনের নেতারূপে সে শ্রমিকদের কাছে বৃহত্তর সশস্ত্র সংগ্রামের ডাক দেয়। কিন্তু শ্রমিকেরা অর্থনীতিবাদের রাজনীতিতে আবদ্ধ। সুতরাং সংগ্রামের আহ্বান বিফল হয়। এরপর সংগ্রাম গ্রামে চলে যায়। গ্রামের গরীব কৃষকদের মধ্যে গড়ে তুলতে থাকে সংগঠন। গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরাও তার রাজনীতির উদ্দেশ্য। এ-সময়েই সে পুলিশের হাতে ধরা পড়লো। কিন্তু শাসকশ্রেণীর কারাগার তাকে আটকে রাখতে পারল না। জেল ভেঙে সে পালাল। ফিরে গেল গ্রামে। আশা,

আবার সে সংগঠন গড়ে তুলবে, বিপ্লবী কৃষকদের সংগঠন। 'চেনা অচেনা' (চন্দননগর) নাট্যগোষ্ঠীর অভিনয়ে নাটকটি যথেষ্ট খ্যাতি পেয়েছে, সন্দেহ নেই। বিষয় বিন্যাসে নাটকটিতে বাস্তবতা ও শ্রেণীচেতনা জাগ্রত করার পরিবর্তে নাট্যকারের বিপ্লবী বাসনাই প্রাধান্য পেয়েছে। অসাধারণ অভিনয় নৈপুণ্যে অনেক নিম্নমানের নাটকও যে উৎরে যায়, তার উদাহরণ আমাদের মঞ্চে কম নেই। কিন্তু বিষয়বস্তুর যৌক্তিকতা, তত্ত্ব ও তথ্যের সম্মিলন ও একই সঙ্গে আধুনিককালে নাটকেও প্রয়োজনীয়।

প্রাক্তন নাটকগুলি ছাড়াও নকশালবাদী চিন্তা ও আন্দোলন-কেন্দ্রিক বহু নাটক লিখিত ও অভিনীত হয়েছে, যার প্রত্যেকটিই বিষয় গুরুত্বে উল্লেখ্য। এখানে উল্লিখিত নমুনাভিত্তিক কয়েকটি নাটকের বিষয়-বিন্যাস ও চরিত্র-নির্ণয়ের মধ্যে দিয়ে নকশালবাড়ি কেন্দ্রিক নাট্যআন্দোলনের চেহারাটা ধরার চেষ্টা করা হোল। অবশ্য কৃষকের আর সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অত্যাচার ও শোষণের চিত্র ইতিপূর্বেও নাটকে বিষয়বস্তু হিসেবে গণ্য হয়েছে ; কিন্তু মুখ্যাত জোতদার ও তার সহযোগীদের হত্যা, মুক্তাঞ্চল গঠনের ডাক দেওয়া, ইত্যাদি ঘটনাবলী একালীন নাটকেরই অবদান, যার প্রেক্ষিতে আছে নকশালবাড়ি ও বৃহত্তর এলাকায় ছড়িয়ে পড়া এক অতিজাগ্রত আন্দোলন। বিজন ভট্টাচার্যের 'দেবী গর্জন' নাটকে জোতদারের বিরুদ্ধে সম্মিলিত কৃষকের আক্রমণের ঘটনা, কেবলমাত্র নাটকের ক্ষেত্রে তাঁর উত্তরণেই নয়, নকশালবাড়ি আন্দোলনের পূর্বকালেই রচিত হবার যে তাৎপর্য, তা ১৯৬৭-তে বাস্তবক্ষেত্রেই প্রতিভাত হয়। যদিও নাটকের সমাপ্তিতে কালীমূর্তির উপস্থাপনা বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ থেকেই যায়। অনল গুপ্তের 'রক্তের রং', সমকালীন রাজনীতির সংঘর্ষ ও সংঘাত উপস্থাপনার চেষ্টা সত্ত্বেও নাট্যরূপ না পাওয়ায় নাটক হিসেবে বহুলাংশে ব্যর্থ। যদিও তাঁর আবেগ ও প্রয়াসের সততা বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই।

উৎপল দত্তের 'তীর' অভিনয়নৈপুণ্যে সার্থক হলেও বিষয়গত উপস্থাপনা সম্পর্কে বহু প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে। 'অস্ত্র চাই' বা 'মুক্ত অঞ্চল' গড়ার সোচ্চার ঘোষণা সত্ত্বেও নাটকে জোতদার সত্যবান সিংকে হেঁপোরুগী ও ভাঁড়সুলভ করে দেখানো বা পুলিশী-শক্তির নির্বোধ পরাজয় ইত্যাদি ঘটনাবলী তুলে ধরার ফলে সমস্ত নাটকটি বহুলাংশে তার তাৎপর্য হারিয়েছে। পবিত্র সরকার লিখেছেন, 'নাট্যকার নিশ্চয়ই শিল্পকে হাতিয়ার হিসেবে মানেন, কিন্তু তাঁর এই হাতিয়ার ঐ অসমান-ফলা তীরের মতো, উত্তেজনায় যার ধারগুলো বেয়াড়া আকৃতি পেয়েছে। এ-অস্ত্র অব্যর্থ কিনা সন্দেহ। নইলে সত্যবান সিংকে আগাগোড়া

কেন একটা ক্যারিকেচার হিসেবে খাড়া করা হবে?' এবং এ নাটকের শেষ দৃশ্যে পুলিশ পক্ষের যে পরাজয় দেখান হয়েছে তার বিশ্বাস্যতা খুব ক্ষীণ, তা শেষ পর্যন্ত একটা fluke ই থেকে যায়। সব দেখে মনে হয়, জোতদার সত্যবান সিং, মিলিটারি এক্সপার্ট, পুলিশ, ইস্টার্ন রাইফেল্‌সের দলবল চারপাশে কোনো প্রহরা না রেখে ইচ্ছে করে কিংবা নির্বুদ্ধিতাবশত তীর খাবার শখ নিয়ে মৃত্যুর গর্তে এসে পা দিয়েছে। জয় এত সহজ? শত্রু এত নির্বোধ?"...এই নাটকের পুলিশ অফিসার বিদ্রোহীদের জ্বালায় প্রায় স্নায়বিক বিকারে ভোগে, ফিকির বার করতে না পেরে কান্নায় ভেঙে পড়ে। অত্যাচারের মুহূর্তে দুর্বল হয়ে যায়, সোফাতে বসতে গিয়ে প্রায়ই জোতদারদের শায়িত পুত্রের পেটের ওপর বা উপবিষ্ট গৃহিণীর কোলের ওপর বসে পড়ে। তাহলে শত্রুর আসল চেহারাটা কী শুধুমাত্র এই? যাদের ওপর দর্শক বেশ খানিকটা করুণাপরবশ হয়ে পড়ে তাদের আঘাত করতে উৎপলবাবু দর্শককে প্ররোচিত করবেন কী করে?' (২২) অন্য সমালোচক অবশ্য এর একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে এই প্রক্রিয়াটাই হোল জনগণকে বিভ্রান্ত করার এক চমৎকার প্রতিবিপ্লবী প্রয়াস। তিনি লিখেছেন, 'উৎপল দত্তর প্রতিটি নাটকে পুলিশ থেকে শুরু করে অত্যাচারী শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী চরিত্রকে আঁকা হয় লঘু করে। তাদের আচার-আচরণ দর্শকরা কৌতুক অনুভব করে, উপভোগ করে চরিত্রের ভাঁড়ামোগুলিকে। উদ্দেশ্য একটিই—নিপীড়ক, অত্যাচারী শ্রেণী সম্পর্কে জনগণের ঘৃণার আগুনকে প্রশমিত করা। শাসকশ্রেণীর প্রতি শোষিত শ্রেণীর মনোভাবকে নমনীয়, সহনীয় করে তোলা। পূর্ব থেকে পরিবেশ চরিত্র সহনশীল হয়ে উঠলে পরবর্তীকালে সেই চরিত্র অত্যাচার করলে, প্রতিবিপ্লবী হত্যালীলা চালালেও সে দৃশ্য দর্শকদের মনে কোন তীব্রতম শ্রেণীঘৃণা জাগ্রত করে না। মনে জাগায় না প্রতিশোধ গ্রহণের শ্রেণীহিংসা। শ্রেণী সমন্বয়ের তত্ত্বের অভিব্যক্তি জনগণকে বিভ্রান্ত করারও এক চমৎকার প্রতিবিপ্লবী হাতিয়ার। আপাতদৃষ্টিতে প্রগতিশীল চরিত্রে প্রতিক্রিয়াশীল। (২৩)

উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিবেচনায় অমল রায়ের এখানে উল্লেখিত নাটকগুলি কার্যত প্রগতিশীল ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়েছে। 'আট জোড়া খোলা চোখ', 'পঙ্কজ দত্ত আসছেন' বা 'লালবিপনি'তে জোতদার, পুলিশ ও প্রতিক্রিয়ার চরিত্রকে এত হাস্যকর, দুর্বল ও অবাস্তব করে দেখানো হয় যে মনেই হয় না কৃষকদের ও বিপ্লবীদের এদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কোন প্রয়োজনীয়তা আছে। স্বপন নন্দী লিখেছেন, 'অমল রায়ের সাম্প্রতিক সময়ে রচিত নাটকগুলি পরোক্ষ উৎপল দত্তের নাট্যকাঠামো, চরিত্র সৃষ্টি ইত্যাদি বিষয়ে কার্বন কপিতে পরিণত হচ্ছে। অকারণ

ভাঁড়ামো অশালীন কথাবার্তা মোটা দাগের মূল রসিকতা—এসব ঝোঁক তীব্র হয়ে উঠছে।' (২৪) কার্যত নাট্যবিচারে যে-মুখ্যচরিত্র বিষয় হয়ে ওঠে বা প্রাধান্য পায়, তার শ্রেণীচরিত্র কি, চরিত্রটি নেতিবাচক না ইতিবাচক শক্তির প্রতিনিধি ইত্যাদি প্রশ্নই এক্ষেত্রে প্রধান। এই মূল প্রশ্নটির উত্তরের দ্বারাই নির্ধারিত হয় নাট্যকারের শ্রেণী অবস্থান ও তার রাজনৈতিক শ্রেণী লাইনের প্রকৃত রূপ। যে বক্তব্যকে কেন্দ্র করে চরিত্রগুলি গড়ে উঠেছে, নাটকে তাদের কিভাবে আঁকছেন নাট্যকার, এবং একটি নাটকের কোন কোন চরিত্রগুলিকে নাটকে বিশেষভাবে আঁকা হয়েছে যারা প্রাধান্য পেয়ে বিশিষ্ট মর্যাদা লাভ করে দর্শকের অতিমাত্রায় দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং এই পদ্ধতিতে দর্শকের অনুভূতি ও ভাবনাকে প্রভাবিত করছে, সেটাই মুখ্যত বিচার্য। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ্য উৎপল দত্ত রচিত 'মাওৎসে-তুঙ' যাত্রাপালা। এই পালার মঞ্চে সর্বদাই প্রাধান্য পেয়েছেন 'চিয়াংকাইসেক্'; তুলনামূলকভাবে মাওৎসে তুঙ-ই হয়ে দাঁড়িয়েছেন গৌণ চরিত্র! 'চতুর ধুরন্ধর নাট্যকার প্রতিবিপ্লবী চরিত্রটিকে, অতি যত্নে, নানা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে, অন্তর্দ্বন্দ্বের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার তিল তিল করে, প্রধান ও প্রভাব সৃষ্টিকারী চরিত্র হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন। তার শ্রেণীচরিত্রকে আড়াল করার জন্য "ম্যানিয়া" বা হিস্টিরিয়াগ্রস্ত করে দেখিয়েছেন।...নাট্যে সচেতন শয়তানীর কৌশলটা এটাই। এটা প্রতিবিপ্লবী দক্ষিণপন্থী সংশোধনবাদী রাজনীতির সাংস্কৃতিক শিল্পে হাতিয়ার। ওটা না বুঝলে কোন নাটক বিচার করা যাবে না। তাই তরুণ অপেরার "মাওৎসে-তুঙ" যাত্রা দেখে বর্তমান লেখকের অভিজ্ঞতা দর্শকরা 'চিয়াংকাইশেক' চরিত্রাভিনেতার অসাধারণ অভিনয়, চরিত্রচিত্রণের ভূয়সী প্রশংসা করতে করতে চলে যাচ্ছেন। মাওৎসে-তুঙ, চীনের কম্যুনিস্ট পার্টি, চীনা জনগণের সশস্ত্র বিপ্লবী সংগ্রাম গ্রীনরুমের অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেছে।' (২৫)

আপাতদৃষ্টিতে মনোরঞ্জন বিশ্বাসের নাটকের ঘটনাবলী, চরিত্রচিত্রণ ও শ্রেণীচেতনার প্রকাশ অনেক বেশি সোচ্চার ও উগ্র। 'পদাতিক' নাটকের গ্রাম ভারতের গরীব কৃষকেরা যে সামন্ততান্ত্রিক প্রক্রিয়ার দ্বারা শোষিত হয়, বৈষ্ণব হালদারের মত জোতদারেরা যে-কৌশলে শোষণ করে এবং তারক, কানু, আশা, নব ও লতিফেরা ভারতের প্রত্যেকটি জীবন-কেন্দ্রে লৌহ-কঠিন-অধিষ্ঠানে বলবান বেঁচে হালদারদের রক্তাক্ত থাবা থেকে মুক্তির পথ খোঁজে এবং ভাবী বিপ্লবের অঙ্কুর এ-পথেই কালক্রমে উদ্গমে পরিণত হয়। কিন্তু কৃষকদের মধ্যে সঠিক রাজনৈতিক চেতনা উপযুক্ত প্রস্তুতির অভাবে বৈষ্ণব হালদারদের ওপর আক্রমণ

চালাতে দ্বিধা থাকে। তাই এ-নাটকে দেখি মহাজনকে হাতের মুঠোয় পেয়েও তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে সকলের মনেই সংশয়। সেই মুহূর্তে অবশ্য স্বামী-হত্যার প্রতিশোধ নিতে গর্ভবতী আশা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই ব্যক্তিগত ক্রোধের স্ফুরণ সমাজজীবনে অসত্য না হলেও, তা সমষ্টির চেতনাকে প্রকাশ করে না। কিন্তু সামান্যকাল পরেই, নাটকে যখন পুলিশের বেয়নেটের মুখে নিশ্চিন্ত মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে নব চিৎকার করে বলে যায় যে আজ সে একা নয়, শত সহস্র নব জন্ম নিচ্ছে ভারতের গ্রামে-গঞ্জে-জনপদে এবং 'আমাকে মেরে, আমাদেরকে তুমরা খ্যাষ করতে পারবা না', তখনই নাটকের সমগ্র চেতনা কেবলমাত্র পলিটিকালাইজড্ই হয় না, ব্যক্তির একার সংগ্রাম এসে মেলে বৃহত্তর সামাজিক বিপ্লবের জনচেতনায়।

মনোরঞ্জন বিশ্বাসের 'কমিউনার্ড' (২৬) নাটকের চাষী বউ জোতদারের শোষণব্যবস্থা কায়েম রাখার জন্যে 'দেয়াসিনী' হতে বাধ্য হয়েছিল। তারপর কেমন করে শোষণব্যবস্থার অন্যতম হাতিয়ার ধর্মের চিরায়ত সংস্কারের বেড়াজাল অতিক্রম করে, সশস্ত্র বিদ্রোহের শরিক হয় এবং থানা হাজতে নিষ্ঠুর পুলিশী নির্যাতনেও যার মুখ থেকে বার করা যায় না, ছিনিয়ে নেওয়া রাইফেলগুলো কোথায়, সে-কাহিনীর নাট্যরূপ দিতে নাট্যকার কোথাও শ্রেণীঘৃণার মূল বিষয় থেকে বিচ্যুত হন না। কিন্তু মঞ্চের প্রধান চরিত্র দেয়াসিনীকে কেন্দ্র করে যে জোতদারের সরকার, বিপ্লবী কাজল, গ্রামের ধর্মবিশ্বাসী কিষাণেরা স্ব স্ব ভূমিকা পালন করে, তার প্রেক্ষিতে গ্রাম্য সরল চাষী বউ কেমন করে 'গরীবের ঝাণ্ডা' হাতে 'বিপ্লবের জননী' হয়ে ওঠে, ঘটনা হিসেবে লেখক তাকে কোথাও পাঠক বা দর্শকের কাছে বিশ্বাস্য করে তুলতে পারেন নি। এবং অবশেষে-দেয়াসিনী যখন দর্শকদের একেবারে সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলতে থাকে, 'আর থিয়েটার নয়, আর মঞ্চ নয়, এখনকার কাজ নাটকের বাইরে। আপনাদের কাজ আমাদের কাজ, সকলের কাজ। এই অত্যাচার এই অন্যায় এই নির্যাতনের বিরুদ্ধে মুক্তির জন্যে। আর প্রতিবাদ নয়, প্রতিরোধ নয়, প্রতিশোধ। এই নিন অস্ত্র। (যেন অস্ত্র দিচ্ছে) সত্যের পথে চলেছি আমরা। ন্যায়ের পথে চলেছি। শত শহীদের রক্তমাখা পথে আগুনের মত জ্বলে উঠেছি। শত সূর্য জ্বেলে দিন আকাশে। এক হয়ে উঠে দাঁড়ান। বিরাট শক্তি গড়ে তুলুন। কিছুতেই ভয় পাবেন না। বিশ্ব সংসারে আলো দেবার মতো এখনো অনেক আলো আছে। দুনিয়ার বুকের মধ্যে সেই আলো তরবারির মতন জ্বলছে। শত্রুরা তাকে যমের মতন ভয় করে। এই অস্ত্র।'—তখন তা নাটকের বক্তব্যের গভীরতাকে সম্পূর্ণভাবে ক্ষুণ্ণ করে

কেবলমাত্র জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন শ্লোগানমাত্র হয়ে দাঁড়ায়। ফলে যখন দেয়াসিনী পুলিশের গুলি বর্ষণের মধ্যে ছুটি হাত সামনের দিকে প্রসারিত করে সমস্ত শরীর আন্দোলিত করতে থাকে, তখন বাস্তব সমস্যা ও সমাধানের মূল প্রশ্নটির বিষয়ে দর্শকরা একেবারেই ভাবিত হন না। আসলে মনোরঞ্জন বিশ্বাসের নাটক যেন সর্বদাই ছক মেনে চলে। সেকারণেই নানা বিপ্লবী বুলির কায়দাকানুন থাকলেও কার্যত তা সর্বত্রই জীবনের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন শ্লোগানে পরিণত হয়েছে।

॥ তিন ॥

১৯৬৭-র নকশালবাড়ি ও তৎপরবর্তীকালের বহু সংঘর্ষ, মৃত্যু এবং হত্যার ধারাবাহিক ঘটনাবলী সাহিত্যের অন্য শাখার মত কবি ও গীতিকারদের বিশেষ-ভাবে নাড়া দেয়। বিপুল পরিমাণ কবিতা ও গান এ-সত্যই প্রমাণ করে। নকশালবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত বা সহানুভূতিসম্পন্ন কবিদের সঙ্গে বয়স্ক ও প্রতিষ্ঠিত কবিরাও মিলেছিলেন ঐকান্তিক সততায়। প্রভেদ এই যে, বয়স্ক বা প্রতিষ্ঠিতেরা উক্তকে বিশেষের মূল্য দেন নি, বলা চলে, সার্বিক মানবতাবাদী চিন্তনে সর্বদাই তাঁরা ছিলেন আবিষ্ট। কিন্তু তরুণদের কাছে এ-আন্দোলনের মূল বক্তব্য ও রাজনীতিক ঘটনাবলীই কাব্যের বিষয়রূপে মর্যাদা পেয়েছে। যদিও কাব্যরচনার অভিজ্ঞতা ও কর্মের ত্রুটি প্রায়শই এখানে প্রকট। কেবলমাত্র কবিতা হিসেবে বিচার করলে যার অসাফল্যই বড়ো হয়ে দেখা দেয়, যথেষ্ট আন্তরিক প্রয়াস সত্ত্বেও। একজন সমালোচক লিখেছেন, 'সাতষট্টির পরের কবিতার মধ্যে বেশ কিছু কবিতা বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের দিক থেকে স্বকীয়তা দাবী করলেও অধিকাংশ কবিতাই অংশতঃ ব্যর্থ হয়েছে। এইসব কবিতাগুলো হয় বিষয়বস্তুর দিক থেকে নয়তো আঙ্গিকের দিক থেকে অথবা এই দুই দিক থেকেই কোন চমৎকারিত্বের সৃষ্টি করতে পারেনি। এটা আমাদের ত্রুটি। এছাড়া আরও একটি লক্ষণীয় ত্রুটি হলো কবিতার মেজাজে—কোন কোন ক্ষেত্রে আবেগ লাগামহীন ছুটতে গিয়ে বিষয়বস্তুকে মাইলখানেক দূরে ফেলে এসেছে, অথবা কোথাও যুক্তিকে আশ্রয় করতে গিয়ে শীতলতার গর্ভে ঢুকে গেছে এবং বিপ্লবী মেজাজ সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। আবার কিছু কবিতায় অদ্ভুত যান্ত্রিকতা প্রশ্রয় পেয়েছে, ভালবাসার হাতের ছোঁয়া পর্যন্ত নেই। বিপ্লবী কবিতা যা চায়, তা হল বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের একত্ব; কোন কবিতা বিষয়বস্তুর দিক থেকে

শ্রমিকশ্রেণীর সংস্কৃতিকে চেহারা দিচ্ছে ঠিকই, অথচ অত্যন্ত ভোলো তার প্রকাশভঙ্গী। আবার কোন কবিতায় আঙ্গিকের বর্শা নিয়ে এমন নাচানাচি যে সেই বর্শা একেবারে ঢুকে গেছে বিষয়বস্তুর বুকের ভিতর। শ্রমিক ও কৃষকের সংস্কৃতি এ দুটোর কোনটাই চায় না (যদিও এইসব লেখার পেছনে সৎ ও আন্তরিক প্রচেষ্টা রয়েছে), কারণ এ দু'টোই হলো শ্রমিকশ্রেণীর রাজনীতি ও সংস্কৃতির পক্ষে বিষের মতো।' (২৭)

এই সমালোচনার মৌলিক বক্তব্য সম্পর্কে দ্বিমত হবার যৌক্তিকতা বিশেষ নেই; কিন্তু মুখ্যত এই আন্দোলনের বক্তব্য বা ঘটনার ছায়াপাতে যে কবিতাগুলির রচিত, সে-সম্পর্কে অন্য বক্তব্যের অবকাশ থাকে। প্রথমত যে তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতা বা প্রেরণা এগুলিকে লিখতে বাধ্য করে, তা কোনক্রমেই দীর্ঘ চিন্তন বা অনুশীলনের ফলশ্রুতি হ'তে পারে না, হয়ও নি। আমি ১৯৬৮ থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত সময়কালের কথা বলছি। তদুপরি, সরাসরি বক্তব্যের উপস্থাপনা যাদের উপজীব্য ছিল, তাঁরা কেউই কাব্যচর্চায় অভিজ্ঞ বা শিক্ষিত নন। একারণে কবিতা হিসেবে বিচার করলে এ-কবিতাগুলির প্রায় কোনটিই উত্তীর্ণ হয়নি, বলা চলে। যেমন ধরা যাক নিমাই ঘোষের কবিতা: 'অনেক সয়েছি আর নয় এবার দুর্জয় সংগ্রাম।/অনেক অত্যাচার, অনেক নিপীড়ন,/সব ঠেলে দিয়ে জ্বালো বুকে ঘৃণার আগুন।/রাইফেলের মুখে শক্তির বাণী,/সে বাণী ছড়ায়ে দাও।/কৃষাণ মজুর কাঁধে কাঁধ রেখে/সব ঝড়ো দিন দুহাতে ঠেলে,/চলো গিয়ে মিশি তরাই-এর কোলে/নব আহ্বান এসেছে আজ/জাগাতে শ্রেণী-সংগ্রাম॥' (আর নয়—এবার দুর্জয় সংগ্রাম) (২৮) অথবা মানিক ইসলামের কবিতা: 'তবু শত্রুশ্রেণীর মনে স্বস্তি নেই কিন্তু/সামনে মৃত্যুবাণ দেখে/ভয়ে তারা কাঁপছে।/কারণ, প্রতিটি গ্রামের গর্ভেই রয়েছে নকশালবাড়ি—/সামন্তশোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের লাল আগুন।/কমরেড, ময়দানে-মিছিলে-ব্যারিকেডে/গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার লড়াই আমরা করবো, কিন্তু শয়তান সংশোধনবাদী নয়া সংশোধনবাদীদের দর্শন অনুযায়ী নয়।/আমাদের এই লড়াই আর তার ভাষা খুবই কঠিন—/বদলা আর বিনিময়ই পাবে প্রাধান্য,/জনযুদ্ধের তত্ত্বে 'গ্রাম থেকে শহর ঘেরাও' হবে আমাদের কৌশল।' (পঁচিশে মে'র লাল আগুন) (২৯) নকশালবাদী আন্দোলনের মূল তত্ত্ব ও রণকৌশল বিষয়ে এ-কবিতাগুলির বিবৃতি যদিও সঠিক, তথাপি কবিতার প্রশ্নে সংশয় শেষপর্যন্ত থেকেই যায়। এতদ্ব্যতীত কবিতার কবিতা হিসেবে উত্তীর্ণ হওয়া প্রসঙ্গে সমস্ত পৃথিবীতেই অদ্যাবধি বহু মত বা মতান্তর বর্তমান।

মনীশ ঘটক, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ প্রবীণ ও প্রতিষ্ঠিত কবিদের কবিতা যদিও নকশালপন্থী পত্রিকাগুলিতে নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে বা তাঁদের সঙ্কলনে স্থান পেয়েছে, তথাপি তাঁদের কবিতাগুলিকে বিশেষভাবে নকশালপন্থী কবিতা হিসেবে চিহ্নিত করা চলে না। সাধারণভাবে বামপন্থী কবিতা হিসেবে উল্লেখই শ্রেয়।

নকশালপন্থী কবিতাবলীর বিষয়বস্তু প্রধানত হোল, কৃষকের ওপর সামন্তবাদী শোষণ ও তার বিরুদ্ধে কৃষকের সশস্ত্র সংগ্রাম, শহরাঞ্চলে হত্যা-সন্ত্রাস ও তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ অথবা 'লাল সন্ত্রাসে'র আহ্বান ইত্যাদি। প্রথমোক্ত বিষয়ের কয়েকটি কবিতা এইপ্রকার: (১) 'এক একটা গ্রাম উঠে দাঁড়াচ্ছে,/অস্ত্র নিচ্ছে তুলে···/সরল সবল ভীরু এক একটা লোক/মালিকের চড় খেয়ে মালিকের খেতে রোদে রোদে সারাদিন নিজে জ্বলে গিয়ে/তুলে আনতো রাশি রাশি প্রাণের ফসল/বিদ্যুতের ফণা কতো আলোর ফসল।/অন্যের খামারে ভরে দিয়ে উজ্জ্বল সময়/নিজে মরতো কপাল চাপড়ে,/শত্রুকে অমৃত দিয়ে নিজে পান করে যে'তো বিষ—/হাড়িয়া বা ধেনো।/···সে মানুষই দাঁড়িয়েছে অস্ত্র হাতে নিয়ে/···এক একটা লোক উঠে দাঁড়াচ্ছে,/অস্ত্র নিচ্ছে তুলে···/এক একটা গ্রাম উঠে দাঁড়াচ্ছে,/অস্ত্র নিচ্ছে তুলে···।' (অজিত মুখোপাধ্যায়, অস্ত্র হাতে) (৩০) (২) 'উধাও মাঠ লোপাট ধান/চোরের গোলা ভর্তি/সামনে খাঁ খাঁ ভরা অকাল/খিদে সত্যি/লঙ্গরখানায় ঢুকবে/কিম্বা হকের ধান কাড়বে/আমি তো সেটা দেবো না বলে, তুমিই ঠিক করবে/মরবে কিম্বা মারবে।/মাঠ গিয়েছে বলদ গেছে/হাতের কাস্তে বৈরী/ভুলেছো ওটা ধানের নয়/নালার মাপেও তৈরী/রোজের লড়াই রুজির লড়াই'লড়বে কিম্বা মরবে/আমি তো সেটা দেবো না বলে/তুমিই ঠিক করবে/মারবে কিম্বা মরবে।' । কৃশল সেন, "চাষাড়ে) (৩১) (৩) একটি গান: 'নকশাল কি মশাল আশমানে জ্বলছে,/কিষাণের ক্ষোভে আজ হিমালয় টলছে,/অনেক দিনের পুরোনো সে জিজ্ঞাসা—/মিটবে কি কভু চাষীর জমির আশা?/লড়াইয়ের ঢেউয়ে ঢেউয়ে উত্তর উত্তাল—/নকশাল, নকশাল, নকশাল, নকশাল!' (দীপক আচার্য, নকশাল কোন্ সাল ইতিহাসে আনলে) (৩২) ইত্যাদি। দ্বিতীয় বিষয়ের কবিতা: (১) 'আমার স্মৃতির নদী তোলপাড় করে/চোখের ছবিতে আঁকে সেই মুখ/দেয়াল লিখনে লিখে গিয়েছিলো/নতুন জীবন সৌধ গড়ার ডাকে /···অথচ সেদিন তার চিতা নিভে গেলো/হাজার বুকের চিতা ক্রোধের মশালে/আগুন জ্বালিয়ে দিলো আগুনের টানে।/যখন ভোরের বাতাস দুনিয়ার দ্বারে/হিমেল বাতাস ছেড়ে রোদ/তখন জলার ধারে প্রাণহীন দেহ,পশুর শিকারে

পড়ে আছে।/দেয়াল লিখনে কেন সে লিখেছিলো/শোষণের ভিৎ ভেঙে ফেলো… ।' (শ্যামসুন্দর দে, মুছে যাবে না) (৩৩) (২) 'রক্তে শহরটা ডুবে যায় পার্লামেণ্ট/সূর্যটা রক্তের মধ্যে আছড়ে পড়ে/শিশুদের জুতোয় রক্ত ছিটকে লাগে/রুটির ওপর ছিটকে পড়ে রক্ত/ইস্কুলের দেওয়ালের ওপর রক্ত/সাদা গীর্জার ওপর রক্ত/গাড়ির উইণ্ড স্ক্রীনের ওপর রক্ত/দোয়াত উপচে পড়ে রক্ত/সাদা ফুলের ওপর জলজল করে রক্ত রক্ত ছিটকে লাগে খবরের কাগজে…/একটা পুলিশ একটা বন্দুক/বন্দুকে তিনটে বুলেট/একটা ছেলে ছুটছে ।' (নবারুণ ভট্টাচার্য, মস্তান) (৩৪) (৩) 'জেলের গরাদ ধরে তবুও দাঁড়িয়ে/নষ্টপ্রাণ মস্তান জননী,/লুপ্তরূপ মাংসলিপ্ত, রক্তক্লেদ হাড়-মাংস-মজ্জার গভীর হতে/চিনে নেবে সন্তানের/প্রিয়তম মুখ।/চেনো তুমি, কে তোমার পেটের সন্তান ?/সনাক্ত করেছো/কোনটা ছেলের লাশ ?/ কাকে তুমি গর্ভে ধরেছিলে ?/কাকে ভিন্ন করে বেছে নেবে/সন্তানের মা ?/একই রক্ত প্রবাহিত সকল শরীরে,/নিশ্বাসের বাতাস/একই, বারুদে বিশ্বাস/যাদের,/তাদের সমান প্রাণ/রক্তের সমুদ্রে শুয়ে/তারা আজও মাটির সন্তান।' (ধূর্জটি চট্টোপাধ্যায়, জেলের গরাদ ধরে) (৩৫) ইত্যাদি।

এতদ্‌ব্যতীত, কবিতাগুলিতে এসেছে নকশালবাদী আন্দোলনের সার্থকতার আশাবাদী আকাঙ্ক্ষা, জেলখানায় ওঁদের ওপর অত্যাচার, জেলের বাইরে যাঁরা লড়ছেন তাঁদের প্রতি সমর্থন ও হুঁশিয়ারী ইত্যাদি নানাবিধ বিষয়। অভিজিৎ গুহ মুস্তাকি, অভীক গঙ্গোপাধ্যায়, অর্জুন গোস্বামী, অমলেন্দু মজুমদার, ইন্দু সাহা, কমলেশ সেন, গীতা চৌধুরী, দ্রোণাচার্য ঘোষ, নির্মল ব্রহ্মচারী, মনোরঞ্জন বিশ্বাস, সত্য রায়, সমীর রায়, সৃজন সেন, সৈকত রায় প্রমুখ বহুজনের কবিতাই বিষয়ানুযায়ী উল্লিখিত হ'তে পারে। সৃজন সেনের 'থানাগারদ থেকে মাকে' কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি কবিতার অনুকরণ নিঃসন্দেহে দীর্ঘস্থায়ী। উল্লেখ করা যেতে পারে উক্ত নামের কবিতাটিরই একটি পঙ্‌ক্তি : 'ওদের বিচারে মাগো দেশকে ভালবাসাটা প্রচণ্ড দেশদ্রোহিতা,/ওদের বিচারে শোষণ মুক্তির জন্যে সংগ্রাম করাটা মর্মান্তিক ব্যাভিচার,/শোষণের লৌহ-শৃঙ্খলকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করার কথাটা/ওদের বিচারে বে-আব্রু বে-আইন!/ওরা আজ তাই আমাদের হত্যা করছে/রাজপথে/জনপথে/ধানক্ষেতে মিলগেটে/অলিতে গলিতে!/দেশকে ওরা বেঁধে ফেলেছে রাইফেল আর কার্ফুর চাবুকে!/কিন্তু সীসের বুলেট আর পৈশাচিক নিপীড়ন দিয়ে/ইতিহাসের অগ্রগতিকে রুখতে চায় কোন আহাম্মকের দল ?/মেহনতী মানুষের সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রামকে রোধ করতে/কোন হিটলার আজ কলকাতার রাস্তায় ?'শোষিতের প্রতিটি ঘর আজ বিপ্লবের দুর্গ/শোষিতের প্রতিটি

হাতে আজ লাল পতাকার উল্লাস,/আর,/বন্দুকের বদলে বন্দুক ধারণ করে/ শোষিতের রাজনৈতিক অধিকার ছিনিয়ে আনতে/প্রতিটি বুকে আজ সূর্য প্রতিজ্ঞা।' কিন্তু সুজন সেনের কোন না কোন কবিতার অতিকথন বা সংগ্রামের অভাব পাঠককে পীড়িত করা; এবং কবিতাও তার মর্যাদা হারায়/নবারুণ ভট্টাচার্যের বহু উচ্চারিত কবিতা 'এই মৃত্যু-উপত্যকা আমার দেশ নয়' (৩৬) প্রসঙ্গেও আমার একই বক্তব্য। অবশ্য এ-কবিতাটির সমালোচনা প্রসঙ্গে সমীর রায়ের বক্তব্যের (৩৭) সঙ্গে আমি একমত নই। তিনি বলেছেন, 'কিন্তু "এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না" ইত্যাদি ইত্যাদি কার দেশ? যে ভূমিতে আমাদের কমরেড পঞ্চাশ বছর ধরে রক্ত ঝরালো সেই দেশ তো আমারই। আমাদের দেশে যতই জল্লাদের উল্লাসমঞ্চ তৈরী হোক না কেন, যতই শ্মশানে ওরা আমাদের কমরেডদের পোড়াক না কেন, যতই আমার দেশকে রক্তস্নাত কসাইখানায় পরিণত করুক, দেশ আমারই, দেশ জনগণের। মনে জ্বালা নিয়ে নতুনভাবে নতুন কিছু কথা বলিষ্ঠভাবে বললে রাজনীতি-চেতনাহীন পাঠকদের উদ্বুদ্ধ করতে পারে, কিন্তু এর বিপদ মারাত্মক।' কবিতার বিষয়টি যথাযথ অনুধাবন করলে কিন্তু অন্য ব্যাখ্যাটাই ছিল স্বাভাবিক। যে ক্রোধ, অন্তর্জ্বালা ও অভিমান থেকে নবারুণ 'এ বিস্তীর্ণ শ্মশান আমার দেশ না। এই রক্তস্নান কসাইখানা আমার দেশ না' বলেন, তা কোনক্রমেই পাঠককে বিপথগামী করে না, পক্ষান্তরে 'দেশকে ফিরে কেড়ে নেবার" সঙ্কল্পে কঠিন ও সঙ্ঘবদ্ধ করে। তিনি যখন স্পষ্টতই বলেন, 'যখন জন্মভূমির মাটি ও বধ্যভূমির কাদা এক হয়ে গেছে, তখন আর দ্বিধা কেন/সংশয় কিসের, তখন বোধ হয় একে পূর্বোক্ত সমীর রায় কথিত বেপরোয়া সংকীর্ণতা বলে অভিহিত করা চলে না।

অনস্বীকার্য, নকশালপন্থী কাব্যচর্চায় আঙ্গিকের চেয়ে বিষয়কেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। আর এর ফলে বক্তব্যে বহুক্ষেত্রেই আবেগের প্রাধান্য দেখা গেল, যা শেষপর্যন্ত পাঠক মানসকে প্রায়শ প্রভাবিত বা প্রাণিত করতে সমর্থ হয়নি। 'ব্যারিকেডের কবিতা' সঙ্কলনের 'বক্তব্যে' সম্পাদক অর্জুন গোস্বামী লিখেছেন, 'এটা সত্তরের' দশক। এই দশক প্রত্যক্ষ করেছে শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে শোষিত-শ্রেণীর লড়াই। এই দশকেই প্রমাণিত হয়েছে যে প্রতিক্রিয়াশীল শাসকচক্রকে উপরে উপরে যতই শক্তিশালী বলে মনে হোক না কেন আসলে তারা হলো কাগজে বাঘ। স্বভাবতই এই দশকের মানুষের সচেতনতা অনেক বেশি। আমরা এমন কোন কবিতা পড়তে চাই না যাতে আছে হতাশা, আছে যন্ত্রণার গোঙানি। আমরা এমন কবিতা পড়তে চাই যাতে ধরা পড়বে শোষণের আসল

স্বরূপ, যে কবিতা পড়ে অনুপ্রেরণা পাবেন লক্ষ লক্ষ খেটে খাওয়া মানুষ এবং যে কবিতা প্রকৃতই হবে শোষিতশ্রেণীর সংগ্রামী হাতিয়ার। আমাদের মধ্যে অনেকে বলেন কবিতা হলো এমন একটা জিনিস যা ঠিক স্লোগান নয়। আমাদের বক্তব্য হলো কবিতার বিষয় ও কবিতার আঙ্গিক এই দুটোর মধ্যে আগে বিষয়, পরে আঙ্গিক। বক্তব্যকে সাধারণের উপযোগী করে বলার জন্য কবিতা যদি কারুর কাছে স্লোগান বলে মনে হয় তবে সেই স্লোগানই হলো সত্তর দশকের শ্রেষ্ঠ কবিতা।' (৩৮) মন্তব্যটি বিষয়ে অবশ্যই বিতর্কের অবকাশ থেকেই যায়। কেননা, কোন না কোনভাবে কবিতাকে স্লোগান পেরিয়ে যেতেই হয়, কোন একটা উত্তরণে উপনীত হতে হয়, অন্যথায় তা পাঠকের মানসিকতায় সঞ্চারিত হয় না। উদাহরণ হিসেবে নাজিম হিকমত তো সামনেই আছেন।

বক্তব্য উপস্থাপনার বিবেচনায় এই কবিদের অনেকেই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা করেছেন। মূল সমস্যা এবং সমাধানের বিশ্বাসী শপথ বারংবার তাঁদের কবিতায় উচ্চারিত হয়েছে। গোপীনাথ দে র'কবিতায়, 'তোমার জমিতে শত্রু ঝরালো তোমার খুন/দধীচির হাড়ে শত্রুর ঘরে জ্বালো আগুন।/ভাইয়ের রক্তে মাটি হলো লাল/শোধ নেবে নাকি, তুমি কি দালাল ?/শ্রেণীসংগ্রাম—জয়• থেকে জয়—/পড়ে মার খাওয়া প্রহসন নয়।/ইতিহাস-কাল ভারতবর্ষে তুলতে ফসল/শেষ লড়াই-এ যেতে হবে তাই ডাকে মাদল—' (ঘর গোছানোর সময় নাই) (৩৯) অথবা চিরঞ্জীব সিদ্ধান্তের কবিতায়, 'আর বিরাট পাহাড়ের মতো বাঁধটা/যাদের জীবনকে এতোদিন কঠিন নিষ্পেষণের বাঁধনে বেঁধে রেখেছিলেন,/নেই সব লক্ষ লক্ষ গৃহহারা সর্বহারার দল/বৃষ্টির প্রত্যাশায় ব্যাকুল কচি সবুজ ধান চারার মতো/আকুল আগ্রহে চেয়ে আছে সেই উজ্জ্বল দিনটার জন্য—'যেদিন যুগের পর যুগ ধরে/তাদের বুকের ওপর পাষাণ হোয়ে চেপে থাকা'এই বাঁধটা ধসে পড়বে—'তারা মুক্তি পাবে।/বাঁধটা অচিরে ধসে পড়বে দেখে নিও।' (বাঁধটা ধসে পড়বেই) (৪০) এবং অন্যান্য অনেক কবির কবিতায় শেষপর্যন্ত এ-সত্য ভাষণও তো কোন না কোন অর্থে আমাদের সমাজজীবনের সত্য হিসেবেই লিপিবদ্ধ হয়।

নির্দেশিকা

১। The Real Face of the U.F. Liberation, June, 1969.

২। চারু মজুমদার, বিপ্লবী সংস্কৃতির দিশা, সমকাল, আগস্ট, ১৯৭৭

৩। মনোরঞ্জন বিশ্বাস, বিপ্লবী সাহিত্যের পটভূমি, সমকাল, পূর্বোক্ত সংখ্যা।

৪। মহাশ্বেতা দেবী, ভূমিকা, অগ্নিগর্ভ, পৃঃ ছয়-সাত

৫। বর্তমান লেখকের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বিনয় ঘোষ এই মন্তব্যকে স্বীকৃতি দেন।

৬। 'সাহিত্যে শিল্পে ভুলতত্ত্ব ভুল ব্যাখ্যা ও ভুল লাইনের বিরুদ্ধে লড়ুন,' সমকাল আগস্ট ১৯৭৭

৭। পল্লব ভৌমিক, সশস্ত্র বিপ্লব বুদ্ধিজীবীদের অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে, প্রতিভা প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা, সপ্তম বর্ষ, ১৯৭৪

৮। নয়ন সেন, কেন লেখা ? গতকাল আজকাল আগামীকাল, প্রতিভা পূর্বোক্ত সংখ্যা এবং তৃতীয়-অষ্টম সংখ্যা, ১৩৮১

৯। Mao Tse-Tung, Yenan Forum on Art and Literature, Selected works, Vol. IV, Bombay, 1956 pp. 66-7

১০। সাংস্কৃতিক ইস্তাহার, প্রতিভা, প্রথম-দ্বিতীয় সংখ্যা, সপ্তমবর্ষ, ১৯৭৪

১১। সমকাল, আগস্ট, ১৯৭৭

১২। শূদ্রক, নবান্ন নাটকেব শ্রেণীভিত্তি ও শ্রেণীচরিত্র বিচার, নাট্যপ্রসঙ্গ, জুলাই, ১৯৭১

১৩। দীপেন্দু চক্রবর্তী, নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য, পুনর্মূল্যায়ন, অনুষ্টুপ, তৃতীয়-চতুর্থ সংখ্যা, ১৩৮৫

১৪। Kanu Sanyal, Report on the Peasant Movement in the Tarai Region, Liberation, November 1968

১৫। Narayanmurthi, the Sri Kakulam Story II, Frontier, September 20, 19৬9

১৬। দেশব্রতী, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৭৫

১৭। মনোরঞ্জন বিশ্বাস, রণক্ষেত্রে আছি

১৮। দশ বছরেব গল্প-কবিতা, সম্পাদনা, দীপঙ্কর চক্রবর্তী, অনীক, মুর্শিদাবাদ

১৯। আজকের একাঙ্ক, সম্পাদনা, শূদ্রক, স্বরলিপি, ১৯৭২

২০। তদেব

২১। পবিত্র সরকাব, লিটল্ থিয়েটার গ্রুপ প্রযোজিত তীর, অভিনয় দর্পণ,.....

২২। স্বপন নন্দী, প্রতিযোগিতা মঞ্চের রাজনৈতিক নাটক, নাট্যপ্রসঙ্গ, ডিসেম্বর, ১৯৭৭

২৩। তদেব

২৪। তদেব

২৫। নাট্যপ্রসঙ্গ, ডিসেম্বর, ১৯৭৭

২৬। সমীরণ চৌধুরী, সাতষট্টির পরের বিপ্লবী ও তার দায়দায়িত্ব, স্পন্দন, দ্বিতীয় সঙ্কলন, ১৯৭৩

২৭। দেশব্রতী, শারদীয় সংখ্যা ১৩৭৪

২৮। দেশব্রতী, শারদীয়, ১৯৬৫

২৯। দশ বছরের গল্প কবিতা, সম্পাদনা দীপঙ্কর চক্রবর্তী, অনীক, মুর্শিদাবাদ

৩০। তদেব

৩১। দেশব্রতী, শারদীয়, ১৩৭৪

৩২। দশ বছরেব গল্প কবিতা

৩৩। নান্দীমুখ, বর্ষ চোদ্দ, সংখ্যা দুই, মে ১৯৭৪

৩৪। দশ বছরের গল্প কবিতা

৩৫। তদেব

৩৬। সমীব রায়, সাম্প্রতিক কবিতায় নতুন জোয়ার, স্পন্দন, জুন ১৯৭৫

৩৭। আমাদের বক্তব্য, ব্যারিকেডের কবিতা, সীমান্ত, সাহিত্য পরিষদ

৩৮। দশ বছরের গল্প কবিতা

৩৯। তদেব

তৃতীয় অধ্যায়

এক।

এদেশে অদ্যাবধি অব্যাহত সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ব্যবস্থার একটি রেখাচিত্র প্রথম অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে। নকশালবাদী আন্দোলনের (সি. পি. আই-এম. এল) কর্মসূচী ও বক্তব্যে যদিও শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকার বিষয় উল্লেখিত হয়েছে, তথাপি অনস্বীকার্য যে কৃষি-বিপ্লবের মূল আদর্শে তাঁরা ছিলেন অবিচল ও অঙ্গীকারবদ্ধ। চারু মজুমদার তো স্পষ্টত বলেছিলেন যে, 'ভারতবর্ষে আধা সামন্ততান্ত্রিক ও আধা ঔপনিবেশিক সমাজব্যবস্থা রয়েছে। কাজেই এদেশের গণতান্ত্রিক বিপ্লব মানে কৃষি বিপ্লব। ভারতবর্ষের সমস্ত সমস্যা জড়িত রয়েছে এই কাজের ওপর।'(১)

স্বাধীনতা প্রাপ্তির এত বছর পরেও কৃষি-সংকট ঘোচেনি, বরং আরো গভীর হয়েছে। মধ্যস্বত্ব ও জমিদারী বিলোপ, খাজনা নির্দিষ্টকরণ, জমির সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেওয়া, উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীন ও দরিদ্র চাষীদের মধ্যে বণ্টন, সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা, কৃষিঋণ কাঠামোর সংস্কার, সমবায় খামার গঠন ইত্যাদি কৃষিকে পুনরুজ্জীবিত করবার আইনী ব্যবস্থাগুলি ভারতের কৃষি-কাঠামোর কোন মৌলিক সংস্কার ঘটাতে পারেনি; কৃষকের ভাগ্য পরিবর্তনে এদের ভূমিকা নিতান্তই নগণ্য বলে পরিগণিত হয়েছে। আর সেই সঙ্গে সংকট তীব্রতর আকার ধারণ করেছে। জমির জন্যে ক্ষুধা বেড়েছে। ভূস্বামী মহাজন, জোতদার প্রমুখেরা একযোগে কৃষি সংস্কারের প্রতিটি প্রয়াসকে প্রহসনে পরিণত করেছে। ভারতের ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র-কাঠামোর কর্ণধারেরা কৃষিক্ষেত্রে ধনতান্ত্রিক বিকাশের পথকে খর্বিত করার সঙ্গে সঙ্গে কোন কোন রাজ্যে আধাসামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের নাগপাশ কঠিনতর করার সুযোগ করে দিয়েছেন। পশ্চিমবাংলা, অন্ধ্র, ওড়িশা, বিহার, উত্তরপ্রদেশে শস্য খাজনা ও শ্রম খাজনা ব্যবস্থা শক্তিশালী হয়েছে। এমন কি সবুজ বিপ্লবের পীঠস্থান পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় দেখা গেছে যে ছোট চাষী, লীজ নেওয়া চাষী, কিংবা প্রজা চাষীর অর্থনৈতিক দুরবস্থা চরমে উঠেছে। জমির ওপর জনসংখ্যার চাপ প্রচণ্ড গতিতে বৃদ্ধি পাওয়ায় জমির মূল্য বেড়েছে আর বেড়েছে খাজনার পরিমাণ। বিকল্প কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা নেই কেননা শিল্পবিকাশের

হার খুবই মন্থর, ফলে ভূমিহীন চাষী ও দরিদ্রচাষী প্রাক্ ধনবাদী আর্থনীতিক বাধ্যবাধকতা এবং ধনবাদী শোষণ, এই দ্বিবিধ শোষণের জাঁতাকলে পিষ্ট হতে বাধ্য হচ্ছে। বর্গাহীন উচ্ছেদ কৃষি কাঠামোয় যে শ্রেণীবিন্যাস সাধন করেছে তা উৎপাদনের ক্ষেত্রে সুফলপ্রদায়ী হবে কি না, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। বিনাশ্রমে, বিনাতদারকীতে বিনা মূলধন নিযুক্তিতে মোট উৎপন্নের অর্ধাংশ বা আরো বেশি যদি লভ্য হয়, তবে জমিতে বার্ষিক সীজপ্রথা, ভাগচাষ প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়াই স্বাভাবিক। জমির মালিক জোতদার মহাজনদের পক্ষেও স্বয়ং চাষ করার চাইতে শস্য ঋণ দেওয়া, ঋণের দায়ে কৃষককে বেঁধে পরে শ্রম খাজনা আদায় করা অনেক বেশি লোভনীয় হয়ে উঠেছে। এভাবে আইনের ছিদ্রপথে অ-আর্থনীতিক বাধ্যবাধকতার চাপ কৃষককে সহ্য করতে হচ্ছে এবং কৃষিক্ষেত্রে আধা সামন্ততান্ত্রিক শোষণ-সম্পর্ক অব্যাহতই থেকে যাচ্ছে। মহাশ্বেতা দেবীর 'অপাবেশন? বসাই টুডু' (২) উপন্যাসের একজায়গায় সৎ ও বিবেকী জেলা হাকিম ও বি. ডি. ও-র পরাজিত মন্তব্য, 'জমি জোতদারের হাতে। জোতদারেরা সেচ-উদ্দেশ্যে জল নিতে নারাজ। ভাগচাষী ও আধিয়ার বেশি ধান ফলিয়ে বেশি ধান পাক, তাতে জোতদারের স্বার্থ চোট খায়। কম ধান চাষ হলে ভাগচাষী খেতমজুর সবাই ফাঁপরে পড়ে। জোতদার যে, মহাজন সে। মানুষ তাদের কাছে টাকা ও ধান কর্জ নেয়। চক্রবৃদ্ধি সুদটি জোতদার মহাজনের লক্ষ্মী।'—সর্বাংশে সচেতন পাঠককে মূল সমস্যার দিকে দৃষ্টিপাতে বাধ্য করে।

১৯৬৯-এর ২৮ নভেম্বর দিল্লীতে মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেছিলেন, 'খুব একটা মৌলিক ধরনের ভূমিবণ্টন জোর করে চাপিয়ে দেওয়া আমাদের অভিপ্রেত নয়। আমাদের লক্ষ্য আরো নিচুতে। প্রজারা ও ভাগচাষীরা যাতে একেবারে সর্বনাশের কিনারায় না যায় আমরা শুধু এইটুকু করতে চাই।' এই 'ভূমিসংস্কারের' কাজে অগ্রাধিকারের যে তালিকা দিয়েছিলেন শ্রীমতী গান্ধী তাতে প্রথমে স্থান পেয়েছিল প্রজাস্বত্বের রেকর্ড, দ্বিতীয়ত, মেয়াদের নিরাপত্তা, তৃতীয়ত, খাজনা নিয়ন্ত্রণ, তারপর জমির সিলিং আরো সৎভাবে কার্যকর করা এবং জোত একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাকাপাকি করা। (৩) অর্থাৎ সামন্ততান্ত্রিক শোষণব্যবস্থা, যাতে কৃষকের উৎপন্ন শস্যের ৯০ শতাংশ খাজনা সুদ হিসেবে জোতদার নিয়ে নিচ্ছে, তা আগের মতই অক্ষুণ্ণ থাকে। একারণেই মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলন সিদ্ধান্তে পৌঁছে যায় যে 'ভূমিসংস্কার সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন ইতিমধ্যেই কমবেশি প্রায় সমস্ত রাজ্যেই সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আসল ফাঁক থেকে

গেছে আইন কার্যকরী করার ব্যাপারে।' (৪) এই সম্মেলনেই তদানীন্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চ্যবন বলেছিলেন যে, সবুজ বিপ্লব যদি সামাজিক সুবিচারের ভিত্তিতে না হয়, তাহলে সবুজ বিপ্লব আর সবুজ থাকবে না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ক্ষেতমজুর ও ভাগচাষীদের (একত্রে যারা কৃষক শ্রেণীর ৭৫ শতাংশ) বিরাট অংশের কথা, অর্থাৎ আইনসম্মত প্রাপ্য থেকেও যারা বঞ্চিত, এই মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে আলোচিতও হয়নি। অন্যপক্ষে জমিদার ও ধনী কৃষকদের রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রভাব এতই বেশি যে নির্বাচনের সময়ে যেহেতু তাদের সমর্থনলাভের প্রয়োজন উপেক্ষা করা মুখ্যমন্ত্রীদের পক্ষে সম্ভব হবে না, সেহেতু আলোচনায় তাদের স্বার্থরক্ষাই প্রাধান্য পায়। (৫)

এদিকে পশ্চিমবাংলার প্রগতিশীল সরকারের প্রস্তাবিত ভূমিসংস্কারের কার্যসূচীতেও ক্ষেতমজুর ভাগচাষীদের দাবী বা অধিকার স্বীকৃতি পায়নি। 'সাংবাদিক' লিখেছেন, হরেকেষ্ট কোনার বলেছে সে একটা বিল পাশ করাবে যাতে থাকবে, (১) পরিবার ভিত্তিতে ২৫ একর জমির সিলিং (২) জমির নতুন মালিকদের বংশগত অধিকার (৩) কৃষক কমিটি স্থাপন, যারা আমলাদের সঙ্গে যুক্ত থাকবে (৪) আপীল শোনার জন্য জেলা ও রাজ্যস্তরে জমির ট্রাইবুনাল। আমূল ভূমিসংস্কারের কী ভীষণ কর্মসূচী একবার দেখুন। বলা বাহুল্য, এতে সামন্ত শোষণ ব্যবস্থার গায়ে একটি আঁচড়ও লাগবে না। অথচ এই নিয়ে একটা হৈহল্লা তুলে কৃষকের দৃষ্টি ক্ষমতা দখলের দিক থেকে জমির দিকে ফিরিয়ে আনা যাবে...। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী জগজীবনরাম পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীদের কাছে এক চিঠিতে লিখেছিল, পশ্চিমবঙ্গে কৃষিতে বর্গাদারী ব্যবস্থা অবিলম্বে বিলোপ করা হোক, সমস্ত বর্গাদারদের প্রজা বলে বর্ণনা করা হোক এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন করা হোক। 'স্টেটসম্যানের' বিশেষ সংবাদদাতা লিখেছে, "পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একজন মুখপাত্র বলেছেন যে যদিও এ সামন্তবাদী কাঠামোরই অংশ তথাপি সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে এ আরও কিছুকাল থাকবে। এক্ষুনি এ তুলে দেওয়া সম্ভবও নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়।" (স্টেটসম্যান, ২৮শে নভেম্বর, ৬৯) (৬) কার্যত নকশালবাড়ি আন্দোলনের সময়কালের ভূমিসংস্কারের কার্যকরী চেহারাটা আজও একইভাবে পশ্চিমবাংলায় ও ভারতবর্ষে বিদ্যমান। এই ১৯৭১ সালেও পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকারের বর্গাদার রেকর্ডের প্রয়াস কিভাবে কোর্টের ইনজাংশনে বন্ধ হয়ে যায় ও জোতদারদের সামন্তশোষণ ব্যবস্থা বজায় রাখার প্রচেষ্টা প্রচলিত আইনে স্বীকৃতি পায়, তা বুঝতর

জনসাধারণের অবিদিত নয়। অবশ্য এর ফলে মূল সমস্যার কিছুমাত্র সমাধান হয়ও নি, হবেও না। এবং পশ্চিমবাংলা ও ভারতবর্ষের রাজনীতি যেহেতু এখনো সাংবিধানিক ও ভোটের বৃহদংশ লাভই যেখানে মুখ্য সত্য, সেখানে জোতদার বা তার স্বার্থকে কিছুতেই ক্ষুণ্ণ হতে দেওয়া চলে না। সেহেতুই এতাবৎকালের কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত কৃষাণ আন্দোলনে ছোট কৃষক ও ক্ষেতমজুরেরা কার্যত অবহেলিতই থেকে গেছে। তদুপরি উল্লেখ্য, 'ছোট কৃষক" কথাটাও ক্রমে অবাস্তব হয়ে উঠছে, কারণ বীজধান, সার, জল ইত্যাদির প্রয়োজনে তাকে একমাত্র জোতদারের ওপরই নির্ভর করতে হয়েছে এবং এর পরিণামে মিথ্যা দেনার দায়ে একদিন নিজের সামান্য জমিটুকু খুইয়ে তাকেও ক্ষেতমজুরে পরিণত হতে হচ্ছে। কৃষকশ্রেণীর এই সংখ্যাগুরু অংশ প্রসঙ্গে সত্যেন সেন লিখেছেন, 'দেশের স্বাধীনতার জন্য যারা একদিন মুক্তি সংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন, এই সমস্ত হতভাগ্য আধিয়ার চাষীদের দুঃখ লাঞ্ছনা তাঁদের মনে কোন দাগ কাটতে পারেনি। দেশের নেতারা যে সমস্ত দাবি-দাওয়ার ফিরিস্তি দিতেন, এখানকার এই চিরবঞ্চিত নিঃস্ব মানুষগুলির বাঁচার দাবি তাদের মধ্যে স্থান পেত না। স্বাধীনতা লাভের পর দীর্ঘ সতেরো বছর কেটে গেল, আজও আমাদের দেশের সরকার, দেশের নেতা বা দেশের মানুষ এই সমস্ত হতভাগ্য আধিয়ার চাষীদের কথা নিয়ে মাথা ঘামায় না। একথা সত্য, অতি বড় নির্মম সত্য।' (৭) শ্রীযুক্ত সেনের বক্তব্য মুখ্যত রংপুরের আধিয়ার চাষীদের বিষয়ে হলেও, কথাটা সমগ্র পশ্চিমবাংলার ক্ষেতমজুরদের সম্পর্কেও সমভাবে প্রযোজ্য। কৃষাণ সভার ইতিহাস প্রণেতা রসুল সাহেবও লিখেছেন, 'ক্ষেতমজুরদের বিশেষ দাবি নিয়ে প্রয়োজনীয় আন্দোলন ও সংগঠন করা হয়নি, তার কারণ মনে হয় কৃষক সভার নেতৃত্ব ও কর্মীদের নীতিগত দুর্বলতা, ক্ষেতমজুরদের শ্রেণীস্বার্থের গুরুত্বকে স্বীকৃতি দিতে তাদের মানসিক ও সামাজিক প্রতিরোধ।' (৮)

এই মূল সমস্যার দিকে খোলা চোখে তাকালে সহজেই বোঝা যায়, কেন ১৯৬৭-তে নকশালবাড়িতে আগুন জ্বলে, কেন নতুন এক কম্যুনিস্ট পার্টির জন্ম হয়, কেন ডেবরা-গোপীবল্লভপুর ও বীরভূমে জোতদার খতম হয় অথবা শহরাঞ্চলে কেন কয়েকশ সৎ ও নিষ্ঠাবান রাজনৈতিক কর্মী প্রাণ হারায়। মহাশ্বেতা দেবীর ক্ষেতমজুর নায়ক বসাই টুডু তো স্পষ্টতই বলে, 'ক্ষেতমজুর আমি। ভেবে দেখলম, চৌচাল্লিশ বয়স হলু, আমু খেতমজুর রইলম। অ্যানেক মিটিং করলম, কনকারেন্সে গেলম কিন্তুক খেতমজুরের আসান দেখলম না। ছত্তিশ সালে কিষাণসভা হলু। তখুন হতে আজও বুঝলম না, খেতমজুর হলো

কিষাণসভা মদত দিবে না কেনী? চৌষট সালে পার্টি ভাগ হল্। ভাগ হক, সভে কম্‌নিস। কম্‌নিসের কিষাণ ফরণ্ট অবধি স্বীকার গেল না, ক্ষেতমজুরও কিষাণ। শুনাছি, গোকুলবাবুর কাছ শুনাছি, আটত্রিশ সালে কুমিল্লা সভায় স্বামী সহজানন্দ বলাছিল, ক্ষেতমজুর আন্দোলনও কিষাণসভার আন্দোলন। ছোট কিষাণ কিষাণসভার জান। আজ যি ছোট কিষাণ কাল সি মহাজনরে জমি দিয়া ক্ষেতমজুর হয়।...কিন্তু খেতমজুরের হক্ কম্‌নিস কিষাণ ফরণ্ট দেখল নাই। কেনী কালীবাবু? কেনী? কমনিস কিষাণসভা যাদের লিয়ে্য, তারা মধ্যম চাষী, লয়? তারাও খেতমজুর লাগায়, লয়? তারাদের হক্ চোট খায়, লয়? আর কমনিস দল যা বুঝে, ভোট—হ্যাঁ ভোট! মধ্যম চাষী ভোট কণ্টোল করে লয়? তবে বুঝ বসাই ঘাস খায় না, ধানের ভাত খায়—তাথে আমু ভেবে লিছু, কম্‌নিস্ হয়্যে কাম করথে পারি। তুমাদের কম্‌রেট বলথে পারি, কিন্তু যখন আমু ক্ষেতমজুর, তখন তুমরাও মোক্ লাথ মারবু। ভুখা মানুষ লয়্যে ই খেলা ভাল খেল নাই হে।' (৯)

এই ছোট কিষাণ বা ভাগচাষী ও ক্ষেতমজুরের সমস্যা কৃষিক্ষেত্রে অবশ্যই এক নয়। ভাগচাষীর প্রয়োজন চাষের যন্ত্রপাতি, বীজধান, জল ইত্যাদি। ক্ষেতমজুরের দাবী মিনিমাম ওয়েজ বা ন্যূনতম মজুরির। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যদিও উভয়ের সংগ্রাম শেষপর্যন্ত একই আন্দোলনের অংশভাগ হয়, তথাপি অনস্বীকার্য যে উভয়ের প্রয়োজনভিত্তিক দাবী ভিন্নপ্রকার। মহাশ্বেতা দেবীর গল্প-উপন্যাসে ভাগচাষীর এই জলের সমস্যা, বিচনের সমস্যা ও ক্ষেতমজুরের ন্যূনতম মজুরির প্রশ্ন বারংবার আসে আর যার পরিণামে সে-কাহিনীগুলির চরিত্রেরা জোতদার বা তার সহযোগী প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের 'খতম' করে। তাঁর লেখায় এই 'খতম' বা 'আগুন' কার্যত বহুলাংশে প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়, যা শেষপর্যন্ত এক বৃহত্তর জনযুদ্ধেরই দিক্‌নির্দেশক। এইসঙ্গে তিনি মূল সমস্যা ধরে যত বেশি নাড়া দেন বা সমস্যার গভীরে প্রবেশ করেন, তা বাংলা সাহিত্যে এতাবৎকাল যথার্থ অর্থে অনুপস্থিতই ছিল। এমনকি 'শিকার' (১০) গল্পে মেরী যখন তহশীলদারকে খুন করে, তখনো তা নিতান্ত ব্যক্তিগত থাকে না, বৃহত্তর শ্রেণীঘৃণার প্রকাশে তা সামাজিক প্রেক্ষাপট পায়।

ভাগচাষীর সমস্যা প্রসঙ্গে পূর্বেই জল ও বীজধানের কথা বলা হয়েছে। এ-দুটি ভাগচাষী ও জোতদার উভয়ের কাছেই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এর অভাবে প্রথমজন ক্ষেতে ফসল ফলাতে পারে না ও সারাবছর উপোসী থাকে আর এটিকে নিজের কুক্ষিগত রেখে দ্বিতীয়জন চাষীকে আজীবন ও বংশপরম্পরায় ভূমিদাস বা

বেঠবেগারে (বণ্ডেড লেবার) পরিণত করে। মহাশ্বেতা দেবীর 'জল' (১১) গল্পটির বাকুলি গ্রামের 'লক্ষণ সামন্ত সবটুকু ভূমির মালিক। গ্রামের আঠারোটি পরিবার লক্ষ্মণের ভাগচাষী।' সে বছর খরা চলছিল। ক্যানালের জল এনে চাষ করার সামর্থ্য থাকে না ভাগচাষীর। তাছাড়া কারো টানা তিন বিঘে জমি পর্যন্ত ভাগে নেই। এ-জল একমাত্র আনতে পারে লক্ষ্মণ সামন্ত। আর সে-কথা বলতে গিয়ে কৃষক নেতা গোকুল দাস পুলিশ কর্তৃক ধৃত ও নিহত হয়। এই জল-প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করে লক্ষ্মণের ছেলে শরদিন্দু পুলিশ অফিসারকে বলে, 'বাবা বলেছিল, ক্যানালের জল এনে বান ভাসাতে পারি। কিন্তু জলে আমার দরকার কি ? ইঁদারা আমার। চাষের জন্যে টিপকল সরকার আমারে দেখে দিয়েছে। আমার ঘরে কল বসাছি। জল ! জল দিয়ে কি হবে ? ধান হবে ? ধান দেখাস না শরৎ। ধান বেচে কত পাব ? বিশ হাজার টাকা ? জল নিব না। ধান বাড়াব না। দেখবি এ বছবই তোর সামনে বসে পঁচিশ হাজার টাকা দশটা গ্রামে ধার দিব। ধার দিব, সুদ নিব। এই সুদ হতে সকল সম্পত্তি করেছি। ক্যানালে জল আছে সে মোর অজানা ?' জোতদারের সুপারিশে ভাগচাষী যে বীজধান, সার ও হাল বলদ কেনার টাকা পায়, তাও আসলে চাষীর ওপর আর একটা বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। কারণ বীজ বোনা ও ফসল ওঠার দীর্ঘ সময়কালে চাষীর ঘরে কোন খাবার না থাকায়, চাষীকে বীজধান খেয়ে বাঁচতে হয়। আর বীজধান না থাকায় সার কোন কাজেই লাগে না। হাল-বলদ কেনার টাকা যেহেতু সরকার থেকে কিস্তিতে দেওয়া হয়, সেকারণেই তা সমান অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। মহাশ্বেতা দেবীর 'বিছন' (১২) গল্পে এর বাস্তব চিত্রণ নিম্নপ্রকার :

'লছমন সিং লেখাপড়ায় মহাপণ্ডিত। উকিল দুলনের হাল বলদ কেনার দফা-দফা ঋণ, সার ও বিছন পাবার ন্যায্যতা বিষয়ে কায়েথি হিন্দিতে অত্যন্ত জবরদস্ত এক আর্জি লিখে দিল। বি. ডি. ও তোহরিতে থাকতে পারেন,— তোহরি, লছমনের গ্রাম তামাডি থেকে দূরেও বটে, কিন্তু তাঁর ধড়ে মাথা একটি। লছমনের সঙ্গে ও হনুমান মিশ্রের সঙ্গে কোন ঠোকাঠুকি না করতে তাঁকে বলেছেন স্বয়ং এস. ডি ও।

তখনি তিনি মেনে নিলেন সব। নেংটি পরা দুলনকে অত্যন্ত নরম গলায় বোঝালেন, বিছন দুলন পাবে, সারও পাবে। হাল-বলদের টাকা একবারে পাবে না। খানিক টাকা বায়না করে হাল-বলদ এনে দেখাতে পারলে বাকি টাকা পাবে।

দুলন গ্রামে এসে পহানকে বলল, সরকার কানুন করে. কিন্তু বুঝে না কিছু।

হাল-বলদ লোকে টাকা দিয়ে কেনে। দফায় দফায় টাকা নিয়ে বেচে কে? তোমার হাল-বলদ দাও।

সেই হাল-বলদ দেখিয়ে তুলন টাকা নিয়েছে। এক বছর অন্তর-অন্তর। যে বার টাকা নেয়, সেবারই বলে, মরে গেল হুজুর।

টাকা নেয়। সার নিয়ে জোহরিতেই বেচে দিয়ে আসে। বিছনের বোঝা কাঁধে বয়ে আনে।

বিছন ও খায়।

বিছনের ধান সিজিয়ে চাল করা চারটিখানি কথা নয়। তাই করে ও। প্রথমবারই বউ বলেছিল, এত বিছন। কত জমি তোমার?

সে জমি মাপলে মাপা যায় না।

সে কি?

আমাদের পেট। খিদের কি মাপ হয়? পেটের জমিন বাড়তে থাকে!

অন্যপক্ষে ক্ষেতমজুরদের জন্যে ১৯৭৬ সালের এপ্রিলের অ্যাক্ট অনুযায়ী ন্যূনতম দৈনিক মজুরি হয় ৮·১০ পয়সা কিন্তু পশ্চিমবাংলার কোথাও ক্ষেতমজুর সে হিসেবে দিন মজুরি পায় না। এই অ্যাক্ট কার্যকর না হবার যে কারণগুলি নির্দেশ করেছেন মৈত্রেয় ঘটক, (১৩) তার মধ্যে আছে প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা, রাজনৈতিক দল ও কৃষক সংগঠনগুলির দাবী আদায়ের সপক্ষে আন্দোলন গড়ে না তুলতে পারার অক্ষমতা। মহাশ্বেতা দেবীর 'এম ডব্ল্যু. বনাম লখিন্দ' (১৪) গল্পের নায়ক একারণে কেবলমাত্র স্বপ্নে এম. ডব্লু (ন্যূনতম মজুরী) পায় আর লখিন্দ ও বসাই টুরা এখনো সরকারী আইনকে কার্যকর করার আন্দোলন গড়ে তুলতে গিয়ে জোতদারদের ভাড়াটে গুণ্ডার হাতে নিহত হয়; পুলিশ আসে কেবল তাদের লাশ তুলে নিয়ে সদরে পাঠাবার জন্যে।

এই ক্ষেতমজুর ও বণ্ডেড লেবার বা বেঠবেগারদের কাজের সমস্যা, ন্যায্য মজুরি না পাবার সমস্যা, তাদের ওপর জোতদারদের শোষণ অত্যাচারের প্রকৃত রূপ এবং পরিণামে তাদের বিক্ষোভ ও লড়াইয়ের বাস্তব চিত্রণ মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাস ও গল্পে উপস্থাপিত হয়, যা সর্বাংশে সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষণেরই তুল্য। এদেশীয় কৃষি-সমস্যার আলোচনায় বারংবার তাঁর রচনা উদ্ধৃত করা ছাড়া উপায় নেই। ক্ষেতমজুর ও বেঠবেগারেরা যেহেতু পশ্চিমবাংলার নকশালবাড়ি-ডেবরা-গোপীবল্লভপুর সিউড়ি রামপুরহাটের নকশালবাদী আন্দোলনের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশভাগ, সেহেতু এদের সমস্যা ও সংগ্রামের প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা কর্তব্য।।

স্থাশনাল লেবার ইনষ্টিটিউটের একটি সমীক্ষা (১৫) থেকে নিয়ে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হোল ; বিহারের ক্ষেতমজুর ও বেঠবেগারদের জীবনযাত্রার সমস্যা ও স্বরূপ এখানে স্পষ্টত প্রকটিত হয়েছে। তদুপরি উল্লেখ্য যে এই চেহারা সামান্য হেরফেরে সমস্ত ভারতে প্রায় একই।

'(ক) গ্রাম : "ধীবর"—এই গ্রামের কৃষি মজুরদের কাজ পাওয়া একটি বড় সমস্যা। কাজ পাওয়া গেলেও মজুরি অত্যন্ত কম। সারাদিন কাজের জন্যে পঞ্চাশ পয়সা। সকাল ৭টা থেকে ১২টা এবং ২টা থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কাজ করতে হয়। উপরন্তু এই মজুরিও মালিকেরা ঠিক সময়ে দেন না। তিন চার বৎসর পূর্বে ঐ গ্রামে কৃষি মজুরেরা ন্যূনতম হারের জন্য হরতাল করেছিল। কিন্তু তাদের সেই হরতাল সফল হয় না। হরতালের সময় মালিকরা সংঘবদ্ধভাবে আশে পাশের অঞ্চল থেকে মজুর এনে নিজেদের কাজ করিয়ে নেয় এবং হরতাল ভেঙে দেয়। এর পর থেকে মালিকেরা মজুরদের বাধ্য করে পূর্বের ঐ মজুরিতে কাজ করার জন্য।

(খ) গ্রাম : 'সাভিয়াম'—এই গ্রামের শতকরা নব্বইজন লোক কৃষিমজুর, বাকি দশজন লোক জমির মালিক। ঐ গ্রামের কৃষি মজুরদের কেউ কেউ মালিকদের বাঁধা শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন। তারা মালিকের নিকট থেকে দশ কাঠা (আনুমানিক .৬ ডেসিমল জমি পায় চাষ করার জন্য। ঐ জমির প্রধান উৎপন্ন ফসল ধান, গম প্রভৃতি দানা শস্য সম্পূর্ণটাই মালিককে দিতে হয়। শ্রমিক শুধু পায় সব্জি বা ঐ জাতীয় ফসল। ঐসব বাঁধা মজুরদেরকে নিকৃষ্ট শ্রেণীর জমি দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে তারা নিজেদের শ্রমের দ্বারা সেই জমির উন্নতিসাধন করলে মালিক ঐ জমিটিকে পুনরায় ফেরত নিয়ে নেয়। বঞ্চনার এক অদ্ভুত কায়দা এমনিভাবেই চলে আসছে ঐ গ্রামের কোন মজুর এখনও পর্যন্ত ন্যূনতম মজুরি পায় না। ১৯৭৬ সনে তারা এই জন্য হরতালের ডাক পর্যন্ত দেন। মালিকশ্রেণী ঐ সময় সংঘবদ্ধভাবে হরতালী শ্রমিকদের উপর গুলিবর্ষণ করে। উক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মহকুমা শাসক যখন বিষয়টির কারণ অনুসন্ধান করেন— দেখা যায় এই হরতালের পেছনে বহু দাসমজুরদের পুঞ্জীভূত বিক্ষোভও কাজ করছে। তিনি তখন সরকারী আইনের সাহায্যে স্থানীয় পঁচাত্তর জন দাসমজুরকে মুক্ত করেন। কিন্তু বক্তব্যে প্রকাশ যে ঐ গ্রামে বেশ কিছু দাসমজুর এখনও বর্তমান এবং নতুন করে ঋণ নেওয়ার জন্য আরও কিছু নতুন দাসমজুর সৃষ্ট হয়েছে।

(গ) গ্রাম : "গুয়ারামপুর"—গত ১৯৭৬ সনের জুন-জুলাই মাসে এই গ্রামে

ন্যূনতম মজুরির জন্য আন্দোলন হয়। এবং ঐ সময় বাড়ের মহকুমা শাসক গিয়ে তাদের গ্রামে ন্যূনতম মজুরির ব্যবস্থা করেন। জমির মালিকরা ঐ বছর ধান কাটার সময় যদিও ন্যূনতম মজুরি দিয়ে দেন, কিন্তু পরবর্তীকালে তারা তা দিতে অস্বীকার করে এবং পুনরায় বিরোধ দেখা দেয়। বেশ কিছু মজুর যারা তাদের ন্যূনতম মজুরির দাবীতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হন, মালিকশ্রেণী তাদের উপর শুরু করে নানান অত্যাচার ও উৎপীড়ন। মিথ্য মামলা দায়ের করা থেকে শুরু করে মাঠে গরু ছাগল চরতে বাধা দেওয়া, ঘরের বাইরে বেরোবার রাস্তা বন্ধ করা এমনকি মালিকদের মাঠে প্রাতঃকৃত্য বা অন্যান্য কোন জৈবিক কারণে যাওয়াকে বন্ধ করা ইত্যাদি নানাভাবে তাদের সামাজিক জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলা হয়। সামন্ততান্ত্রিক অবশিষ্টের উৎকট নিপীড়ন এই গ্রামে আজও বর্তমান।

(ঘ) গ্রাম: "মারাচী"—এই গ্রামের বেশির ভাগ মজুরই "দাসমজুর" হিসাবে মালিকের নিকট কাজ করতে বাধ্য আছেন। ঋণ করলে তার জন্যে ১৫০ থেকে হইতে ২০০ শতকরা সুদ দিতে হয়, এবং ঐ গ্রামে মালিকদের প্রতাপ ও দাপট এমন উগ্র যে তারা ঐ গ্রামস্থ মজুরদের অন্য গ্রামে কাজ করতে দেয় না। এবং নিম্ন মজুরিতে নিজেদের গ্রামের মধ্যে কাজ করতে বাধ্য করে। এরই অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে তারা ঋণ করতে বাধ্য হয় এবং ক্রমশ দাসমজুরে পরিণত হয়। শোষণের এই চেহারা এই অঞ্চলের অনেক স্থানেই'বর্তমান।

(ঙ) গ্রাম: "বামপুরডুংরা"—প্রতিনিধি দুটি উদাহরণের মাধ্যমে দাস-মজুরদের অবস্থার ব্যাখ্যা করেন: (১) একজন মজুর তার মালিকের নিকট থেকে দুই মন শস্য ঋণ কবেন এবং ঐ ঋণ শোধ করার জন্য তিনি সারাজীবন মালিকের দাসমজুর হিসাবে কাজ কবতে বাধ্য হন। (২) আর একজন মজুরের পিতামহ তার মালিকের নিকট থেকে সতের সের বার্লি ঋণ করেন। ঐ ঋণ শোধ করার জন্য তার পিতামহ, পিতা সারাজীবন দাসমজুর হিসাবে কাজ করেন, বর্তমান মজুরও তিন বৎসর যাবৎ দাসমজুর হিসাবে কাজ করে চলেছেন। এযাবৎ তারা মালিককে ২৬০০ টাকা শোধ দিয়েছেন। কিন্তু মালিকেব দাবী এখনও তাদের ঋণ ৩০০০ টাকা।'

যে প্রয়োজনগুলি থেকে ঋণগ্রস্ত হয়ে কৃষি মজুরেরা দাসমজুরে পরিণত হয় তার মধ্যে প্রাত্যহিক খাদ্যের প্রয়োজন মেটানো ছাড়াও আছে মজুরের ছেলে-মেয়ের বিয়ের জন্যে ঋণ, পূজা-পার্বণ ও সে-উপলক্ষে মানসিক শোধ দেবাব জন্যে ঋণ, সামাজিকতা রক্ষার জন্যে ঋণ ইত্যাদি। (১৬) প্রাগুক্ত সমীক্ষাগুলিতেই দেখান হয়েছে যে একবার এভাবে ঋণগ্রস্ত হলে, সে ঋণভার শ্রমিককে বংশপরম্পরায়

বয়ে চলতে হয়। মহাশ্বেতা দেবীর গল্পে বেঠবেগারদের এই ঋণভারগ্রস্ত জীবনযাপন ও তাদের ওপর জোতদার-মহাজনদের শোষণ ও অত্যাচারের ছবি বারংবার এসেছে। তাঁর 'নুন' (১৭) গল্পের একটি অংশ : '...উত্তমচাঁদের কাছে গ্রামটি বেঠবেগারির ডাণ্ডাবেড়িতে বাঁধা। কয়েক পুরুষ ধরে। পূর্বপুরুষের অলিখিত ঋণ শোধ করতে এরা বছর বছর ফসলের সময়ে উত্তমচাঁদের গ্রাম টাহাড়ে চলে যায় বারো মাইল হেঁটে এবং পেট-খোরাকি ও সামান্ত ফসলের বিনিময়ে বেগারি দিয়ে আসে। যে ফসল পায়, তাও যোগ হয় ঋণের খাতায়। বেঠবেগারি বে-আইনি, এ-কথাও তারা জানত না। জেনেছিল বটে আদিবাসী দপ্তরের ইন্‌স্পেক্টরের সৌজন্যে। জেনেও ওরা বেঠবেগারি দেওয়া বন্ধ করেনি। কেননা, বেঠবেগারি আদায়কারী উত্তমচাঁদের বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ করা ওদের দ্বারা হবার নয়, তা ওরা জানত। এরপর রাজনৈতিক দলের কর্মীরা গ্রামে এসে তাদের বেঠবেগারি দেওয়া বন্ধ করে ও উত্তমচাঁদ তাদের অর্ধেক ফসল দিতে বাধ্য থাকবে, এই মর্মে চুক্তি করে যায়। এর প্রতিশোধ নিতে উত্তমচাঁদও বেঠবেগারদেব কাছে নুন বিক্রি বন্ধ করে ; গ্রামের একমাত্র দোকানটিও ছিল তার।

'এম. ডব্ল্যু. বনাম লখিন্দ' গল্পে কৃষি-মজুরদের নেতা বসাই টুরা এম. ডব্ল্যু. ইনস্‌পেক্টর ও জোতদার লস্করের মধ্যে চুক্তি হয়, 'বাইরের দাওয়াল আসবে না। এরাই ধান কাটবে। আটষট্টি ও চুয়াত্তরের রেট হিসেবে যা হবে তার অর্ধেক হাতে নিয়ে তবে এবা ধান কাটবে। অর্ধেক পরের মৌসুমে দেওয়া হবে। এবার ছিয়াত্তরের রেটে এবা মজুরি পাবে। হিসাবটি বসাই, লস্কর, সুবোধ এক সঙ্গে তৈরি করবে। ঋণমজুরি আইন হবে।' কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দাওয়াল আসে। আসে লস্করের ভাড়াটে গুণ্ডারা, 'বর্তমানে তাদের হাতে টাকা, নামে ছাপ, জীপ চড়ে তারা সদরকে ত্রাসিত করে রাখে।' বসাই টুরা, লখিন্দরা তাদেব গুলিতে মরে। ইনস্‌পেক্টর সুবোধ আহত হয়ে পুলিসের গাড়িতে হাসপাতালে যায়। 'অপারেশন? বসাই টুডু'—উপন্যাসেও বসাই কালীকে বলেছিল, 'সাইত্রিশ লাখের বেশি খেতমজুব সরকারের ঘোষিত রেট পায় না...বল্য, সকল জোতদার এম. ডব্লু দিথে হবে খেতমজুরবে।...জোতদাররে কিছু বলথে পাব নাই। না কি তুমরা জোতদারের হক বেশি দেখ? আইন পাস করাও, চালু কর না?' এই ন্যূনতম মজুরির দাবীতে খেতমজুরেরা বহু ধর্মঘট ও আন্দোলন করেছে ও করছে। কিন্তু প্রশাসন ও সামন্ত ব্যবস্থার সমঝোতা এতই নিবিড় যে অদ্যাবধি খেতমজুরদের অবস্থার কিছুমাত্র উন্নতি হয় নি। পূর্বেই বলা হয়েছে যে পশ্চিমবাংলার কোন খেতমজুর ন্যূনতম মজুরি পায় না। 'মিনিমাম ওয়েজ

অ্যাক্টের ২০(২) ধারা অনুযায়ী কোন জোতদার এই আইনে দোষী সাব্যস্ত হলে ছ'মাস কারাদণ্ড, অথবা পাঁচশ টাকা জরিমানা অথবা দুইই ভোগ করবে। কিন্তু বিহারের একটি সমীক্ষাতে দেখা যায় জোতদারদের বিরুদ্ধে বহু কেস থাকা সত্ত্বেও, আজ পর্যন্ত কেউই এই সাজা পায়নি।(১৮)

সি পি. আই (এম-এল)-এর কর্মসূচী ও আন্দোলন উক্ত মৌল সমস্যার দিকে সর্বপ্রথম সামগ্রিকভাবে বৃহত্তর জনসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়। ১৯৭০ সালের মে মাসে উক্ত পার্টির কংগ্রেসে গৃহীত কর্মসূচীতে বলা হয়, 'ভূমিহীন ও দরিদ্র কৃষকেরা সারা বছর যতটুকু ফসল তোলে তার শতকরা ৫০ থেকে ৯০ ভাগই খাজনা হিসেবে জমিদারদের দিয়ে দিতে হয়। এই রক্তচোষা মহাজনী পুঁজি কৃষকদের নিংড়ে নিঃস্পেষিত করে দিচ্ছে। কৃষককে উচ্ছেদ করাটা আজকের দিনের একটা প্রথায় দাঁড়িয়েছে; তপশীলী জাতিগুলির ওপর সামাজিক নিপীড়ন, হরিজনদের হত্যা করাও এর অঙ্গীভূত, যা আজও সমানভাবে চলেছে, যা মধ্যযুগীয় বর্বরতার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। একটি সমীক্ষাতে প্রকাশ যে, সি পি. আই (এম এল)-এর কয়েকটি গোষ্ঠীর নেতৃত্বে এখনো বিহারের গ্রামাঞ্চলে খেতমজুর ও বেঠবেগারদের আন্দোলন চলছে। কিন্তু বেশির ভাগ গ্রামেই স্থানীয় কৃষি মজুরদের নেতৃত্বে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলন গড়ে উঠছে। এই আন্দোলনের মুখ্য দাবী ন্যূনতম মজুরি। এই দাবী আদায়ের জন্যে কৃষি মজুরেরা ১৯৬৮ সালে ১,৫০০ অভিযোগ পেশ করে; ১৯৭৫-এ ১২,০০০ এবং তার পর থেকে বছরে গড়ে ২৫,০০০। ফলে বিহারের গ্রামাঞ্চলে হরিজন ও আদিবাসীদের (কৃষি মজুর ও বেঠবেগার হিসেবে এদেরই সংখ্যাধিক্য) ওপর উচ্চবর্ণের জোতদার-মহাজনদের নির্যাতন বেড়েই চলেছে। আর সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য যে এই আন্দোলনে ফসলের ভাগ, ঋণমকুব, ন্যূনতম মজুরি ইত্যাদির দাবী ও আন্দোলনে ছোট কৃষক, খেতমজুর ও বেঠবেগারেরা সম্মিলিত হতে পেরেছে।(১৯) সরকার কিভাবে জোতদারদের পক্ষাবলম্বন করছে বা মদত দিচ্ছে, তারও উদাহরণ মেলে উক্ত সমীক্ষণে। ব্লকে ব্লকে যে লেবার ইনসপেক্টরদের পাঠানো হচ্ছে, তাদের জন্যও নির্দেশ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে যেসব জোতদারদের ২৫ বিঘার কম জমি আছে বা ট্রাক্টর ইত্যাদির দ্বারা চাষ হয় না, তাদের বিরুদ্ধে যেন কোন ব্যবস্থা না নেওয়া হয়। এদিকে সরকারী মহলে ও এ-তথ্য অজানা নয় যে জোতদারেরা 'সিলিং-আইন' এড়াতে ইতিমধ্যেই তাদের জমি দেবতা, আত্মীয়স্বজন-পোষা কুকুর-গোরু ইত্যাদির নামে এমনভাবে বেনামী করে রেখেছে, যে আইনত সকলেই ২৫ বিঘার কম জমির অধিকারী।

১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে পশ্চিমবাংলায় যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় আসায়, মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির বিপ্লবী নেতা ও কর্মীরা (যাঁরা পরবর্তীকালে সি. পি আই. এম. এল.এ যোগ দেন) নতুন সরকারকে শ্রেণীসংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে গণ্য করে গ্রামের গরীব ও ভূমিহীন চাষীদের সামন্তবাদবিরোধী আন্দোলনের ডাক দেন। কানু সান্যালের নেতৃত্বে নকশালবাড়ি আন্দোলন সংগঠিত হয়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)-র ডেবরা থানা সংগঠনী কমিটির রিপোর্টে (২০) এ-সময়ের ভাগচাষী ও খেতমজুরদের মানসিক ভাব ও আন্দোলনের ধারা বিবৃত হয়েছে . '৬৭-সালের সাধারণ নির্বাচনের পর যুক্তফ্রন্ট যখন প্রথমবার ক্ষমতায় এল, মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির ভেতর বিপ্লবী কর্মীরা পার্টি নেতাদের যুক্তফ্রন্ট সরকারকে শ্রেণীসংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে ধরে গণসংগ্রাম বাড়ানোর আওয়াজকে সত্যিই এতদিনের প্রতীক্ষিত লড়াইয়ের ডাক হিসেবেই ধরলেন। শুরু হল এলাকায় শ্রেণীসংগ্রামের জোয়ার। জায়গায় জায়গায় মজুতদার বিরোধী আন্দোলন দানা বেঁধে উঠতে লাগল। হাজার হাজার গরীব কৃষকের মিছিলের ভারে সারা থানাটা কাঁপতে লাগল। বালিচক, রাধামোহনপুর, মলিহাটি—বড় বড় হাটে কালো ব্যবসার ওপর সশস্ত্র মিছিলের হামলা হতে শুরু করল। আন্দোলন চরমে উঠল মজুরিবৃদ্ধির দাবীকে কেন্দ্র করে। সারা থানা জুড়ে শুরু হ'ল খেতমজুরের আন্দোলন। জোতদার ও ধনী কৃষকদের একগুঁয়েমিপনা, তাদের কঠোর মনোভাব ভূমিহীন কৃষকদের শ্রেণীচেতনা, শ্রেণীঘৃণা বাড়িয়ে দিল। কৃষক, একটা সময় এল, যখন আর মজুরি-বৃদ্ধির দাবীতে ক্ষান্ত রইল না। বলতে গেলে সারা জোতদার শ্রেণীর বিরুদ্ধে একটা এসপার ওসপার লড়াইয়ের জন্যে কৃষকেরা ডাক ছাড়ল। বহুলাসিনীতে কৃষক মিছিলের ওপর জোতদাররা বন্দুক নিয়ে হামলা করতে গেলে, কৃষকরা ভয়ে তো পালালই না, উল্টে তীর নিয়ে একেবারে প্রস্তুত হয়ে গেল আক্রমণের মোকাবিলা করতে। অঞ্চলপ্রধানের হুমকি কৃষকরা আর মানতে চাইল না। গাঁয়ের চিরাচরিত সামন্ততান্ত্রিক কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে তারা মাথা তুলে দাঁড়াতে শুরু করল। ভয়ে জোতদাররা মিছিল দেখলেই বলত, "ফৌজ আসছে।" ৮ নং অঞ্চলের সামন্ততান্ত্রিক প্রধানকে খতম করার বীর প্রয়াস আমরা দেখলুম। অঞ্চলপ্রধানের তথাকথিত আদেশ পায়ে মাড়িয়ে দিয়ে, কৃষকের এই অভিযানে জোতদাররা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। বসল ডেবরায় পুলিশ ক্যাম্প। তবু কৃষক দমল না। ধান কাটার মরশুমে যেন আগুন আরো জ্বলে উঠল। সমস্ত জোতদারশ্রেণীর বিরুদ্ধেই কৃষকের এই শ্রেণীসংহতি ও শ্রেণীসংগ্রাম অর্থনৈতিক দাবীর গণ্ডি পেরিয়ে যেতে লাগল।

প্রকাশ্য দিবালোকে "মারের বদলে পাল্টা মার"—আওয়াজ তুলে জোতদারদের ধরে কৃষকরা পিটোল। প্রতিটি মিছিলে কৃষকরা আসত সশস্ত্র হয়ে। সশস্ত্র প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে সশস্ত্র হয়েই লড়তে হবে, কৃষকের লড়াই-ই কৃষকের মাথায় এই শিক্ষা আরো ভালো করে ঢুকিয়ে দিল।'

এখানে স্বভাবতই 'অপারেশন? বসাই টুডু' উপন্যাসের সেই লড়াইয়ের দৃশ্যটি মনে আসে। 'তার যুদ্ধের ডাক "মাহো"তে ভীষণ কারেন্ট। চমকে রামেশ্বর লাফিয়ে ওঠে ও গলনলীতে বসাইয়ের টেঁটা খায়। পলায়নপর সাঁওতালদের ওপর গুলি। ধানখেত হতে তীর। আগুন। আগুন, আগুন। গুলি ও তীর। এস. আই চেঁচিয়ে ওঠে ও হেঁসোর আঘাতে ঢলে পড়ে। গুলি, গুলি, বসাইয়ের কোঁচ ডি. এস. পি.-র পেটে। বসাইয়ের পায়ে গুলি। বসাইয়ের পেটে বেয়নেট। সঙিনের ফলা মুখে। তব্ ভি হম্ লড়েঙ্গে। পুলিশের পায়ে তীর। কুচিলা। বসাই ঢলে পড়ে। কংগ্রেসী ছেলেরা ছুটে গিয়ে ভ্যানে ওঠে। কোঁচসুদ্ধ ডি. এস. পি-র ছোটা ও পড়ে পা ছোঁড়া। আগুন ছড়িয়ে পড়ে।'

কিন্তু এভাবে সরাসরি লড়াইতে যেহেতু কৃষকেরাই পরাজিত ও নিহত হয়, সেহেতু নকশালবাদীরা বলেন যে, কৃষক দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারে একমাত্র গেরিলা যুদ্ধ মারফত। শ্রীকাকুলামের সংগ্রামে এই তত্ত্বই প্রমাণিত হয়েছে। আর এই গেরিলা যুদ্ধই হোল কৃষকের নিজস্ব সংগ্রামের ধরণ। এই গেরিলা যুদ্ধ কিভাবে শুরু করা যায় বা এর স্বরূপ কি, এ-প্রশ্নের উত্তরে চারু মজুমদার লিখেছেন, 'ভারতবর্ষের বিপ্লবী কৃষক সংগ্রাম এ-প্রশ্নের জবাব দিয়েছে যে, একমাত্র গ্রামাঞ্চলে সামন্ত শ্রেণীগুলিকে খতম করার মধ্য দিয়েই গেরিলা যুদ্ধ শুরু করা যেতে পারে। এই শ্রেণীশত্রুকে নির্মূল করার অভিযান পরিচালনা করা যায় একমাত্র দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষককে গ্রামাঞ্চলে সামন্ত শ্রেণীগুলির প্রভুত্ব ধ্বংস করে কৃষকের রাজত্ব কায়েম করার রাজনীতিতে উদ্বুদ্ধ করে। তাই শ্রেণীশত্রুকে খতম করা হোল শ্রেণীসংগ্রামের উন্নতরূপ এবং গেরিলা কৌশলে এই খতম করার কাজটিই হোল গেরিলা সংগ্রামের প্রাথমিক স্তর। শ্রেণীশত্রুকে খতম করার অর্থ শুধু ব্যক্তিকে খতম করা নয়; তার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিপত্তিকেও খতম করা।'(২১)

স্বর্ণ মিত্রের 'গ্রামে চলো'(২২) উপন্যাস থেকে এই শ্রেণীশত্রু খতমের একটি চিত্র এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে—

'হঠাৎ ঘরের দু'পাশ দিয়ে বন্যার স্রোতের মতো একদল সশস্ত্র কৃষক গোটা বাড়িটাকে ঘিরে ধরলো।

সত্যবানের নেতৃত্বে জনাকয়েক কৃষক তব্‌তব্‌ কোরে বারান্দার ওপর উঠে গিয়ে সীতানাথবাবুকে ঘিরে ধরলো। গম্ভীরস্বরে সত্যবান বোললো, "বন্দুক কুথায়? সকল মহাজনী দলিলপত্তর জলদি বার করো।"

কালিপদ নির্দেশ দিলো, "গোলার মুখ ভাঙ্গি ফেলো।"

গোলার মুখ ভেঙে ফেললো সশস্ত্র কৃষক জনতা।

হতভম্বের মতো খানিকক্ষণ তিনি ফ্যালফ্যাল্‌ কবে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর হুঙ্কার ছাড়লেন, "বনবিহারী! ফায়ার! ফায়ার!"

মহাজনের আর্তনাদে কেউ সাড়া দিল না। বন্দুকধারী চাকরেরা অনেক আগেই বাবুর অস্ত্র তুলে দিয়েছে সশস্ত্র জনতার হাতে। বনবিহারী সিন্দুকের পেছনে উবু হয়ে বসে কাঁপছে।

সীতারামবাবু সত্যবানের দিকে কটমট করে তাকিয়ে হাতের কাপটা ছুঁড়ে মারবার আগেই পেছন থেকে একজন কৃষক টাঙ্গি ঘুরিয়ে কোপ মারে। যেরকম বসেছিলেন তিনি, ঠিক তেমনিই আবার তিনি বসে পড়লেন। ইজিচেয়ারের ওপরে।

বারান্দা পেরিয়ে উঠোনের ওপর তাজা রক্তের ফোঁটা পড়তে থাকলো অবিরামভাবে।

বাঁধ-ভাঙা জলস্রোতের মতো মজুত ধান মাটির ওপর আছড়ে পড়ছে ধানের গোলা থেকে।'

মহাশ্বেতা দেবীর 'বিছন' গল্পে দুলন গঞ্জু যখন জোতদার লছমন সিংকে খতম করে অথবা 'শিবা'২৩। গল্পে জোতদার প্রেমদাস গোলদার যখন চাষী দুকড়ির ফাঁদে পড়ে খতম হয়, তখন সেই একই শ্রেণীঘৃণা প্রকাশ পায়। এই গেরিলা আক্রমণে কৃষকের জোতদার হত্যার অন্য একটি দৃষ্ট উপস্থাপিত করা যেতে পারে গুণময় মান্নার 'শালবনি'।২৪) উপন্যাস থেকে

'কর্তা একবার এদিক একবার ওদিক তাকাচ্ছিল, উনুনের কম্পমান আলোতে তার চোখের সাদা দেখা যাচ্ছিল। মুখ দিয়ে এক সময় কথা বেরোল তার, যেন অনেকটা বাধা পেরিয়ে, কফ বসে গেলে যেমন ঘড়ঘড় করে তেমনি—'কে তুমরা, কী চাও?'

'আমরা তোমার শত্রু

'কেনে? কী করেছি আমি

'ঠিক আমাদের শত্রু নও তুমি, ব্যক্তিগতভাবে। তুমি সমাজের শত্রু, তুমি জোঁক, কেবলই রক্ত শোষণ করেছ...'

'আমি কার কী করেছি?'

'তুমি মহাজন, তুমি সুদখোর, তুমি চালানী, তোমার ডালপালা চারদিকে ছড়ানো, শোষণের জাল মেলেছ...'

••• ••• •••

'আমার কী দোষ, আমার পৈতৃক ব্যবসা, এই চলে আসছে

'তোমার জোঁকের প্রাণ, রক্ত শুষে মোটা হয়েছ, সেই রক্ত ঝরিয়ে দেব আমরা...'

বিদ্যুৎবেগে কোমরের পিছনে গোঁজা ধানকাটা ঝকঝকে কাস্তেটা বের করল লোকটা। পাশের দুজন দুটো হাত চেপে ধরল। সামনের লোকটা টেবিলটা কাত করে ঠেলে ধরল একটু পিছনের লোকটা বাঁ হাতে কর্তার মাথাটা পিছনে হেলিয়ে ধানের গোছে কাস্তে দেবার মতো গলার দিকে বসাল, তারপর টানল কয়েকবার। তারপর ছেড়ে দিল। সরে গেল একটু চারজনেই। পরক্ষণেই বারান্দা থেকে লাফ দিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।'

উপরে উদ্ধৃত জোতদার 'খতমে'র চিত্রায়ন (মহাশ্বেতা দেবী, গুণময় মান্না ও স্বর্ণ মিত্র ছাড়া সমকালীন বহু লেখকের গল্প-উপন্যাসে উপরোক্ত ঘটনার চিত্রণও অবশ্য উল্লেখ্য) প্রকৃত প্রস্তাবে বাস্তব ঘটনারই প্রতিচ্ছবি। এবং নকশালবাদী আন্দোলনেরই ফললাভ। ১৯৬৯ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত 'দেশব্রতী' পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় প্রায় নিয়মিতই এই 'শ্রেণীশত্রু' খতমের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ একটি রিপোর্ট উল্লেখ করা কর্তব্য. 'পুলিসী বেষ্টনীর ভেতরেও কৃষক গেরিলা দলের শ্রেণীশত্রু খতম করার অভিযান সক্রিয় রয়েছে। অত্যাচারী জমিদার দ্বিজ রায় খতম হতে না হতেই, আবার গেরিলা দল ঝাঁপিয়ে পড়েছে নতুন অভিযানে। কৃষক কমরেডদের বিরুদ্ধে দালালি করছে, এমন লোকেরাও রেহাই পায়নি। গত ২০শে অক্টোবর কৃষকরা নিজেরাই বসে সিদ্ধান্ত নেয়, এক দালালকে শেষ করে দিতে হবে। তার নাম ধনা হেম্‌রম্‌ এবং সেইদিনেই তারা তাদের সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করে দালালটিকে খতম করে। তার মৃতদেহ রাস্তার পাশে ফেলে দিয়ে গেছে তারা।...আর একটা ঘটনা ঘটেছে গত ২৩শে অক্টোবর। চারজনের একটি গেরিলা স্কোয়াড অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ডেবরার ৪নং ইউনিয়নের জোতদার ও পুলিসের দালাল চূড়ামণি সতীশ পড্যার ওপর। সতীশ পড্যা কোনো আওয়াজ করার আগেই খতম হয়।'(২৫) এই প্রসঙ্গে 'দেশব্রতী' ১৬ই এপ্রিল, '৭০ সংখ্যায় লিখিত হয়, 'আমাদের প্রিয় নেতা চারু মজুমদার বলেছেন, "প্রতিটি জোতদারই হত্যাকারী, কাপুরুষ এই সশস্ত্র জোতদারেরা

নিঃসহায় নিরস্ত্র ক্ষেতমজুর ও গরীব চাষীদের যুগ যুগ ধরে নিজেরা হত্যা করে চলেছে, প্রায় প্রতিটি ক্ষেতমজুর গরীব চাষী পরিবারের কেউ না কেউ এদের হাতে নিহত হয়েছেন।" তিনি আমাদের আরও শিখিয়েছেন, "হত্যাকারীকে বাঁচিয়ে রাখার অর্থই মৃত্যু"—এই মহান আওয়াজে সাড়া দিয়ে সীমান্ত এলাকার বিপ্লবী কৃষকেরা পুলিশ, মিলিটারি পাহারার মধ্যেই বীরের মতন একের পর এক শ্রেণী-শত্রুকে খতম করে চলেছেন।'

খতমের বর্ণনা যে সুখপাঠ্য হবে না তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু কার্যকারণে তার অনিবার্যতাকে প্রতিষ্ঠা না করে 'খতমের' তাৎক্ষণিক নির্মমতা, হত্যার ভয়ঙ্করতার অতিশয়িত বর্ণনায় মৃতের প্রতি 'মানবিক' করুণা জাগিয়ে তোলার 'সাহিত্যিক' প্রয়োগ কৌশলের মধ্যে একটা বিপজ্জনক রক্ষণশীল রাজনীতি চিন্তা সক্রিয়। বাস্তবের উপাদানকে সরাসরি বিকৃত না করে তার সূক্ষ্ম গুণগত পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব, তার প্রমাণ এই ধরনের দৃষ্টান্তে পাওয়া যায় 'বিভূতির চোখের সামনে সেই দৃশ্যটা ভাসছিল, গলা কাটা ফেরিওয়ালাটা শালগাছের গোড়ায় ছিটকে পড়লো। রক্তাক্ত ছুরিটা ওর নিজের হাতে। মাথায় বেতের গোল চুপড়িটা আর কাঁধে ঝোলানো সেফটিপিন, চুলের ফিতের ব্রাকেটটাও দুপাশে পড়েছিল। সিঁদুর, আলতা, সস্তা সাবান, স্নো, পাউডার, গোল চৌকো ছোট ছোট আয়না, লক্ষ্মীর পাঁচালী, বাঁধানো দেবদেবীর ছবি, এমনকি খানকয়েক সিনেমার চটি ম্যাগাজিনও। জ্যোতি বলছিল, আর সেই ছবিটা বিভূতির চোখের সামনে ভাসছিল, একটা খতমের ছবি।' (সমরেশ বসু, বিবেক, মাসের প্রথম রবিবার)

সংখ্যাতাত্ত্বিক বিচারে পশ্চিম বাংলায় ও ভারতবর্ষে বেশি জোতদার 'খতম' হয় নি, ভাগচাষী, ক্ষেতমজুর ও বেঠবেগারদের ওপর একইভাবে শোষণ অব্যাহত আছে। 'গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরাও' হয়নি, কিন্তু তাৎপর্যময় যে ঘটনা ঘটেছে, তা হোল গ্রামের শ্রমজীবী মানুষের মূল সমস্যা শহরের মধ্যশ্রেণীকে ভাবিত করেছে, গ্রাম ও শহরের মধ্যে মানসিক যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে। এতকাল ধরে কৃষকেরা নিজেদের ন্যায্য দাবীর সপক্ষে যত আন্দোলন গড়ে তুলেছেন, যত বিদ্রোহ করেছেন, সবই কার্যত থেকে গিয়েছিল গ্রামীণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ। কাঁচামালের প্রয়োজনে ইংরেজ শাসকেরা যে গ্রাম-ভারতবর্ষকে মধ্যশ্রেণী অধ্যুষিত শহর-ভারতবর্ষকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল, নকশালবাদী আন্দোলন সে বিচ্ছিন্নতার প্রাচীর ভেঙে এই প্রথম উভয়কে মানসিকভাবে সংযুক্ত করে। তারই ফললাভে এই প্রথম শহুরে লেখকদের কলমে ভাগচাষী, ক্ষেতমজুরদের সমস্যা ও সংগ্রাম প্রকৃত অর্থে বিধৃত হতে আরম্ভ করে। অবশ্য এর মধ্যেও নানা রাজনৈতিক

উদ্দেশ্য চরিতার্থের খেলা বর্তমান। একদিকে যেমন সৎ ও বিবেকী লেখকেরা, নকশালবাদী আন্দোলনের সরিক না হয়েও, কৃষকের সমস্যা ও সংগ্রামের যথার্থ চিত্রকে তুলে ধরতে চেয়েছেন, অন্যদিকে তেমন কিছু লেখক মূল সমস্যার বিকৃত রূপায়ণে অন্য শ্রেণীর স্বার্থকে অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়াসে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন।

প্রাগুক্ত প্রেক্ষিতে, বর্তমান অধ্যায়ে নকশালবাদ-প্রভাবিত গ্রাম ও কৃষি-ভিত্তিক গল্প ও উপন্যাসের আলোচনা করা হচ্ছে

দুই ॥

এ-বিষয়ক আলোচনায় সবপ্রথম আলোচ্য মহাশ্বেতা দেবীর গল্প-উপন্যাস। ইতিপূর্বে এ-অধ্যায়ের ভূমিকায় আমি দেখাতে চেয়েছি যে সমকালে তিনিই একমাত্র ভারতীয় ঔপন্যাসিক, যাঁর লেখায় ভাগচাষী, ক্ষেতমজুর ও বেঠবেগারদের সমস্যা ও সংগ্রাম বাস্তব অর্থেই রূপায়িত, তিনিই একমাত্র কথাশিল্পী, যাঁর লেখায় ভারতীয় সমাজের অন্যতম মূল দ্বন্দ্ব অর্থাৎ 'সামন্তবাদ ও কৃষকশ্রেণীর দ্বন্দ্ব' যথাযথ প্রতিফলিত হয়েছে। শ্রেণী সংগ্রামের সার্থক উপস্থাপনায় তিনি গল্প-উপন্যাসের বিষয়বস্তুকে যে-বৈজ্ঞানিক পটভূমি দিয়েছেন, তা এতাবৎকালের ভারতীয় সাহিত্যেও বিরল।

তাঁর 'অপারেশন? বসাই টুডু' উপন্যাস থেকে আলোচনা শুরু করা যাক। যদিও এর আগে, এবং প্রায় গত দশ বছর ধরে তিনি গভীর নিষ্ঠায় সমাজের বৃহৎ অংশের কথা লিখে চলেছেন, তথাপি অনস্বীকার্য যে এ-উপন্যাসে পটভূমি ও বিস্তৃতিতে তাঁর প্রায় সকল বক্তব্যকেই ধারণ করে আছে। সে-কারণেই এই উপন্যাসটিকে কেন্দ্র করেই আলোচনার সম্প্রসারণ করাই আমার ধারণায় যুক্তিযুক্ত, তাঁর এ-বিষয়ক অন্যান্য গল্প-উপন্যাসগুলি প্রাসঙ্গিক আলোচনায় অবশ্যই উল্লেখিত হবে।

বসাই টুডু একজন ক্ষেতমজুর। সে দীর্ঘদিন কৃষক আন্দোলনে কামিউনিস্ট পার্টির বিশ্বস্ত কর্মী হিসেবে কাজ করেছে। তারপর একদিন সে স্পষ্টত অনুধাবন করে যে কিষাণসভা ক্ষেতমজুরের দাবীর হয়ে লড়বে না। নির্বাচন ইত্যাদি প্রয়োজনীয় কাজের জন্যে মাঝারি কৃষককেও তার হাতে রাখতে হয়, আর মাঝারি কৃষক ও ক্ষেতমজুরের স্বার্থ যেহেতু একই সঙ্গে কোন দলের পক্ষে দেখা সম্ভব নয়, সেহেতু কিষাণসভা কার্যত ক্ষেতমজুরদের ত্যাগই করে। বসাই বলেছে, 'তুমরা বাবুছেলা, পার্টিতে আসছ। আমি কি কালীবাবু?' সানতাল, ক্ষেতমজুর,

মিশনে লিখাপড়া, আবার ক্ষেতমজুর। তুমু বলছু পঁয়তাল্লিশ সাল হতে কিষাণ সভা কবছু? তিতাল্লিশ সালে জিলা কিষাণসভার নকুলবাবু আমারে মাইমানসিং লয়্যে যায়, নালিতাবাড়ি কন্‌ফারেন্সে। সিথা পয়লা দাবি উঠাছিলু, ক্ষেতমজুররে এম. ডাব্লু দিতে হবু।...(হাটগোবিন্দপুব কন্‌ফাবেন্সে) কথা হলু ক্ষেতমজুরদের আলাদা জোট হবু। তা বাদে হুগলী কন্‌ফাবেন্স। খুব বিশ্বাস যেছিল কালীবাবু, ক্ষেতমজুব কিষাণ হতে আলাদা লয়। আজ যি কিষাণ, মাহাজনরে জমি বান্‌ধা দিলে কাল সি ক্ষেতমজুর। হ্যাঁ কালীবাবু, তারপব বর্ধমান, মেদিনীপুরে ক্ষেতমজুব পার্টি হলু, কিন্তু যখন দেখলু কিষাণসভা ক্ষেতমজুর দলরে ফেলে দিলু পাপগর্তের ছেলার মত, কুন্-অ সময়ে মদত দিল নাই, তখন হতে লিজের কথা ভাবতে লাগলাম। লিজেব কথা ভাবতে লাগলাম মানে বুঝছু? লিজের কথা মানে ক্ষেতমজুব সামাজেব কথা।' তারপব সত্তব-একাত্তরে বসাইদেব জন্যে পরগনা জ্বলেছে এবং সে সময়ে নিবন্ন নেংটে বনাম প্রশাসনেব সশস্ত্র লড়াইয়ে ভাবতের গর্বস্থান জওয়ানবা হামেহাল পর্যুদস্ত হয়েছে।'

এ-ধবনেব অসম লড়াইয়েব প্রাথমিক পর্যায়ে পৃথিবীব সব দেশেই যে ঘটনা ঘটেছিল, এখানেও তাব পুনবাবৃত্তি হয়, অর্থাৎ বৃহৎ সশস্ত্র শক্তিব হাতে তারা মাব খায় বসাই টুডুবা মবে। কিন্তু এ-ধবনেব আন্দোলনে নেতাব মৃত্যু যেহেতু প্রশাসনেব কাছে গুরুত্বপূর্ণ, সে কাবণেই মৃতদেহ শনাক্তকরণেব প্রয়োজনীয়তাও অনিবার্য হয়ে ওঠে ডাক পড়ে বসাইয়েব একদা ঘনিষ্ঠ সহকর্মী, বর্তমানে অন্য কমিউনিস্ট দলভুক্ত কালী সাঁতরাব এই কালী সাঁতবা রাজনীতিক্ষেত্রে সর্বাংশে একটি প্রতীকী চবিত্র। 'বহুকাল আগেই পার্টিব লোক এবং মফঃস্বল-কেন্দ্রিক কর্মক্ষেত্র তাব স্বনির্বাচিত ফলে শহবমুখী বাবুদেব মত তাব উন্নতি হয়নি। তাব সততাতে কারো সংশয় নেই। বাজনীতি থেকে দু পয়সা না গোছাবার কাবণে স্বীয় পুত্রেব কাছেও সে বোকা বলে পবিচিত। কিন্তু মহল্লায় তাব একটা ইমেজ আছে। পুবনো দিন থেকে পার্টিব লোক, অথচ নিখবচায় চক্ষু অপাবেশন ক্যাম্প না পড়লে ছানি কাটাতে পাবে না। এমন লোককে ভোটেব সময়ে কিংবা পার্টি-ইমেজ নষ্ট হবার সময়ে গল্পেব কুমিবেব একটি ছানাব মত তুলে দেখাতে কাজে লাগে।.... ..এখনো সে ধানকাটা হাঙ্গামায় গ্রামে যায়। কৃষককে কৃষিঋণ দিতে হবে বলে তদ্বিব কবে, "জিলা-বার্তা" প্রকাশ কবে, বহু জায়গায় বুকপোস্টে পাঠায়। এখনো সে স্থূল-কমিটির মিটিঙে যায় ও শহীদ দিবসের অনুষ্ঠানে জেলাব হাকিমের পাশে বসে। কিন্তু ফুটো পাত্রে জল ভরাব মত বার্থতাব অনুভূতি তাকে বিষণ্ণ করে আজকাল। কালী সাঁতরা বোঝে, সে বাসটি মিস্ কবেছে। -... এখন তাব

যে সব কথা অবরেসবরে মনে হয়, সেগুলি সংকর্মীর জীবনের গোধূলিতে বড় মর্মান্তিক। ব্লকের কুয়ো থেকে ডোমরা জল নিতে পারে না দেখলে, অথবা বিধবা সহকর্মিণীকে বিয়ে করার কারণে গ্রাম-স্কুল থেকে নিত্যজীবন দলুইকে বিতাড়িত হতে দেখলে (বিধবাটি বামনী) কালী সাঁতরার মনে হয় প্রাথমিক সংগ্রামগুলিই বিফল হয়েছে—বিপ্লব এ দেশে গালভরা কথা বই নয়, পানের তবকমাত্র।'

এ-হেন কালী সাঁতরার সঙ্গে বসাই টুডুর মত ও পথের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও কোথায় যেন একটা গভীর আত্মীয়তা থেকেই যায়। কারণ এ-দেশীয় কৃষি ব্যবস্থার যে মৌলিক প্রশ্নে বসাই আজ 'নকসালী', সে প্রশ্নে কালীও সমপরিমাণ ভাবিত। কিন্তু তবুও পার্টির প্রতি 'আউট অফ লয়ালটি' কালীকে চুপ করেই থাকতে হয়। অন্যপথে সাঁওতাল বসাই খেতমজুরদের নিয়ে সংগঠন গড়ে, আন্দোলন চালায়, মহাজনকে 'খতম' করে। মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাসের এই বসাই অবশ্যই ব্যক্তিবিশেষ নয়। প্রথমবার পুলিশ অ্যাকশনে যে-বসাই মারা যায়, সে-ছিল সেদিনের আন্দোলনের নেতা, অতএব সে বসাই; দ্বিতীয় বারের অ্যাকশনে সত্যিকার বসাই মারা যায়; এরপর আরও তিনবারের অ্যাকশনে তিনজন বসাইয়ের মৃত্যু এ-উপন্যাসে উল্লেখিত; প্রকৃতপ্রস্তাবে এই ধারাবাহিক আন্দোলনের নেতৃত্বের নাম বসাই। ১৯৭০ থেকে ১৯৭৬ পর্যন্ত এই বসাইয়ের চারবার মৃত্যু হলে কলকাতার ফোনের নির্দেশে কালীকে যেতে হয় বসাইকে সনাক্ত করতে।

এই বসাই টুডুদের কাছে সামন্তবাদী শোষণ-ব্যবস্থাটা থিয়োরী নয়, বাস্তব সত্য। 'ভুঞা জমিদার, সাউ মহাজন, বাররি জোতদার। তিন যমের ডাঙশে মার খাই নাই করে, মনে করথে পারি না।' সুতরাং বসাই খেতমজুর হিসাবে ন্যায্য দাবী আদায়ের সংগ্রাম করতে কিষাণসভায় যোগ দিয়েছিল। কিন্তু সে অচিরাৎ আবিষ্কার করে যে কিষাণসভা মধ্যম চাষীকেই মদত দেবে, পার্টির স্বার্থে তাদের নয়। 'খেতমজুরের হক্ কমুনিস কিষাণ ফরণ্ট দেখল নাই।…কমুনিস কিষাণসভা যাদের লিয়ে তারা মধ্যম চাষী, লয়? তারাও খেতমজুর লাগায় লয়? তারাদের হক চোট খায়, লয়? আর কমুনিস দল যা বুঝে, ভোট—হাঁ, ভোট! মধ্যম চাষী ভোট কণ্টোল করে, লয়? তবে বুঝ বসাই ঘাস খায় না, ধানের ভাত খায়,—ভাথে আমু ভেবো লিচ্ছু, কমুনিস হয়ো কাম করথে পারি। তুমাদের কমরেট বলথে পারি, কিন্তু যখন আমি খেতমজুর তখন তুমরাও যোক্ লাথ মারবু।' প্রাসঙ্গিক ভাবেই সে বলছে তেভাগা আন্দোলনের কথা, যে আন্দোলন ছিল কিষাণসভার নেতৃত্বে মূখ্যত ভাগচাষীর আন্দোলন। সে

আন্দোলনে খেতমজুরেরাও ভাগচাষীদের সঙ্গে একই ভূমিতে দাঁড়িয়ে লড়েছিল। কিন্তু যখন ভাগচাষীদের খানিকটা পাওনা আদায় হোল, তখন খেতমজুরেরা তা থেকে কিছুমাত্র লাভবান হোল না। আর স্বাধীনতার পর থেকে তো কিষাণসভার চেহারাটাই পালটে গেল। 'ভাগচাষী, খেতমজুর, বড় কিষাণ, মধ্যম চাষী, শউরা বাবু, সকলেরে এক চোখে দেখলু সভা। মরল ছোট চাষী, মরল খেতমজুর।' ফলে বসাই টুডু কিষাণসভা ছাড়ে। কমিউনিস্ট নেতৃত্বের প্রতিও তখন সে বিশ্বাস হারিয়েছে। তার কাছে, 'ভদ্দরলোকের হক্, বড় চাষী মধ্যম চাষীর হক্, বাবু লীডার দেখবু বলেই ত আজ অবধি বাবুঘর ছাড়া লীডার আস্থে নাই? কম্‌নিস লীডারও বাবু, কংগ্রেস লীডারও বাবু, আমু বসাই টুডু যখন পার্টি ছাড়বু বলো বুঝলু তখন তারে জিলা সেক্রেটারী করথে চাহালু।'

নেতৃত্বের চরিত্র বিশ্লেষণে বসাইয়ের এই 'বাবু' শব্দটির ব্যবহার বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তার সাঁওতাল-অভিজ্ঞতা থেকে সে এর ব্যাখ্যা দিয়েছে, 'বাবু একটো জাত। বাগদী-কাওরার মত জা—ত একটো। তাথেই, এত ভাল লোক তুমু (কালী), তুমুও বাবু হয়ে বাবুরে মদত দাও।...রাগ কর়োনা কালীবাবু, তুমার মথ দু চারজন ছাড়া আর সকলজনে কুন্ না কুন্ টাইনে বুঝায়ে ছাড়ছু, তু বসাইটো, সান্তালটো, তুর সামাজের মনিষ লেংটি পর়ো, আকালে ইন্দুর-সাপ খায়।' বসাই-কথিত এই 'বাবু লীডার' বলতে বোঝান হয়েছে উচ্চবর্ণের নেতা। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের বিরোধ বর্তমান। এদেশের ক্ষেত্রে এই বর্ণ ও শ্রেণী প্রায়শই সমার্থক। ই. এম. এস. নাম্বুদ্রিপাদের বক্তব্যে, আমাদের দেশের মত প্রাক-ধনবাদী সমাজে বর্ণই হলো প্রধান, যা শ্রেণীরই প্রতিরূপ।(২৬) হরিজন বা তপশীলী সম্প্রদায়কে 'অবদমিত শ্রেণী' (ডিপ্রেস্‌ড্ ক্লাস) হিসেবে উল্লেখ প্রায়শই লক্ষিত। ভারতে হরিজন ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের ওপর উচ্চবর্ণের নির্যাতন একই সঙ্গে বর্ণ সংঘাত ও শ্রেণী-সংঘাত হিসেবেই সত্য। ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে 'বাবু' বা নেতারা প্রধানত আসেন উচ্চবর্ণ থেকে। এবং কমিউনিস্ট পার্টিও এর ব্যতিক্রম নয়। ১৯৬১ সালের একটি রিপোর্টে দেখা যায় যে তৎকালে কেরালায় কমিউনিস্ট সরকারের পতনের অন্যতম মূল কারণ সরকারী শিক্ষানীতিতে নিম্নবর্ণের এঝাভাসদের সামান্য সুযোগ সুবিধা দেওয়ার প্রতিবাদে উচ্চবর্ণের নায়ারদের সরকারের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার।(২৭) কার্যত একই পার্টিতে পরস্পর পরস্পরের কমরেড হওয়া সত্ত্বেও কলকাতা নামীয় নগরের বাইরের বিস্তৃত ভারতবর্ষে বর্ণ-বিভেদ এতই প্রবল যে উচ্চবর্ণের লোকেরা নিম্নবর্ণকে প্রায়শ এক আসনে বসতে দেবে না।

তাই বড়ো দুঃখেই বসাই বলে, 'নতুন জমানায়, পার্টির বাবুরা সানতাল-কাওরা-তিওরবে ভাই-ভায়া ভাবে ? অ্যাঁ ? তাথে সামন্তবাবুব বাসায় তুমরা পিয়ালায় চা খেত্তা, আমু মাটিব ভাণ্ডে ?' পবিণামে হবিজন ও আদিবাসীদের কাছে 'বাবু' কমবেডবা বহুলাংশে অন্য শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসাবেই বিবেচিত হয়েছেন। নিম্নবর্ণের ভাগচাষী ক্ষেতমজুবেবা যে-অর্থে উচ্চবর্ণের জোতদার-জমিদাবদেব আদেশ মেনে চলে, শাসনে বশীভূত হয়, 'বাবু লীডাব'দেব সঙ্গে হবিজন ও আদিবাসীদেব সম্পর্ক ত' ছাড়িয়ে কদাচিৎ অধিকদূর অগ্রসব হয়েছে। কার্যত অদ্যাবধি কমিউনিস্ট পার্টিগুলিতেও মধ্যশ্রেণীরই একাধিপত্য। ১৯৭২ সালে সি. পি আই (এম)-এব সদস্যদেব মধ্যে মধ্যশ্রেণী থেকে আগতদেব সংখ্যা ছিল ১১,১০৯, সেখানে শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৬,৮৯৭ জন।(২৮) সি. পি. আই। এম. এল -ও এব ব্যতিক্রম নয়। তাই চারুবাবুর 'কৃষকেব সাথে একাত্ম হও' ডাকে সাড়া দিয়ে যে মধ্যশ্রেণীব ছাত্র-যুবকেরা গ্রামে গিয়েছিলেন, তাবাও শেষ পর্যন্ত তাদেব মধ্যবিত্ত মানসিকতাব কারণে শহরেই ফিবে আসতে বাধ্য হন। এইভাবে শহুরে মধ্যশ্রেণী অবশ্য আর্থনীতিক বিপর্যয়ে এবা আজ শ্রেণীচ্যুত) ও গ্রামীণ কৃষকদেব মধ্যেকার ইংরেজ-সৃষ্ট ব্যবধান অদ্যাবধি ঘোচানো সম্ভব হয়নি।

মিশনে পড়া, একদা কমিউনিস্ট কিসাণসভাব সদস্য বসাই টুডুকে তাই খেতমজুবদেব স্বার্থে পার্টি থেকে বেবিয়ে আসতে হয়, নিজে সংগঠন গড়তে হয়, নেতৃত্ব দিতে হয়। বসাই টুডু প্রসঙ্গে বাবংবাব আমার মনে পড়ে বিহারেব পূর্ব চম্পারণ জেলাব খেতিহাব কিষাণ মজদুব সঙ্ঘেব নেতা গম্ভীবাকে। কৃষক-সন্তান গম্ভীরা গ্রামেব স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেছিল। অর্থেব অভাবে লেখাপড়া চালাতে না পেরে সে মতিহারীতে একটা অটোমোবাইল কোম্পানিতে মিস্ত্রির কাজ করতে থাকে কিন্তু সামান্যকাল পরেই সে গ্রামে ফিরে আসে এবং সংযুক্ত সোসালিস্ট পার্টি প্রভাবিত খেতিহাব কিষাণ মজদুব সঙ্ঘে যোগ দেয়। কিন্তু কিষাণ-সমস্যাব প্রশ্নে গম্ভীবাব সঙ্গে সঙ্ঘেব মতভেদ অনিবার্য হয়ে ওঠে এবং ১৯৭৪ এ সঙ্ঘের বৃহৎ অংশ গম্ভীরার নেতৃত্বে বেবিয়ে আসে। এরপর সে সঙ্ঘকে পুরোপুরি সংগ্রামী সংগঠন হিসেবে গড়ে তোলে এবং 'ক্রান্তি'র ডাক দেয়। তারা স্থির করে যে কখনো নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবে না এবং স্পষ্টত বলে যে, 'আমাদের প্রধান শত্রু হোল জমিদার, তাব সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে ও তার জমি ছিনিয়ে নিতে হবে'। ১৯৬৯-৭২-এ চম্পারণের বাধা, নারকেতিয়াগঞ্জ ও মদনপুর অঞ্চলে বহু সশস্ত্র সংগ্রামের ঘটনা ঘটল, কয়েকজন জমিদার খুন হোল, অনেক আইনী ও বেআইনী বন্দুক ছিনতাইয়ের রিপোর্ট

পাওয়া গেল। এরপরই চললো গম্ভীরা ও তার দলের উপর একযোগে শুরু হোল জমিদার ও পুলিশের অত্যাচার। নকশালবাদীদের সমস্ত সশস্ত্র আন্দোলনের দায়ভাগ গম্ভীরাকেই বহন করতে হয়। কারণ সেও বর্গাদারের স্বত্ব ও খেত-মজুরের ন্যূনতম মজুরি আদায়ের জন্যে লড়ছিল। অতএব পুলিশী অ্যাকশন শুরু হয়। গম্ভীরা ধরা পড়ে। তারপর জমিদার ও পুলিশ একসঙ্গে তাকে পিটিয়ে মারে। (২৯) গম্ভীরার সমগ্র কর্মকাণ্ডে নকশালবাদী মতই স্বীকৃতি পায়, যদিও সে কখনো সি. পি. আই (এম. এল)-এ যোগ দেয়নি; একইভাবে বসাই টুডু ও নকশাল-মত ও পথের পথিক, যদিও সে বলে, 'ই বসাই টুডু পথ।…আইনে গেল্যে যিথা কাজ হবু, সিথা আইন। যিথা আইনের কলা দিশাবে জোতদার, সিথা আঙুল বাঁকাবু। নকশাল মোক মদত নেয়, মদত লিাবু। তুমু দাও, লিবু।' এবং উক্ত বাস্তব ঘটনাব প্রেক্ষিতে বিচারে বসাই টুডু উপাখ্যান স্বভাবতই আর আইডিয়া মাত্র থাকে না। গম্ভীরার মৃত্যুর পর তার স্ত্রী সিউ কুমারী বলেছিল, 'সে গরীব-রাজ প্রতিষ্ঠার জন্যে জীবন দিয়েছে, আমরা সে-রাজ প্রতিষ্ঠার জন্যে সংগ্রাম চালিয়ে যাব।' বসাইয়ের মৃত্যুর পর তাই অন্য বসাইয়ের জন্মের মধ্যে দিয়ে সংগ্রাম অব্যাহত থাকাটাই স্বাভাবিক

অতঃপর এ-উপন্যাসে উপস্থাপিত খেতমজুর ও ভাগচাষীদের আন্দোলনের বিষয়বস্তুতে আসা যাক। এক্ষেত্রে খেতমজুরদের মূল দাবী হোল ন্যূনতম মজুরির। যে মজুরির হার এখনো যথাযথভাবে ভারতের কোথাও চালু হয়নি। আইনগতভাবে খেতমজুরদের পক্ষে জোতদারেব বিরুদ্ধে লড়াও সম্ভব নয়; কারণ মামলা চালানো, খরচ, প্রমাণ করা ইত্যাদি বহু বিষয়ে অশিক্ষিত দরিদ্র খেতমজুরের পক্ষে আইনের সহায়তায় নিজের হক পাওয়া প্রায়শ অসম্ভব। তদুপরি আইনে জিতলেও পরের মরশুমে তার কাজ পাওয়া-না-পাওয়া নির্ভর করে জোতদারের ইচ্ছার ওপর। আর আইনে জেতা খেতমজুরকে নিশ্চয়ই জোতদার পুনর্বার তার ক্ষেতে কাজ দেবে না। সুতরাং জোতদারের বিরুদ্ধে সামান্য কয়েকটি কেস ইত্যাদি হলেও ব্যবস্থাটা অব্যাহতই থেকে গেছে এবং একটাকা-আট আনা মজুরিতে খেতমজুরেরা কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে। খেতমজুরেরা ন্যূনতম মজুরি পাচ্ছে কিনা এটা দেখার জন্যে যে সরকারী ইনস্‌-পেক্টর নিয়োজিত হয়েছে তারাও মুখ্যত জোতদারের স্বার্থ দেখছে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেই ধরা যাক। এখানে এই ইনস্‌পেক্টর নিয়োগের সময় যে পূর্বশর্ত আরোপিত হয়েছিল (যদিও তা কখনো লিপিবদ্ধ হয়নি), তা হোল, (ক) ভূস্বামীদের পরিবারভুক্ত লোকেরা কখনো নিয়োজিত হবেন না; (খ) যথাসম্ভব তারা হবেন

অবদমিত শ্রেণীর থেকে আগত এবং (গ) তারা এ-কাজকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করবেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল যে ২৪৫ জন এম. ডাব্লু. ইনস্পেক্টার নিয়োগপত্র পেলেন, তাদের অধিকাংশই ভূস্বামী পরিবারের। তদুপরি এই নিয়োগ হয় সম্পূর্ণত রাজনৈতিক মানদণ্ডে, ফলে বেশির ভাগই কংগ্রেস ও তার ছাত্র-সংগঠনের লোকেরা চাকরী পেলেন।(৩০) সুতরাং এদের কাছে কাদের স্বার্থরক্ষা প্রয়োজনীয়, তা সহজেই অনুমেয়। সি পি. আই (এম) খেত-মজুরদের জন্যে আন্দোলন করেনি, সি. পি. আই-এর সাংবিধানিক পদযাত্রায় এদের ভাগ্য ফেরেনি। বসাই বলছে, 'কিছু বলা লাভ নাই কালীবাবু। উনিশশো তিপ্পানে এম ডবলু। উন্ষাটে রিভিশান। আটষটে রিভিশান। এখন সত্তর সাল। আটষটের রিভিশান এখনো চালু। মরদ তিনটাকা চুয়ান্—বিটি তিন টাকা সাতাশ—টোকাটোকি দুটাকা দু পয়সা। হাথে কি মিল্যে? আট আনা-দশ আনা-এক টাকা-আশি পয়সা—তা দিবার কাল্যেও লুকান্ খাতা বেরায়। তাথে টিপ ছাপ, কে কত লিছু, কার ভাগে কত কাটবু' জানু, আমার-তোমার রাজ্যে খেত-মজুর কথ? সাতত্রিশ লাখের ভি বেশি। সাতত্রিশ লাখের বেশি খেতমজুর সরকারের ঘোষিং রেট পায় না, তাথে কম্নিস কিষাণ ফরন্টের এন্তে যায় নাই কিছু'

উক্ত সমগ্র বিষয়টি বিস্তৃত হয়েছে মহাশ্বেতারই 'এম. ডব্ল্যু বনাম লখিন্দ' গল্পে। লখিন্দ-বসাই টুবারা তাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতায় জেনেছে যে ন্যূনতম মজুরি বা মিনিমাম ওয়েজের সরকারী ফতোয়াটা নিতান্তই ফতোয়া, রেডিও-খবরের কাগজের সরকারী প্রচারের সত্য। তাকে কার্যকরী করতে সরকারের ইচ্ছা বা সামর্থ্য কোনটাই নেই। জোতদারকে চটালে শ্রেণীস্বার্থে ঘা পড়ে। বসাই টুরা বলেছে, এম. ডব্লু 'রেডিওতে হয়্যাছে, কাগজে হয়্যাছে, সরকারী রেকর্ডে মরদ মিঞা টোকা কত পেয়েছে? তিন টাকা চুয়ান্ পসা, তিন টাকা সাতাশ পসা, দু টাকা দু পসা' রেকডে মোরা রাজা হয়্যাছি।' গ্রামীণ খেতমজুর এভাবেই শোষিত হয়েছে, হচ্ছে। তারা 'আটষটের' হিসাব পায়নি, চুয়াত্তরের হিসাব পায় নি, ছিয়াত্তরের সরকার ঘোষিত রেট আট টাকা দশ পয়সা পায় নি। বসাই টুরার নেতৃত্বে গড়ে উঠেছে 'খেতমজুর ইউনিয়ন'। জোতদার লছর একাধারে মহাজন ও জোতদার 'দুই মুখা সাপ'। তার বিরুদ্ধে বসাইরা লড়ছে। তাদের দাবী, ছিয়াত্তরের মজুরি, ধানকাটার অধিকার, বাইরের দাওয়াল ঢুকতে না দেওয়া ইত্যাদি।

এ-সময়ে গ্রামে আসে নতুন এম ডাবলু ইনস্পেক্টর সুবোধ রুইদাস।

ভাগ্যক্রমে সে খেতমজুরের সন্তান। কিন্তু গ্রামে আসার আগেই যুবনেতা সুবোধকে সাবধান করে দেয়, 'নতুন ওয়েজ দেবার কোনই দরকার নেই তবে খেতমজুরেরা এখন যা পাচ্ছে, তার চেয়ে যেন কিছু বেশি পায়, সেটা দেখবেন।' অন্যদিকে সৎ আই. এ. এস সামন্ত তাকে বলে, 'এগ্রিকালচার মানেই খেতমজুর। স্বাধীন দেশ যখন, তখন খেতমজুরদের কথাও ভাবতে হয়। ফিফটি থ্রি অব্দি এম. ডবলু ছিল শুধু দার্জিলিং আর জলপাইগুড়ি জেলায়। তারপর আটষট্টি, চুয়াত্তর, কারেন্ট ছিয়াত্তরের ওয়েজ রিভিশনের, ওয়েজ রিভিশনের কথা আপনি জানেন। মজা হল, আটষট্টি থেকে সব জেলাই এম ডব্লু-র আণ্ডারে। অথচ কোথাও খেতমজুর এম. ডবল্যু পায়নি। বাঁকুড়ায় খেতমজুর পেয়েছে ছ-আনা। সেভেনটি-সেভেনটিওয়ান-সেভেনটিটু—দেশে কি চলছে, খেতমজুর পাচ্ছে ছ-আনা, লেবর কমিশনার রিপোর্ট—"ভ্যাট হি একজিস্টস, ইজ এ মিব্যাকল" এসব কথা বক্তে জানে সুবোধ। সে খেতমজুরেরই ছেলে। সেভেনটি-সেভেনটি টুর ফলে গৌড় বাটে আর্মি নামতে পারে কিন্তু খেতমজুরের মজুরি ছ'আনা থেকে ওপরে ওঠাতে কোন সরকার পারে না। সামন্ত বলেছিলেন, কেন খেতমজুর এম. ডব্লু পায়নি? ১৯৬৩-এ ন্যাশনাল লেবার কমিশন, ওয়েজ অ্যাক্ট করা হয়েছে। কিন্তু খেতমজুরেরা তা জানে না। সে আইন বলবৎ করার মত সরকারী ইচ্ছা বা ব্যবস্থা নেই।...আপনারা কাজ করবেন। জোতদার ও জমি-মালিক প্রচণ্ড বাধা দেবে। দেবেই। কেন না কোনদিন তারা খেতমজুরকে কিছু দেয় নি। আজ তারা আইন হয়েছে বলে রোজ আট টাকা দশ পয়সা দেবে? দেবে না। খেত মজুর চাইবে।...এই যে কথাগুলো আইনে বলছে—মালিক স্ট্যাট্যুটরি এম. ডব্লু এর চেয়ে কম টাকা দিলে খেতমজুর নিজে, অথবা লিখিত অথরিটি-প্রাপ্ত রেজিস্টার্ড ট্রেড ইউনিয়ন কর্মচারী, অথবা এম. ডব্লু. আই. জেলা জজের কাছে প্রতিকার চাইবে—এর কি কোন মানে আছে? খেতমজুর কি মালিকের নামে কিছু বলতে সাহস পাবে? প্রোসিডিয়রটা খেতমজুরের পক্ষে সময়সাপেক্ষ গোলমেলে, কঠিন।' এই গোলমেলে ব্যাপারটা আচরাৎ উপলব্ধি করে এম. ডব্লু ইনস্পেক্টর সুবোধ। তার আদর্শবাদী মানসিকতা ধাক্কা খায়। এম ডব্লুর দাবীতে খেতমজুরদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সে লড়ে। কিন্তু জোতদার শঙ্কর-এর পেছনে এসে দাঁড়ায় তার গুণ্ডা বাহিনী ও পুলিশ। সুতরাং অনিবার্যভাবে বসাই-লখিন্দররা গুলিতে মারা যায়। সুবোধের সাসপেনশন ও চার্জশীট হয়।

ক্ষেতমজুরদের এই ন্যূনতম মজুরির দাবীতে নিরন্তর সংগ্রামের চিত্র বারংবার এসেছে মহাশ্বেতার সাম্প্রতিক গল্প-উপন্যাসে। এসেছে নির্মোহ বাস্তবতায়, ও

কঠিন সততায়। এদেশে পরিকল্পনার দৌলতে ক্ষেতমজুরদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান ; অন্যদিকে জমি কেন্দ্রীভূত হচ্ছে সামান্য কয়েকটি পরিবারের হাতে। ফলে ছোট কিষাণেরা অচিরাৎ পরিণত হচ্ছে ভূমিহীন ক্ষেতমজুরে। বসাই টুডু যথার্থই বলে, 'আজ যি ছোট কিষাণ, কাল সি মহাজনরে জমি দিয়া ক্ষেতমজুর হয়।' ১৯৫৬-৫৭ থেকে ১৯৬৩-৬৪ সালের মধ্যে ক্ষেতমজুরের সংখ্যা এদেশে বেড়েছে ৫৮·৪ শতাংশ থেকে ৬১·২ শতাংশে। উক্ত সময়কালের রাজ্যভিত্তিক পরিসংখ্যানটি নিম্নপ্রকার(৩১) :

রাজ্য	জমি আছে		জমি নেই	
	১৯৫৬-৫৭	১৯৬৩-৬৪	১৯৫৬-৫৭	১৯৬৩-৬৪
অন্ধ্রপ্রদেশ	৩৩·০	২৭·৩	৬৭·০	৭২·৭
আসাম	২৯·৭	৪০·৩	৭০·৩	৫৯·৭
বিহার	৬১·২	৪৭·৩	৩৮·৮	৫২·৭
গুজরাট	২৭·১	১৩ ৭	৭২·৯	৮৬·৩
জম্মু ও কাশ্মীর	৩২·৮	৫০·০	৬৭·২	৫০·০
কেরল	৫৬·১	৬৯·৯	৪৩·৯	৩০·১
মধ্যপ্রদেশ	৩৮ ৯	১০·০	৬১·০	৫০·০
মহারাষ্ট্র	২৭·১	২৮·৬	৭২·৯	৭১·৪
মহীশূর	৩৪ ৫	৩১·০	৬৫·৫	৬৯·০
ওড়িশা	৫৩·০	৪৪ ৮	৪৭ ০	৫৫·২
পাঞ্জাব	১১·০	১৪ ৫	৮৯·০	৮৫·৫
রাজস্থান	৩৫ ৮	৩৯·৬	৬৪ ২	৬০·৪
তামিলনাড়ু	৩৪·৫	২৯ ০	৬৫ ৫	৭১·০
উত্তরপ্রদেশ	৫৪ ৩	৫১·৫	৪৫·৭	৪৮·৫
পশ্চিমবঙ্গ	৩৩ ৪	৩৭·৮	৬৬·৬	৬২·২
সারা ভারত	৪১ ৬	৩৮·৮	৫৮·৪	৬১·২

১৯৬৩-৬৪ সালের পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে প্রায় ৩৩ শতাংশের হাতে তখনো সামান্য জমি ছিল, ১৯৫৬-৫৭ সালে যা ছিল ৪২ শতাংশ। এগ্রিকালচারাল লেবার এনকোয়ারিজ থেকে জানা যায় ১৯৫০-৫১ সালের ক্ষেত-মজুরদের সংখ্যা ৫০ থেকে ১৯৫৬-৫৭ সালে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল ৫৭-তে। আজ

এই সংখ্যা কোন কোন অঞ্চলে বাড়তে বাড়তে গিয়ে দাঁড়িয়েছে কৃষিক্ষেত্রের সঙ্গে সংযুক্ত মোট জনসংখ্যার ৮৫ শতাংশ।(৩২)

এদের মাথাপিছু আয়ের প্রসঙ্গ বোধ হয় না তোলাই শ্রেয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার মতে '১৯৬৭-৬৮ শতকরা ৭০ ভাগ গ্রামীণ মানুষের অবস্থা ছিল দারিদ্র্য সীমায়'। উল্লেখ না করলেও অনুমেয় যে এরা বেশির ভাগই ক্ষেতমজুর। কিন্তু কেবলমাত্র যে তাদের মজুরিই কম ছিল তাই নয়, সেইসঙ্গে তাদের মধ্যে কাজ-না-পাওয়ার সমস্যাও ছিল গুরুতর। মহাশ্বেতার কাহিনীতে যে বারংবার 'বাইরের দাওয়াল' এনে কাজ করানোর কথা উল্লেখিত হয় এবং জোতদারেরা ক্ষেতমজুরদের সঙ্গে সামান্য বিরোধে ঐ কায়দাটা গ্রহণ করে, তার অর্থ হোল স্থানীয় ক্ষেতমজুরদের বেকার হয়ে যাওয়া। 'এম. ডাবলু বনাম লখিন্দ' গল্পে বসাই টুরা যখন বলে, 'দেখছু, দাওয়াল লিয়সছে। চরের বাথানে বসত করাছে, ভাত-জল দিছে, টাকা টাকা দিন মজুরি স্বীকার যেছে।' অথবা 'অপারেশন? বসাই টুডু'তে—'বামেশ্বর তাই এ বাহাত্তরে আখখুটে আবদার ধরে, এবার সে অঞ্চলের কারুকে কাজ দেবে না। সব কাজ দেবে বাইরের দাওয়ালদের।'—তখন উক্ত সমস্যাটি আর পাঠকের অগোচর থাকে না। ১৯৭০ সালের একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে গ্রামীণ মানুষদের বেকারের সংখ্যা যেখানে ৩ শতাংশ সেখানে ক্ষেতমজুরদের সংখ্যা ১৫ শতাংশ।(৩৩) অবশ্য ১৯৫৬-৫৭ সালের তুলনায় ১৯৬৩-৬৪-তে তাদের আয় ৭১ শতাংশ বেড়েছে। প্রত্যেক ক্ষেতমজুর পরিবার পিছু যেখানে ১৯৫৬-৫৭ সালে বাৎসরিক গড় আয় ছিল ৩৮৫.৮৮ টাকা সেখানে ১৯৬৩-৬৪ সালে তারা পেয়েছে ৬৬০.১৯ টাকা। উল্লেখ যে ১৯৫৬-৫৭ সালের তুলনায় ১৯৬৩-৬৮-তে তাদের একান্তভাবে ক্ষেতের কাজের ওপরই নির্ভরশীল হয়ে পড়তে হয়েছে। তদুপরি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি ঘটায় টাকার মান হ্রাস পেয়েছে। ১৯৭০ সালের ইকনমিক টাইমস্ রিসার্চ ব্যুরোর হিসেবে (নভেম্বর ১৮, ১৯৭০) অনুযায়ী ১৯৫০-৫১ সালে একজন ক্ষেতমজুরের দৈনিক আয় ছিল ২.০৭ পয়সা, যা ১৯৫৬-৫৭ সালে কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল ২.০৩ পয়সায়; ১৯৬৪-৬৫ সালে যা বেড়ে দাঁড়ায় মাত্র ২.৯৭ পয়সাতে। ১৯৭৮-৭৯-র মুদ্রামানে এই মজুরিপ্রসঙ্গ উত্থাপন অবশ্যই অস্বস্তিকর। ভারতীয় সাহিত্যে মহাশ্বেতা দেবীই একমাত্র লেখক, যিনি কৃষি ভারতের এই নগ্নরূপটি তাঁর গল্প উপন্যাসে সরাসরি উপস্থাপিত করেন। এবং সেই ক্ষেতমজুরদের, যারা সদাজাগ্রত শ্রেণীচেতনায় জোতদার-জমিদারের বিরুদ্ধে লড়ছে; লড়ছে সামন্তব্যবস্থা ভাঙার দুর্মর রাজনৈতিক আত্মপ্রত্যয়ে।

বসাই টুডুতে উপস্থাপিত দ্বিতীয় উল্লেখ্য বিষয় হোল 'জল'। ছোট চাষী ও ভাগচাষীর কাছে এই জলের প্রশ্নটি অন্যতম জল সমস্যা। এদেশের চাষবাস এখনো আকাশের জলের ওপর নির্ভরশীল। জোতদার বা বড়ো চাষী সাধারণত ক্যানাল থেকে জল নিতে বা গভীর নলকূপ বসিয়ে চাষের উন্নতিতে আগ্রহী নয়। কারণ চাষ বাড়লে, ফসল বাড়লে ভাগচাষী ও ক্ষেতমজুর লাভবান হয়। ভাগচাষীর ভাগের মাত্রা বাড়লে জোতদার মহাজনের কাছে আর ঋণ করবে না বা ঋণগ্রস্ত থাকবে না। সুতরাং ফসল না বাড়লে জোতদারই লাভবান হয় এবং কৃষি ব্যবস্থা তার স্বার্থেই পরিচালিত। বসাই টুডু বলে, 'এথ জল, তাথেও আকাশের জলে চাষ। শালো সূর্য সাউ, না দিবু কানাল কর, না লিবু জল।... কানাল কর লয়্যে চাষ বাড়াবু কেনী? উনা চাষে জোতদারের দুনো লাভ! চাষ কম হবু। ভাগচাষী কম পাবু। ক্ষেতমজুর লেংটা রবু। তাথে বছর ভর ঋণ দিবু, সুদ লিবু।' অন্যত্র জোতদার সূর্য সাউ বলে, 'মোর ধান-কাজে ভাগচাষী। কানাল হতে জল লয়্যে চাষ যথ বাডাবু উ তথো ভাগ লিবে।· শুনুন, চাষ বাড়াব না, জল লিব না।...উরা ধার লিবু, আমু ধার দিবু। চক্রবৃদ্ধি সুদ। সকল শালো কিনা হয়া থাকবু।' 'অমৃত' পত্রিকায় প্রকাশিত 'জল' গল্পটিতে 'বসাই টুডু'র অনেক আগেই সমস্যাটি উপস্থাপিত করেছিলেন মহাশ্বেতা। বাকুলি গ্রামের ভাগচাষীর দেখে ক্যানাল দিয়ে জল বয়ে যায়, রাতে জলের গর্জন শোনা যায়। অথচ জোতদার লক্ষ্মণ সামন্ত সে জল নেবে না। ভাগচাষীদের ধাপ্পা দেয়, 'ভগবান জল না দিলে চাষ হয় খালের জলে? কখনো হয়েছে? কোথাও হয়েছে?' অথচ তখন সারা গ্রাম জুড়ে চলেছে খরা লক্ষ্মণ সামন্তর ছেলে শরৎ বলেছে, 'বাবা কখনোই চায়নি ভাগচাষীরা জল নিয়ে চাষ করে তাকে দিবা-প্রতি ধান বেশি বেশি দিক। নিজেদের খোরাকি পাক। বাবুরাও চায়নি চাষ ভালো হোক, দুর্ভিক্ষ ঘুচুক। কেননা, দুর্ভিক্ষ থাকলে তাদের সাহায্য খয়রাতি আসে।' এ-সমস্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করেই ভাগচাষীদের মনে বিক্ষোভ জমতে থাকে। গোকুল দাসের নেতৃত্বে একদিন বিক্ষুব্ধ ভাগচাষীরা জোতদারের বাড়ি আক্রমণ করে। লক্ষ্মণ সামন্ত 'খতম' হয়, তার বাড়ি জ্বলে। তারপর 'অপারেশন বাকুলি'। পুলিশের গুলিতে গোকুল দাসও নিহত হোল।

অথচ সরকারী হিসেবে দেখা যাচ্ছে যে পঞ্চমবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছতে না পারলেও সেচের আওতাধীন জমি বেড়েছে। উল্লেখ্য প্রথম পরিকল্পনার শেষে ৫৬·২ মিলিয়ন একর জমি সেচের আওতাধীন হয়; দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সেচ ও বিদ্যুৎ-খাতে খরচ হয় ৯১৩ কোটি টাকা, অর্থাৎ পরিকল্পনায় ব্যয়িত টাকার

১৯ শতাংশ; তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষি, ক্ষুদ্র সেচ ও সমষ্টি উন্নয়নের জন্যে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১০২৫ কোটি টাকা। এর ফলে অবশ্যই বেশ কিছু জমি সেচের আওতায় এসেছে, কিন্তু সামন্তব্যবস্থার অমোঘ নিয়মেই এর ফলে ছোট চাষী, ভাগচাষী বা খেতমজুর কিছুমাত্র লাভবান হয়নি। কারণ সরকারী জল নেবার জন্যে যে-পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তা ছোট চাষীর পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়, জমিদার/জোতদাররা জল নিয়ে ফসল বাড়াবে না। সুতরাং ছোট চাষী, ভাগচাষীদের ভাগ্য অপরিবর্তিতই রয়ে গেছে। বিহারের কৃষি বিষয়ক একটি একটি সমীক্ষা (৩৪) থেকে উক্ত বিষয়টি স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। এখানে বলা হয়েছে যে বিহারের কয়েকটি পরিকল্পনার ফলে সেচ ব্যবস্থার কিছুটা উন্নতি হলেও ছোট কৃষকেরা (২.৫ থেকে ৯.৯ একর পর্যন্ত জমির মালিকেরা) টাকার অভাবে জল নিতে পারে না। মহাজনের কাছ থেকে এ-ব্যাপারে তারা দাদন পায় না, আর সরকারী ক্রেডিট সোসাইটির কাছে তারা অন্ত্যজ। প্রাসঙ্গিক-ভাবেই এখানে স্মরণযোগ্য মহাশ্বেতা দেবীর 'দ্রৌপদী' গল্পের (৩৫) জোতদার সূর্য সাউকে 'খতমে'-র ঘটনাটি।

'কোথাও জল নেই, বীরভূমে খরা। সূর্য সাউয়ের বাড়িতে অথই জল কাকের চোখের মত নির্মল।

কানাল টেক্সো দিয়ে জল লাও জলে গেল সব।

টেক্সোর জলে চাষ বাড়িয়ে আমার কি লাভ?

জলে গেল সব।

যাও, যাও। তোমাদের পঞ্চায়েত্তী বদমাসি আমি মানি না। জল লয়ে চাষ বাড়াব। আধা ধান আধিয়ার লিবে। উনো ধানে সবাই বশ। তখন ধান বাড়ি দাও, টাকা দাও, বাঃ তোদের তবে ভাল কাজ করে আমার শিক্ষা হয়েছে।

কি ভাল কাজ করলা তুমি?

জল দিই নাই গ্রামকে?

ভগুনাল বিয়াইকে দিয়াছ।

তোরা জল পাস না?

নাঃ ডোম চাঁড়াল জল পায় না।

এই কথা থেকে ঝগড়া। খরায় মানুষের ধৈর্যসত্ত্ব সহজে জলে। গ্রামের সতীশ-যুগল-সেই বাবু ছেলেটা, বুঝি রানা তার নাম, তারা বলল, জোতদার মহাজন কিছু দিবে না, খতম কর।

সূর্য সাউয়ের বাড়ি রাতে ঘেরাও। সূর্য সাউ বন্দুক বের করেছিল। গরুর দড়িতে পাছমোড়া বাঁধা সূর্য। চোখের ডিম সাদাটে, ঘুরছে, কাপড় নষ্ট হচ্ছিল। ফুলনা বলেছিল, আমি আগে কোপ দিব হে। আমার বাপের বাপ ধান বাড়ি দিয়াছিল সে ধার শুধতে আজও বেগারী দিই।

দোপ্দি বলেছিল, মোর পানে চেয়ে লাল গড়াত মুখে, ওর চোখ আমি উপড়াব।'

সেচের জল বিষয়ে মহাশ্বেতার এই বস্তুনিষ্ঠ চিত্রণে এ-সমস্যার সঙ্গে সংযুক্ত অন্য দুটি বিষয়ও এখানে আসে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই। এর প্রথমটি হোল গ্রামের তপশীলী জাতির সমস্যা আর অন্যটি হোল বেঠবেগারী। এই তপশীলী বা অনুন্নতরা যাদের মধ্যে আছে হরিজন, আদিবাসী প্রমুখেরা, কার্যত একই সঙ্গে নিম্নবর্ণ ও শ্রেণী হিসাবে বিবেচ্য। গ্রামীণ সমাজব্যবস্থায় অদ্যাবধি যে শ্রেণীবিভেদ, শোষণ ও শ্রেণীসংঘর্ষের চেহারা বর্তমান, তা এদেশের চিরাচরিত বর্ণব্যবস্থার আড়ালেই কাজ করে চলেছে। (৩৬) মহাশ্বেতার 'সরসতীয়া' (৩৭) উপন্যাসে যুগল করণ, বাঁকা দুসাদের প্রশ্ন, 'আপনিও কি সেই, যাকে বলে নকশাল?'—এর উত্তরে উক্ত সত্যটিই উপস্থিত করে, 'আমিও হরিজন আন্দোলন করতাম বাঁকা, তখন বুঝলাম হরিজনদের সমস্যা আর খেতমজুরদের সমস্যা একই দাঁড়ায় হিসেবে। আর খেতমজুর আন্দোলনেও আইনের পথে অনেক লড়ি। আর মার খেয়ে খেয়ে বন্দুক হাতে নিলাম। হ্যাঁ, নকশাল আন্দোলন দেখে তো বুঝেছিলাম অস্ত্র নিতে হবে।' মহাশ্বেতার বস্তুবাদী চেতনা এই সত্যটিকে বারংবার উদঘাটিত করেছে তাঁর সাম্প্রতিক গল্প-উপন্যাসে। সামন্তব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামে, তাঁর রচনায় যে হরিজন-আদিবাসী-নিম্নবর্ণের মানুষেরা এসে মেলে একই ভূমিতে, তারা কার্যত উচ্চবর্ণ বা সামন্তপ্রভুদের বিরুদ্ধে এক সম্মিলিত শোষিত শ্রেণীই। তাঁর মহান উপন্যাস 'চোট্টি মুণ্ডা ও তার তীর' (৩৮) মুখ্যত এ-সত্যকেই মর্যাদা দিয়েছে। চোট্টি একই সঙ্গে আদিবাসী মানুষ ও দেশব্যাপী খেতমজুরদের একজন বর্ণ ও শ্রেণীর প্রতিনিধি।

মহাশ্বেতার কাহিনীগুলি প্রধানত বিহারের গ্রামাঞ্চলের পটভূমিকায়, বৃহত্তর অর্থে যা অবশ্যই সমগ্র দেশেরই সত্য। আলোচনার স্বার্থে বিহারের গ্রামীণ বনিয়াদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যেতে পারে। বিহারের শাসকগোষ্ঠী বা ভূস্বামীরা সর্বত্রই উচ্চবর্ণের, যাদের মধ্যে আছে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, কায়স্থ ও ভূমিহার। জমিদারী ব্যবস্থার আইনগত অবলুপ্তির আগে জমিদার বলতে উক্ত বর্ণদেরই বোঝাত এবং ছোটচাষী, ভাগচাষী ও খেতমজুর ছিল হরিজন, আদিবাসী

বা নিম্নবর্ণের মানুষ। অদ্যাবধি, জমিদারী উচ্ছেদ সত্ত্বেও ব্যবস্থা একইভাবে বিদ্যমান। সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষা (৩৯) থেকে জানা যায় যে জমিদারদের মধ্যে ৮০ শতাংশই উচ্চবর্ণের এবং এদের মধ্যে কোন তপশীলী নেই। চাষীদের মধ্যে ৫০ শতাংশ নিম্নবর্ণের এবং এদের মধ্যে কোন হরিজন বা আদিবাসী নেই। গরীব চাষী ও খেতমজুরদের মধ্যে ৫৬·৭৮ শতাংশ হরিজন ও আদিবাসী, বাকিরা অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোক। ফলে সরাসরি বলতে গেলে বলতে হয় যে জমিদার বা শাসকেরা উচ্চবর্ণের, এবং শোষিতেরা হরিজন, আদিবাসী ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের; অতএব সিদ্ধান্তে আসতে অসুবিধে নেই যে এই বর্ণবিভাগ ও শ্রেণীবিভাগ মূলত একই। আর এই সামন্তব্যবস্থা বজায় রাখার জন্যে বর্ণবিভাগও বজায় রাখতে হয়। আইনত তপশীলীরা মন্দিরে ঢোকার অধিকার পেলেও কার্যক্ষেত্রে তা ঘটে না। গ্রাম-সমাজে নিম্নবর্ণের দুসাদ মেয়েরা উচ্চবর্ণের জোতদার-পুত্রের সন্তান গর্ভে ধারণে বাধ্য হয় এবং পরিণামে তার 'বেওসারাণ্ডী' হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না (ধৌলী' গল্প দ্রঃ)। গ্রাম-সমাজের এই কাঠামোকে জিইয়ে রাখার কাজে সামন্তশ্রেণী যে কি পরিমাণ তৎপর ও পারদর্শী তা হরিজন-আদিবাসীদের পুড়িয়ে মারার বহু ঘটনায়ও প্রমাণিত। এর সঙ্গে অবশ্যই যুক্ত থাকে উচ্চবর্ণের জোতদার-মহাজনদের, হরিজন-আদিবাসীদের জমি কেড়ে নেওয়া, তাদের মেয়েদের তুলে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি ঘটনাবলী। মহাশ্বেতা লিখেছেন, 'রাজপুত রাজপুতই থাকে, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণই থাকে, দুসাদ-চামার-গঞ্জু-ধোবি এরা থাকে রাজপুত-ভুঁইহার-কুর্মিদের নিচে। রাজপুত বা ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ বা ভুঁইহার বা যাদব বা কুর্মি, স্থানবিশেষে হরিজনদের মতই, হরিজনদের চেয়েও গরীব হতে পারে। কিন্তু জাতের কারণে তাদেরকে জ্বলন্ত আগুনে ছুঁড়ে ফেলা হয় না।' (বিছন) এর মূল কারণ যে একই সঙ্গে হরিজনদের শ্রেণী হিসেবে অবস্থান, সে সত্য মহাশ্বেতার রচনায় গোপন থাকেনি, তাই বারংবার তিনি কৃষিসমস্যার মূল কেন্দ্রে এদের সংস্থাপন করেন। সরকারী সমীক্ষাতেও প্রকাশ যে হরিজনদের ওপর নৃশংস অত্যাচারের মূল কারণ ভূমিসমস্যা। (৪০)

প্রাসঙ্গিকভাবেই মহাশ্বেতা এনেছেন বেঠবেগারদের (বণ্ডেড লেবার) প্রশ্ন। এই সমস্যার সঙ্গে পূর্বোক্ত বর্ণসমস্যা গভীরভাবে জড়িত। উচ্চবর্ণের জমিদার-জোতদারদের কাছেই নিম্নবর্ণের হরিজন-আদিবাসীরা বেঠবেগারী ব্যবস্থায় আবদ্ধ। ১৯৭৫ সালের বেঠবেগারী উচ্ছেদ আইন (দি বণ্ডেড লেবার সিস্টেম-অ্যাবলিশন-অর্ডিন্যান্স, ১৯৭৫) সত্ত্বেও প্রথাটি আজও একইভাবে বিদ্যমান। সাধারণভাবে একজন ক্ষেতমজুর বছরে ১৫০ থেকে ১৮০ দিনের বেশী কাজ পায় না। (৪১)

ফলে এই ক্ষেতমজুরদের জোতদার মহাজনের কাছ থেকে ধার নিতেই হয়। আর এই দেনা থেকেই বেঠবেগারী প্রথার জন্ম। পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, উত্তরপ্রদেশে ৬৪টি পরিবারের মধ্যে ৫৩টি পরিবার, পাঞ্জাবে ৩,২৪৩টি পরিবারের মধ্যে ১,৮৫৬টি পরিবার, এই বেঠবেগারী প্রথায় আবদ্ধ, এবং এরা সকলেই হরিজন বা আদিবাসী পরিবার। (৪২) বিহারে এর অনুপাতের হার হোল, মোট ৫৮ জনের মধ্যে ৩৪ জন হরিজন ও ২৪ জন আদিবাসী, আব এদের প্রভুদের মধ্যে ২৩ শতাংশ বেনে, ১০ শতাংশ আহির, ১০ শতাংশ রাজপুত, ৮ শতাংশ ব্রাহ্মণ ও বাকিরা অন্য বর্ণের। (৪৩) গান্ধী পীস ফাউণ্ডেশন ও ন্যাশনাল লেবার ইনস্টিটিউটের সমীক্ষা (৪৪) অনুযায়ী সমগ্র দেশে বেঠবেগারের সংখ্যা ২২ লক্ষ। এর মধ্যে উত্তরপ্রদেশের সংখ্যাই সর্বাধিক ৫৫ লক্ষ, মধ্যপ্রদেশ ৪'৬ লক্ষ; তামিলনাড়ু ২'৫ লক্ষ; কর্ণাটক ১৯ লক্ষ; গুজরাট ১'৭ লক্ষ; বিহার ১'১ লক্ষ; মহারাষ্ট্র ১'৫ লক্ষ; রাজস্থান ৬৭,০০০। এই সমস্যার উল্লেখযোগ্য দিকগুলি এবম্প্রকার: (ক) এদের মধ্যে ৬৬ শতাংশ হরিজন ও ১৮'৩ শতাংশ আদিবাসী। এদের প্রভুদের মধ্যে ৮৪'২ শতাংশ উচ্চবর্ণেব হিন্দু। (খ) এদের মধ্যে ৪৭'৫ শতাংশ দেনা কবতে বাধ্য হয়েছে তাদের দৈনান্দিন জীবনধারণের জন্যে, আর ৩৩'৬ শতাংশ দেনা করেছে তাদের সামাজিক দায়িত্ব (বিবাহ, উৎসব ইত্যাদি) পালনের তাগিদে। (গ) তাদের মজুরি এতই কম যে দারিদ্র্যসীমার নিচে বললেও কিছুই বলা হয় না; সুতরাং উক্ত দেনা আর তারা কোনকালেই শোধ করতে পারে না। এদের মধ্যে ৩০ শতাংশের আয় মাসিক দশ টাকার কম, ৩৮ শতাংশের আয় মাসিক দশ টাকা থেকে চল্লিশ টাকা, ২৫ শতাংশের ৪০ থেকে ৮০ টাকা; আর মাত্র ৭ শতাংশের মাসিক ৮০ টাকার সামান্য বেশি। (ঘ) এদের মধ্যে ১০ শতাংশ খুবই অল্প বয়স থেকে বেঠবেগার, ৫৬ শতাংশ গত পাঁচ বছর থেকে ও ৩৩ শতাংশ এক বছর বা তার সামান্য বেশি সময় থেকে বেঠবেগার। (ঙ) এদের মধ্যে ৬০ শতাংশের বেঠবেগারী দিয়ে চলতে হবে, অন্তত যতক্ষণ না মালিক বলছে যে তার ঋণ শোধ হয়েছে। ৮০ শতাংশ তাদের সমস্ত স্বাধীনতা হারিয়েছে, এমনকি যখন লোকের কোন কাজ থাকে না, তখনো তারা অন্য কোন কাজ করার অধিকার পায় না। চাষের সময় ১১ শতাংশকে জোতদার-মহাজনেরা তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে ব্যবহার করে। (চ) বেঠবেগারদের মধ্যে ২১ শতাংশের বয়স ২০-র নিচে, ৫৬ ৩ শতাংশের ৩০-এর নিচে এবং ৮৩'২ শতাশের ৪০-এর নিচে।

উক্ত সমীক্ষার প্রেক্ষিতে মহাশ্বেতা গল্প-উপন্যাসগুলির আলোচনায় স্বভাবতই

তাঁর শ্রেণীচেতনা ও বাস্তবতাবোধ স্পষ্টত ধরা পড়ে। বেঠবেগারদের দৈনন্দিন জীবনসংগ্রাম, সামন্ততান্ত্রিক শোষণব্যবস্থা এবং বেঠবেগারদের সম্মিলিত বিদ্রোহের বা 'শ্রেণীশত্রু খতমে'র যে চিত্রণ তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয়ে ওঠে, তা কোনক্রমেই বুর্জোয়া মানবতাবাদ নয়, একান্তভাবে শ্রেণীচেতনারই ফসল। 'অপারেশন ? বসাই টুডু'-তে একটি ছোট ঘটনা তুলে ধরে তিনি যেভাবে বিষয়টির অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিধৃত করেন, অথবা অন্যান্য গল্পগুলিতে তা কেবলমাত্র সফল সাহিত্যসৃষ্টিই নয়, শ্রেণীচেতনাসমৃদ্ধ মহৎ জীবনবেদও। কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হলেও, অংশটির উদ্ধৃতি অনিবার্য; আমতোড়া-গ্রামের হবিব খাঁ ও ইরফান মোল্লা খেতমজুরদের 'রিভাইজ্‌ড রেট' দেবে জানায়। জগত্তারণ লোহারীর আটজন বেঠবেগার পালিয়ে সেখানে কাজ করতে যায়।

"কালী বলল, 'পালিয়ে গেল কেন ?'

'ওরা জগত্তারণেব বন্‌ডেড লেবার। জগত্তারণের পিতামহ, ওদের পূর্ব-পুরুষকে ধান-টাকা ইত্যাদি ধার দেয়।'

'কত ধান ? কত টাকা ?'

'ধান হয়তো মণ খানেক কবে। টাকা হয়তো বড় জোব শত খানেক। আমি জানি না।'

'তারপব ?'

'চার পুরুষেও আসল শোধ হয়নি। সুদও নয়। যা হোক জগত্তারণের বাপের আমল থেকে ওবা টিপছাপ দিয়ে লেবাব দিচ্ছে। মানে, যারা ওরিজিনালি নিয়েছিল তাবা তো ছিল না। তাদের ডিসেন্‌ডেন্‌টবা টিপছাপ দেয়। যদ্দিন না সুদ-আসল শোধ হচ্ছে, ওবা এসে বেগাব-বেগারী দেবে।'

'দাঁড়ান, দাঁড়ান, জগত্তারণেব পিতামহ বললেন না ?'

'হ্যাঁ।'

'জমিদার ত, প্রজাবা ওরা ?'

'জগত্তারণের পিতামহও মহাজন ছিল। পবে জমিদার হয়। তার ছেলেই জমিদারী কবে গেছে।'

'তাই বলুন। আমার কনফিউজিং লাগছিল, জমিদারী চলে যেতেই মহাজনীতে নামল কি করে জগত্তারণ। এখন বুঝেছি, ঠাকুর্দার রক্ত ছিল ওর গায়ে'

'আপনি মশায়, বক্ত দেখছেন। ইদিকে···যাক, বন্‌ডেড লেবারের মজা তো জানেন, সাত পুরুষেও শোধ হয় না ধার। জগত্তারণ বেশ খেলা খেলে। তার জমি ওর বন্‌ডেড লেবার বারোটা ফ্যামিলিই চাষ করে। পেটভাতায়।

'নো দাওয়াল, নো।ভাগচাষী, নো খেতমজুর ?'

'নাথিং।'

'তারপর ?'

'যতগুলো ফ্যামিলি বন্‌ডেড লেবার, তারা কখনো ওয়েজবেণ্টে যেতে সাহস করেনি। কিন্তু এবার একটা ক্যাওট ফ্যামিলি, তিনটে মাঝি ফ্যামিলির ছজন, ওই ডিকলেয়ার্ড ওয়েজ পাবে শুনে চলে যায় আমতোড়। জগত্তারণ তাদের প্রথমে শাসায়। তারা যে বলে বন্‌ডেড লেবার অ্যাক্ট্‌ হয়েছে, তাতেই মনে হয় পেছনে বসাই টুডু মার্কা কোন লোক আছে। এতে জগত্তারণ আবার শাসায়। তারপর ওরা আটজন বলে, ঘরবাড়ি তুলে নিয়ে চলে যাবে।'

'তারপর ?'

'জগত্তারণ প্রোভোক্‌ড্‌ হয়। ক্যাওট ও সাঁওতাল আটজনকে, ওর।বাড়িতে যখন কথা বলতে আসে, তখন অ্যাকস্ট করে ঘবে বেঁধে রাখে। ওদেব ঘর জ্বালিয়ে দেয়।'

'বাঃ। পুলিশ জানত ?'

'না।'

'তারপর ?'

'তিন দিনের মাথায় ও বাড়িতে পঞ্চাশ-ষাটজন লোক। তারা ডিকলেয়াব করে বেঠ-বেগারী দিব নাই, উয়াদের খালাস কর্য। তীর ছুঁড়ে জগত্তারণের লোকজনকে জখম করে ওদের খালাস করে।'

কিন্তু এমত ঘটনাবলীর ফলে গ্রামাঞ্চলে কোথাও কোথাও বেঠবেগারেরা সাময়িকভাবে মুক্তি পেলেও তা স্থায়ী হয়নি, হতে পারে না। কারণ এই বেঠবেগারেরা, যে সামন্তব্যবস্থার সৃষ্টি, তার অবসান না হওয়া পর্যন্ত এর অবসান অসম্ভব। সরকাব আইনগতভাবে বেঠবেগারী বেআইনী করলেও, অদ্যাবধি আইনকে কার্যকব করার কোন ব্যবস্থা গ্রহণে আগ্রহী হননি। এর কাবণ, গ্রামীণ ভারতে সম্পত্তি ও আয়ের ক্ষেত্রে এই বেঠবেগারেরা একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে ; তাকে সরিয়ে নিতে গেলে পুরো সামন্তব্যবস্থার শিকড়ে টান পড়ে। অন্যপক্ষে বেঠবেগারদেরও আইনসঙ্গত আন্দোলন গড়ে তোলা বহুবিধ কারণেই দুরূহ। তুলনামূলকভাবে সামন্তপ্রভুরা অনেক বেশি সংগঠিত, তাদের পেছনে আছে প্রশাসন। আর নিম্নবর্ণের বেঠবেগাররা শ্রেণী হিসাবে এখনো যথেষ্ট সংগঠিত নয়, আইন-আদালতের দ্বারস্থ হওয়া, মামলা চালিয়ে যাওয়ার অর্থনৈতিক সামর্থ্যের কথা তাদের কাছে স্বপ্ন। মহাশ্বেতা 'মুন' (৪৫)

গল্পে দেখান যে বেঠবেগারেরা যেদিন থেকে 'সংগঠিত যুবকদলের' মধ্যস্থতায়, বেঠবেগারি বেআইনী বলে জানে এবং ভাগচাষী হিসেবে জোতদারের স্বীকৃতি পায়, সেদিন থেকেই জোতদার উত্তমচাঁদ তাদের অন্নপথে মারতে থাকে। সে বলে, 'ওদের নুনে মারব।' আর অঞ্চলের দুটো হাটের বেনেতি দোকানই যেহেতু উত্তমচাঁদের, সেহেতু সে ওদের কাছে নুন বিক্রি বন্ধ করে। সুতরাং ঠিকাদারের কাছে যায়, কাজের বদলে নুন পাবার আশায়। কিন্তু বেঠবেগারী থেকে মুক্তি পেয়েও তারা আবার ফিরতে চায় জোতদারের কাছে। যদিও সে ফেরার পথ তাদের তখন বন্ধ হয়ে গেছে। পূর্বোক্ত সমীক্ষায়ও প্রমাণিত যে বেঠবেগারেরা সমস্ত দিন পরিশ্রম করে অন্তত আধমুঠো পায়, কিন্তু খেতমজুরেরা ফসলের সময় ছাড়া তাও পায় না। মহাশ্বেতা বেঠবেগারদের এই বাস্তব জীবন সত্যকেই প্রকাশ করেন, 'ঝুঝার গ্রামবাসীদের কাছে তখন বেঠবেগারি দেবার, ফসল না পাবার দিনগুলিকে অনেক সুখের মনে হয়।' তবু ইতিহাসের অনিবার্য নিয়মে গ্রামে গ্রামে খেতমজুর-বেঠবেগারেরা সংঘবদ্ধ বিদ্রোহে উঠে দাঁড়ায়; বসাই টুডু, দুলন গঞ্জু, লখিন্দররা জোতদারদের 'খতম' করে, যা মহাশ্বেতার গল্পে-উপন্যাসে সমগ্র সামন্তব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রতীকীতে অচিরাৎ রূপান্তরিত হয়। 'বেহুলা' (৩৬) গল্পের সেই অবিস্মরণীয় শেষ লাইন 'আগুন তাই ভীষণ জ্বলে', আগামী এক মহাবিদ্রোহের ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবেই যেন আমাদের রক্তে সংক্রামিত হয়।

মহাশ্বেতা দেবীর পূর্বোক্ত কাহিনীগুলির বাস্তব প্রেক্ষিতের প্রয়োজনে নকশালবাদী আন্দোলন চলাকালীন পশ্চিমবাংলা ও বিহারের ঘটনাবলীর পর্যবেক্ষণ পর্যালোচনা করা যেতে পারে। তাঁর কাহিনীগুলি যেহেতু প্রধানত বিহারের পটভূমি-নির্ভর, সেহেতু বিহার-প্রসঙ্গ অবতারণাই এক্ষেত্রে যুক্তিসিদ্ধ। বিহারের 'ইণ্ডিয়ান নেশন' পত্রিকার ১৯ জানুয়ারী, ১৯৭০ সংখ্যায় 'বিহারে নকশালপন্থীরা তৎপর হয়ে উঠেছে' শীর্ষক রিপোর্টে বলা হয় যে গত বছর এই রাজ্যে গুরুতর কৃষক-হাঙ্গামা হয়েছে ৪৬টি, তার আগের বছর ১৯৬৮ সালে হয়েছিল মাত্র ২১টি। ১৯৬৮ সালে সশস্ত্র সংঘর্ষে মারা যায় ১৭ জন, আহত হয় ৮৩ জন। একটি সরকারী রিপোর্ট অনুযায়ী, গত বছর যা দেখা যাচ্ছে তা হচ্ছে হিংসা, বিশৃঙ্খলা ও শ্রেণীগত উত্তেজনার ঝোঁক ক্রমেই বেড়ে উঠেছে। প্রজাদের, বর্গাদারদের, ভূমিহীন খেতমজুরদের ও খাতকদের রক্ষার জন্যে বিহার রাজ্যে ইতিপূর্বে যে সব আইন চালু করা হয়েছে, সেগুলি কার্যকরী করতে যে শিথিলতা ও মন্থরতা দেখা দিয়েছে তার ফলে গ্রামাঞ্চলে, বিশেষত উত্তর বিহার ও

সাঁওতাল পরগনার গ্রামাঞ্চলে অসন্তোষ জেগে উঠেছে। উগ্রপন্থীরা দরিদ্র কৃষকদের এই অসন্তোষের সুযোগ গ্রহণ করে যেসব স্থানে তাদের কিছুটা প্রভাব ছিল, সেই সব স্থানে আন্দোলন জাগিয়ে তুলছে।' আর এর ফলে বিহারের জমিদার-জোতদার-ধনিকশ্রেণী যে কি পরিমাণ ভীত হয়ে পড়েছে, তা লক্ষ্য করা যায় ঐ কাগজেরই ২০ জানুয়ারীর সম্পাদকীয় প্রবন্ধে। এখানে লেখা হয়, 'সরকারের কর্তৃত্ব ভাঙার জন্যে ক্ষমতাধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা, এমন কি যারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত নেই তারাও খোলাখুলি নকশালপন্থীদের উৎসহ যোগাচ্ছে। সম্পত্তিতে মৌলিক অধিকারের ওপর এই আক্রমণ কিসের? এর ফলে কি আইনভঙ্গকারীদের হাত শক্তিশালী হচ্ছে না? শুধু তাই নয়, সরকার যখন তখন জোর দিয়ে বলছেন, "গ্রাম্য জনগণের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক বৈষম্যের ফলে একটি বিস্ফোরক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে"; তার ফলে নকশাল-পন্থীদের কার্যকলাপের ন্যায্যতার একটি রাজনৈতিক ভিৎ তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে। এ যে নকশালপন্থীদের কিংবা ঐ রকম লোকদের সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি কবাব জন্য উৎসাহ দেওয়া, চক্ষুষ্মান ব্যক্তিমাত্রেই তা বুঝতে পারবেন।' ৪৭)

গ্রামীণ সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় কৃষকেব ন্যায্য দাবীর বিরুদ্ধে জমিদার-জোতদার-মহাজন এবং প্রশাসনেব আক্রমণ যে কত সংগঠিত ও শক্তিশালী, তা বোঝাবার জন্যে কোন উদ্ধৃতির প্রয়োজন নেই। ইতিপূর্বে আলোচিত মহাশ্বেতাদেবীর প্রত্যেকটি লেখায় সামন্তশ্রেণীর চাবত্র সর্বাংশে উদ্‌ঘাটিত। প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য 'শিবা'(৪৮) গল্পটি, যেখানে জোতদারের অত্যাচার ও কৃষকের আক্রমণেব মুখে তার অসহায় আর্তনাদ সমগ্র সমাজব্যবস্থাব মূল নগ্ন সত্যটিকে প্রতিফলিত করে। নকশালবাদীরা সামন্ততন্ত্রের এই 'শ্বেতসন্ত্রাসের বিরুদ্ধে 'লাল সন্ত্রাসে'র ডাক দিয়েছিলেন। তাঁদের কার্যক্রমে ছিল, '(১) প্রজাপীড়ক অত্যাচারী জমিদার-জোতদারকে খতম করা হবে। শ্রেণীশত্রুর দালালদেব শাস্তি দেওয়া হবে। (২) শ্রেণীশত্রুর বক্ষাকারী ঘৃণ্য পুলিশদলকে খতম করা হবে।' (৪৯) কারণ, 'সশস্ত্র কৃষকবিপ্লবের জয়লাভের মধ্যেই শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির একমাত্র পথ। বিপ্লবী সংগ্রামে ভূমিহীন ও দরিদ্র কৃষকই প্রধান পরিচালিকা শক্তি, অগ্রণী বাহিনী। কারণ, এবা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পেরেছেন যে জোতদার-জমিদারী (সামন্ততান্ত্রিক) শোষণ থেকে মুক্তির এটাই একমাত্র পথ।' 'সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার ধ্বংস করতে হবে। জমির উপর সামন্তশ্রেণীর অধিকার খতম করতে হবে। কৃষককে জমি দখল করতে হবে। তাহলেই জনগণের সব সমস্যার সমাধান হবে।' (৫০)

মহাশ্বেতা দেবীর পূর্বোক্ত গল্প-উপন্যাসগুলিতে উক্ত মতবাদই বহুলাংশে প্রতিফলিত। তাঁর নায়কেরা 'ভূমিহীন ও দরিদ্র কৃষক', তারা সামন্ততান্ত্রিক শোষণে জর্জরিত, বারংবার এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, পরাজিত হয়েছে, অনেক জোতদার পুলিশী সন্ত্রাসে নিহত হয়েছে এবং হচ্ছে, কিন্তু তাদের বিদ্রোহ কখনো থেমে থাকেনি। একজন বসাই টুডুর জন্ম দিয়েছে। পঞ্চম মৃত্যু আরেকজন বসাই টুডুর জন্ম দিয়েছে। 'পঞ্চম মৃত্যুতে বসাই মৃত ও সমাহিত। রাতে। একই রাতে বসাই ডেন ছেড়ে পলাতক। ষষ্ঠ-সপ্তম-অষ্টম, মরণ বোলথে কিছু নাই হে কম্‌রেট।'

'অপারেশন? বসাই টুডু'-তে দ্রৌপদী দুলনাকে বিয়ে করেছিল। 'দ্রৌপদী'(৫১) গল্পে মহাশ্বেতা যখন এই দ্রৌপদীকেই প্রতিরোধের চরিত্র করে তোলেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই এই চরিত্রটি হয়ে ওঠে আন্দোলনের বিস্তৃতি, প্রবহমানতা ও প্রতিনিধিত্বের এক মহান প্রতীক। এ-অর্থে তখন আর দ্রৌপদী একটি বিচ্ছিন্ন গল্পের নায়িকা থাকে না, হয়ে ওঠে মহাশ্বেতার অন্যতম মূল বক্তব্যের কেন্দ্রবিন্দু। দ্রৌপদীর বিরুদ্ধে প্রশাসনের মূল অভিযোগ, সূর্য সাহু ও তার ছেলেকে খুন, ড্রাউটের সময়ে আপার কাস্টের ইঁদারা ও টিউবওয়েল দখল, সবেতেই এরা মেইন, সেই ছেলে তিনটেকে পুলিশের হাতে সারেণ্ডার না করাতেও।' লক্ষণীয়, খেতমজুর-সমস্যা, কাস্ট বা বর্ণ-সমস্যা, নকশালবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়া ইত্যাদি ঘটনাগুলির প্রেক্ষিতে দ্রৌপদীর সংস্থাপনা প্রমাণ করে যে মহাশ্বেতার বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও শ্রেণীচেতনা জানে যে সমস্ত সমস্যাই মূলত একই সমস্যারই বিভিন্ন প্রকাশ। এবং এ-থেকে কৃষক শ্রেণী-শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির একমাত্র পথ (নকশালবাদী মতানুসারে) কৃষক-বিদ্রোহ ও সামন্ত ব্যবস্থার ধ্বংসসাধন।

বহু যুদ্ধের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ সেনানায়ক দ্রৌপদীর মুখোমুখি দাঁড়াতে ভয় পেয়েছিলেন। 'দ্রৌপদী দুই মর্দিত স্তনে সেনানায়ককে ঠেলতে থাকে এবং এই প্রথম সেনানায়ক নিরস্ত্র টার্গেটের সামনে দাঁড়াতে ভয় পান' 'দ্রৌপদী' গল্পের এই সমাপ্তি সর্বাংশে প্রতীকী সম্মিলিত কৃষক বিদ্রোহের মুখে যে সুশিক্ষিত ও সংগঠিত জোতদার-প্রশাসকদের আক্রমণ ব্যর্থ হতে বাধ্য, তা এখানে স্পষ্টতই ব্যক্ত।

প্রাসঙ্গিকভাবেই প্রাগুক্ত গল্প-উপন্যাসগুলি সম্পর্কে কয়েকটি তথ্যের উপস্থাপনা অনিবার্য। ভূমি-সমস্যা, কৃষকদের জীবিকার প্রশ্ন, সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ইত্যাদি যে মূল প্রশ্নের অবতারণা মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্যে প্রতিভাত, তা কদাচ লেখা সম্ভব ছিল না নকশালবাদী আন্দোলন ছাড়া। পূর্বেই বলা হয়েছে, এই

আন্দোলনই প্রকৃত প্রস্তাবে সচেতন লেখক-শিল্পীদের দৃষ্টিভঙ্গি ও 'চিন্তাচর্চাকে গভীরভাবে আঘাত করে, অবশ্য এর পরিণামে সকলেই যে মহাশ্বেতা হয়ে ওঠেন না বা উঠতে পারেন না, তার কারণ অনুসন্ধানে সামাজিক দ্বন্দ্ব ও লেখকের বস্তুবাদী চেতনা ও বৃহত্তর শ্রেণীমানসের সঙ্গে ব্যক্তিচেতনার সংযুক্তিকরণের প্রশ্নটিই সর্বাংশে জড়িত। তাই মহাশ্বেতা 'বর্তমান সমাজব্যবস্থার বদলে আকাঙ্ক্ষিত।' নকশালবাদী রাজনীতি যে মূল সমস্যাগুলি উপস্থাপিত করে, তা এদেশে অতীতেও ছিল, আজও আছে। সঙ্কট তীব্রতর হয়েছে মাত্র। মহাশ্বেতা এই সত্যকেই সামনে তুলে ধরতে চান। বিক্ষোভে-বিদ্রোহে তার সমাধান খোঁজেন, যা আমাদের বাস্তব জীবনক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে এক অমোঘ সত্য হিসেবে। নকশালবাদী রাজনীতি তাঁর সাহিত্যে প্রাথমিক সত্যমাত্র।

গুণময় মান্নার 'শালবনী' উপন্যাসে প্রেসিডেন্সি কলেজের 'ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট' অমলেশ চ্যাটার্জী গ্রামে এসেছিল নকশালবাদী রাজনীতির কর্মী হিসেবে। গ্রামের কৃষকদের সঙ্গে আশ্চর্যভাবে 'একাত্ম' হতে পেরেছিল। অমলেশ হয়ে গিয়েছিল মোহন তুলে। এদেশের ভূমি-ব্যবস্থার স্বাভাবিক নিয়মে এখানেও অধিকাংশ জমির মালিকানা সিংহবাবুদের, অর্থাৎ গণপতি সিং-এর। কিন্তু এ-পরিমাণ জমিতে গ্রামের সমস্ত খেতমজুরদের কাজ হওয়া সম্ভব নয়, 'বর্ষার মুখে সব মেয়ে-মদ্দ চলে যায় অনেক দূরের দূরের জায়গায়। পায়ে হেঁটে, সড়ক রাস্তায় মোটরে করে। ধান বোয়া চাষের কাজের মজুরির জন্য।' আছে সিংহবাবুদের 'অন্নপূর্ণা রাইস মিল,' সেখানে গাঁয়ের মেয়েরা কাজ করে, আর আছে জঙ্গলে চুরি করে কাঠ আনতে যাওয়া, তাতে 'গণ্ডা কয়েক' পয়সা হয়। এহেন আর্থনীতিক কাঠামোতে মোহন ও তার কমরেডদের হাতে গণপতি সিং 'খতম' হলে প্রশাসন অপারেশন শুরু করে। গ্রামে মিলিটারি নেমে পড়ে

এই প্রেক্ষিতে গুণময় গ্রামীণ মানুষের সামাজিক জীবনের প্রাত্যহিক ছবি তুলে ধরেন। সিংহবাবু 'খতম' হবার পর 'সিংহবাবুদের জমি, মাঠের অর্ধেক' খালি পড়ে ছিল। মথুর কৌড়ির পরামর্শে যারা যতটুকু ভাগচাষ করতো, আবার করতে শুরু করে। বড়ম পূজার উৎসব করে। সিংহবাবুর বয়স্য তারক শামলীকে ধর্ষণ করতে না পারার চরম অপমানে গলায় দড়ি দেয়। মোহনের আর এক কমরেড আসে শহর থেকে। সেও গ্রামীণ মানুষদের সঙ্গে 'একাত্ম' হতে মোহনের মামাত ভাই বলাই হয়ে যায়। এদিকে মোহন বিয়ে করে শামলীকে।

এরপর স্বাভাবিক নিয়মেই এনকাউণ্টারে মোহন-বলাই 'ক্যাপ্টেন নরেন্দ্র সিন্‌হা, অব কম্প্যানী নাম্বার ফর্টি সেভ্‌ন'-র হাতে নিহত হয়। সেদিন ক্যাপ্টেন

সিন্‌হার প্রশ্ন ছিল, 'মিঃ চ্যাটার্জী, ইফ ইউ ডোণ্ট মাইণ্ড, আপনার পার্সন্যাল হিষ্ট্রি আমাদের জানা, আপনি স্কুল থেকেই স্বামী বিবেকানন্দের ভক্ত, খুব মর‍্যালিস্ট ছেলে, আই ওয়াণ্ডা, হাউ ডু ইউ রেকন্‌সাইল বিবেকানন্দ উইথ ইয়ো লেনিন, অ মাও-সে-তুং, অ্যাণ্ড দিস ভায়লেন্স ?'

'ক্বা, ক্বা বেটা হ্যান ইউ হিপক্রিট্‌স্‌ রেক্‌ন্‌সাইল ইয়ো গান্ধী উইথ দিস নেকেড ভায়লেন্স ইউ পারপিট্রেট্‌ !'

'আর বিবেকানন্দ-বিদ্যাস'গর-রবীন্দ্রনাথের স্ট্যাচু আপনারা ভাঙছেন, বিকৃত করছেন…'

'মিথ্যে কথা, ভাঙছ বিকৃত করছ তোমরাই, তোমাদের মতো করে তাঁদের দেখাচ্ছ, আমরা সেই মিথ্যে দেখানোটাই ভেঙে তাঁদের একটা রাইট পারস্পেক্‌টিব দিতে চাই।'

এরপর পরপর তিনটে গুলি বেঁধে মোহনের বা অমলেশের শরীরে, শামলী সেনাদের দ্বারা ধর্ষিত হয়।

কিন্তু জীবনপ্রবাহ থেমে থাকে না। আবারও গ্রামে ধান চাষ হয়। গর্ভবতী শামলী ধান কাটতে যায় সকলের সঙ্গে। আবারও ধান ঘরে তোলা নিয়ে জোতদারের সঙ্গে ক্ষেতমজুর-ভাগচাষীদের বিরোধ বাধে। মালিকপক্ষের সহায়তার জন্যে আসে পুলিশ। তাদের গুলিতে নিহত হয় একজন চাষী, আহত হয় জন আষ্টেক; রাতের অন্ধকারে পাণ্টা আক্রমণে তীরবিদ্ধ হয়ে মরে দুজন পুলিশ। তারপর গ্রামজুড়ে শুরু হয় পুলিশী অত্যাচার। এক রাতে পুলিশের হাতে নিহত হয় মথুর কৌড়ি। এরপরেও বনা-পচাইরা তীর বানায়, নিশানা ঠিক করে। শামলীর কোলে ছেলে আসে। সংগ্রামের উত্তরাধিকারী।

গুণময় মান্না উপন্যাসটিকে তিনটি পর্বে ভাগ করেছেন: তরঙ্গ, ঘূর্ণি ও প্রবাহ প্রথম পর্ব শেষ হয় 'মহাজন' গণপতি সিং-এর 'খতমে', দ্বিতীয় পর্ব শেষ হয় মোহন বা অমরেশের নিহত হওয়ায় এবং তৃতীয় পর্ব শাম্‌লীর সন্তানের জন্মে। অনস্বীকার্য গুণময় মান্নার ক্যানভাস বিশাল; ভূমিকেন্দ্রিক যে-জীবনপ্রবাহের চিত্র তিনি আঁকেন, তা বাস্তব এবং অন্তরঙ্গ। কিন্তু যে-কারণসমূহকে কেন্দ্র করে মোহন বা বলাই (সুজিৎ হালদার) গ্রামে যায় অথবা শোষণের যে ভয়ঙ্কর চরিত্র গ্রাম-সমাজে নগ্ন, তা এ-গ্রন্থে প্রায় অব্যক্তই থেকে যায়। হঠাৎ শহুরে শিক্ষিত যুবক অমলেশ ও সুজিৎ কি করে মোহন ও বলাই হয়ে যায়, তা লেখক বিশ্বাস্য করে তুলতে পারেননি; আর যখন মোহন তার সঙ্গীদের নিয়ে গণপতিকে 'খতম করে, তখন বলে 'তুমি মহাজন, তুমি সুদখোর, তুমি চালানী,' কিন্তু

একবারও তার জোতদার-চরিত্র উচ্চারিত হয় না। তদুপরি, বর্ষার মুখে যদি গ্রামের 'সব মেয়ে-মদ্দ' অনেক দূরের জায়গায় চলে যায় ক্ষেতের কাজে, তবে গ্রামের চাষ-আবাদের সঙ্গে কারা যুক্ত থাকে। অথচ গ্রামে ভাগচাষী আছে, সিংহবাবুদের জমি আছে, ইত্যাদি ঘটনাও তো সত্য। আর যদি এসব না থাকে, গ্রামে জোতদারের শোষণ না থাকে তবে দু'জন নকশালবাদী যুবক কি করে তাদের 'খতমে'র কাজে সঙ্গী পায়। এই অসঙ্গতির জন্যে মনে হয় নকশালবাদীরা যেন খুন করতে এবং খুন হতেই গ্রামে আসে। তাই বনার একক কণ্ঠস্বর, 'ই মাটিএ খুন পড়িছে, মহনের খুন' ছাপিয়ে সমবেত কণ্ঠের উচ্চারণ, 'ভরত টুডুর খুন আছে মাটিএ' অনেক গভীরতা ও ব্যাপ্তি পায়। শাম্‌লীর ছেলে 'মহনিয়ার বেটা'-র চেয়ে সত্য হয়ে ওঠে 'মথুরবাবুর বংশ' হিসেবে। তথাপি অনস্বীকার্য যে 'শালবনি'তে মোহনের মৃত্যুর পরও আন্দোলনের ধারা অব্যাহত থাকে আর যে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে গ্রামীণ মানুষদের মধ্যে থেকেই নেতা তৈরি হয়, শাম্‌লীর ছেলের জন্ম তো প্রবহমানতারই প্রতীক, তা সর্বাংশে তাৎপর্যপূর্ণ।

সমরেশ বসুর 'মহাকালের রথের ঘোড়া, (৫২) নকশালবাড়ি আন্দোলনের যে নেতার জীবনকাহিনীকে কেন্দ্র করে রচিত, তাকে চিনতে পাঠকের দেরি হয় না। তরাইয়ের কৃষক সংগ্রামের এই বীর যোদ্ধা রুহিতন কুরমিকে পুলিশ এক জেল থেকে অন্য জেলে নিয়ে যাচ্ছে, জীপ গাড়িতে চলতে চলতে রুহিতন ভাবছে। এই ভাবনার প্রেক্ষিতে লেখক বিন্যস্ত করেন তাঁর জীবন ও রাজনৈতিক লড়াইয়ের সমগ্র কাহিনী। রুহিতন একবার মাত্র কলকাতায় এসেছিল। কলকাতার জমায়েতে তরাইয়ের চা শ্রমিক আর ভূমিহীন কৃষকদের নেতৃত্ব করে নিয়ে এসেছিল সে।' বর্ধমান স্টেশনে নেমে অনেক শ্রমিকের সঙ্গে কলকাতায় যাবার অভিজ্ঞতায় রুহিতন রীতিমত রোমাঞ্চিত হয়েছিল। কিন্তু রুহিতন যে কী আশা নিয়ে গিয়েছিল, নিজেই তা জানতো না। সভা শেষ হতেই তার মনটা কেমন হতাশায় ভরে উঠেছিল।'

রুহিতনকে দলে এনেছিলেন 'শিলিগুড়ির ধনে মানে বড মানুষ,' 'মোহন ছেত্রীর থেকেও বড় জোতদার' দীনু বাগচির ছেলে দিবা বাগচি (এঁকেও কি পাঠকের চিনতে সময় লাগে?)। এই "দিবা বাগচিই একটা শোলোক নিয়ে এসেছিল, 'গ্রাম দিয়ে শহর ঘিরতে হবে। শহরকে গ্রামের কবজায় ঘিরতে হবে। কলকাতায় জমায়েত না। দক্ষিণের যাবত শহর ঘিরতে ঘিরতে, কলকাতাকেও গ্রাম দিয়ে ঘিরতে হবে।' রুহিতন সেই থেকে গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার লড়িয়ে। জানকবুল কিন্তু শত্রুর শেষ রেখো না। রুহিতন রাখেনি।

খতম আর ঘেরাও এক নাগাড়ে।" সেই উজ্জ্বল উৎসাহিত দিনগুলোর কথা বারবার মনে পড়ে রুহিতনের। এর পরই আসে পুলিশী আক্রমণ। অন্য অনেকের মতো রুহিতনও গ্রেপ্তার হয়। তারপর স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্যে তার ওপর চলে অত্যাচার। রেখে দেওয়া হয় নির্জন সেলে। রুহিতন অসুস্থ হয়ে পড়ে। জ্বর হতে থাকে। সারা শরীরে ফুটে ওঠে লাল চাকা চাকা দাগ, উঠে যেতে থাকে ভুরুর লোম।

ছেড়ে দেবার কিছুদিন আগে রুহিতনকে নিয়ে আসা হয় জেলে তার পুরোন বন্ধুদের মধ্যে। সেখানেই সে জানতে পারে দিবা বাগচি ধরা পড়ার পর হার্টফেল করে মারা যান। শোকটা বড়ো বেশি করেই বেজেছিল রুহিতনের বুকে। কিন্তু কথা বলতে গিয়েই সে বুঝতে পারে 'দলে' ভাঙন এসেছে; খেলু চৌধুরীর মত অনেকেই এখন মনে করে, দিবাবাবু 'নিজে ছিল শ্রেণীশত্রু, তাই শেষ পর্যন্ত সে পার্টিকে ভুল পথে চালিয়েছিল' আর এই দিবাবাবুর প্রকাশ পাওয়ায় রুহিতন খেলু চৌধুরীদের কাছে সন্দেহভাজনে পরিণত হয়। তারা তাকে 'বড়কা ছেত্রীর টাকায় লবু খাকড়ির (নরম বা মেয়ে কাঁকড়া) সঙ্গ করার ও তার ফলে কুরোগ হবার অপবাদ দিয়ে আলাদা করে দেয়। পরে ডাক্তারের কাছ থেকে অবশ্য রুহিতন জানতে পারে যে তার কুষ্ঠ হয়েছে। সরকারী চিকিৎসা চলতে থাকে। এর বছরখানেক পরে একদিন রুহিতন ছাড়া পেল।

রুহিতন ঘরে ফিরছে অঞ্চলের ওপর দিয়ে বাস চলেছে, বাসের কেউ তাকে চেনে না। বাস থেকে নামলে যারা তাকে নিতে আসে, তাদের একজন হলো কাছিমুদ্দিন, যে, রুকনুদ্দিন আহম্মদ তাদের দলের হাতে নিহত হয়েছিল তার ভাই। এসেছিল বরাহলাল, দিল নারান, নরসিং ছেত্রী, প্রমুখ অনেকেই। কিন্তু 'গরীব সাধারণ মানুষেরা কেহই প্রায় আসেনি।' ছেলেরা 'তার দিকে এক পাও এগিয়ে এলো না। দু'জনের দৃষ্টি দেখে মনে হলো, রুহিতনকে ওরা চিনতে পারছে না।' স্ত্রী মঙ্গলা 'ওর ছেলেদের মতোই গম্ভীর মুখে অচেনা অবাক চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। রুহিতনকে যেন চিনতে পারছে না।' অর্থাৎ একদিন জেলের মধ্যে যে রুহিতন সহযোদ্ধাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন, সেই রুহিতন বাইরে এসেও দেখলেন তার আপন পরিবার ও অঞ্চলের সাধারণ মানুষও তাকে পরিত্যাগ করেছে। এদিকে তার ছেলেরা এখন শাসকদলের ঝাণ্ডা নিয়ে ঘোরে। সরকার তার 'বউ ছেলেদের চাষের জমি দিয়েছে, নতুন বাড়িটার খরচও তারাই দিয়েছে। আর এ-বাড়িতে রুহিতন থাকতে পায় না; তার থাকার ব্যবস্থা হয় পুরোন বাড়ির ভাঙা ঘরে। একা।

তার এই নির্বাসিত হবার মুহূর্তে রুহিতন আঁকড়ে ধরতে চায় অতীতকে, 'মঙ্গলি, সেই সব দিনের কথা তোর মনে আছে তো? আমাদের সেই মুক্ত স্বাধীন অঞ্চলের দিনগুলো।' মঙ্গলার কঠিন মুখ তাকে স্তব্ধ করে দেয় মুহূর্তেই, 'কী হবে সে সব দিনের কথা মনে রেখে? আমার এখন আর তেমন মনে পড়ে না।' রাতে মঙ্গলা ওর ঘরে ভাত রেখে যায়। খেতে পারে না রুহিতন। 'সব ভাত কি খাওয়া যায়?' রাত গভীর হলে রুহিতন বেরিয়ে পড়ে। অনেক পথ হেঁটে সে গিয়ে পৌঁছয় সেই জায়গায়, যেখানে সে মাটির নিচে পুঁতে রেখেছিল 'ডবল ব্যারেল একটা বন্দুক।' তারপর 'বুকের কাছে বাট চেপে, ট্রিগারে ক্ষয়প্রাপ্ত তর্জনী দিয়ে চাপ দিল। জং ধরার একটা শব্দ হলো। কিন্তু ট্রিগার নড়ে উঠলো।' পরিশ্রমের ফলে তখন 'রুহিতনের সর্বাঙ্গে দরদর দিয়ে ঘাম ঝরছে। মুখের ভিতর থেকে জিভটা বাইরে বেরিয়ে পড়েছে। না, বসে থাকা সম্ভব না। বুকের মধ্যে নিঃশ্বাস রাখবার জায়গা নেই যেন। সে আস্তে আস্তে শুয়ে পড়লো। বন্দুকটা রইলো তার বুকের পাশে মাটিতে। কাত হয়ে মাথাটা রাখলো জোড়া ব্যারেলের ওপর।'

এই গ্রন্থের কাহিনীবিন্যাসে সমরেশ বসুর কৃতিত্বের প্রশংসা করতেই হয়। প্রথমত, রুহিতন কুরমির ধরা পড়া পর্যন্ত কাহিনীর অংশটা ধরা যাক। যে রুহিতন 'তরাইয়ের চা শ্রমিক আর ভূমিহীন কৃষকের নেতৃত্ব' দেয়, সে কেন কলকাতার মনুমেন্টের নিচে অনুষ্ঠিত সভায় আসে বা এখানে নেতাদের মুখে কি বক্তব্য শুনতে চায়, সমরেশ বসুর কথায়, সে তা জানতো না। তারপর সভাশেষে ঘরে ফেরার পথে তার 'মনটা কেমন হতাশায় ভরে' ওঠে। আর সেই কেবল নয়, চা বাগানের লড়িয়ে নেতা ভাদুয়া মুণ্ডার মুখেও হাসি ছিল না। কি, কেনর ধার দিয়ে গেলেন না সমরেশ। ইতিহাসে কোন কমিউনিস্ট নেতার (তা যত ছোটই হোক না কেন) স্বপ্নভঙ্গ বোধ হয় এত সহজে ঘটে না। তিনি বোধহয় অন্তত কি, কেনটা জানেন বা বোঝেন। আর এদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের ছাত্রমাত্রেই অবগত যে সি. পি. আই (এম) থেকে বেরিয়ে আসবার অনেক আগে থেকেই পার্টির বিপ্লবী অংশ পার্টির ভেতরে থেকেই 'বাম সংকীর্ণতাবাদী' ঝোঁকের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে আসছিলেন। এতদ্‌ব্যতীত তরাই অঞ্চলে ১৯৬৫ সাল থেকে কিষাণ আন্দোলনের ধারা তো অব্যাহতই ছিল। (৫৩) অথচ সমরেশ দেখাতে চান যে তরাইয়ের কৃষক আন্দোলনের অন্যতম নেতা রুহিতন যেন হুজুগে পড়ে সকলের সঙ্গে কলকাতায় আসে আর ফেরার পথে প্রভূত অভিনন্দন ইত্যাদি না পেয়ে হতাশাগ্রস্ত হয়। অবশ্য এ-প্রসঙ্গে তিনি মঙ্গলার

পেটে বাচ্চা, দিবা বাগচির বাবা বড়ো জোতদার ইত্যাদি ঘটনার অবতারণা করতে ভোলেন না। অবশ্য এর কয়েক পৃষ্ঠা পরেই (৩১ পৃঃ) রুহিতনকে বলতে শুনি, কলকাতা যাবার উদ্দেশ্য, 'সারা দেশের কৃষি মজুর কলকাতার মাঠে জমা হয়ে সরকারের কানের তুলো খুলে দিয়ে আসবো। ওরা যে কানে শুনতে পায় না।' ২৪ পৃঃ ও ৩১ পৃঃ-র এই পরস্পব বিরোধী চিত্র কি লেখকের ইচ্ছাকৃত ? প্রথম বক্তব্যে, অর্থাৎ 'রুহিতন যে কী আশা নিয়ে গিয়েছিল, নিজেই তা জানতো না' কিন্তু উদ্দেশ্যপ্রণোদিত চবিত্রহননই বোঝায়। আর কলকাতার জমায়েত থেকে যে ভাঙা মন নিয়ে রুহিতন ফিরে এসেছিল, তা জোড়া লাগে বেশ কয়েক বছর পরে, যখন দিবা বাগচি 'একটা শোলক' নিয়ে আসে, 'গ্রাম দিয়ে শহর ঘিরতে হবে।' পাঠক অবশ্যই এখানে 'শোলক শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করে থাকবেন ; যে-শোলকটি (?) পৃথিবীর অন্তত একটি দেশের রাজনৈতিক-সামাজিক অবস্থার বদল ঘটাতে সক্ষম হয়েছে, সে-তত্ত্ব সম্পর্কে সমরেশের এই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ব্যঙ্গাত্মক শব্দের ব্যবহারটি অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ।

এরপর লেখকের মূল বক্তব্যে আসা যাক। অর্থাৎ রুহিতনকে শেষপর্যন্ত কুষ্ঠ-রুগীতে পরিণত করে, পার্টি থেকে, রাজনীতি থেকে, সমাজ-সংসার থেকে বহিষ্করণের দ্বারা সমরেশ পাঠকের কাছে কি বলতে চান। পুলক চন্দ লিখেছেন, 'নকশালবাড়ির অতীতের কিছু জয়গানের বিনিময়েও যদি তার অন্ধকারময় পারণতির কাল্পনিক ছবিকে পাঠকেব মনে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার অধিকার পাওয়া যায় তাহলেই উদ্দেশ্য সফল। সুতরাং আন্দোলনের সংগ্রামী বিকাশের ধারার মধ্যে একটি বিপ্লবী চবিত্রকে দেখানো নয়, তাকে লড়াই থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ক'বে নিয়ে, পাশাপাশি অন্যান্য বিপ্লবীদেব চূড়ান্তভাবে সংকীর্ণ, নীচ, অমানবিক এবং তুলনায় তাকেই একমাত্র মহান হিসাবে চিত্রিত ক'রে সমরেশ বসু সুপরিকল্পিতভাবে যা দেখাতে চেয়েছেন তা হল : দেখ, সৎসাহসী একজন বিপ্লবীর এটাই হল অমোঘ পবিণতি।' (৫৪) কিন্তু আমার ধারণা, সমরেশ বসুর উদ্দেশ্য কেবলমাত্র একজন বিপ্লবীর জীবনেব ব্যর্থতার ছবি আঁকা বা জনমানসে বিপ্লবী নেতার ছবির ওপর কিছু কালিমালেপন নয়। আসলে তিনি বলতে চান যে সমগ্র আন্দোলনটাই হলো একটা বালখিল্য ব্যাপার, যার সঙ্গে যুক্ত থেকে কিছু সৎ কর্মীর জীবন পঙ্গু হয়ে যায়। একারণেই তিনি দেখান যে নকশালবাড়ি আন্দোলনের পেছনে কোন রাজনীতিক তত্ত্ব নেই, আছে 'একটি শোলক' ; পার্টির মধ্যে যখন ভাঙন শুরু হয় (জেলের মধ্যে খেলু চৌধুরী ও অন্যান্যের কথা দ্রঃ), তার পেছনে দিবা বাগচির বিরুদ্ধে অন্যদের কোন রাজনৈতিক মতাদর্শগত বিরোধ

থাকে না, আসলে তিনি বড় জোতদারের ছেলে ছিলেন, এই তার একমাত্র অপরাধ। অথচ আমরা জানি যে চারু মজুমদার যখন মারা যান (২৮ জুলাই ১৯৭২) তখন সি. পি. আই (এম. এল) দলের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব চরমে উঠেছে; পরস্পর দোষারোপে মগ্ন। কিন্তু এ-দোষারোপের পশ্চাতেও একটি রাজনৈতিক বক্তব্য ছিল। ১৯৭২ সালের শেষ দিকে পার্বতীপুরম চক্রান্ত মামলায় ধৃত ছ'জন নেতার (অন্ধ্রের কোল্লা ভেঙ্কিয়া ও চৌধুরী তেজেশ্বর রাও, পশ্চিমবাংলার কানু সান্যাল ও সৌরেন বসু, উড়িষ্যার ভুবনমোহন পটনায়েক ও নাগভূষণ পটনায়েক) স্বাক্ষরিত যে চিঠিটি পার্টির কর্মীদের উদ্দেশে প্রচারিত হয় এবং মুখ্যত এখানে উল্লেখিত যে-বক্তব্য নিয়ে অন্তদ্বন্দ্ব দেখা দেয় তা হোল, (১) ১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক ভারতবর্ষের মুক্তিসংগ্রাম সম্পর্কে কতকগুলি 'অত্যন্ত মূল্যবান ভ্রাতৃত্বমূলক উপদেশাবলী, (২) সি পি. আই (এম. এল) দলের কেন্দ্রীয় কমিটি ও (৩) দলের সাধারণ সম্পাদক চারু মজুমদারের সমালোচনা এবং (৪) সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের আত্মসমালোচনা এবং (৫) সর্বোপরি আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে ঐক্য প্রয়াস চালানোর আবেদন ইত্যাদি। দেখাই যাচ্ছে এর মধ্যে চারু মজুমদার ছিলেন অন্যতম বিষয়মাত্র, যদিও দলের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে সমস্ত দায় তাঁর কাঁধেই বর্তায়। উক্ত নেতাদের মতে, ভ্রাতৃপ্রতিম দলের (চীনা কমিউনিস্ট পার্টি) এই উপদেশগুলি গ্রহণ করা উচিত। দেশের কৃষি-বিপ্লবের স্বার্থে চারু মজুমদারের নেতৃত্বে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির ঐ উপদেশগুলি ও সমালোচনাগুলি গ্রহণ করা উচিত ছিল। কিন্তু তিনি তা না করায় বা দলের সদস্যদের মধ্যে ঐগুলি প্রচার না করায় দলের মধ্যে ভাঙন দেখা দিয়েছে। এবং উক্ত নেতাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে দলের কেন্দ্রীয় কমিটি নকশালবাড়ি কৃষক অভ্যুত্থানের গৌরবজনক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে দলের মধ্যে একটা ভ্রান্ত বাম হঠকারীর পথ গ্রহণ করেছে, ফলে দলের মধ্যে বিভিন্ন উপদলের সৃষ্টি হয়েছে।

সমরেশ বসু কিন্তু এ-সব তথ্যের ধারকাছ দিয়েও যান না। তিনি দলের ভাঙনের কারণ হিসেবে দেখান দিবা বাগচির জোতদারের ছেলে হওয়া। পাঠককে বিভ্রান্ত করার কী মহান পথ! এরপরই তিনি রুহিতনের শরীরে কুষ্ঠ আমদানি করে আসল চালটি চালেন। অর্থাৎ এভাবে তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া যায় সমাজ ও সংগ্রাম থেকে। রাইফেল তখন আর তার কাছে ক্ষমতার উৎস থাকে না, হয়ে পড়ে খেলনার সামগ্রী। অথবা সমরেশ কি বোঝাতে চান যে সমাজের কাছে এরাও কুষ্ঠব্যাধি স্বরূপ। এর উত্তর অবশ্য তিনিই দিতে পারেন, যদিও সমকালের ইতিহাস অন্য কথাই বলে।

গ্রামের পটভূমিকায় সমরেশ বসুর গল্প 'বিবেক' (৫৫) নকশালবাদীদের প্রতি অন্য এক ফ্রন্ট থেকে আক্রমণ। এই গল্পের আখ্যানভাগ এইরকম: বিভূতি গ্রামের এক মাঝারি কুলাকের ছেলে। সে কলকাতায় এসেছিল এম-এ পড়তে। জেলা শহরের কলেজে পড়ার সময় থেকেই তার বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক ছিল. কলকাতায় আসার ফলে 'ওর রাজনৈতিক জগৎ আরো বিস্তৃত হয়েছিল।' এরপর পার্টি ভেঙে দু'ভাগ হোল; ওর রাজনৈতিক গুরুর অধ্যাপক গদাধর রায়ের উপদেশে ও 'জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবে'র প্রতি সমর্থন জানায়। এর মধ্যে বিভূতি এম এ পাস করে। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের পতন, বামফ্রন্টের মন্ত্রিসভা গঠন, ইত্যাদি ঘটনা ঘটে যায়। বিভূতিও জ্যোতি নাম্নীয় একটি 'স্বাস্থ্য আর লাবণ্যে' ভরা মেয়েকে বিয়ে করে ফেলে। এরপর ওর বাবা মারা যায়। বিভূতি ওর রাজনীতি (সি. পি. (এম)?) বিশ্বাসে অটুট ছিল এবং সেই মত কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের পতনে বিভূতির মনে হতাশা আসে। সেই সময়েই সে 'কমরেড গদাধর রায়ে'র কাছ থেকে 'চারুবাদের' কথা শোনে। তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন, 'গ্রামে ফিরে যাও, শ্রেণীশত্রু খতমের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ো। · নির্বাচন নয়, ক্ষমতা দখলের লড়াই। এর ফলে তার জীবনে এক নতুন উত্তরণ ঘটে। তার 'চোখে আগুন জ্বলেছিল. বুকে রক্তের তৃষ্ণা।' বিভূতি বদলে গেল। আশেপাশের গ্রামের যতগুলো বাড়িতে বন্দুক ছিল, ওরা ছিনিয়ে নিল; শুরু করলে 'খতম অ্যাকশন'।

বিভূতি আহত অবস্থায় পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। জেলের মধ্যে দল ভাগাভাগি হয়। আণ্ডারগ্রাউণ্ড থেকে আত্মপ্রকাশ করে গদাধর ঘোষণা করেন যে, 'আর চারুবাদ নয়, খতম নয়, সশস্ত্র বিপ্লব নয়।' সুতরাং জেল থেকেই বিভূতি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হয়। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ও বাড়ি আসে। স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে উঠে পড়ে গোপালের কথা, থাকে ও 'খোঁচড়' সন্দেহে খুন করেছিল। এবপর বিভূতি কলকাতায় এসে ওই ফেরিওয়ালা গোপালের স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে; সে তখন পেটের দায়ে, সন্তানদের বাঁচাবার তাগিদে বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ করেছে। গোপালের স্ত্রী কুসুম কিন্তু স্বামী হত্যার ব্যাপারটাকে তখন কপাল হিসেবে মেনে নিয়ে শান্ত; পরন্তু বলে যে, 'ওই উয়াদের, জামাইকে (বিভূতিকে) যারা জেলে পুরেছিল, উয়াদের মুণ্ডুগুলান কাটা যায় ক্যানে নাই?' ঘরে ফিরে এ ঘটনা যখন বিভূতি জ্যোতিকে বলে তখন 'জ্যোতির অপলক চোখ যেন আরো দীপ্ত দীর্ঘ হয়।' তারপর 'জ্যোতি মুখ তুলে বিভূতির দিকে তাকালো। জ্যোতি হাসছে। অনেক দিনের

পুরনো জ্যোতিকে যেন চেনা যাচ্ছে। এ হাসি আলগা না। এ হাসি জ্যোতির্ময়ী।'

লেখকের কাহিনী ও বিন্যাসের দিকে তাকালে এর বক্তব্য ও উদ্দেশ্য কিছুমাত্র গোপন থাকে না। 'জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের ধুয়া' যখন বিভূতির কাছে অর্থহীন হয়ে গেছে, তখন 'উত্তরের তরাই অঞ্চলে ক্ষমতা দখলের জন্যে সশস্ত্র রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম শুরু হয়ে' গিয়েছে। বিভূতিও যথানিয়মে গদাধরের নির্দেশে এই আন্দোলনে যোগ দেয়। সমরেশ এর ব্যাখ্যানে বলেন, তখন বিভূতির 'চোখে আগুন জ্বলছিল, বুকে রক্তের তৃষ্ণা।' অর্থাৎ প্রথমেই তিনি পাঠককে বুঝিয়ে দেন, নকশালবাদীরা আসলে প্রত্যেকেই এক একজন খুনে, তাদের বুকে প্রথমাবধি ছিল 'রক্তের তৃষ্ণা'। এদের আসলে কোন রাজনীতি নেই। সুতরাং খুনীরা যে রক্তপিপাসায় নিরপরাধ সাধারণ মানুষকে খুন করবে, এটাই তো স্বাভাবিক। গোপালকে খুন করার ব্যাপারটা তাই বেশ বড়ো করে তুলে ধরা হোল। আর সমরেশ তো বাঙালী উপন্যাস গল্প পাঠককে চেনেন; তাঁর এ-কৌশল ভাবপ্রবণ পাঠক মনে কী পরিমাণ কার্যকর হবে, তা তাঁর চেয়ে বেশি আর কে জানে। এর পরেই সেই পুরোন ভাববাদী ছক। অনুশোচনায় দগ্ধ বিভূতি গোপালের স্ত্রীর কাছে যায়। আর জ্যোতির খোঁচাটা 'এখন আর সশস্ত্র আন্দোলনে বিশ্বাস করো না, কিন্তু যে নিরপরাধ লোকগুলোকে তোমরা খুন করেছো, তার কী হবে ?'—তো ছিলই। বিভূতি জ্যোতির কাছেই ফিরে আসে অনুশোচনার আগুনে পুড়ে শুদ্ধ হয়ে। এখন সে দেবীপ্রতিমার মত ক্ষমাসুন্দর উজ্জ্বল 'জ্যোতির্ময়ী'কে দেখতে পায়। চমৎকার গান্ধীবাদী সমাধান। বুর্জোয়া মানবতাবাদের সুকৌশল প্রয়োগে পাঠককে অন্তত সাময়িকভাবে হলেও ভাববাদের চোরাগলিতে নিমজ্জিত করা গেল।

তিন ॥

স্বর্ণ মিত্রের 'গ্রামে চলো'(৫৬) উপন্যাসটির রচনাকাল ১৯৬২-৭০। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চম বার্ষিকী শ্রেণীর ছাত্র অনিরুদ্ধ বাগচী, ওরফে রঘু তালডাংরা গ্রামে যায়। 'আজ সে গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার বীর সৈনিক। চোখ ভরা তার স্বপ্ন আর আশা.... কারণ তালডাংরার কৃষক খুব শিগগিরি লৌহ দৃঢ় লাল ঘাঁটি গড়ে তুলবে। চিংকাং-এর মতো।' মাঝারি চাষী হীরেন নায়েকের বাড়িতে গৃহ শিক্ষক হিসেবে সে গ্রামে থাকতে শুরু করে। কিন্তু মাসখানেক কেটে যাবার

পরও সে কিছুই করে উঠতে পারে না; 'কৃষকদের চরম দুরবস্থার কথা', 'মহাজনের শয়তানির' বিষয়, তরাইয়ের কৃষক আন্দোলনের কথা কৃষকদের কাছে দিনের পর দিন বিশ্লেষণ করা সত্ত্বেও। হতাশায় ক্লান্ত শরীর নিয়ে ভোরবেলায় সে বেরিয়ে পড়ে ষোল মাইল দূর জামতাড়ার উদ্দেশে কমরেড অচিন্ত্য চ্যাটার্জীর সঙ্গে দেখা করার জন্যে। সেখানে দেখা হয় কমরেড অজয়দা'র সঙ্গে। সে ওর হতাশায় বিরক্ত হয়ে বলে, 'এটা কলকাতা নয়। অতো সহজে বিপ্লব এখানে সম্ভব নয়। হয় গ্রামে ফিরে গিয়ে মাটি কামড়ে থাকো, নতুবা ঘরের ছেলে ঘরেই ফিরে যাও। বিপ্লবীরা এসব মধ্যবিত্তসুলভ দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেয় না।' অচিন্ত্য এসে আলোচনার মাধ্যমে, মাও-ৎসে-তুঙের বক্তব্য বুঝিয়ে কেবল রঘুরই দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করে না, সেইসঙ্গে অজয়ের ধ্বংসাত্মক সমালোচনাও যে অনুচিত, সেটাও তাকে বুঝিয়ে দেয়। রঘু আবার গ্রামে ফেরে নতুন সংকল্পে বুক বেঁধে। অচিন্ত্য-র সঙ্গে আলোচনায় রঘু বুঝেছিল যে দিনমজুরের, গরিব চাষীর বন্ধুত্ব অর্জন করতে হবে, অধ্যবসায়ী ও ধৈর্যশীল হতে হবে। অতএব সে তার কাজের ক্ষেত্রকে বিস্তৃত করতে থাকে। ক্ষেতমজুর সত্যবানের সংস্পর্শে পায় নতুন শিক্ষা, অনুপ্রেরণা। বুঝতে পারে নিজের ভুল। 'ভুলটা তার হয়েছে শ্রেণী-বিশ্লেষণের। মাঝারি চাষীর বৈপ্লবিক কাজে অনাগ্রহ আর দোদুল্যমানতা দেখে সে হতাশায় ভেঙে পড়েছিল।...আজ সে বিশ্লেষণ করতে পারছে—হীরেন নায়েকরা মাঝারি কৃষক। তাদের মাঝারি সম্পত্তিটুকু শিকলের মত পায়ে আটকে আছে। আছে নিরাপত্তাবোধ। আর মধ্যবিত্ত মানসিকতার দরুন এই বুর্জোয়া শিক্ষার প্রতি এতো আকর্ষণ।...কিন্তু গরীব ও ভূমিহীন কৃষকের নেতৃত্বে যে বিপ্লব শুরু হোয়েছে, তাতেও হীরেন নায়েকের সক্রিয় সমর্থন প্রয়োজন, লড়াইকে সুদৃঢ় করবার জন্য।'

রঘু এরপর গ্রামে গ্রামে গরিব ও ভূমিহীন কৃষকদের নিয়ে ঘরোয়া আলোচনায় বসে। বোঝায়, ভোটের রাজনীতি গরিবের কোন সমস্যার সমাধান করতে পারে না। 'ভোটবাজীটা পুরো বড়োলোকের স্বার্থে।' 'বাইশ বছর ধরে ভোট দিয়ে গরীব থেকে আরো গরীব হোচ্ছো—আর মহাজনেরা আরো বড়লোক হচ্ছে।' বোঝায়, 'এই দেশের শতকরা পঁচানব্বই ভাগ লোক গাঁয়ের কৃষক। তারাই সবচেয়ে বেশী গরীব। তাদের ওপর মহাজন, পুলিশ, মন্ত্রী সকলে একজোটে অত্যাচার চালাচ্ছে।' বোঝায়, 'প্রথমেই আমাদের পার্টিটা গঠন করতে হবে। তাই গরীব আর ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে প্রচার করতে হবে লড়াইয়ের কথা।' রঘুর কথা অচিরে কৃষকদের মনে চিন্তার ঢেউ তোলে। মহাজনের অত্যাচার,

খিদের জ্বালা, মেয়েদের সতীত্ব, ইত্যাদি সব ঘটনাই তাদের চোখের সামনে, বুকের ভিতরে আগুনের মতো জ্বলতে থাকে। রঘুর কাজের উৎসাহ বেড়ে যায়। সে তাদের 'চেয়ারম্যানের' বাণী পড়ে শোনায়; শোনায় 'কমরেড চ্যাং-শু-তে', নর্মান বেথুনের কথা। সত্যবান ও তার খুড়ো আন্দোলনে মেতে ওঠে। ওদিকে 'পঞ্চাশটি মৌজার অধিনায়ক' সীতানাথবাবুও চুপ করে বসে থাকেন না। প্রশাসনের মদত পাবার সব ব্যবস্থাই তিনি করে ফেলেন। ভাগচাষীদের তিনি হুমকি দিতেও ভোলেন না, 'যে কৃষক পার্টিতে যোগ দেবে, তাকে সঙ্গে সঙ্গে জমি থেকে বিদেয় করা তো হবেই, উপরন্তু বেঁধে তুলে দেওয়া হবে পুলিশের হাতে।' এদিকে চাষীরাও সংগঠিত হতে থাকে। স্লোগান ফেরে মুখে মুখে, 'মজুতদারের মজুত ধন ছিনিয়ে নাও, বিলিয়ে দাও।' তারপর একদিন সত্যবানের 'লড়াই তোলার' প্রস্তাব গৃহীত হয়; কেননা তার মতে, 'শুধু বাজনা বাজালিই মানুষের মন জয় করা যায় না, পালা ত্যাখাতি হয়। তেমনি মোদেরও শুধুই প্রচার করি গেলি চলবেক্ না, লড়াই তুলতি হবেক্। নতুবা গাঁয়ের মানুষের মন এবং সাহায্য বুঝতি পারা যাবেক্ না।' রঘুর মনে অবশ্য তখন দ্বন্দ্ব উঁকি দিয়েছিল, লড়াইটা অর্থনীতিবাদের শিকার হবে না তো? পরমুহূর্তেই সে ভেবেছে, তা হতে পারে না, কারণ 'এই সশস্ত্র-সংগ্রামকেন্দ্রিক গণ-আন্দোলনগুলি শ্রেণীশত্রুদের আঘাত করে, রাষ্ট্রীয় যন্ত্রকে আঘাত করে, জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে তাদের সক্রিয়তা বাড়ায়।' রঘু, সত্যবান, খুড়ো, কালিপদ, রোহিণীদা, ভোলা, শবর এবং আরো অনাগত সহযোদ্ধারা এগিয়ে নিয়ে চলে লড়াইয়ের কাজ। আর এই কাজ যত এগোতে থাকে ততই বিচিত্র রকমের সরকারী-বেসরকারী লোকের আনাগোনা শুরু হয় গ্রামে। আসে সরকারী লোকজন নিয়ে ডাক্তার, উদ্দেশ্য জন্মনিয়ন্ত্রণের কাজে গ্রামীণ মানুষকে সাহায্য করা। আসে সর্বোদয় কর্মী, ভূ-দানে সকলকে উৎসাহিত করতে, 'মারামারি-হানাহানি'র পথ থেকে সরে আসার উপদেশ দিতে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। সংগঠিত কৃষকেরা একদিন মহাজন সীতারামবাবুর বাড়ি আক্রমণ করে; তাকে হত্যা করে, গোলার মুখ ভেঙে ধান বিলিয়ে দেয়, দলিলপত্রে আগুন জ্বালায়। তালডাংরা গ্রামের এ-সার্থকতা গ্রাম-গ্রামান্তরের চাষীদের মনে উৎসাহ যোগায়। ফলে ফরেস্ট গার্ড, সীমান্তরক্ষীরা, 'পজিশন্' নিতে থাকে। এমত সময়ে 'তালডাংরা পার্টি-ইউনিটের সদস্য শালবনীর ভূমিহীন চাষী' খুড়ো 'ধনুকের সঙ্গে বিষাক্ত তীর সংযোজন করে।' পরিণামে তাদের গুলিতে খুড়োর মৃত্যু হয়। মৃতদেহের পাশে দাঁড়িয়ে সত্যবান শান্ত স্বরে বলে, 'কমরেড! খুড়োর মৃত্যু মোদের জয়কে আরো নিশ্চিত ক'রলো।'

তত্ত্বগত বিবেচনায় স্বর্ণ মিত্র বহুলাংশেই সার্থক। চারু মজুমদার ছাত্র-যুবকদের প্রতি গ্রামে যাবার ডাক দিয়েছিলেন; 'লিবারেশন' পত্রিকার পাতায় গ্রামের সমীক্ষায় দেখান হয়েছিল কৃষকদের মধ্যে কোন অংশ বিপ্লবের সহায়ক, কোন অংশ প্রতিবিপ্লবী হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে; 'মহান চীন বিপ্লবের শিক্ষাকে কৃষক জনসাধারণের মধ্যে প্রচার ও প্রসারের'(৫৭) দায়িত্বের কথাও চারুবাবুর বক্তব্যে আছে, গেরিলা যুদ্ধ, জোতদার 'খতম' ইত্যাদিও তত্ত্বগতভাবে নকশালবাদী রাজনীতিতে স্বীকৃত। সুতরাং এই ছকে উপন্যাসের বিষয়টি বিন্যস্ত করলে তাত্ত্বিক ত্রুটি না থাকারই কথা। কিন্তু উপন্যাস যে-অর্থে সাধারণের পাঠ্য বা লেখকের মত পাঠকের কাছে পৌঁছে দেবার হাতিয়ার, সে-অর্থে তাকে কিছু শর্ত পূরণ করতে হয়, যার মধ্যে থাকে বিশ্বাস্য হয়ে ওঠা, অর্থাৎ পাঠকের কাছে উপস্থাপনার কৌশল, ঘটনায় পারম্পর্য, যৌক্তিকতা ও সংগতি এবং সর্বোপরি পাঠযোগ্যতা। এ-উপন্যাস স্বর্ণ মিত্র পূর্বাহ্নেই একটা তৈরি ছকে গল্পটা যেমন বসে, তেমনি সাজিয়েছেন। একারণে প্রারম্ভে মধ্যবিত্ত সন্তান বগুর হতাশা যে যৌক্তিকতায় উপস্থিত হয়, খেতমজুরদের সঙ্গে একাত্ম হবার ব্যাপারটায় সে-সংগতি প্রায় অনুপস্থিতই থেকে যায়। কৃষকদের ঘরোয়া সভায় মাও-এর উদ্ধৃতি বা মাও সে-তুং 'অনেক কাল বাঁচি থাক' ইত্যাদি বক্তব্য শুধু মধ্যশ্রেণীর শহুরে রাজনীতির কথা মাত্র হয়ে দাঁড়ায়। গরীব ও ভূমিহীন কৃষকদের শ্রেণীঘৃণা জাগ্রত হবার পেছনে যে কারণগুলি বর্তমান, বিশ্লেষণের অভাবে, পাঠকের মনে তা বিন্দুমাত্র দাগ কাটে না। মনে হয়, সমস্ত ঘটনাই লেখকের মনোগত বাসনার প্রতিফলন। তত্ত্ব ও তথ্যে সমৃদ্ধ স্বর্ণ মিত্রের এ-ব্যর্থতা দুঃখের। সম্ভবত ১৯৬৯-৭০ সালের পশ্চিম বাংলায় প্রাত্যহিক লড়াইয়ের মাঝখানে বসে ঘটনা থেকে যে-দূরত্ব একজন লেখকের প্রয়োজন হয়, স্বর্ণ মিত্রের পক্ষে সে দূরত্বে অবস্থান সম্ভব ছিল না। তদুপরি তাঁর এ ব্যর্থতার মূলে আছে শহুরে বুদ্ধিজীবী ছাত্রদের তত্ত্ব-সর্বস্বতা, যে তত্ত্বসর্বস্বতা কখনো তাদের গ্রামের আন্দোলনের মধ্যে মিশে যেতে দেয়নি। বক্তব্যটি এই পর্বের বহু লেখকের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। স্বর্ণ মিত্রের 'বাঘ-শিকার'(৫৮) গল্পটি (বাঘ শিকার গল্প-সংকলন) প্রসঙ্গেও উক্ত অভিযোগগুলি উপস্থাপিত হতে পারে। জোতদার খতমকে বাঘ শিকার হিসাবে বিবেচনা, তখন গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত। ডেবরা সাংগঠনিক কমিটি প্রচারিত একটা ইস্তাহারে (৫৯) লেখা হয়, 'বন্ধুগণ! আমরা বাঘ মারছি—বাঘ মারতে দয়ামায়া আর করুণার স্থান নাই। বাঘ মারবো, না হয় আমরা মরব।' বর্তমান 'বাঘ-শিকার' গল্পটিও একজন জোতদার হত্যার কাহিনী। গ্রামে বাঘ এসেছে।

চৌধুরীবংশের বর্তমান পুরুষ সতীনাথবাবু বাঘ মারবেন। 'সাতশত ঘরকে হত্যা করি যে বংশের জন্ম, তার নাম চৌধুরীবংশ। সীতানাথ তো তেনাদের ছা।' এহেন সীতানাথ জঙ্গল ইজারা নিয়েছেন। তাই জঙ্গলেই তাঁবু খাটিয়ে থাকেন। রাতে বাইরে পালা করে পাহারা দেয় দিনমজুরেরা টাঙি বল্লম নিয়ে। সীতানাথের থাকে বন্দুক। তবু তিনি ভয়ে অস্থির। এদিকে মজুরদের মধ্যে বিক্ষোভ। 'দূর হ সীতানাথের ছাঁ'। সীতানাথ শুনেছেন যে 'গোপীবল্লভপুরের পিতানাও গ্রামের কতিপয় মজুরেরা গুণ্ডামি রাহাজানি শুরু করেছে। একজন জোতদার খুন হয়েছে।' তবু মজুরদের ভরসায় তিনি রেখে যেতে পারেন না জঙ্গলের কাঠ। অবশ্য ডি. এফ ও সাহেব তাকে ভরসা দিয়েছেন। ইতিমধ্যে দুর্জন সিং একদিন গোপীবল্লভপুর 'জ্যাঠার ঘর' থেকে ঘুরে এসে মুণ্ডামারীব দিন মজুরদের নিয়ে বসে; বলে, 'মোদের বাপঠাকুদ্দা তেনাদের বাপঠাকুদ্দা যুগ যুগ ধবি এই অঞ্চলে বাস করতিছি। কিন্তু বাঘের মুখে ক'জনা মরিছে, আর মহাজনেব পীড়নে ক'জনা মরিছে হিসাব করো তো!' হিসেব অবশ্য তারা করে। 'গোপনে গোপনে মাটি তৈরী হতে থাকে।' তারপর একদিন খবর আসে। 'ভোরের খবর; সীতানাথ বাবুর হাতেই নাকি চন্দনপুরের শেষ ও বড় বাঘটা শিকার হয়েছে। বেলাব খবর: শিকার পাওয়া গেছে। তিন খণ্ডে—সীতানাথ বাবুব লাশ।'

এ-গল্পেও বাঘ শিকার প্রসঙ্গে চমৎকার প্রেক্ষিত গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন লেখক; কিন্তু বাঘ-শিকার ও জোতদার খতম যে সমার্থক অর্থে লেখক তুলে ধরতে চেয়েছেন সে বিবেচনায় এর সার্থকতা বিষয়ে প্রশ্ন জাগাই স্বাভাবিক। চৌধুরীবংশের মহিমা কীর্তনে ও সীতানাথের কর্মকাণ্ডের চিত্রায়ণে লেখক যে নৈপুণ্য দেখান, তুলনায় মজুরদের ওপর তার শোষণ বা তাদের ক্রোধের মূল কারণসমূহ প্রায় অকথিতই থেকে যায়। দুর্জন সিং গোপীবল্লভপুর থেকে শুনে আসে সেখানকার ভাগচাষী খেতমজুরেরা 'কঠিন লড়াই তুলছেন'। উত্তরে আলোচিত হয় অনেক অনেক বছর আগের সেই 'সাতশত ঘড়ুইকে খুন করিছিল নরহরি চৌধুরী' অথবা 'মোদের জঙ্গলমহলের পূর্বপুরুষেরা জমিদারদিগের ভয়েই মাটির তলায় ঘর বাঁধি থাকত'। অথচ এর চেয়ে, চাষী-মজুরের কাছে বোধহয় অনেক জীবন্ত বর্তমানের ঘটনাবলী। অথচ এ বিষয়ে মাত্র একটা স্লোগানের মত ('আইন কোন বাঘে মোদের ভাত মারে, ভিটা কাড়ে?') বক্তব্য ছাড়া কোন কথাই উচ্চারিত হয় না। তাহলে কোন পথে বা কেন তাদের শ্রেণীঘৃণা জাগ্রত হয়েছিল, কেনই বা হঠাৎ তারা সীতানাথবাবুকে 'খতম' করে, সে প্রশ্ন পাঠকের মনে থেকেই যায়।

স্বর্ণ মিত্রের 'প্রসব'(৬০) গল্পটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' গল্পটিকে মনে করায়। 'দশ মাসের পেট' নিয়ে আন্না এসে দাঁড়িয়েছিল হৃদয়পুরের সীমান্ত রক্ষীর ক্যাম্পের সামনে। কমাণ্ডার সাহেবের প্রশ্ন, খিস্তি ইত্যাদির পর আন্না যখন যাবার অনুমতি পেল তখন সন্ধ্যা। তাড়াতাড়ি হাঁটতে থাকে সে। সামনে শালবনের ছোট্ট ঐতিহাসিক স্মৃতিপট—'পুলিশের গুলিতে মরণের আগে সিদু মাঝি এই বনেই নাকি ছিলেন।' অন্ধকার জঙ্গলের দীর্ঘ ঐতিহাসিক পথ হেঁটে নির্দিষ্ট সময়ের কিছু পরে পৌছয়। তাকে দেখা মাত্র ছনের বাড়ির ভাঙা বেড়ার ওপাশ থেকে একের পর জোয়ান ছায়া বেরিয়ে আসে। 'তারপর সাঙাৎদের সামনে, ডিবের আলোয়, ছনের চালায়—ছমছমে হৃদয়পুরের সান্ধ্য আইনের বুকে—পোয়াতী আন্না প্রসব করলো—চারটে রিভলবার, অনেকগুলো দলিলপত্র এবং আপত্তিকর লাল বই.' এখানে 'সিদু মাঝি'র উল্লেখে সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রেক্ষাপট আনা হয়েছে; ধারাবাহিকতা বোঝানোও বোধহয় লেখকের উদ্দেশ্য। টুকরো টুকরো কথার ইঙ্গিতে পুলিশী হামলা, গ্রামীণ পরিবেশ বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এবং আন্না যা প্রসব করেছে, রিভলবার, দলিলপত্র এবং লাল বই, তা যে নিতান্তই দ্রব্যমাত্র নয়, রাজনীতি ও সশস্ত্র সংগ্রামের হাতিয়ার সেসত্য অনুধাবনে দেরি হয় না।

স্বর্ণ মিত্র সশস্ত্র সংগ্রামের চিত্রণে যত বেশি তৎপর, কারণাদি ব্যাখ্যানে তত নন। সম্ভবত পাঠকের কাছে তাঁর প্রত্যাশা কিছু অতিরিক্ত। কিন্তু যে যে কারণে উক্ত সশস্ত্র সংগ্রামের প্রয়োজন, এবং যার সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কাল থেকে আজ পর্যন্ত বিদ্যমান ভূমি-ব্যবস্থা ও কৃষক-শোষণ জড়িত, তা বোধহয় বারংবার তুলে ধরার প্রয়োজন আছে। যে ঐতিহাসিক দায়িত্ব একা মহাশ্বেতা দেবী বহন করে চলেন, তার গুরুত্ব অনুধাবন ভিন্ন কোন সমাজ সচেতন লেখকের উত্তরণ ঘটা অসম্ভব। কার্যত সশস্ত্র সংগ্রাম ও তার বিভিন্ন সমস্যাবলী তখনই পাঠকমানসকে আক্রান্ত করতে পাবে, যখন তা যথার্থ প্রেক্ষিত পায়। আমার বিবেচনায়, লেখার মুন্সিয়ানার চেয়েও, প্রাথমিকভাবে সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

বেণী দাশগুপ্ত ১৯৬৭ সালে (নকশালবাড়ি আন্দোলনের বছরেই) লেখেন 'সন্তানের নাম ধান'(৬১) নামীয় গল্প। খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবি পরা 'ত্রেতা যুগের প্রতীক' মদন দত্ত ভাতুড়ে গ্রামের জোতদার এবং মোড়ল। গ্রামের সকলের 'ধন-মান-ইজ্জৎ এমনকি প্রাণটুকু পর্যন্ত বাঁধা' তার কাছে। রাতের আঁধারে গ্রামের ধান-চাল-আনাজপাতি সে ট্রাকে করে শহরে চালান দেয়। যাদের শ্রমের বিনিময়ে এর উৎপাদন, তারা থাকে অভুক্ত। গাঁয়ের প্রাইমারী স্কুলের মাস্টার

দেবু 'লাল ঝাণ্ডা' করে ; 'নতুন এক উৎপাত শুরু করেছে আজ বছরখানেক যাবৎ কৃষক সমিতি, গাঁয়ে আকাল যত বেশী হয়, তত ওটা বড় হয়।' দেবু জানে 'তেলেঙ্গনা-কাকদ্বীপের ব্যর্থতার ইতিহাস।' এই দেবুই এক রাতে আবিষ্কার করে তার একদা ছাত্রী ভাগচাষী করিমের মেয়ে পঞ্চদশী রাবেয়াকে, যে মোড়লের কাছ থেকে মাত্র দু কিলো চাল পেয়েছে নিজের দেহের বিনিময়ে। 'এ গাঁয়ে বা আশপাশ গাঁয়ে আজ এ ঘটনা নতুন নয়।' এরপর মাঠে যখন ধান পাকে, তখন কিষাণদের সঙ্গে জোতদার মদন দত্তের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। মাঠ ঘিরে দাঁড়ায় কিষাণেরা ; পুলিশ বলে ধান কাটা চলবে না। দেবু জানতো পুলিশ জোতদারকে মদত দেবে। সে ছোটে কলকাতায়, দেখা করে কৃষক নেতাদের সঙ্গে মন্ত্রীদের সঙ্গে। তারা বলেন, অপেক্ষা কর, গোলমালে যেও না, নকশাল-বাড়ির হঠকারি পথে যেও না। সেখান থেকে ফিরে দেবু মাঠে গিয়ে দাঁড়ায় চাষীদের পাশে। এতদিন তার নিজের মধ্যে যে সংশয় ছিল, তা কেটে যায়। সে উপলব্ধি করে, 'এরা রুখুক বুক দিয়ে ধান। এখন ওদের থামান মানে সংগ্রামের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা।' প্রচলিত সাহিত্যবিচারে এ গল্পের লিখনরীতির ত্রুটি অনেক ; কিন্তু কৃষকদের দারিদ্র্য-অনাহারের প্রেক্ষিতে ধান রক্ষার লড়াই, একজন সৎ কৃষাণসভার নেতার চরিত্র ও 'সংশোধনবাদী' পার্টি নেতৃত্বের সঙ্গে বিরোধের যে চিত্রটি এখানে উপস্থাপিত হয়, তা অবশ্যই স্বীকার্য।

উক্ত গল্পে দেবুর উপলব্ধি ও সিদ্ধান্তের মধ্যে দিয়ে মধ্যবিত্ত পার্টি নেতার যে রূপান্তর দেখান হয়, তার পেছনে আছে কৃষকসভার আন্দোলনের ব্যর্থতার বা বিশেষ স্বার্থে পরিচালনার পুরো ইতিহাসের তাৎপর্য। চারু মজুমদার লিখেছেন, 'কৃষকদের মধ্যে যে পার্টিসভ্য ছিল সেখানেও শ্রেণী বিশ্লেষণ করা হোত না, বিপ্লবী রাজনীতির অভাবে কৃষকদের সুমহান দায়িত্ব সম্পর্কে সজাগ করে তোলা হত না, সংস্কারবাদী কৃষকসভা, যার নেতা প্রধানত ধনী কৃষক ও মধ্য কৃষক এবং যাকে আইনানুগ আন্দোলনের পথে পরিচালনা করা হোত, ফলে পার্টি সভ্যদের বেশিরভাগই হোত ধনী ও মধ্যকৃষক এবং আইনানুগ আন্দোলনের দরুন সেখানেও মধ্যবিত্ত পার্টিনেতার নির্দেশ পালনই তাদের প্রধান কাজ হোত। ফলে শ্রমিক ও কৃষক পার্টিসভ্য থাকা সত্ত্বেও পার্টি মূলত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পার্টিতে পর্যবসিত হয়েছিল। তারই ফলে পার্টি একটি খাঁটি সংশোধনবাদী পার্টিতে রূপান্তরিত হয়েছে। একটি সংশোধনবাদী পার্টির মতই আমাদের পার্টিও একটি নির্বাচন থেকে আর একটি নির্বাচন পর্যন্ত যে সব আন্দোলন পরিচালনা করত তার লক্ষ্য থাকত পরবর্তী নির্বাচনে বেশি আসন দখল। পার্টির প্রধান কেন্দ্রগুলি ছিল

শহরে এবং শহরে আন্দোলন সৃষ্টি করাই পার্টির প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এমন কি গ্রামের কৃষককেও শহরে আনা হোত শহরের আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য।'(৬২) এই নির্বাচনের রাজনীতিতে 'পার্টি বদল হয় কিন্তু জনগণের ভাগ্য বদল হয় না'; সুখেন মুখোপাধ্যায়ের 'পূর্ব দিগন্ত'(৬৩) গল্পের এটিই মূল বক্তব্য। সীতেশ পার্টির পুরোন কর্মী। নির্বাচনে পার্টির জন্যে খাটছে। গ্রামের খেতমজুর সুরতুল্লা সেখেরা যখন তার কাছে অনাহারের কথ', কাজের কথা বলে, সে জানায় কংগ্রেসের বদলে যুক্তফ্রণ্টকে ভোট দিলে তোমাদের দুঃখ ঘুচবে। ভোটে যুক্তফ্রণ্ট ক্ষমতায় আসে। কিন্তু সমস্যার কিছুমাত্র আসান হয় না। চালের দাম বাড়ে। সরকারের হাতে ন্যস্ত জমি নেই। ভূমিহীনেরা যেখানে ছিল সেখানেই থাকে। তাদের দারিদ্র্য আরো বাড়ে। 'পশ্চিমবঙ্গের চাষীরা সরকারী পতিত জমি দখল করলে যুক্তফ্রণ্টের পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়েছে তাদের ওপর।' যুক্তফ্রণ্টের পতন হোল। আবার নির্বাচন আসে। কিন্তু এবার সীতেশ বোঝে ভোটের রাজনীতিতে কোন সমস্যার সমাধান হয় না। সে নকশালবাদী রাজনীতির শরিক হয়। 'বারুদের গন্ধে ভরে উঠল ভারতবর্ষের আকাশ। সে আলো এসে মিশে গেল তরাই-এর ছোট্ট দীপশিখার সঙ্গে।'

'সংশোধনবাদী' রাজনীতির বিরুদ্ধে নকশালবাদীদের আদর্শগত লড়াইয়ের অন্য চিত্র অঙ্কিত হয় ব্রজেন মজুমদারের 'খোদহাটির ডাক'(৬৪) গল্পটিতে। খোদহাটির মাঠ থেকে ভাগচাষীদের উচ্ছেদ করতে চায় জোতদাররা তাদের গুণ্ডা, ঠেঙাড়ে বাহিনী তৈরী আছে। এদিকে কৃষকেরাও তৈরি। তাদের লাঙল মাঠে নামবেই! জমির অধিকার ওরা রক্ষা করবেই। রাধিকা ওদের বোঝাতে থাকে 'খবদ্দার, হটকারী করোনি।' 'জমির লড়াই হবে শান্তিপূর্ণ।' সোনা মাহাতো ক্ষেপে যায়। বলে, 'জমি রক্ষা করবো, লড়াই করবো নি—এসব সুবিধাবাদী কথা, মতলব খারাপ।' এইসব আলোচনার মধ্যেই সকলের খেয়াল হয়, মধু মাহাতো এখনো আসেনি। বাড়ি থেকে মধ্যরাতে খবর আসে সে তখনো ফেরেনি। মধুর ছেলে সোনা তাকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়ে। গ্রামের পর গ্রামে সে মধুকে খুঁজতে থাকে। সকলকে শুধোয় তারা কাল খোদহাটির মাঠে যাবে কি না। সকলেই একের পর তাকে 'না' জবাব দিয়ে যায়। অবশেষে সে পৌঁছয় নয়াবাদের কৃষক সমিতির অফিসে। সেখানে কালীবাবু বলেন, মধু এসেছিল কাল। 'তাকে নিরস্ত্র করা গেছে।' সোনা তার কথায় অবাক হয়! তার মানে কাল খোদহাটির মাঠে লাঙল পড়বে না। পড়লেও তা চাষের জন্যে, মালিকানার জন্যে নয়। কালীবাবু বলেন, 'জোতদারদের সঙ্গে একটা আপোসরফা

হচ্ছে।' উত্তরে সোনা বলেছে, 'আজ খোদহাটির চাষীর মাথায় যখন জোতদারের লাঠি ভাঙছে, তখন আপনারা চাষীর হাতের লাঠিটা কেড়ে নিচ্ছ'। সোনা আবার ছুটতে থাকে মধুর খোঁজে। অবশেষে খবর পায় জোতদার তাকে মেরে গুম ঘরে ফেলে রেখেছে, রাতেই পুড়িয়ে ফেলবে। জোতদারের বাড়িতে ঢুকে পিতার লাশ খুঁজে পেতে তার দেরি হয়নি। কিন্তু বাধা পেল বেরিয়ে আসার সময়। তারপর লড়াই করে জোতদার শ্রীধরকে 'খতম' করে সে পিতার দেহ এনে রাখে খোদহাটির মাঠে। পিতার নামে সোনা ডাক দেয় সমস্ত কিষাণদের। গল্পের প্রথমাংশে দুই রাজনীতির মৌল সংঘাতটির প্রকাশে লেখকের মুন্সিয়ানা অবশ্যই স্বীকার্য; একদা জমির মালিক কি করে নিজের জমি হারিয়ে ভাগচাষীতে পরিণত হয় এবং জোতদারেরা তাদের কিভাবে জমি থেকে উচ্ছেদ করতে চায়, আর তার বিরুদ্ধে বর্গাদারদের জমির লড়াইকে জোতদারের স্বার্থে পরিচালনা করতে চায় এক রাজনৈতিক মতবাদ ও দল—সব নির্মম সত্যই এখানে উদ্‌ঘাটিত। কিন্তু সোনার জোতদারের বাড়িতে ঢোকা থেকে পিতার শবদেহ বহন করে মাঠে আনা পর্যন্ত ঘটনাবলী হিন্দী ফাইটিং ছবির হিরোকে স্মরণ করায়। বিপ্লবী রোমান্টিসিজমকেও বাস্তবতার হাত ধরে এগোতে হয়—লেখক এ আপ্তবাক্য ভুলে এক আশ্চর্য সম্ভাবনাকে ভ্রূণেই হত্যা করেন।

নির্মল চন্দের 'আবার উজান'(৬৫) গল্পটির নারান ছিল গরিব কৃষক। পরপর কয়েক বছর অজন্মার ফলে নিজের সাত বিঘে জমি তাকে একে একে বন্ধক দিতে হয়েছে জোতদার সুজন মহাজনের কাছে। তারপর থেকেই সে ভাগচাষী; কিন্তু সুজন মহাজন কখনো তার পাওনা আধা ফসল দেয় না, সুদ বাবদ সবটাই নিয়ে নেয়। নারান বা নারানদের চুপ করে থাক ছাড়া উপায় নেই, এমনকি সনাতনের পনের বছরের মেয়েটার ইজ্জত নিলেও। কারণ 'টাকার জোর আছে মহাজনের, তাছাড়া থানার দারোগার সাথে ওঠাবসা খানাপিনা চলে।' কিন্তু সহ্যেরও সীমা আছে। তাই একদিন বাদল শেখ, নারান এবং আরো জনা চোদ্দ মিলে সুজন মহাজনের বাড়ি আক্রমণ করে। বাদলের হাতে সুজন 'খতম' হয় আর সুজনের লাঠিয়ালেরা নারানের পাটা খোঁড়া করে দেয়। বাদল ফেরার হয়েছিল, নারান ছ'মাস জেল খেটে গাঁয়ে ফিরে আসে। তার ভাইপো মিহির তখন সুরেন মণ্ডলের বাড়িতে পেটভাতা, আর বছরে কুড়ি টাকায় রাখাল ছিল। এরপর থেকে দু'জনের সংসার। দৈনিক পাঁচ টাকা হিসাবে ওরা একটা বিল মাছ ধরে; সে মাছ বিক্রি করে বন্দোবস্তের টাকা দিয়ে যা থাকে তাতেই ওদের দিন গুজরান। ইতিমধ্যে একদিন সুধীর মহাজন 'খতম' হয়; তার দলিলপত্র

পুড়িয়ে, গোলার ধান বিলিয়ে দেওয়া হয়। মাছ ধরতে ধরতে মিহির বলে, 'গরীব চাষী আর জোতদার মহাজনের জুলুম সইবে না; একটা লড়াই হবে। ...নতুন করে রাজত্ব তৈরী করবে গরীব মজুর চাষী। সবাই জমি পাবে, জোতদার মহাজন থাকবে না।' তখন নারানের হাতও মুঠো হয়ে যায়। অবশ্য নারান সব বুঝে উঠতে পারে না, কিন্তু এটা বোঝে যে 'সুধীর মহাজন খুনের ব্যাপারে মিহির কিছু জানে।' তারপর একরাতে পুলিশ আসে। নারানকে আধমরা করে, ঘর তছনছ করে যায়। মিহির তার আগেই পালিয়েছে। 'রোহিণী মণ্ডলের সঙ্গে দারোগা রওনা দিলেই শঙ্কর এগিয়ে আসে। এর সঙ্গে আরো কয়েকজন কয়েকটা হাত নারানকে তুলে দাঁড় করায়। শঙ্কর নিচু গলায় বলে—'হ' জুলুম ভুলব নাই। জনাকয়েক মিহিরের শক্ত হাতে, খোঁড়া পায়ে সোজা, আরো সোজা হয়ে দাঁড়াতে দাঁড়াতে নারান খোঁড়া পাটার কথা ভুলেই যায়। মিহিরের কথা ভাবে, লড়াইয়ের কথা ভাবে।' গল্পটিতে, একজন ভীরু সহায় সম্বলহীন ভাগচাষী কেমন করে বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়, তা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন লেখক। সর্বোপরি নারানের সকলের হাত ধরে উঠে দাঁড়াবার মধ্যে যে ব্যঞ্জনা প্রকাশ পায়, তাকে সর্বাংশে শ্রেণীচেতনারই জন্ম হিসেবে চিহ্নিত করা চলে।

জয়ন্ত জোয়ারদারের 'এভাবেই এগোয়'(৬৬) উপন্যাসে গৌতম ওরফে অশোকের গ্রামে যাওয়া, সংগঠন গড়া থেকে শুরু করে তার জেলে যাওয়া, নিহত হওয়া পর্যন্ত নকশালবাদী আন্দোলনের প্রায় সমগ্র সময়কাল বিধৃত হয়েছে। শহরের মধ্যবিত্ত পরিবারে শিক্ষিত ছেলে গৌতম মালদার গ্রামে যায় 'কৃষি-বিপ্লবের' স্বপ্ন বুকে নিয়ে। পুরোন পরিচয় মুছে ফেলে সে অশোক হয়। মালদাতে ওর সাময়িক থাকবার জায়গা ঠিক হয়েছিল মিনুদের বাড়িতে। জেলা পার্টির নেতা জহর সব ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। এই মিনু নামের মেয়েটি ভালবাসে দীপু নামক এক প্রেস-কর্মীকে। এখান থেকেই অশোক চলে যায় জয়রামপুরে পুনর্ভবার ডোবা অঞ্চলের একটা গ্রামে। এই ডোবা অঞ্চলের নমঃশূদ্র, রাজবংশী ও সাঁওতালদের মধ্যে কাজ শুরু করে অশোক। 'সাঁওতালদের ওপর শোধনবাদী পার্টিগুলোর প্রভাব বেশি। এই এলাকার মানুষগুলোকে নিয়ে, তাদের সংগ্রামী শক্তিকে নিয়ে এই বদমাইশেরা কী ছিনিমিনিই না খেলেছে। সাঁওতালদের সঙ্গে নমশূদ্রদের বিরোধ, হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানদের বিরোধ জোর করে জিইয়ে রাখছে এই ভোটের পার্টিগুলো।' অশোকের সংগঠন গড়ার কাজ এগুতে থাকে। এ-সময়ে একদিন জেলার পার্টি-নেতারা এক গোপন বৈঠকে মিলিত হলেন।

'শ্রীকাকুলামে সোমপেতার কৃষক গেরিলারা অত্যাচারী জমিদারকে খতম করেছে। সেই অভিজ্ঞতার সারসঙ্কলন করে পার্টি-নেতৃত্ব দশ পয়েন্ট একটা নির্দেশ গ্রামের পার্টি-কমিটিগুলোর কাছে পাঠিয়েছেন।' দেবেন, রবীন প্রমুখ পার্টি কমরেডরা সকলেই 'জমিদার খতমের' 'লাইন' পাওয়ায় উল্লসিত। অথচ জেলা কমিটির সম্পাদক জহরের মনে তখন সংশয়। 'জহরের মাথায় চেয়ারম্যানের কথাগুলো ঘুরপাক খাচ্ছে, সুদৃঢ় গণভিত্তি ছাড়া সমতল অঞ্চলে লড়াই টিকে থাকতে পাবে না। প্রস্তুতিবিহীন উৎকৃষ্ট অবস্থা উৎকৃষ্ট অবস্থা নয়। ও ঠিক বুঝতে পারছে না, এই আটজন কর্মী ক'জন কৃষকের কাছে পার্টির বক্তব্য নিয়ে পৌছোতে পেরেছে? গাজোলেই তো ও প্রায় মাস নয়েক আছে, ক'জন কৃষক সঙ্গে আছে? পাঁচ-সাতটা গ্রামে কোথাও পাঁচজন কোথাও তিনজনের পার্টি-কমিটি। আর সাধারণ সমর্থক প্রচারকের সংখ্যাই বা কত, আরও জনা তিরিশ।' রবীনের মনে কোন প্রশ্ন নেই। সে তখনই 'খতমের' কাজে নেমে পড়তে চায়। অশোকও এই মতেই সায় দেয়। সে বলে, 'আমাদের সামনে এদ্দিন গ্রামের কাজের কোন লাইন ছিল না, আমরা প্রচার করেছি, সংগঠন গড়েছি, হয়ত খুব বেশী পারিনি, কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, কৃষকেরা শোষণের চূড়ান্ত সীমায় এসে পৌছেছে ... মাণিকচকে কিছু বাঁশ ও গাজোল বামনগোলায় কিছু জোতদারের জমি থেকে ধান কেটে নেওয়াই আজ অব্দি আমাদের নেতৃত্বে হয়েছে। একাজ শোধনবাদী পার্টিগুলোও করে। এতে শোষণের মূলে আঘাত করা যায় না। শোধনবাদীদের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য-রেখাই হবে খতমে।' এরপর পার্টির নির্দেশ মেনেই জহরের স্কোয়াড জোতদার-খতমে নেমে পড়ে। নেতৃত্ব ছিল টুড়ু নামের এক কিষাণের। কিন্তু জোতদার অনাদি রায় সেদিন কোন কারণে ফেরেনি। কিন্তু অভিযানে সমস্ত সময় ভয়ে-সংশয়ে কেঁপেছে জহর। হরিশ্চন্দ্রপুরে একটা অ্যাকশন হয়। গাজোলে ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলস-এর অনেকগুলো ক্যাম্প বসে যায়। অশোকেরা ঠিক করেছিল 'দেড় হাজার বিঘের ভূষমণ' মণিরাম ভগতকে 'খতম' করবে। কিন্তু কয়েকদিন চেষ্টা করেও পারে নি। খতম ও খতমের সংবাদে 'জোতদারেরা সাবধান হয়েছে। কংগ্রেসী থেকে মার্কসবাদী সব পার্টির লোকেরাও একজোট হয়েছে শান্তিরক্ষায়।' এ সময়েই একদিন পুলিশের হাতে ধরা পড়লো অশোক। পুলিশ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে ও তল্লাসি চালাতে থাকে। অনেকেই ধরা পড়ে অথবা গা ঢাকা দেয়। জহর পার্টি লাইনের সঙ্গে একমত না হওয়ায় সম্পাদক পদ থেকে ইস্তফা দেয়। নতুন সম্পাদক হয় রবীন। আর মিতু একদিন খবর পায় তার একান্ত ভালবাসার মানুষ অশোক জেলে নিহত হয়েছে। এই

মূল ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ-উপন্যাসে শহরের নকশালবাদী আন্দোলন, মিনু প্রমুখ মেয়েদের ছোট ছোট সুখ-দুঃখ-ভালবাসার জগৎ থেকে বৃহত্তর জনচেতনার মধ্যে আসা, মধ্যবিত্ত জীবনবোধ, সুজিতদের শৌখিন নকশালবাদ ইত্যাদি ঘটনাবলীর উপস্থাপন। আন্দোলনের সামগ্রিক চরিত্র-চিত্রায়ণের ক্ষেত্রে মূল্যবান। ভূমিহীন কৃষকদের দারিদ্র্য, ক্রোধ এবং সংগত কারণেই অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ যেভাবে এ-উপন্যাসে এসেছে, তা কখনোই রোমান্টিক ভাবনার ফসল বলে মনে হয় না; যেমন বাস্তবায়িত হয়েছে জহরদের সংশয় ও সংকট। কিন্তু উপন্যাসের সমাপ্তিতে এসে, জহরের মিনুকে লেখা চিঠি ('আমাদের মত লক্ষ কোটি মানুষের ব্যক্তি-জীবনের ছোট দুঃখ-সুখ—বহতা নদীর শুধু ঢেউয়ের মত। গত বছর মহানন্দায় দেখেছিলাম নদীগর্ভে ভীষণ এক চর। মহানন্দাও নিশ্চয়ই থেমে যাবে না, আগামী কোন এক ভরা বর্ষায় গতিপথ পরিবর্তন করবে।') সত্ত্বেও, যে সর্বব্যাপ্ত হতাশা ছড়িয়ে পড়ে, তা বোধ হয় ইতিহাসের বিকৃতি। অন্তত সমকালের সত্য তা নয়ই।

অংশু চৌধুরীর 'শীতলাতলির গল্প' (৬৭) ভাগচাষীদের ধানের লড়াইয়ের গল্প। গ্রামের পঁচিশ একর জমির মালিক রামাই মল্লিক, একই সঙ্গে পাটের আড়ত, মাছের ভেড়িরও মালিক। স্বাভাবিক নিয়মেই ধান কাটার সময়ে চাষীদের সঙ্গে রামাইয়ের বিবাদ বাধে। গাঁয়ের চাষীদের বিরুদ্ধে লাঠি ধরবার জন্যে আনা হয় পচাকে। কিন্তু সম্মিলিত চাষীদের লাঠির ঘায়ে রাতে মাঠেই নিহত হয় পচা। পরদিন ভোরে অবশ্য শীতলাতলির পঞ্চাশ জন চাষী পচার জন্যে 'সহানুভূতিশীল'ও হয়। কারণ সেও তো ছিল চাষী ঘরের ছেলে, শুধুমাত্র 'বাবুর অনুগত পেরজা' হতে গিয়ে সে মরলো। এরপরই দারোগা আসে, সঙ্গে পাঁচজন কনস্টেবল্। এবং মাঠের সব চাষীই বলে সকলেই ওকে মেরেছে। এখানে কথায় কথায় রামাইয়ের নামটা ওঠে। দারোগা কাউকে গ্রেপ্তার না করেই লাশ নিয়ে পেছু হটেন। তিনি জানতেন, 'ওখানে একটা কুটো ছোঁয়ালে আজ আর বাড়ি ফিরতে হত না।' তারপর ঘুরপথে তিনি লাশ নিয়ে হাজির হন রামাই মল্লিকের বাড়ি। রামাই জানতে পারে যে অকুস্থলে চাষীরা তার কথা তুলেছে। সুতরাং দারোগা ও রামাই মিলে লাশ গুম করে দেয়। তারপর সে চাষীদের গিয়ে বলে আসে যে পচাইয়ের ব্যাপারে তার কোন দোষ নেই। 'শূয়োরের বাচ্চা দল পাকালো কি না আমার গাঁয়ের চাষীদের ধান লুঠ করব' জন্মি, ছিঃ ছিঃ।' আর এসব কথা যেন গোপন থাকে। চাষীঘরের ছেলে পচা যে রামাইয়ের আদেশে ধান কাটতে এসেছিল আর প্রাণও দিল, চাষীরা অবশ্য এ সত্যটা বুঝতে ভুল করেনি। তাই

বিকেলে 'সফিক মিঞা, হারান ঘোষ এবং গুখা হারানের বাড়ীর দাওয়ায় বসে কী এক সলাপরামর্শে ব্যস্ত' হয়। গুখাকে একদিন আর দেখতে পাওয়া যায় না। আর পরদিন সকালেই জানা যায় যে রামাইয়ের ছেলে ভেড়ি দেখতে গিয়ে আর ফেরেনি। গল্পটির উপস্থাপনা রচনাশৈলী ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন তোলার কোন অবকাশ আছে। রামাইয়ের ছেলেকে মারার ব্যাপারে লেখক যে যুক্তি ও সিদ্ধান্তের অবতারণা করেন (যদিও গল্পে তা খুব স্পষ্ট নয়) তা কি রাজনীতি হিসেবে স্বীকার করে নেওয়া চলে ? জোতদারের গুণ্ডা বা মস্তানের শোকপ্রকাশ বা প্রতিশোধ গ্রহণে যে শ্রেণীচেতনা প্রকাশ পায়, তা কি সঠিক ?

তুলনামূলকভাবে কারুকর্মের যথেষ্ট কুশলতা না থাকলেও একলব্য ঘোষের 'হাবা' (৬৮) গল্পটিতে এই শ্রেণীচেতনা স্পষ্টত প্রকাশ পায়। হাবা ক্ষেতমজুর। গ্রামের লোক জানে সে কাজেও হাবা অর্থাৎ ভালোমানুষ। নকশালবাদী কর্মীরা গ্রামে এলে তার বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছে। হাবা তাদের সঙ্গে অনেক কথা বলেছে। এমন সময় গ্রামের জোতদার 'খতম' হয়। কিন্তু তার টাকা-পয়সা জিনিসপত্তরে হাত না পড়ায় পুলিশ ও গ্রামের সকলে বলে যে তাকে নকশাল-বাদীরাই হত্যা করেছে। পুলিশ কাউকেই গ্রেপ্তার করতে পারেনি। হাবা সকালে জাল নিয়ে খানা-খন্দে খেপ দিয়ে বেড়ায়। চারটে চুনো মাছ পেলে ছেলে-বউ খেয়ে বাঁচবে। চাট্টে চাল বউ যোগাড় করবেই। খাওয়া-দাওয়ার পর শুয়ে যখন বউ বলে, 'কি যেন এট্টা ওলট-পালট হবে মন নেয়।' তখন হাবা বলেছে, 'সে তো ভালই, গরীবির অবস্থা পাল্টাবে।' আর তখনি তার চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে করে, 'আমি—আমি—আমি। আমি হাবা। বউ।' বউ জেনে চমকে উঠতেই সে আবার বলেছে, 'বউ, মানুষের ভাল হবে—গরীব মানুষের।'

রাম রায়ের 'প্রতিরোধ'(৬৯) গল্পটি চাষীদের ধান কাটার লড়াইয়ের কাহিনী। মহাজন গোকুল গ্রামের বাইরে ধান বিক্রি করে দিচ্ছে। নন্দ ধান কিনে রাতের অন্ধকারে তা নৌকোয় করে পাচার করছে। এদিকে 'বর্ষার পর আমন শীতে সোনালী ফসল মাঠে দেখা যায়, কিন্তু তারপর যে কোথায় যায়, কেউ জানে না। সারা বছর চাষীর ভিটেতে শেয়াল কাঁদে। অনাহারে মানুষ মরে। দুর্ভিক্ষ লাগে।' সঙ্গে আর কেষ্ট নৌকো নিয়ে চলেছে, সঙ্গে নন্দ। গ্রামের ধান পাচার হচ্ছে শহরে। তারপর অমরপুরের কিছু আগে এক শ্মশানের সামনে ঘটনাটা ঘটল। পাড়ের দিকে লগি উঁচিয়ে ধরল কেষ্ট। নন্দ স্পষ্ট দেখল ওটা লগি নয়, মাছ-মারা কোঁচা। কেষ্ট বলে চলে, 'রামপদর ঘরে ধান ছিল না, চাল ছিল না। জোয়ান মদ্দ, পেটে বড় ক্ষুধা—...সেই জোয়ান মদ্দ পড়ে গেল, পেটে যে দানা

ছিল না একমাস।···এই দ্যাখ রামপদ, কত ধান শহরে যায়! আর তুই জোয়ান মদ্দ, না খেয়ে মরে গেলি!' নদীর চড়ায় কারা যেন অপেক্ষারত। এবার তারা ছুটে আছে। 'এই খবরদার! এ আমার কেনা ধান!' নন্দ ককিয়ে উঠল। 'দেব না, এ ধান মোরা শহরে যেতে দেব না। নদীর চড়ায় অস্পষ্ট আলোতে ওরা চিৎকার করে উঠলো।'

অন্য প্রেক্ষিতে এই প্রতিরোধের কাহিনীই ব্যক্ত হয় পরেশ মিত্রের 'মধু'(৭০) গল্পটিতে। রঘুরা সুন্দরবনে মধু সংগ্রহ করতে যায়। অনেক বিপদের সঙ্গে লড়ে, কখনো কখনো বাঘের হাতে প্রাণ দিয়ে, তারা তাদের জীবিকার সংগ্রাম চালিয়ে যায়। কিন্তু এ-মধু থেকে তারা প্রায় কিছুই পায় না। ঘোষবাবুরা প্রায় বিনে পয়সায় সে মধু এদের কাছ থেকে নিয়ে নেয়। পারমিট বের করে দেবার একমাত্র অধিকারে তারা এই শোষণ চালিয়ে যায়। কিন্তু শোষণ-ক্লিষ্ট রঘুরা এবার রুখে দাঁড়ায়। তারা আর ঘোষবাবুদের মধু দেবে না। ঘোষবাবুরা তৈরি ছিল। লাঠি সোটা নিয়ে তাদের আক্রমণ করে। রঘু জলে পড়ে যায়। আর তখনি 'সঙ্ঘবদ্ধ একটি বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর শোনা যায়, না আমরা মধু দেবো না আড়তে।'

শমিত সরকারের 'বোকা বুড়ো'র(৭১) পুলিশী আক্রমণের বিরুদ্ধে একক প্রতিরোধ কার্যত কৃষকদের সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধেরই প্রতীকী। গ্রামে পুলিশের 'কোন এক বড়কর্তা মারা যাওয়ার পর থেকে' মাঝে মাঝেই পুলিশী হামলা চলছে। 'বুড়ো কাল সারারাত কোথায় যেন গিয়েছিল।' গ্রামে তখন রোজই চলছে পরস্পর আলোচনা আর মিটিং। বুড়ো সেদিন সকাল থেকেই 'বলুয়াটা' ধার করে চলেছে। এমন সময়ে একটা পনের-ষোল বছরের ছেলে এসে খবর দেয়, 'আজু! পুলিশ আসির ধরছে।' বুড়ো একটু ভেবে নিয়ে তখনি বলে, 'সব বাড়িত্ খবর দিয়া আয়, ঘরত্ বেটাছেলে যেন না থাকে।' বুড়ি অবশ্য বুড়োকেও বলেছিল, 'লুকায় পড়েন বাহে।' বুড়ো কিন্তু পালায় নি। তারপর মার্চ করে গ্রামে পুলিশ ঢোকে। বুড়ো তাক করেই ছিল। অকস্মাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে বলুয়া নিয়ে। দুজন পুলিশ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। অবশ্য বুড়োও নিষ্কৃতি পায় না। বেয়নেট দিয়ে তাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারা হয়। এসব দেখে একটা বল্লম তুলে নেয় বুড়ি। কিন্তু কিছুই করতে পারে না। পুলিশের লাথি খেয়ে ছিটকে পড়ে। সময় পেরিয়ে যায়। তারপর সেই বোকা বুড়োই হয়ে ওঠে গ্রামের মানুষের কাছে প্রতিরোধের প্রতীক।

কিষাণ গোপাল কাহার অবশ্য প্রতিরোধ জানতো না, গণতন্ত্রের অর্থও তার জানা ছিল না, তবু জোতদারের চক্রান্তে সে গণতন্ত্রের শত্রু হিসেবে জেলে যায়।

তারপর দীর্ঘ সাত মাস পরে সেই গোপালই জেল থেকে বেরিয়ে আসে 'সকলের ব্যবহারযোগ্য একটা নতুন গণতন্ত্র-প্রতিষ্ঠার' দৃঢ় প্রতিজ্ঞা বুকে নিয়ে। মণি মুখোপাধ্যায়ের 'গণতন্ত্র ও গোপাল কাহার'(৭২) গল্পটি এক কিষাণের সংগ্রামী চেতনার জন্মলাভের কাহিনী। 'গেল বছর বর্ষার মরশুমের আগে তারা এ তল্লাটের গরিব গুরবো মানুষগুলো মিলেঝুলে, মিটিং মিছিল করে বড় জোতদার প্রসন্ন হালদার মশায়ের রেললাইন বরাবর কিছু বেনামী জমি দখল করেছিল। এ-বছর বর্ষা নামতেই সে দেখতে গিয়েছিল মাঠে জল জমেছে কি না। মাঠের অদূরে তখন প্রসন্ন হালদার দাঁড়িয়ে। তার উদ্দেশ্য বুঝতে দেরি হয়নি গোপাল ও অন্য চাষীদের। কৃষক সমিতির অফিসে আলোচনা করা হবে, ঠিকও হয়। কিন্তু সেদিন রাতেই পুলিশ বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায় গোপালকে। কারণ সে গণ-তন্ত্রের পক্ষে ভীষণ মারাত্মক। থানায় তার ওপর চলে অকথ্য অত্যাচার। তারপর সে থানা-হাজতে মাষ্টারের কাছ থেকে জানতে পারে গণতন্ত্রের মানে কি। সাতমাস পরে সে যখন ছাড়া পায় তখন তার বাঁ হাতখানা কাটা গেছে, থানার অত্যাচারের ফলে। জেল থেকে সে যেদিন ছাড়া পেল তখন সে সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ অন্য মানুষ। তাই সে সিদ্ধান্ত নিতে পারে—'প্রথমে বাড়ি যাইবে। বউ-ছেলেমেয়ের বাঁচা-মরার সংবাদ লইবে। তাহার পর সোজা সমিতির অফিসে। কেননা সে স্থির করিয়া ফেলিয়াছে, যে গণতন্ত্রের জন্য সে বাঁ হাতখানি সেলামী দিয়াছে, সেই গণতন্ত্রকে ভাঙিয়া সকলের ব্যবহারযোগ্য একটা নতুন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সে তাহার দক্ষিণ হাতখানিতে সেলামী দিবে।'

এখানে অবশ্য উল্লেখ্য তিমিরবরণ সিংহের 'সূর্যসেনা' নামীয় গল্পের খসড়াটি। খসড়া বলছি এই কারণে যে এটাকে পরিমার্জিত করে গল্পের ফর্মে আনার সময় আর তিনি পাননি। (১৯৭১ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী বহরমপুর জেলে তিনি নিহত হন)।(৭৪) এ-গল্পে তিনি চেয়েছিলেন প্রতীকের মাধ্যমে গ্রামীণ শোষণব্যবস্থা, জোতদারের নির্যাতন, নারী ধর্ষণ এবং তার বিরুদ্ধে কিষাণের সঙ্ঘবদ্ধ সংগ্রামের রূপায়ণ। প্রতীকটি এই প্রকার: প্রত্যেক বছর একটা শকুন ডানা মেলে গ্রামটাকে ঢেকে ফেলে একবার না একবার। শকুনের নখগুলি বিঁধে যেত মাটিতে। আর প্রত্যেকবারই শকুনটা একটা যুবতী মেয়েকে ছিনিয়ে নিয়ে যেত। লখিনের বৌ চম্পাকে নেওয়ার সময়ই বাধা এল মরদগুলোর কাছ থেকে। তারা বোঝে, 'আজ অনুশোচনার দিন নয়, আগুনের মত জ্বলে ওঠার দিন, কোন হত্যাই যেন বিনা বদলায় না যায়।'

গ্রামাঞ্চলে এই শকুন বা জোতদারদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও ক্রোধ কী পরিমাণ

প্রজ্বলন্ত, তা স্বাভাবিকভাবেই আসে অসীম চক্রবর্তীর 'বাবু ভুবনবিহারী মণ্ডলের অগ্নিদর্শন'(৭৫) গল্পে। জোতদার ভুবনবিহারী তল্লাটের প্রায় সব জমিই স্বনামে-বেনামে, বাড়ির রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহও নারায়ণশিলার নামে অধিকার করেছেন। নবর বাপ যখন হঠাৎ মারা গেল, তার বউ এসে দাহ খরচের জন্যে কেঁদে পড়তেই তিনি সানন্দে সব ভার নিয়ে, গোপনে কেটে আনালেন তার ডান হাতের বুড়ো আঙুলটি। আর মৃতের সেই বুড়ো আঙুলের ছাপে অনায়াসেই নবর বাপের জমি হয়ে গেল ভুবনবিহারীর সম্পত্তি। অবশ্য এর আগে নবর মার শরীরটা জরিপ করে নিতে ভুল হয়নি তার। কিন্তু যেহেতু ওই জমির চেয়ে 'নবর বাপের নরম মাটির জমিটুকু অধিক ফলনশীল', তাই শেষেরটাই শেষ পর্যন্ত বেছেছিলেন তিনি। এই ভুবনবিহারী একদা দাপটের সঙ্গে বলতেন, 'আমার নিজের নামে তো মাত্র এগার একর। দাও হাত—দেখব কার কত মুরোদ। কতবড় বাপের ব্যাটা সব।' এহেন ভুবনবিহারী এখন ভয় পাচ্ছেন। 'কেননা, এখন তিনি নিজের মুণ্ডু নিজের ঘাড়ের ওপরে রাখার থিয়োরীতে বিশ্বাসী হয়ে পড়েছেন।' এখন তিনি সব সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়ে গ্রাম ছেড়ে পালাতে চান। শহরে ফ্লাটবাড়ি করে সেখানে নতুন জমিদারী স্থাপনই তার ইচ্ছে। বাঁধা মেয়েমানুষ রেখেছিলেন ময়নাকে। এখন তাকে ঘাড় থেকে নামাতে পারলেই তিনি চলে যেতে পারেন। তাই করতেই অবশেষে গেলেন ময়নার বাড়ি; বাড়িটা তিনিই করে দিয়েছিলেন। অবশ্য এই পালিয়ে যাবার ইচ্ছেটা এত তাড়াতাড়ি হোত না। কিন্তু 'এলাকায় কয়েকটা রক্তাক্ত ঘটনা ঘটে যাওয়ায় এই ইচ্ছেটা দশ কিলোর একটা কাৎলা মাছের মত ঘাই দিচ্ছিল। গত পরশু মহাজন নেপালবাবু নিহত হয়ে যাওয়ার পরই তিনি উঠে পড়ে লেগে গেছেন।' ময়নার ঘরের দাওয়ায় বসে তাকে চলে যাবার কথাটা বলতে বলতে জ্বলন্ত সিগারেটটা ছুঁড়ে দিলেন ভুবনবিহারী। খড়ের গাদায় পড়ে সে জ্বলন্ত সিগারেট বাঁশ-হোগলার বেড়ায় আগুন ধরলো। আগুন ক্রমশ বেড়ে উঠলো। 'আগুনের আভায় ময়নার নিকানো উঠানের দিকে তাকিয়ে তার চোখ স্থির হয়ে গেল। তিনি স্পষ্ট দেখতে পেলেন কয়েকটা তরুণ ছেলে দাঁড়িয়ে আছে উঠানে। একজনের হাতের বল্লম সেই আগুনের আলোয় ঝকঝক করছে…। ভুবনবিহারী একটু পিছিয়ে যেতে চাইলেন। এবং ঘাড় ঘুরিয়ে এবার এক লহমায় জীবনের শেষতম অভিজ্ঞতাটুকুও সঞ্চয় করে নিলেন। তিনি স্পষ্ট দেখতে পেলেন ময়নার শরীরটা একটা লাউডগা সাপের মত লাফ দিয়ে খড়ের চালার বাতা থেকে টেনে নিয়েছে ধারালো হাঁসুয়া।'

সামন্ততান্ত্রিক শোষণব্যবস্থার বিরুদ্ধে এই সংগ্রাম অব্যাহত ছিল এবং আছে। এই সংগ্রামের অবসান ঘটলে গ্রামের সামন্তশ্রেণী আবার সুসংবদ্ধ আক্রমণ শুরু করবে। তাই আজকে ভূমিহীন ও গরীব কৃষকের আন্দোলন অব্যাহতই থাকে। অমর মিত্রের গল্প 'ডাইন' (৭৬) এই বক্তব্যই উপস্থিত করে। নকশালবাদী নেতা হরি নায়েক ধরা পড়লে সুদের কারবারী দাতারাম সিং 'চড়া সুদে ধার দিয়ে চাষাভুষোর ঘটিবাটিও জমা করেছেন তার ঘরে।' আগে ধার দিত কীর্তনিয়াশোলের মহাপাত্রবাবু, নায়েক জেলে যাবার পর সেটা বন্ধ। জেল থেকে ফিরে এসে নায়েক দাতারামকে বলেছে, 'মানুষের যা যা গেছে সব ফেরত চাই। একদিন জীবনরুদ্ধ হয়েছিল, জীবন ফেরৎ চাই।' দাতারাম জানেন একবার যদি আত্মসমর্পণ করা হয় তো সব শেষ। পরিণামে নায়েকের নেতৃত্বে পাঁচশো মানুষের মিছিল গেল দাতারামের কাছে। তীরে তীরে ঝাঁঝরা হয়ে গেল দাতারামের শরীর। পুলিশ আসে। নায়েকের নামে ওয়ারেন্ট। কিন্তু নায়েক তখন এক শালগাছের গোড়ায় গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে পড়ে আছে। আর সে-ঘটনার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গ্রামের মানুষ ভাবে, 'এই খবর জানলে কীর্তনিয়াশোলের বাবুরা বাঘ হয়ে উঠবে। ছিঁড়ে খাবে মানুষগুলোকে। ...নায়েক মরল, না আমরা সকলে মরলাম।' তারা লাশ নিয়ে যায় নদীর চরে।

—শাঁখা ভাঙ। একজন নায়েকের বউ-এর দিকে তাকায়।

বউ চুপ করে আছে।

—শাঁখা ভেঙে ঘর যা। একজন হিসিয়ে ওঠে।

—না। বউটা গর্জে ওঠে।

—কিনো? চারটে মানুষ আগুন চোখে বউটাকে দেখে।

—শাঁখা ভাঙলে গাঁ শুদ্ধ মানুষ মরবে, নায়েক মরলে সকলের মরণ।

কিন্তু করি কী! একজন ফুঁপিয়ে উঠে নদীর বালি হাতড়াতে থাকে।

—লাশ পুঁতে ফেল, রটাই দে নায়েক পলাইছে, মু সিন্দুর পরি। বউ গর্জে ওঠে।

—বলিস কী তুই, পাপ হবে না মেয়েমানুষের।

—আগে বাঁচি, পরে পাপ, গাঁ বাঁচলে বড় পুণ্যি। শাঁখা-সিঁদুর পরা থাকলি নায়েক মানুষের ভিতর বেঁচে থাকে, বাবুগণ ভয় পায়, তদ্দিনে আর এক নায়েকের জন্ম হবে।'

মহাশ্বেতা দেবীর বসাই টুডুর কথা এখানে স্বাভাবিকভাবেই মনে হয়। দ্বিতীয় এনকাউন্টারে বসাইয়ের মৃত্যু হলে, একের পর এক সংগ্রামী নেতা বসাই নাম নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। এভাবেই এক অব্যাহত সংগ্রাম এগিয়ে চলে।

নির্দেশিকা

(১) চারু মজুমদার, নকশালবাড়ির বীর কৃষক জিন্দাবাদ, দেশব্রতী, শারদীয়, ১৩৭৪ ·

(২) অগ্নিগর্ভ, করুণা প্রকাশনী, ১৩৮৫

(৩) The Statesman, November 29, 1969

(৪) Hindusthan Standard, November 30, 1969

(৫) The Statesman, December 2, 1969

(৬) দেশব্রতী, ডিসেম্বর ২৫, ১৯৬৯

(৭) রংপুরের আধিয়ার চাষী, গ্রাম বাংলার পথে পথে, কলকাতা, ১৯৭১, পৃঃ ২

(৮) অপারেশন ? বসাইটুডু, অগ্নিগর্ভ পৃঃ ৫২

(৯) তদেব, পৃঃ ৩০-৩১

(১০) নৈঋতে মেঘ, করুণা প্রকাশনী, ১৯৭৯

(১১) অমৃত ··

(১২) নৈঋতে মেঘ

(১৩) Minimum Wage for Agricultural Labour, The Economic Times, June 20, 1977

(১৪) অগ্নিগর্ভ

(১৫) Comp Report of the Rural Labour Comp at Agwanpur in Barh Sub-Division of Patna District, Organised by National Labour Institute, New Delhi, from 20-11-78 to 23-11-78.

(১৬) Bonded Labcur in India, Sponsored by Indian School of Social Science, Calcutta, 1976. p. 5.

(১৭) নৈঋতে মেঘ

(১৮) Bonded Labour Astir, Economic and Political Weekly, March 17, 1979

(১৯) Ibid

(২০) ডেবরার সশস্ত্র বিপ্লবী কৃষক সংগ্রামের সূচনা ও বিকাশ, দেশব্রতী, ২০ নভেম্বর, ১৯৬৯

(২১) ভারতের বিপ্লবী কৃষক সংগ্রামের অভিজ্ঞতার সারসঙ্কলন করে এগিয়ে চলুন, দেশব্রতী, ৪ ডিসেম্বর, ১৯৬৯

(২২) গ্রামে চলো; পিপলস্ বুক এজেন্সি, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ, ১৯৭২

(২৩) আনন্দবাজার পত্রিকা, বার্ষিক সংখ্যা, ১৩৮৪

(২৪) শালবনি, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা ৬

(২৫) ডেবরা থানায় কৃষক গেরিলাদের হাতে আরও দু'জন শ্রেণীশত্রু খতম, দেশব্রতী, ৬ই নভেম্বর, ১৯৬৯

(২৬) 'There is a cestain amount of intermingling between the two factors, class and caste. In the pre-capitalist society such as ours, caste is the main form through which class manifests itself.' E. M. S. Namboodiripad, in a personal intervew with Anthony Fernandez. quoted in his 'Communal Confrontations in Kerala, India Eorum, Vol. I, March 1970.

(২৭) 'Role of Caste in Determining Party Loyalties, The Statesman (Calcutta), May 18, 1961

(২৮) Amrita Bazar Patrika, December 14, 1978.

(২৯) Murder of a Peasant Leader, Economic and Political Weekly, July 30, 1971.

(৩০) Maitreya Ghatak, Minimum Wage for Agricultural Labours in West Bongal. The Economic Times, June 20, '77

(৩১) T. Nagi Reddy, India Mortgaged, 1978, p. 317

(৩২) Mainstream, December 21, 1969, quoted in Ibid, b. 318

(৩৩) Economic Times, September 25, 1970.

(৩৪) F. Thomasson Jannuzi, Agrarian Gisis in India, The Case of Bihar, 1974, p. 186.

(৩৫) অগ্নিগর্ভ

(৩৬) Andre Beteille, Cast Class and Power, 1965, p. 5.

(৩৭) প্রসাদ, শারদীয় সংখ্যা, ১৯৭৯

(৩৮) করুণা প্রকাশনী, ১৯৭৯

(৩৯) Harihar Bhakta, Caste, Class in Agricultural Development, Mainstream, July 14, 1979

(৪০) The Statesman, October 3, 1978

(৪১) Agrarian Reform as Unfinished Business, The Salected Papers of Wolf Ladejiusky, ed Louis J. Walinsky, 1977, p 451.

(৪২) Bonded Labour in India, op, cit, p. XXXXVIII

(৪৩) Ibid pp. Lvii-Lix

(৪৪) Indian Express, October 25, 1978

(৪৫) নৈর্ঋতে মেঘ

(৪৬) প্রমা, শারদীয় সংখ্যা, ১৯৭৮

(৪৭) দেশব্রতী, ২৯শে জানুয়ারী, ১৯৭০ সংখ্যায় উদ্ধৃত।

(৪৮) আনন্দবাজার পত্রিকা, বার্ষিক সংখ্যা, ১৩৮৪

(৪৯) যে ঘোষণা সারা অঙ্গে বিপ্লবী লড়াইয়ের জোয়ার এনেছে, দেশব্রতী, ১৪ই আগস্ট, '৬৯

(৫০) তদেব

(৫১) অগ্নিগর্ভ

(৫২) মহাকালের রথের ঘোড়া, আশা পাবলিশার্স, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৭৮

(৫৩) Sankar Ghosh, op. p. cit 25

(৫৪) মহাকালের সন্ত্রাস ও সত্তরের নির্ভীক জননী; সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাসের একটি দিক, অনীক, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর-নভেম্বর, ১৯৭৭

(৫৫) মাসের প্রথম রবিবার, বিশ্ববাণী প্রকাশন ১৯৭৮

(৫৬) পিপলস্ বুক এজেন্সি, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, ১৯৭২

(৫৭) 'ভারতের বিপ্লবী কৃষক সংগ্রামের অভিজ্ঞতার সারসঙ্কলন করে এগিয়ে চলুন,' দেশব্রতী; ৪ ডিসেম্বর ১৯৬৯

(৫৮) দশ বছরের গল্প কবিতা

(৫৯) দেশব্রতী, ১১ ডিসেম্বর, ১৯৬৯

(৬০) দশ বছরের গল্প-কবিতা

(৬১) দেশব্রতী, শারদীয়, ১৩৭৪

(৬২) 'বিপ্লবী পার্টি গড়ার কাজে হাত দিন,' দেশব্রতী, শারদীয়, ১৩৭৫

(৬৩) দেশব্রতী, শারদীয়, ১৩৭৫

(৬৪) আবাদ, শারদীয়, ১৯৬৭, দশবছরের গল্প-কবিতা
(৬৫) স্পন্দন, জুলাই ১৯৭২
(৬৬) অনুষ্টুপ, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৮৫
(৬৭) প্রস্তুতিপর্ব, অক্টোবর, ১৯৭৪
(৬৮) প্রস্তুতি, জুলাই, ১৯৭৪
(৬৯) সমকাল, আগস্ট, ১৯৭৭
(৭০) মাটি, এপ্রিল ১৯৭৭
(৭১) অনুষ্টুপ, এপ্রিল, ১৯৭১, দশবছরের গল্প-কবিতা
(৭২) পশ্চিম-বাংলার গল্প-সংগ্রহ, দশবছরের গল্প-কবিতা
(৭৩) স্পন্দন, জুলাই ১৯৭২
(৭৪) সম্মুখ, বিশেষ অক্টোবর বিপ্লব সংখ্যা, ১৯৭৩
(৭৫) অমৃত, ৩১ আগস্ট, ১৯৭৯
(৭৬) অঙ্কুর, মার্চ, ১৯৭৯

চতুর্থ অধ্যায়

॥ এক ॥

১৯৭০ সালের মার্চ মাস নাগাদ কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গের শহরাঞ্চলে নকশালবাদী ছাত্র-যুবকদের কর্মতৎপরতা প্রত্যক্ষতর হতে থাকে। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে 'আঘাত-এবং-পলায়ন' রীতিতে ছাত্রেরা আক্রমণ শুরু করে; গান্ধীর ছবি পোড়ানো এবং স্কুল ও কারখানার ওপরে লাল পতাকা উত্তোলন এই কর্মকাণ্ডের অঙ্গীভূত হয়। ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা ও কলেজ ইউনিয়নের রাজনীতি যে ছাত্রদের বিপ্লবী চরিত্র নষ্ট করে এবং একটি অর্থনীতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর জন্ম দেয়, এ-তত্ত্ব ইতিপূর্বেই পার্টিগতভাবেই তুলে ধরা হয়েছিল। ১৯৬৯-এ চারু মজুমদার লিখেছিলেন, 'সাম্রাজ্যবাদীরা ও প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণী ছাত্র-যুবকদের এই বিপ্লবী সম্ভাবনাকে অঙ্কুরে বিনাশ করতে চেয়েছে এবং সামনে তুলে ধরেছে কলেজ ইউনিয়নের টোপ। কলেজ ইউনিয়নগুলো যুবক ও ছাত্রদের শিক্ষার কোনো সমস্যার সমাধান করতে পারে না, শুধু তাই নয়, এই ইউনিয়নগুলোয় অংশ গ্রহণ করে এই শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুব ছাত্রদের বিদ্রোহকে নেতৃত্ব দিতে অক্ষম হয়। এগুলো মূলত বিপ্লবী ছাত্রসমাজের সামনে একটা অর্থনীতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী তুলে ধরে। তাই কলেজ ইউনিয়নগুলো ছাত্র-যুবকদের বিপ্লবী প্রতিভাকে নষ্ট করে, শ্রমিক-কৃষকের সাথে একাত্ম হওয়ার পথে এগুলো হোলো বিরাট বাধা।' (১) একটি বেসরকারী হিসেব থেকে জানা যায় যে এপ্রিল ও মে মাসে মোট ৫১টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ওপব আক্রমণ চালানো হয়েছিল। এবং লক্ষণীয় যে এই তড়িৎগতি আক্রমণের বিরুদ্ধে তারা কোথাও কোন বাধা পায়নি। (২)

চারুবাবু মুখ্যত গ্রামাঞ্চলেই আন্দোলন সংহত ও শ্রেণীশত্রুর ওপর আক্রমণ জোরদার করার প্রতিই গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। অবশ্য শহরাঞ্চলে আন্দোলন গড়ে তোলার বিষয়টিকে তিনি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেননি; বলেছিলেন শাসকশ্রেণীর আক্রমণের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলা, শ্রমিকশ্রেণী ও পেটিবুর্জোআ বুদ্ধিজীবীদের, গ্রামীণ কৃষকদের সঙ্গে একাত্মকরণের জন্যে প্রয়াস চালিয়ে যাওয়াই হবে এই আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য। এবং বারংবার তিনি বলেছেন, 'ছাত্র ও যুবক সম্প্রদায়ের দায়িত্ব হচ্ছে চেয়ারম্যানের চিন্তাধারা অধ্যয়ন করা, আত্ম-সমর্পণের পথ বর্জন করে শ্রমিক ও কৃষকের সাথে একাত্ম হওয়া।' (৩) 'চেয়ারম্যান বলেছেন যে ছাত্র-যুবক কৃষক ও শ্রমিক জনতার সাথে মিশে

যেতে পারে তারাই বিপ্লবী এবং যারা পারবে না তারা প্রথমে অবিপ্লবী এবং কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিবিপ্লবী ক্যাম্পে যোগ দেবে। এ শিক্ষা শুধু চীনের নয়, এ শিক্ষা পৃথিবীর সমস্ত দেশের।' (৪) শহরে পার্টির কার্যকলাপ গ্রামাঞ্চলে কৃষকের সশস্ত্র সংগ্রামের পরিপূরক মাত্র। ১৯৭০ সালে পার্টি কংগ্রেসের অধিবেশনে রাজনৈতিক সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করা হয়, সে-প্রসঙ্গে চারুবাবুর বক্তব্যে কলকাতার অ্যাকশন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ ছিল না, কারণ শহরকেন্দ্রিক আন্দোলনের তখন সূত্রপাতের কাল। এখানে তিনি বলেন যে, গ্রামাঞ্চলে কৃষকের সশস্ত্র সংগ্রামের অনুপ্রেরণায় কলকাতায় ছাত্রেরা বিপ্লবী সংগ্রাম শুরু করেছে। কলকাতার শ্রমিকশ্রেণীও জেগে উঠেছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে অচিরেই ভারতবর্ষের অন্যান্য শহরেও শ্রমিক-শ্রেণীর বিপ্লবী অভ্যুত্থান ঘটবে এবং শহরাঞ্চলের অবস্থা সম্পূর্ণভাবে বদলে যাবে। আর এটা ঘটতে বাধ্য। (৫)

কৃষিবিপ্লব সফল করার কাজে শহরাঞ্চলে শ্রমিকশ্রেণীকে সংগঠিত করার দায়দায়িত্বের বিষয়টি ১৯৬৭ থেকে নকশালবাদীরা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে আসছিলেন। ঐ সালেই সি. পি. (এম)-এর যে শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য মেহনতী মানুষকে অর্থনীতিবাদী আন্দোলন থেকে সরিয়ে এনে কৃষিবিপ্লবমুখীন আন্দোলনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে, তাদের জঙ্গী ও বিপ্লবী সংগ্রামী হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। (৬) এ-ভাবনায় শহরাঞ্চলে ছাত্র-যুবকদের এবং শ্রমিকশ্রেণীকেও আংশিকভাবে হলেও সংগঠিত করার কাজ চলতে থাকে। পার্টির শহরাঞ্চলে কাজ সম্পর্কে এ-সময়ে চারুবাবুর অনেক বক্তব্যও প্রকাশিত হতে থাকে। তথাকথিত ট্রেড ইউনিয়ন রাজনীতির প্রবল বিরোধিতা করেছিলেন চারুবাবু। তাঁর বক্তব্যে, যখন আমরা সংশোধনবাদে সবচেয়ে বেশী ভুগছিলাম তখন বহু গণসংগঠন বানিয়েছি এবং গণসংগঠনের মধ্যে পার্টি ইউনিট করেছি। কিন্তু সেই পার্টি ইউনিটগুলিকে আমরা ট্রেড ইউনিয়ন কাজের পরিপূরক হিসাবে ব্যবহার করেছি, ফলে শ্রমিকশ্রেণীকে আমাদের রাজনীতির পেছনে টেনে আনতে পারিনি।···বিপ্লবী রাজনীতি অর্থাৎ কৃষিবিপ্লবের রাজনীতির দ্বারা যদি শ্রমিকশ্রেণীকে উদ্বুদ্ধ করতে হয়, তাহলে স্বাধীনভাবে পার্টি ইউনিট-গুলির বিপ্লবী রাজনীতি প্রচারের দায়িত্ব অনেক বেশী এসে পড়ে, কারণ শ্রমিকশ্রেণী তার অর্থনীতির দাবির আন্দোলনের মারফতে কৃষিবিপ্লবের প্রয়োজনীতা কোনদিনই বুঝবে না। কৃষিবিপ্লবের রাজনীতি তাকে বোঝাতে হবে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বাইরে থেকে।' (৭)

কিন্তু এই আন্দোলনে ছাত্রদের যোগদান বিষয়ে চারুবাবু সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। কারণ তারাই পারে আত্মস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে, অসীম সাহসে কৃষিবিপ্লবের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে আর তাদের এই আত্মোৎসর্গের ক্ষমতাই তাদের 'করে তোলে বিপ্লবের কাজে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ'। প্রথমত, তিনি চেয়েছিলেন যে ছাত্র-যুবকেরা কৃষকদের সঙ্গে একাত্ম হোক এবং বিপ্লবী রাজনীতি প্রচার করুক। কিন্তু 'যারা গ্রামে যেতে অপারগ, তারা শহরে শ্রমিকদের মধ্যে প্রচারের কাজ চালিয়ে যাবে। তাদের মুখ্য কাজ হবে গ্রামাঞ্চলে কৃষকের সংগ্রামের সমর্থনে শহরে গণতান্ত্রিক আন্দোলন সংগঠিত করা।' (৮) শহরাঞ্চলে এই গণতান্ত্রিক আন্দোলন সংগঠিত করার বিষয়টি প্রথম বিস্তারিত আলোচনা হয় ১৯৬৮র ২২শে মার্চ কলকাতায় অনুষ্ঠিত গণতান্ত্রিক কনভেনশনে; কৃষকদের সমর্থনে আন্দোলন সংগঠিত ছাড়াও শ্রমিকদের উদ্দেশে আহ্বান জানানো হয় তাদের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার জন্যে জঙ্গী সংগঠন গড়ে তোলার। স্থির হয়, পি. ডি. অ্যাক্ট, অটোমেশন, ছাটাই, লে-অফ, লক-আউট, পুলিশী অত্যাচার, রুটি-রুজি এবং ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের দাবীতে লড়াই চালিয়ে যাওয়া হবে। চারু মজুমদার অবশ্য ছাত্র-যুবকদের প্রচারের কাজের ওপরই বেশী গুরুত্ব আরোপ করেন এবং ওই 'ছাত্র ও যুবকদের রাজনৈতিক সংগঠন অনিবার্যভাবেই রেডগার্ড সংগঠন। এবং এদের কাজ হবে চেয়ারম্যানের কোটেশনগুলো যতো ব্যাপক অঞ্চলে সম্ভব প্রচার করা।' (৯)

অনস্বীকার্য যে ১৯৬৮ থেকে সি. পি. আই (এম-এল)-এর জন্ম পর্যন্ত কালে শহরাঞ্চলে ছাত্রেরা বহু সাধারণ দাবীর ভিত্তিতে আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকে, ট্রামভাড়া ও খাদ্যমূল্যের বৃদ্ধির প্রতিবাদে উত্তাল শহরের স্মৃতি অদ্যাবধি বহুজনের স্মরণেই বর্তমান। ১৯৬৯-এর ২০শে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবী ছাত্র-যুবকদের আন্দোলন বিষয়ে যে খসড়া রাজনৈতিক কর্মসূচী প্রকাশিত হয়, সেখানে স্পষ্টতই বলা হয় যে, ছাত্র ও যুবকদের অগ্রগামী অংশের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া বিপ্লব কখনোই সফল হতে পারে না। কিন্তু কেবলমাত্র সাধারণ প্রচারের মাধ্যমে অসংখ্য পশ্চাদপদ অংশের কাজের মধ্যে টেনে আনা অসম্ভব। একারণেই ছাত্র-যুবকদের এই অংশকে সংগঠিত ও সক্রিয়ভাবে বিপ্লবী আন্দোলনের অংশভাগ করার জন্যেই 'খাদ্য, চাকরী, শিক্ষা ও সংস্কৃতি'-র দাবীতে আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন। আর এভাবেই তাদের অসন্তোষ ও ক্রোধকে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের দিকে পরিচালিত করা সম্ভব হবে। এবং এই সংগ্রামের প্রত্যেক পর্যায়ে তারা এমন কৌশল ও প্রচার চালিয়ে যাবেন, যার ফলে বৃহত্তর ছাত্র-যুবকগোষ্ঠী

এ-সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে এবং তারা ক্রমশ অধিকতর সক্রিয় ও রাজনৈতিক চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

কিন্তু এদিকে তখন নকশালবাদীরা পার্টি গড়ার দিকে অধিকতর মনোযোগী হয়ে পড়ার ফলে কার্যত ছাত্র-যুবকদের মধ্যেকার আদর্শগত চেতনায় অগ্রগামী অংশের সঙ্গে পশ্চাদপদ বৃহত্তর অংশের একটা ছেদরেখা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। গণসংগঠন ও ট্রেড ইউনিয়নকে অবহেলা করার এই নীতিকে কঠোরভাবে সমালোচনা করেছিলেন দলত্যাগী পরিমল দাশগুপ্ত, উত্তরে চারুবাবু লেখেন, 'পরিমলবাবুরা প্রাদেশিক ভিত্তিতে একটা পাল্টা 'কো-অর্ডিনেশন' করেছেন এবং একটি দলিল প্রকাশ করেছেন। সেই দলিলে তারা কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের কাজে কতকগুলো ভুল ঝোঁক ও ধারণা এবং বিচ্যুতি দেখা দিচ্ছে বলে জানিয়েছেন এবং সেই ভুলগুলি বর্ণনা করেছেন। তাবা বলেছেন যে শহরে কাজকে অবহেলা করা হচ্ছে, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে অংশে গ্রহণ না করার ঝোঁক আছে এবং জোর দিচ্ছেন না গণসংগঠন গড়াব কাজে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে সকলেই যদি গণসংগঠন গড়ার কাজে লেগে যায় তাহলে গোপন পার্টি গড়ার কাজ কে করবে? গণসংগঠন দিয়েই কি কৃষিবিপ্লব সংগঠন হবে?' (১০) শ্রমিকদের মধ্যে পার্টির কাজ প্রসঙ্গে তিনি স্পষ্টতই বলেন যে শ্রমিকশ্রেণীকে বিপ্লবী রাজনীতিতে উদ্বুদ্ধ করতে হলে পার্টিকে প্রচারের মাধ্যমেই তা করতে হবে এবং ইউনিয়নের বাইরে থেকেই। কারণ, 'শ্রমিকশ্রেণী তার অর্থনৈতিক দাবীদাওয়ার বাইরে কৃষিবিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা কিছুমাত্র উপলব্ধি করতে অসমর্থ।' তিনি আরো বলেন যে, যখন দেশে কোন বিপ্লবী পরিস্থিতি থাকে না, পুঁজিবাদী শ্রেণী যখন অতিমাত্রায় শক্তিশালী ও শ্রমিকশ্রেণী নিজেকে তুলনায় অধিকতর দুর্বল মনে করেন, সে-সময়ে ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে রাজনৈতিক শিক্ষার স্কুল হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। একালে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন শ্রমিকশ্রেণীর আত্মবিশ্বাস বাড়ায় এবং তারা আন্দোলনের কৌশলগত শিক্ষালাভও করেন। কিন্তু দেশে যখন বিপ্লবী পরিস্থিতি বর্তমান যখন প্রত্যেকটি লড়াইই সহিংস সংঘর্ষের রূপ নিচ্ছে, তখন ট্রেড ইউনিয়নগুলি সে-পরিস্থিতিতে যথেষ্ট কর্মক্ষম হতে পারে না। বিপ্লবী পরিস্থিতিতে পার্টিই হোল শ্রমিকদের শ্রেণী-সংগঠন। ভারতবর্ষের মতো দেশে যেখানে বিপ্লবের প্রধান কেন্দ্র হচ্ছে গ্রামাঞ্চল, সেক্ষেত্রে পার্টির দায়িত্বও অনেক বেশী এবং শ্রমিকদের মধ্যে পার্টি-সংগঠন গড়ে তোলা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আর এই পার্টি-সংগঠন ছাড়া শ্রমিকশ্রেণী, বিপ্লবের নেতৃত্ব গ্রহণের দায়িত্ব পালন করতে পারে না।

১৯৬৯-এর আগস্টে লিখিত 'ছাত্র-যুবকদের কাছে পার্টির আহ্বান' নামীয় লেখায় চারুবাবু সরাসরি ছাত্র-যুবকদের বিপ্লবের কাজে অংশগ্রহণের ডাক দেন: 'দুশো বছরের পরাধীন ও শোষিত ভারতবর্ষে ছাত্র ও যুবকরাই হচ্ছেন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ব্যাপক জনতাকে অশিক্ষিত ও অন্ধ করে রেখে দিয়েছে। তাই বিপ্লবী আন্দোলনে এই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ছাত্র-যুবক শুধু শিক্ষিতই নন, তাঁদের আছে বিরাট উৎসাহ, ত্যাগ স্বীকারের শক্তি এবং যে কোন অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা। তাই, তাঁরাই বিপ্লবী রাজনীতি অর্থাৎ চেয়ারম্যানের চিন্তাধারায় শিক্ষিত হয়ে ব্যাপক জনতার মধ্যে, বিশেষ করে ভূমিহীন ও দরিদ্র কৃষক জনতার মধ্যে চেয়ারম্যানের চিন্তাধারাকে ছড়িয়ে দিতে পারেন এবং তাদের সাথে একাত্ম হয়ে ভারতবর্ষের গ্রামে গ্রামে কৃষকের বিপ্লবী ঘাঁটি তৈরির কাজে এগিয়ে যেতে পারেন। …আজকের এই নতুন যুগে যখন সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংসোন্মুখ, যখন পৃথিবীর দেশে দেশে বিপ্লবী আগুন জ্বলছে, যখন সে বিপ্লবী আগুন ভারতবর্ষেও ছড়িয়ে পড়েছে নকশালবাড়ি থেকে শ্রীকাকুলামে, আসাম থেকে পাঞ্জাবে, তখন বাংলাদেশের সেই বিপ্লবী ছাত্র-যুবকরা তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বভার কাঁধে তুলে নেবেন এবং শ্রমিক ও কৃষকের মধ্যে, বিশেষ করে দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে বিপ্লবী-রাজনীতি প্রচারের কাছে নামবেন।' (১১)

শহরাঞ্চলে ১৯৬৭-৬৮ তে নকশালবাদীরা যে কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন, ১৯৬৯-এর এপ্রিলে সি. পি. আই (এম. এল) গঠনের পর যে খসড়া সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করা হয়, সেখানে তা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হয়। এখানে বলা হয়েছে যে, যেহেতু এই পার্টি একটি গোপন সংগঠন, সেহেতু কোন প্রকাশ্য বা গণ-আন্দোলনের ঝুঁকি তারা নেবেন না। 'যদিও বিপ্লবী কর্মতৎপরতাকে বাড়িয়ে তোলবার জন্যে সমস্ত রকমের আইনানুগ সুযোগ গ্রহণ করা হবে, তথাপি কোন অবস্থাতেই পার্টি প্রকাশ্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হবে না।' এ কাজকে ত্বরান্বিত করার জন্যে কোন ফ্রন্ট-সংগঠন গড়ে তোলা প্রয়োজনীয় কি না, সে-বিষয়ে এখানে কোন স্পষ্ট বিবৃতি নেই। কেবলমাত্র বলা হয়েছে যে শহরে আর্থনীতিক এবং সাংস্কৃতিক কার্যাবলীর ওপর গুরুত্ব আরোপ না করে, শ্রমিকশ্রেণীকে কৃষি-বিপ্লবের নেতৃত্বদানের উপযোগী করে গড়ে তোলাই হবে পার্টির প্রাথমিক দায়িত্ব।

শ্রমিকদের মধ্যে পার্টির কাজ ও কৌশলগত লাইন বিষয়ে পার্টির বক্তব্য স্পষ্টত প্রকাশিত হয় ১২ই মার্চ, ১৯৭০-এ। শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করেন, এমন পার্টি-কর্মীদের এক বৈঠকে চারু মজুমদারের ভাষণের অনুমোদিত

নোটটিকে পার্টি-বক্তব্যের দলিল হিসেবে গ্রহণ করাই সঠিক। এখানে তিনি একদিকে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের চরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন এবং অন্যদিকে পার্টির সঙ্গে তার সম্পর্ক ও কাজের নির্দেশ দিয়েছেন: 'পার্টি হলো শ্রেণীশত্রু উচ্ছেদ করার জন্য শ্রমিকের আক্রমণাত্মক লড়াইয়ের সংগঠন, আর ট্রেড ইউনিয়ন হলো শ্রেণীশত্রুর আক্রমণ থেকে শ্রমিকের আত্মরক্ষার লড়াইয়ের সংগঠন। কিন্তু আজকের দিনে ট্রেড ইউনিয়ন দিয়ে এই আত্মরক্ষা করা সম্ভব নয়। তাই ট্রেড ইউনিয়ন গড়া আমাদের কাজ নয়, ট্রেড ইউনিয়ন দখল করাও আমাদের কাজ নয়, ট্রেড ইউনিয়নের নির্বাচন নিয়ে মাথা ঘামানোও আমাদের কাজ নয়। আমাদের কাজ শ্রমিকদের মধ্যে গোপন পার্টি সংগঠন গড়া। কিন্তু ট্রেড ইউনিয়ন আছে ও থাকবে এবং প্রধানত সংশোধনবাদীদের নেতৃত্বেই থাকবে। এই ট্রেড ইউনিয়ন মারফৎ লড়াইও হবে এবং যেহেতু লড়াই করা শ্রমিকদের চিরকালের স্বভাবধর্ম, তাই এ সব লড়াইয়েও সে থাকবে। আজকের দিনে ট্রেড ইউনিয়নের লড়াইয়ে জয় নিশ্চিত নয় এবং সংশোধনবাদীরা বিশ্বাসঘাকতা করবে জেনেও সে থাকবে। আমরা শ্রেণীশত্রুর বিরুদ্ধে শ্রমিকের কোনো লড়াইয়েই বিরোধিতা করতে পারি না। এই বিরোধিতা হবে ভাববাদী পেতিবুর্জোয়া চিন্তাধারা। অর্থনৈতিক দাবিদাওয়ার জন্য অথবা মালিকের কোন আঘাতের বিরুদ্ধে যে কোন সংগ্রামে শ্রমিকদের আমরা আমাদের মুখাপেক্ষী করে রাখব না, তাদের স্বাধীনভাবে উদ্যোগ নিতে রাজনীতি দিয়ে উৎসাহিত করব। শ্রমিকদের নিছক আমাদের অর্থাৎ পার্টি ক্যাডারদের অনুগামী করে রেখে নিজেরা আগ বাড়িয়ে নেতৃত্ব দিতে যাব না। যেখানে শ্রমিকদের কোনো ইউনিয়ন নেই, সেখানে শ্রমিকরা যদি ইউনিয়ন করতে চান তা হলে আমরা বাধা দেব না। ট্রেড ইউনিয়নগত লড়াই সাধারণ শ্রমিকেরাই করবেন, আমাদের ক্যাডাররা সে লড়াইয়ে যাবেন না। আমাদের ক্যাডাররা করবেন রাজনীতি দিয়ে গোপন পার্টি গড়ার কাজ। এই কাজ মারফৎ যদি সাধারণ শ্রমিকদের মধ্যে উদ্যোগ ও আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করা যায় তবে তাদের মধ্যে থেকেই লোক এগিয়ে গিয়ে এই ট্রেড ইউনিয়নগত লড়াইয়েরও যোগ্য নেতৃত্ব দিতে পারবেন এবং সেখানেও সংশোধনবাদীদের বিরুদ্ধে লড়তে পারবেন। এটাই কাম্য এবং সম্ভবও বটে। কিন্তু তাদের ওপরও নজর রাখতে হবে, তাদের মধ্যে যদি কোনো সংশোধনবাদী ঝোঁক দেখা দেয় তা হলে শ্রমিকদের দিয়ে তার সমালোচনা করতে হবে। কিন্তু পার্টি ক্যাডাররা কিছুতেই এ লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়বেন না। কিন্তু যে কোনো সংগ্রামে উৎসাহ দিলেও শ্রমিকদের সব সময়ই একথা বোঝাতে হবে যে, আজকে

সংগঠিত মালিকশ্রেণীর আঘাত (যেমন লক-আউট, লে-অফ, ক্লোজার ইত্যাদি) মোকাবেলা করার জন্য হরতাল, ধর্মঘট এসব হাতিয়ার এ যুগে অনেকাংশেই ভোঁতা হয়ে গেছে। আজ আর শান্তিপূর্ণভাবে, বিনা রক্তপাতে নয়—ঘেরাও, পুলিশ-মালিকের সঙ্গে সংঘর্ষ, ব্যারিকেড, শত্রু বা দালাল খতম করা—অবস্থা অনুযায়ী লড়াইগুলিকে এই সব পথ ধরেই এগুতে হবে। ঘেরাওকে সংশোধনবাদীরা সত্যাগ্রহে পরিণত করছে, তাকে আবার সত্যিকারের ঘেরাও-এ পরিণত করে মালিকশ্রেণীর বুকে ত্রাস সৃষ্টি করতে হবে। এ কাজ সমস্ত শ্রমিকের মধ্যে মধ্যে বিপুল উদ্দীপনার জোয়ার আনবে। ফলে তাদের মধ্যে সংহতি দ্রুত হবে। আর এইসব প্রয়োগের মধ্য দিয়েই শ্রমিকশ্রেণী আবার নূতন নূতন কৌশল উদ্ভাবন করবেন। পার্টি শ্রমিকদের এই সব কৌশল উদ্ভাবন করে দেবে না; পার্টি শ্রমিককে রাজনীতি দেবে এবং সেই রাজনীতির সাহায্যে শ্রমিক নিজেই এইসব কৌশল উদ্ভাবন করবে। বস্তুত, ভারতবর্ষে আগামী কিছুকাল ধরে দুটো লাইনেই শ্রমিক সংগ্রাম চলবে: একটি সংশোধনবাদী নেতৃত্বে মামুলী কায়দায়, অপরটি আমাদের পার্টি নেতৃত্বে নতুন কায়দায়। এবং শেষপর্যন্ত নতুন কায়দা আর নতুন থাকবে না; নতুন কায়দা পাকাপাকিভাবে কায়েম হবে।' (১২)

কিন্তু পার্টি-নেতৃত্বের পক্ষ থেকে কেন এই বক্তব্য পূর্বাহ্নেই উপস্থিত করা হয়নি, তার জবাবে চারুবাবু এখানে বলেন যে যদি না পার্টি কর্মীরা শক্তভাবে রাজনীতি আঁকড়ে ধরে থাকেন, তাহলে নতুন কায়দায় কাজ করতে গিয়ে তাদের গুরুতর বিচ্যুতি দেখা দিতে পারে। এই বিচ্যুতি হোল: 'সহরাঞ্চলে শ্রমিকের জঙ্গী লড়াই কেন্দ্রীভূত করে গ্রাম এলাকার লড়াই থেকে সরে-আসা এবং এইভাবে পার্টির মতাদর্শগত ও প্রচার আন্দোলনকে ভোঁতা করে দেওয়া। তাই রাজনীতিকে শক্তভাবে আঁকড়ে না ধরে নতুন কায়দায় লড়াই শুরু করলে সহরের শ্রমিক আন্দোলন সহজেই জঙ্গী অর্থনীতিবাদী আন্দোলনে পর্যবসিত হতে পারে। বাস্তবিকপক্ষে, পার্টি গঠিত হবার পর থেকে শ্রমিক আন্দোলনের এই লাইনটি কমরেডদের কাছে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এই কারণেই এতদিন রাখেনানি। কিন্তু আজ রাজনৈতিক কাজকর্মের মধ্য দিয়ে কমরেডরা কতকটা অভিজ্ঞ হয়েছেন, এবং রাজনৈতিক প্রচারটিও কিছুটা শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড়াতে পেরেছে।' এই প্রসঙ্গে চারুবাবু শ্রমিকদের মধ্যে পার্টির প্রচারের কাজের ত্রুটির দিকও উল্লেখ করেছেন। এবং এই ত্রুটি থাকার কারণেই, 'সবচেয়ে সচেতন ও সবচেয়ে জঙ্গী ও সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় শ্রমিক আমাদের পার্টির প্রভাবে থাকা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক শ্রমিকই গ্রামের সশস্ত্র কৃষক সংগ্রামের জন্য এগিয়ে

আসছেন। কারণ অনেক সময়ই শ্রমিককে বিপ্লবী কাজে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করা হয় অর্থ নৈতিক ভবিষ্যতের লোভ দেখিয়ে। বলা হয়, কৃষিবিপ্লব সম্পন্ন হলে তবেই তার বৈষয়িক দুর্দশা ঘুচবে, তার স্বাচ্ছন্দ্য আসবে। প্রথমত এটা মিথ্যে কথা। কারণ বিপ্লবের পর দীর্ঘকাল শ্রমিককে দুঃখবরণ করতে হবে দেশ, জাতি ও বিপ্লবের ব্যাপক স্বার্থে, কারণ বিপ্লবের নেতা সে। দ্বিতীয়ত এককথায় শ্রমিককে বিপ্লবী আত্মত্যাগের রাজনীতিতে টেনে না এনে সংশোধনবাদী আত্মোন্নতির রাজনীতিতেই উদ্বুদ্ধ করে তোলে। সে আত্মসর্বস্ব ত্যাগ করে প্রাণ দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে গ্রামে কৃষকের সঙ্গে একাত্ম হয়ে সেখানকার বিপ্লবী সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করতে এগিয়ে যায় না। সহরে বসেই কৃষি বিপ্লবী সংগ্রামের নিষ্ক্রিয় সমর্থক হয়েই থাকতে চায়। কিন্তু সরাসরি তাকে বিপ্লবী রাজনীতি দিলে ফল পাওয়া যাবে হাতে হাতে।'

সর্বোপরি চারুবাবু চেয়েছিলেন শ্রমিকদের আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত করতে পার্টি প্রয়াস চালিয়ে যাবে। কারণ, 'শ্রমিক যে পার্টির প্রভাবেই থাকুক না কেন, দাসত্বের জ্বালার অপমানবোধ তার মধ্যে থাকেই। কারণ শ্রমিক সব কিছু সৃষ্টি করেন নিজ হাতে, আর তার ওপর মাতব্বরী করে মালিক ও আমলারা। এখানে তার মধ্যে ইজ্জতবোধ যদি জাগিয়ে তোলা যায় বিপ্লবী রাজনীতির প্রচারের মধ্য দিয়ে, তা হলে অর্থনীতিবাদের জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা তার পক্ষে সহজ হবে।...এই ইজ্জতের লড়াইয়ে তার চাকরী গেলে সহরে সে ভাল পার্টি সংগঠক হয়ে উঠবে, নতুবা গ্রামে গিয়ে বিপ্লবী কৃষক সংগ্রামে সে যোগ দেবে।'

সি. পি. আই (এম. এল.) এর ক্যাডাররা শহরাঞ্চলে শ্রমিকদের মধ্যে পার্টির উক্ত নির্দেশ মত কাজে যে কিছু পরিমাণে হলেও অগ্রসর হয়েছিলেন, তার প্রমাণ ১৯৭০ সালের 'দেশব্রতী'র রিপোর্টে ছড়িয়ে আছে। নিতান্ত অর্থনীতিবাদী ট্রেড ইউনিয়নের আন্দোলন পেরিয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনের পথে পদক্ষেপ যে শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে অনিবার্য, এ-তত্ত্ব বোধ হয় পার্টিকর্মীরা অন্তত কিছু সংখ্যক শ্রমিককে বোঝাতে পেরেছিলেন; অন্যথায়, সংগঠনে, কারাবরণে, অসহনীয় পুলিশী নির্যাতনের মধ্যে বা সাহসী মৃত্যুবরণে আমরা শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিনিধিদের দেখতে পেতাম না। ৮ জুলাই ১৯৭৭-এ প্রকাশিত 'সপ্তাহ' পত্রিকায় প্রকাশিত পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনী কর্তৃক নিহত নকশালবাদীদের যে অসম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশিত হয়েছে তাতে দেখা যায় যে এদের মধ্যে ছিলেন বেলঘরিয়া টেক্সম্যাকো ফ্যাক্টরি, কেশরাম

রেয়ন, ডানলপ, ব্রেথওয়েট, কেশরাম স্প্যান পাইপ, হিন্দুস্থান মোটর, ডালহৌসী জুট মিল, স্টেট ট্রান্সপোর্ট, ওরিয়েণ্ট ফ্যান, ব্রিটানিয়া বিস্কুট, প্রভৃতির শ্রমিক ও শ্রমিক নেতারা। এছাড়া যাদবপুর, হাওড়া প্রভৃতি অঞ্চলের ছোট ছোট কারখানা-শ্রমিকদের মধ্যে কতজন শহীদ হয়েছেন, তা অদ্যাবধি অজানা।

'দেশব্রতী'র সম্পাদকীয়তেও শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি আহ্বানে বলা হয় : 'মালিক শ্রেণীর হাতে রোজকার হাজারো অপমানের বদলা তাকে নিতে হবে, ইজ্জত রক্ষার লড়াইএ মালিকশ্রেণীকে ভীত সন্ত্রস্ত করে লড়ায়ের সুখের সঙ্গে ক্ষমতার সুতীব্র সুখ তাকে পেতে হবে। শত্রু শহরে শক্তিশালী, তাই শত্রুর হাত থেকে এখন এখানে ক্ষমতা কাড়া যাবে না; কিন্তু ক্ষমতা কাড়ার মেজাজ নিয়ে ও চেয়ারম্যানের চিন্তাধারা নিয়ে সে গ্রামাঞ্চলে যেখানে ক্ষমতা দখলের লড়াই চলছে সেখানে যেয়ে দাঁড়াবে, সেই লড়াইয়ের অংশীদার হবে, সর্বহারার নেতৃত্বকে জোরদার করে তুলবে।' এবং সর্বোপরি বলা হয় যে, 'আজ আত্মরক্ষার চেয়ে আক্রমণই প্রধান এবং আমাদের পার্টি শ্রমিকের হাতে এই আক্রমণের হাতিয়ার, ইজ্জতের লড়াইয়ের হাতিয়ার, বিপ্লবী তৈরীর হাতিয়ার, মালিকশ্রেণীকে ভীত সন্ত্রস্ত করে রাখার হাতিয়ার এবং সর্বোপরি গ্রামে কৃষিবিপ্লবের লড়াইয়ে অংশীদার হওয়ার জন্য চেয়ারম্যানের চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ শ্রমিক-বিপ্লবী প্রেরণের হাতিয়ার।' (১৩)

কিন্তু বৃহত্তর অর্থে শ্রমিকদের শ্রেণী হিসেবে তারা নকশালবাদী আন্দোলনের অংশভাগ করে তুলতে পারেন নি। শ্রমিকশ্রেণী ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে অর্থনীতিবাদী আন্দোলনের মধ্যেই বাঁচার সংগ্রামকে সীমাবদ্ধ রাখেন। তার মুখ্য কারণ সম্ভবত ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি কখনো শ্রমিকদের রাজনৈতিক আন্দোলনের বা রাজনীতির সঙ্গে যথার্থ অর্থে সংযুক্ত করেনি। অথচ তাদের ওপর প্রত্যহই শোষণের মাত্রা বেড়ে চলেছে এবং তা থেকে মুক্তির পথ কোন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের দ্বারা সম্ভব নয়, এ-সত্য কোনক্রমেই অস্বীকার করা চলে না। তথ্য প্রমাণ থেকে দেখা যায়, '১৯৬৪ সালে, সংগঠিত শিল্পের শ্রমিকেরা যে প্রকৃত মজুরী পেয়েছেন তা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের অধীনে ১৯৩৯ সালে উপার্জিত প্রকৃত মজুরীর চেয়েও কম ছিল। ১৯৬৪ সালের পর থেকে দ্রব্যমূল্য দ্রুতগতিতে উপরে উঠে যাচ্ছে এবং মজুরী আরও বেশি বেশি করে পিছনে পড়ে যাচ্ছে। আজ শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থা ১৯৬৪ সালের চেয়েও অনেক খারাপ।' (১৪) অথচ 'এটা কেউ বলতে পারবে না যে শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতা আগের তুলনায় যথেষ্ট বেড়েছে। সব চেয়ে তিক্ত ঘটনা হচ্ছে এই যে, কারখানার শ্রমিকেরা আজ পূর্বের চেয়ে নির্দয়ভাবে শোষিত হচ্ছে।' (.৫) ভারতীয় শিল্পে

অনুসৃত মজুরী সংক্রান্ত নীতির বিশ্লেষণে এই শোষণের চেহারাটা স্পষ্টতর হয়। শ্রমিকদের শ্রমের মূল্যে যে কোন পদ্ধতিতে মুনাফা বাড়িয়ে চলাই এই নীতির বৈশিষ্ট্য এবং জাতীয় অর্থনীতির সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারক ভারত সরকার শুধু এই নীতিকেই মদত দিচ্ছেন তাই নয়, সেই সঙ্গে নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্রের ওপর কর বসিয়ে বা সরাসরি দাম বাড়িয়ে এবং মুনাফার ওপর কোন নিয়ন্ত্রণের কার্যকরী ব্যবস্থা না করে একতরফাভাবে শুধু শ্রমিকদের আরো উৎপাদন বাড়াতে বাধ্য করে এই নীতিকেই আরো জোরদার করে তুলছেন। মুনাফামুখী ও শ্রমিকস্বার্থ-বিরোধী এই নীতিরই অন্য গুরুত্বপূর্ণ দিক হোল, ছাঁটাই, লক-আউট, লে-অফ ও ক্লোজার। কাঁচামাল, বিদ্যুৎ, ও অন্যান্য সাজ-সরঞ্জামের অভাবে অথবা চাহিদা পড়ে যাওয়ার ফলে, যখনই মন্দা দেখা দিচ্ছে, অর্থাৎ মালিকের মুনাফায় টান পড়ছে, তখনি সেই সংকটের বোঝা শ্রমিকদের ঘাড়ে চালান করে দিয়ে এইসব কায়দায় লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে জীবিকাচ্যুত করা হচ্ছে। এবং লক্ষণীয় যে শ্রমিকদের রুটি-রুজির ওপর ধারাবাহিক আক্রমণ চালাবার এগুলি সবই হোল আইনসিদ্ধ কায়দা। প্রতিবাদে শ্রমিকেরা মিছিল, ধর্মঘট, ঘেরাও ইত্যাদির মাধ্যমে যে আন্দোলন চালায় তা বহুলাংশেই রাজনীতিহীন অর্থনীতিবাদী আন্দোলন। ফলে কখনো কখনো সাময়িক দাবীদাওয়া মিটলেও, কার্যত তাদের ওপর শোষণ-ব্যবস্থা আরো জোরদার হয়। এবং শ্রমিকদের ওপর মালিকশ্রেণীর সংগঠিত আক্রমণ তীব্রতর হ'তে থাকে।

তদুপরি এদেশে ট্রেড ইউনিয়ন-আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রায়শই শ্রমিকদের যথার্থ দাবীদাওয়া ও অসন্তোষের বিষয়গুলি সরাসরি মালিকদের কাছে অভ্যাবাধ উপস্থাপিত হবার সুযোগ নেই। কারণ এই ট্রেড ইউনিয়নগুলির নেতৃত্ব, ছোট কারখানা থেকে রাজ্য বা কেন্দ্রীয় স্তর পর্যন্ত, থাকে এক নেতার হাতে, যিনি কেবলমাত্র মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মানুষই নন, চিন্তায় ও জীবনযাপনে শ্রমিকদের সঙ্গে যার একাত্মতার কথা কল্পনাও করা চলে না। প্রথমত এই নেতা প্রায়শই কোন না কোন সর্বভারতীয় পার্টির সদস্য, এবং শ্রমিকদের আন্দোলনে সর্বদাই তিনি নিজের পার্টিলাইনের প্রতিফলন ঘটাতে আগ্রহী; দ্বিতীয়ত, এই নেতাকে মোটামুটি শিক্ষিত হতে হয়, যাতে করে তিনি মালিকদের সঙ্গে ইংরেজিতে কথাবার্তা চালাতে পারেন। এবং এরা সাধারণত উচ্চবর্ণ থেকেই আসেন। ফলে শ্রমিককেরা অনন্যোপায় হয়ে তাকে নেতা বলে স্বীকার করে নিলেও শেষপর্যন্ত এই নেতৃত্ব এবং ইউনিয়ন-সদস্যদের মধ্যে আসমান-জমিন ফারাকই থেকে যায়। ইউনার বলেছেন যে এই সর্বক্ষণের পেশাদার রাজনীতিবিদেরা

প্রধানত জমির আয়ের উপর নির্ভরশীল, কলেজী শিক্ষায় শিক্ষিত; সাধারণভাবে, আয়, শিক্ষা, পারিবারিক কৌলীন্য, জমির মালিকানা অথবা উচ্চবর্ণের কারণে, তারা যাদের নেতৃত্ব দেন তাদের তুলনায় সামাজিক কৌলীন্যে অনেক উঁচুতে। কারখানার শ্রমিকেরা যেহেতু তুলনামূলকভাবে সমাজ কাঠামোর নিচুতলার বাসিন্দা তাই মালিক বা সরকারী স্তরে কথাবার্তা চালাবার জন্যে উক্ত নেতাদের স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়। (১৬) এইভাবে যদিও ইউনিয়ন একটি শ্রেণীর সংগঠন হিসাবে কাজ করে, তথাপি নেতৃত্ব ও সদস্যদের মধ্যে আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক প্রায়শই শ্রেণীর স্বার্থকে আঘাত করতে থাকে।

নকশালবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে একারণেই বারংবার উপস্থাপিত হয়েছে শ্রমিকদের রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার কথা। এবং এই রাজনৈতিক শিক্ষা গ্রহণ ছাড়া সে শহরে 'ভাল পার্টি সংগঠক' বা 'গ্রামে গিয়ে বিপ্লবী কৃষক সংগ্রামে' যোগ দেওয়া, কোনটাই করে উঠতে পারে না। ১৯৭১-এ 'শহরাঞ্চলে পার্টির কাজ' শীর্ষক নিবন্ধে চারুবাবু লেখেন যে, শহরাঞ্চলে যে কমরেডরা থাকবেন, তারা রাজনীতির ওপরই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করবেন। তারা অবিচলিতভাবে শ্রমিকশ্রেণী ও গরীব শ্রেণীর মধ্যে কাজ করে চলবেন এবং তাদের মধ্যে আমাদের রাজনীতি প্রচারের কাজ চালিয়ে যাবেন। আমাদের উদ্দেশ্য থাকবে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে আমাদের পার্টির প্রতিষ্ঠা এবং শ্রমিকদের মধ্যে থেকেই পার্টিসংগঠক গড়ে তোলা। যদিও আমরা সবসময়েই শ্রমিকদের পাশে থাকবো এবং তাদের সমস্ত সংগ্রামের সাথী হবো, তথাপি যদি অনেকগুলি রাজনীতি সচেতন পার্টি ইউনিট তাদের সঙ্গে থাকে তবে তারা নিজেরাই বহু সংগ্রাম পরিচালনা করতে পারবেন। একারণেই পার্টির কাজ হবে শ্রমিকদের মধ্যে অনেক পার্টি ইউনিট গড়ে তোলা এবং তাদের রাজনৈতিক সচেতনতাকে জাগিয়ে তোলা। শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে এখনো সংশোধনবাদের প্রভাব অতিমাত্রায় বিদ্যমান। আমাদের কাজ হবে তাদেরকে সে প্রভাব থেকে মুক্ত করা। শ্রমিকশ্রেণী ক্রমাগত ছোটবড় অনেক সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। তাদের মধ্যে আমাদের কাজ এইসব সংগ্রামের সহায়ক হবে এবং এদের মধ্যে থেকে এক বৃহৎ অংশ আমাদের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হবেন। আর শ্রেণীসচেতন শ্রমিক শেষপর্যন্ত স্বেচ্ছায় গ্রামে গিয়ে কৃষকের সশস্ত্র সংগ্রামে অংশ নেবেন। (১৭)

প্রাসঙ্গিকভাবেই চারুবাবু বিপ্লবী ছাত্র-যুবকদের 'রেডগার্ড স্কোয়াড' সংগঠিত করার কথা বলেছেন। 'শহরে শ্রমিকরা যখনই কোনও লড়াইয়ে বা ধর্মঘটে নামবেন রেডগার্ডরা তাঁদের শুধু সমর্থন জানাবার জন্যই পাশে গিয়ে জমায়েত

হবে। কিন্তু শ্রমিক ইউনিয়ন বা তার নেতাদের সম্পর্কে কোন মতামত রেডগার্ড রাখবে না, বা বক্তৃতা দেবে না। যুবছাত্রদের এই একাত্মসমর্থনই শ্রমিকদের মধ্যে বিশেষ উদ্দীপনা সৃষ্টি করবে।......এর পরে, রেডগার্ডরা শুরু করো শ্রমিকদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক প্রচার। বিপ্লবী ক্যাডার তৈরীর কাজ। একজন বা দুজন নিয়ে। বিপ্লবী রাজনীতি গ্রহণ করলেই তাকে পার্টির হাতে তুলে দাও।' (১৮)

এই বিপ্লবী কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে স্কুল-কলেজ ছেড়ে ছাত্র-যুবকদের অবিলম্বে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান চারুবাবু। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র উদ্ঘাটন করে তিনি লেখেন, 'এদেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির মধ্য দিয়ে ছেলেমেয়েদের এমনভাবে তৈরী করা হচ্ছে যাতে তারা গরীব কৃষক-শ্রমিক জনগণকে ঘৃণার চোখে দেখে, যাতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর সবকিছুরই ওপর তারা শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠে, তাদেরই সেবাদাস বা অনুচর হয়ে ওঠে। তা ছাড়া, আঠারো থেকে চব্বিশ বছর বয়সটাতে মানুষ সারাজীবনে সবচেয়ে বেশি পরিশ্রমী, উৎসাহী, নির্ভীক ও আদর্শনিষ্ঠ হতে পারে। অথচ, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় সেই বয়সটাতেই যুবছাত্রদেব এই জনবিরোধী লেখাপড়া ও পরীক্ষায় পাশ করার জন্য ব্যস্ত রাখা হয়। তাই চেয়ারম্যান বলেছেন : যতো বেশি পড়াশুনা করবে, ততো বেশি মূর্খ হবে। আমি সবচেয়ে খুশি হবো যদি তোমরা এই পরীক্ষা পাশের জন্য নিজেকে অপচয় না করে আজই বিপ্লবী সংগ্রামের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ো।' (১৯) এখানে আরো বলা হয়েছে যে এই যুবছাত্রদের বিপ্লবী হওয়ার জন্যে দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষক এবং শ্রমিকের সঙ্গে একাত্ম হওয়া প্রয়োজন এবং একাত্ম হওয়ার জন্যে দরকার কায়িক শ্রমের অভ্যাসের, যা উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত। অতঃপর ছাত্র-যুবকদের জন্যে যে প্রোগ্রাম তিনি রেখেছেন তা হোল, পাড়ায় পাড়ায় স্কুল-কলেজ থেকে ৪।৫ জনের ছোট ছোট স্কোয়াড ৪।৫ দিনের জন্যে গ্রামে যাবে, সেখানে গ্রামের কৃষকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করবে, তাদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং খোলাখুলি প্রচারের কাজ চালিয়ে যাবে। অবশ্য এই গ্রামে থাকাকালীন তারা কখনো সেখানকার কোন পার্টিসংগঠন বা কমরেডদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করবে না। আর গ্রাম থেকে ফিরে এসেই তারা রেডগার্ড সংগঠন গড়বে এবং শ্রমিকদের সঙ্গে একাত্ম হবার প্রয়াস চালিয়ে যাবে। পাড়ায়-পাড়ায় স্কুলে কলেজে যুবছাত্ররা এই রেডগার্ড সংগঠন গড়ে তুলবে। আর আজকের এই রেডগার্ডই হবে ভবিষ্যতে ভারতের গণমুক্তিসেনার সৈনিক—পি. এল. এর সৈনিক।

এরা যুদ্ধে শত্রু সংহার করে আবার রাজনীতিক মতাদর্শও প্রচার করে। জনতার রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করে, জনতাকে সশস্ত্র করে এবং জনতার উৎপাদনে অংশগ্রহণ করে। রেডগার্ড সাধারণত শুধু রাজনৈতিক প্রচারের সংগ্রামই করবে। শুধু দরিদ্র ভূমিহীন কৃষকই নয়, শ্রমিকদের সমর্থনেও যুবছাত্রদের জমায়েত করবে। তদুপরি 'শহরাঞ্চলে যেখানেই আমাদের উপর অন্য পার্টির কোন হামলা হবে, সেখানেই পালটা আঘাত হানবার জন্য রেডগার্ডদের সর্বদাই প্রস্তুত থাকতে হবে। এটা বিশেষ প্রয়োজন।'

১৯৭০-এর মার্চে কলকাতায় নকশালবাদীরা অ্যাকশন শুরু করেন। অচিরে এই অ্যাকশন পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য শহরাঞ্চলেও ব্যাপ্ত হয়। পূর্বেই বলা হয়েছে স্কুলে-কলেজে-কারখানায় লাল পতাকা উত্তোলন ছিল এই আন্দোলনের প্রাথমিক পর্ব; কাশীপুর গান এবং শেল ফ্যাক্টরীতেও তাঁরা পতাকা উত্তোলনে সমর্থ হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পর্যায়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে মাওয়ের রচনাবলী পাঠ্য করার দাবীতে তাঁরা আন্দোলন চালান। নকশালবাদীদের প্রতিরোধের ফলে কলকাতায় এবং অন্যান্য শহরের কয়েকটি সিনেমা হলে চীন-বিরোধী চলচ্চিত্র প্রদর্শনী বন্ধ করে দিতে হয়। প্রথম দিকে তারা এসব কাজে কোন বাধা পাননি; কিন্তু যে মুহূর্ত থেকে বাধা আসতে থাকলো, তারাও প্রতিরোধে পিছপা হলেন না। সুতরাং সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ালো। আব এভাবেই শহরাঞ্চলে 'শ্বেত সন্ত্রাসের' বিরুদ্ধে শুরু হোল 'লাল সন্ত্রাস'।

গান্ধী মূর্তি ভাঙা, গান্ধীবাদী আমেরিকান ও সোভিয়েত-সাহিত্য পোড়ানো ইত্যাদি হয়ে উঠলো তাঁদের দৈনন্দিন কার্যক্রম। গান্ধীমূর্তির ওপর আঘাতের কোন সরাসরি প্রতিক্রিয়া তৎকালে পশ্চিমবাংলায় পরিলক্ষিত হয়নি, কারণ গান্ধীজী কোনদিনই এখানকার মানসিকতায় তেমন প্রভাব রা৾ং'ত পারেননি। কিন্তু যখনি তাঁরা আঘাত হানতে থাকলেন রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ বাঙালী ব্যক্তিত্বদের মূর্তির ওপর, তখনি বাঙালী মধ্যবিত্ত ভাবপ্রবণতা এবং একশ্রেণীর সাংস্কৃতিক কায়েমী স্বার্থ-রক্ষাকারীর মানসিকতা আঘাত পেল। স্বভাবতই প্রতিবাদ-প্রতিরোধ একযোগে মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। শহরের ক্যাডারদের এই কার্যক্রমকে সমর্থন করে চারু মজুমদারের বক্তব্য (কৃষকের বিপ্লবী সংগ্রামের সাথে মিলিত হোন) প্রকাশিত হোল ৫ই আগস্ট, ১৯৭০-এ: সরোজ দত্ত মূর্তি ভাঙার সপক্ষে তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করেন ২০-শে 'আগস্ট ১৯৭০'-এ। 'দেশব্রতী'-তে প্রকাশিত এই দুটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ ছাড়াও সামগ্রিকভাবে এই আন্দোলনকে সমর্থন করে খবর বেরুতে থাকে।

আজ এই মুহূর্তে 'মূর্তিভাঙা প্রসঙ্গে মতাদর্শগত বহু বিতর্কের অবকাশ আছে। বলা হয়েছে 'যে কোন আন্দোলনের ক্ষেত্রেই এই প্রাসঙ্গিক মতাদর্শগত আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ। 'প্রচারকার্য প্রসঙ্গে রচনায় মাও ৎসে-তুঙ তা উল্লেখ করেছেন। মূর্তিভাঙা প্রসঙ্গে তা আরো গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে এই আন্দোলনে সবচেয়ে বেশি আলোড়িত হয় সমাজের পেটি বুর্জোয়া শ্রেণী, যাদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে রামমোহন-বঙ্কিম-বিদ্যাসাগরের ভাবমূর্তি গড়া হয়েছে। এই ভাবমূর্তি ভাঙতে সময় লাগবে—দীর্ঘ তিক্ত মতাদর্শগত বিতর্ক চালাতে হবে এটি ভাঙবার জন্যে।' (২০) অন্যপক্ষে বলা চলে যে, এই ধরনের মতাদর্শগত লড়াই অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির আমলে চালাবার চেষ্টা ('মার্কসবাদী' সঙ্কলনগুলি দ্রঃ) কিছুমাত্র কম হয়নি ; কিন্তু তার কোন বৃহত্তর প্রতিক্রিয়া কি জনমানসে লক্ষ্য করা গেছে ? নকশালবাদীদের মূর্তিভাঙা বা ভাঙার চেষ্টা বোধহয় বিষয়টি সম্পর্কে জনগণকে অনেক বেশি ভাবিত করেছিল। এবং উক্ত ব্যক্তিবর্গবিষয়ে আজকের পুনর্বিবেচনার সমগ্র প্রয়াস, আমার বিবেচনায়, মূর্তিভাঙা হয়েছিল বলেই, লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

এই মূর্তিভাঙার সপক্ষে সরোজ দত্ত যে বক্তব্য উপস্থাপিত করেন, তা হোল : 'বিপ্লবী যুবছাত্রদের মূর্তি ভাঙার অভিযানে প্রতিক্রিয়াশীল শাসক ও তাদের বেতনভুক্ত দালাল বুদ্ধিজীবী মহলে কান্নাকাটি পড়ে গেছে।...ব্যারাকপুর গান্ধীঘাটের প্রার্থনা সভায় রাজ্যপাল শ্রীশান্তিস্বরূপ ধাওয়ান উগ্রপন্থী যুবকদের হিংসাত্মক কার্যকলাপের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন এর মধ্যে দেশপ্রেমও নেই, বিপ্লবও কিছুমাত্র নেই। এখন আমার প্রশ্ন, গান্ধীঘাট ব্যারাকপুরে হল কেন ? গান্ধীর চিতার ছাই এত জায়গা থাকতে ব্যারাকপুরে এনে গঙ্গায় দেওয়া হল কেন ? মনে রাখতে হবে, তথাকথিত সিপাহী যুদ্ধের অভ্যুত্থানের সূচনা হয় এই ব্যারাকপুরে এবং এই অভ্যুত্থানের প্রথম শহীদ প্রাতঃস্মরণীয় মঙ্গল পাঁড়েকে ইংরেজরা ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করে এই ব্যারাকপুরে। এই সশস্ত্র জাতীয় অভ্যুত্থানের—কার্ল মার্কসের ভাষায় বৃটিশের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনতার প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের—এবং তার প্রথম নায়ক মঙ্গল পাঁড়ের অস্বস্তিকর স্মৃতিকে চাপা দেবার জন্যই লর্ড মাউন্টব্যাটনের গোপন অনুরোধে গান্ধীস্মৃতি পূজার পীঠস্থান নির্বাচিত হয় ব্যারাকপুর। ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের সুদীর্ঘ ইতিহাসে সি. পি. আই (এম. এল)-ই সর্বপ্রথম তথাকথিত সিপাহী যুদ্ধকে মুক্তিযুদ্ধের গৌরব দিয়েছে এবং তাকে কৃষকযুদ্ধ বলে আখ্যা দিয়েছে। এতদিন পরে পশ্চিমবাংলায় সি. পি. আই (এম. এল)-এর নেতৃত্বে সশস্ত্র কৃষকসংগ্রাম তীব্র ও ব্যাপক আকার ধারণ করার পর তারই আঘাতে ও আলোকে বিপ্লবী

যুবশক্তির চোখে গান্ধী-ব্যারাকপুর রহস্য পরিষ্কার হয়ে আসছে। তাই তারা গান্ধীর মূর্তি ভাঙছে মঙ্গল পাঁড়ের মূর্তি গড়ার জন্য। কারণ চেয়ারম্যান মাও শিখিয়েছেন না ভাঙলে গড়া যায় না। বিদ্যাসাগরের দেড়শ বছর পূর্ণ হওয়ার ঘটনাকে মওকা হিসেবে গ্রহণ ক'রে আজ বিদ্যাসাগরের পূজায় কেন এত আড়ম্বর হচ্ছে? ব্যারাকপুরে যখন মঙ্গল পাঁড়ের ফাঁসি হয় এবং সশস্ত্র বিদ্রোহ সারা বাংলায় জ্বলে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দেয়, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর কি তখন তার কলেজকে এই বিদ্রোহ দমনের জন্য সেনানিবাসে পরিণত হতে দেয়নি? ব্যারাকপুরে মঙ্গল পাঁড়ে যখন ফাঁসিতে উঠেছিল বিদ্যাসাগর কি তখন সংস্কৃত কলেজে বসে বৃটিশের জয়গান করে "বাংলার ইতিহাস" রচনা করেনি? তাইতো আজ ছেলেরা ভাঙছে গান্ধী ও বিদ্যাসাগরের মূর্তি মঙ্গল পাঁড়ের মূর্তি গড়ার জন্য। কারণ মহান শিক্ষক চেয়ারম্যান মাও শিখিয়েছেন, না ভাঙলে গড়া যায় না।...আজ যখন নকশালবাড়ী হয়েছে, মাও ৎসে তুং চিন্তাধারা সারা ভারতের কৃষক জনতার গভীরে প্রবেশ করেছে, সি. পি. আই (এম. এল) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সারা ভারতে বিশেষ করে সারা পশ্চিমবাংলায় লক্ষ লক্ষ কৃষক ক্ষমতা দখলের জন্য সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধে সামিল হয়েছেন এবং তারই অনিবার্য প্রভাবে জেগে উঠেছে যুবশক্তি, শ্রমিক এবং ব্যাপক জনতা তখন তাদের চোখে এই ধোঁকাবাজি ধরা পড়ে যাচ্ছে, তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। তাই তারা আজ মূর্তি ভাঙছে শুধু মূর্তি ভাঙার জন্য নয়, এ কাজ তাদের নেতিবাচক কাজ নয়, মূর্তি ভাঙছে তারা পাল্টা মূর্তি প্রতিষ্ঠার তাগিদে। গান্ধীর মূর্তি ভাঙছে তারা ঝাঁসীর রানীর মূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য, গান্ধীঘাট ভাঙছে মঙ্গলঘাট তৈরী করার জন্য। প্রশ্ন উঠবে তরুণরা কি এত সব বুঝে এই সব কাজ করছেন? বিপ্লবী জনতা সবসময় সব কিছু বুঝে বিপ্লবী কাজ করে না, যার মূর্তি তারা ভাঙছেন তার কার্যকলাপকে কি তারা বিচার করে দেখেছেন? না করেননি, তবু তারা সঠিক কাজই করছেন। তারা বিপ্লবের বিজয়ের যুগে জন্মেছেন ও বেড়ে উঠেছেন ও প্রবীণদের সংশোধনবাদী পূর্বসংস্কারে তারা ভারাক্রান্ত নন। যে মূর্তি চিনতে প্রবীণদের পুরানো বন্ধন ছিন্ন করার তীব্র বেদনাময় প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে সে মূর্তিকে আজকের তরুণেরা অনেকটা সহজাতভাবেই চিনে ফেলবেন।...প্রশ্ন উঠবে, ওসব মূর্তি না ভেঙে কি নিজেদের মূর্তি গড়া যায় না, নিজেদের মনোমত ঘাট বানানো যায় না? না, তা যায় না। চেয়ারম্যান মাও আমাদের শিখিয়েছেন, না ভাঙলে গড়া হয় না। যা গড়তে হবে তার বিপরীতকে ভাঙার মধ্যে দিয়েই গড়া হয়।... ১৮৫৭-৫৮

সালের জাতীয় মহাবিদ্রোহের এবং তার পূর্ববর্তী কালের কৃষক জনতার বারংবার সশস্ত্র বিপ্লবী অভ্যুত্থানের যারা বিরোধিতা ও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তথাকথিত সমাজ, ধর্ম ও শিক্ষার সংস্কারবাদী আন্দোলন চালিয়ে তাদেরই আদর্শপুরুষরূপে খাড়া করা হয়েছে। মূর্তি গড়া হয়নি এ সংগ্রামে যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন তাঁদের।... অতএব এতো নিছক মূর্তি স্থাপন নয়, এ যে এক মূর্তিকে সরিয়ে আর এক মূর্তি বসানো ; বিপ্লবের মূর্তিকে সরিয়ে বিপ্লবের বিরোধিতার মূর্তিতে বসানো। এরা যে প্রাণপণে পুরানো মূর্তিগুলো রক্ষা করতে চাইছে তার কারণ এরা জানে এগুলো রক্ষা করতে না পারলে এগুলির জায়গায় নূতন মূর্তি আসবে এবং তাহলেই সর্বনাশ। কারণ নূতন মূর্তি আসলেই আসবে নূতন রাজনীতি, সর্বত্রই সংগ্রামের বিপ্লবী রাজনীতি, নকশালবাড়ির রাজনীতি, সি. পি. আই (এম. এল)-এর রাজনীতি, চেয়ারম্যান মাও ৎ:সে-তুঙের রাজনীতি। তাই মূর্তি ভাঙার লড়াই হচ্ছে আসলে দু'মূর্তির লড়াই এবং দুই মূর্তির লড়াই হচ্ছে আসলে দুই রাজনীতির লড়াই, দুই লাইনের লড়াই, দুই শ্রেণীর লড়াই। শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের স্থান এখানে নেই। একে অন্যকে উচ্ছেদ না করে লড়াইয়ের ফয়সালা হবে না।' (২১)

চারুবাবু অবশ্য এর আগেই (৫ই আগস্ট, ১৯৭০) মূর্তিভাঙার সপক্ষে তাঁর বক্তব্যে বলেছিলেন : 'গত কয়েকমাস ধরে কলকাতা ও বাংলাদেশের ছাত্রযুবকেরা গান্ধী ও বুর্জোয়া নেতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। তারা মূর্তিভাঙার উৎসব পালন করছেন। তারা ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার উপর আঘাত হানছেন এবং পুলিশের দমননীতিকে উপেক্ষা করে এই সংগ্রাম ছড়িয়ে দিচ্ছেন সারা বাংলাদেশে। ছাত্র যুবকেরা যে কাজগুলি করেছেন তা নিঃসন্দেহে সঠিক কাজ। তার কারণ ভারতবর্ষে এই ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থাকে এবং দালাল পুঁজিপতিদের প্রতিষ্ঠিত মূর্তিগুলিকে ধ্বংস না করে নতুন বিপ্লবী শিক্ষা বা সংস্কৃতি সৃষ্টি হতে পারে না। কিন্তু ছাত্র যুবকদের এই সংগ্রাম একক বা স্বয়ংসম্পূর্ণ সংগ্রম নয়। এই সংগ্রাম অবশ্যই চীনের মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মত প্রতিক্রিয়াশীল সংস্কৃতির সমস্ত ইমারতকে ভেঙে দেওয়ার জন্য শুরু হয়নি বা সেই পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না। এই সংগ্রাম চলছে কারণ সশস্ত্র কৃষিবিপ্লব এই বাংলাদেশে এক বাস্তব সত্য হিসাবে বেরিয়ে এসেছে। কৃষকের সশস্ত্র বিপ্লবী সংগ্রামের আঘাতে ভিত ভাঙছে, যার ফলে ইমারতও ঘা খাচ্ছে এবং খাবেই। ভিত ভাঙার প্রতিক্রিয়া থেকেই আসছে ইমারতের উপর এই আক্রমণ আবার ইমারতের উপর এই আক্রমণ ভিত ভাঙার প্রতিক্রিয়াকে সাহায্য করছে। এই কৃষি বিপ্লবের প্রয়োজনের তাগিদেই, ছাত্রযুবকেরা চঞ্চল হয়ে উঠেছেন এবং তারা আঘাত

হানছেন সেইসব মূর্তির উপর যারা কৃষক জনতার সশস্ত্র বিপ্লবকে চিরদিন শান্ত করতে চেয়ে এসেছে শান্তি ও সংস্কারের বাণী শুনিয়ে। তাই ছাত্রযুবকদের এই সংগ্রাম সশস্ত্র কৃষক সংগ্রামেরই অঙ্গ।' (২২)

এই মূর্তিভাঙার রাজনীতিকে কেন্দ্র করেই পার্টিতে প্রথম বড়ো রকমের বিরোধের সূচনা ঘটে। পার্টির পলিট ব্যুরো ও সেন্ট্রাল কমিটির সদস্য এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক সুশীতল রায়চৌধুরী 'পূর্ণ' ছদ্মনামে মূর্তি-ভাঙা ও শহরের অ্যাকশনের বিরোধিতা করে একটি বিবৃতি প্রচার করেন। এখানে তিনি গান্ধীর মূর্তিভাঙা সমর্থন করেন, কারণ নকশালবাড়ির বিপ্লবী রাজনীতির বিরুদ্ধে গান্ধীবাদ সর্বদাই বাধাস্বরূপ; কিন্তু তাঁর মতে রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য বাঙালী রেনেসাঁসের পুরোধা পুরুষদের মূর্তিভাঙা সঠিক কাজ নয়, কারণ তাঁরা ছিলেন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরের বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী। এতদ্ব্যতীত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ওপর আক্রমণ, রেকর্ড ও আসবাবপত্র ভাঙচুর, এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের ল্যাবরেটরি নষ্ট করাতেও তাঁর সমর্থন ছিল না; তাঁর মতে ছাত্রযুবকদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্কারের জন্যে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। চারুবাবু অবশ্য শ্রীরায়চৌধুরীর এ-বক্তব্যকে সরাসরি আক্রমণ করে বলেন যে রামমোহন বিদ্যাসাগর প্রমুখ বুদ্ধিজীবীরা কখনো ভারতবর্ষ থেকে বৃটিশ-বিতাড়নের কথা বলেননি, পক্ষান্তরে তাঁদের সংস্কারপন্থী আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামে জনগণকে বৃটিশবিরোধী ভূমিকা থেকে সরিয়ে আনা। তিনি বলেন যে রায়চৌধুরীর মূল্যায়নে মনে হয় যে ভারতীয় বুর্জোয়াদের একাংশ ছিল বৃটিশ বিরোধী, যা গৃহীত পার্টি-প্রোগ্রামের বিরোধী। এই প্রোগ্রামে স্পষ্টত বলা হয়েছে যে ভারতীয় বুর্জোয়ারা 'চরিত্রগতভাবে মুৎসুদ্দি'। এবং চারুবাবু মনে করেন যে আজ যখন ছাত্ররা বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি গভীর ঘৃণায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির চেয়ারটেবিল ভাঙছে বা কাগজপত্রে আগুন দিচ্ছে, তখন কোন বিপ্লবীর তাকে বাধা দেওয়া উচিত হবে না। (২৩)

মূর্তিভাঙা ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির ওপর আক্রমণের ধারা পরিণতি লাভ করে পার্টির শহরাঞ্চলে শ্রেণীশত্রু খতমে'র আহ্বানের মধ্যে। পার্টির কলকাতা জেলা কমিটি অকস্মাৎ ঘোষণা করে যে পুলিশ, সেনাবিভাগের অফিসার, বৃহৎ পুঁজিপতি, এবং চোরাকারবারীদের খতম করা হবে, অন্ধ্রপ্রদেশে, পশ্চিমবাংলায় ও অন্যান্য প্রদেশে সি. পি. আই (এম.এল) এর নেতৃবৃন্দ ও ক্যাডারদের হত্যার বদলা হিসেবে। ইতিপূর্বেই (১৫ জানুয়ারী, ১৯৭০) অবশ্য পার্টির কেন্দ্রীয় সংগঠনী কমিটি 'শ্রেণীশত্রু খতমের অভিযান তীব্রতর' করার ডাক দিয়েছিলেন। (২৪) এই

বিবৃতিতে বলা হয়, 'গত বছরের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে শ্রীকাকুলামে তিনজন মহিলাসহ আমাদের তেরজন কমরেড শত্রুর বুলেটে প্রাণ দিয়েছেন। · আজ শোক আমাদের নিদারুণ, শোক আমাদের সুতীব্র। কিন্তু কমরেডস, এই দারুণ শোককে আমরা দারুণ ঘৃণায় পরিণত করব, পরিণত করব ঘৃণিত শ্রেণীশত্রুর প্রতি জলন্ত ঘৃণায়। আমাদের অন্ধ্রের বীর কমরেডরা এই প্রতিটি হত্যার প্রতিশোধ নেবার শপথ গ্রহণ করেছেন এবং আমরা ঘোষণা করছি তাঁদের এই শপথ শুধু তাঁদের নয়, সমগ্র পার্টির শপথ। যত বেশি সংখ্যায় সম্ভব গ্রামাঞ্চলে শ্রেণীশত্রু খতম করে শ্রীকাকুলামের নিহত কমরেডদের ঘৃণিত হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)-র কেন্দ্রীয় সংগঠনী কমিটি আজ সমগ্র পার্টির প্রতি আহ্বান জানাচ্ছেন।…কমরেডস, যেমন শ্রেণীশত্রুদের, তেমনই তাদের এই দালালদের আমরা জবাব দেব, শ্রেণীশত্রুকে গেরিলা যুদ্ধে খতম করার পথে, বিপ্লবী কৃষক যুদ্ধকে তীব্রতর করার পথে, পার্টির সাধারণ লাইনকে আরও দৃঢ়ভাবে কার্যকরী করে— একমাত্র এইভাবেই তাদের জবাব দেওয়া যায়।'

এরপর যে সাধারণ পুলিশ কনস্টেবলদের ওপর আক্রমণ চলে তাতে পার্টি নেতৃত্বের অনুমোদন ছিল না। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যকমিটির একটি সভায় চারুবাবু বলেছিলেন যে এই 'পুলিশ খতম কোনক্রমেই শ্রেণীঘৃণাকে বাড়িয়ে তুলবে না, বরং কমিয়ে দেবে; আসলে প্রয়োজন হোল শ্রেণীশত্রু খতমের প্রচার অভিযানকে এগিয়ে নিয়ে চলা।' (২৫) পরে অবশ্য পার্টিগতভাবে এই পুলিশ-খতমকে কার্যক্রম হিসেবে মেনে নেওয়া হয়। জুন ১৯৭০-এর মধ্যে, লিবারেশন (মে-জুলাই ১৯৭০) 'পত্রিকার তথ্যানুসারে দেখা যায় যে পাঁচজন শ্রেণীশত্রুকে খতম করা হয়েছে, তার মধ্যে চারজন পুলিশ অফিসার ও একজন 'পুলিশের এজেন্ট মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির লোক'। এভাবে পুলিশ কর্মচারীদের খতমের রাজনীতি কলকাতা ছাড়িয়ে অন্যান্য শহরাঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৭০-এর শেষে দেখা যায় যে অনেক পুলিশকর্মী নিহত হয়েছেন এবং আহতের সংখ্যা প্রায় চারশ'। এ-সময়েই রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে প্রচারপত্র মারফৎ পুলিশ বাহিনীকে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আহ্বান জানানো হয় এবং এই আহ্বানে সাড়া না দিলে যে তারা নকশালবাদীদের হাতে খতম হবেন, তাও জানিয়ে দেওয়া হয়। (২৬) এখানে আরও বলা হয় যে তাঁদের উদ্দেশ্য হোল শোষক এবং জনগণের শত্রুদের রাষ্ট্রযন্ত্র চূর্ণ করে জনগণের রাষ্ট্রযন্ত্র গড়ে তোলা। বিপ্লবীরা 'সাধারণ' এবং 'উচ্চপদস্থ নির্বিশেষে পুলিশ-খতম চালিয়ে যাবেন, কারণ সমগ্র

পুলিশবাহিনীই নিয়োজিত হয়েছে বিপ্লবী আন্দোলনকে দমন এবং বিপ্লবীদের ও বিপ্লবী জনগণকে খুন করতে। সাধারণ পুলিশ কর্মচারীদের উদ্দেশে এই প্রচারপত্রে বলা হয়েছে যে তারা গরীব পরিবারের সন্তান ; এদের মধ্যে অনেকেই এসেছেন কৃষক পবিবার, শ্রমিক ও নিম্ন মধ্যবিত্ত থেকে। কিন্তু তারা কি অস্বীকার করতে পাবেন যে জমিদাব ও পুঁজিপতিদের জন্যে গরীব ও শ্রমজীবী জনগণকে হত্যা করার জন্যেই তাদের চাকরী দেওয়া হয়নি ? এদের মধ্যে অবশ্য কিছু পুলিশকর্মী একথা বুঝতে পেরেছেন এবং বিভিন্নভাবে বিপ্লবীদের সাহায্য করতে রাজী। সাধাবণ পুলিশ কর্মীদের একারণেই জনগণের হত্যাকারী হিসাবে তাদের ব্যবহৃত হতে না দেওয়াই উচিত। তাদের কর্তব্য বিদ্রোহ করা এবং তাদের অফিসারদের উদ্দেশে বন্দুক উঁচিয়ে ধরা অথবা বিপ্লবীদের 'খতম' অভিযানে সহায়তা করা। আর সাধারণ পুলিশ-কর্মীরা যদি এই আহ্বানে সাড়া না দেন তবে যেন তার উপযুক্ত ফলভোগেব জন্যে তৈরী থাকেন।

পরিবর্তে পুলিশ বাহিনীও তৈরী হতে থাকেন এবং কলকাতা ও শহরাঞ্চলে নকশালবাদী ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। এবং পরিণামে এ-ধরনের সংঘর্ষে অনভিজ্ঞ নকশালবাদীরাই নিহত হতে থাকেন। যতদূর জানা যায়, দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকাবের পতনের পর, রাষ্ট্রপতির শাসনকালে নকশালবাদী আন্দোলন দমনে পুলিশেব হাতে সর্বময় কর্তৃত্ব তুলে দেওয়া হয়। (২৭)

নকশালবাদীদের ওপর এই নির্বিচার আক্রমণ ও হত্যার প্রতিবাদে সেদিন কোন রাজনৈতিক দলই প্রশ্ন তোলেনি। পশ্চিমবঙ্গে প্রথম থেকেই মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি বলে এসেছেন যে নকশাল-আন্দোলন সি. আই. এ-পুষ্ট এবং নকশালবাদীরা ও পুলিশ একযোগে পশ্চিমবাংলার গণতান্ত্রিক আন্দোলন ধ্বংস করার জন্যে কাজে নেমেছে। কিন্তু যখন থেকে পুলিশ নকশাল হত্যার তাণ্ডব চালাতে থাকলো, তখন থেকেই মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি আশ্চর্য নীরবতা অবলম্বন করে। এবং আশ্চর্যের বিষয় যে অন্ধ্রের শ্রীকাকুলামে নকশালবাদীদের হত্যার প্রতিবাদে এই পার্টিরই অন্ধ্র রাজ্যকমিটি যখন সোচ্চার, তখন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যকমিটি অদ্ভুত নীরবতা অবলম্বন করে দূরে সরে থেকেছেন।

মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির মনোভাব ইতিমধ্যেই নকশালবাদীদের সম্পর্কে তিক্ত হয়েছিল। ১৯৬৭-তে নকশালবাদীদের তারা চিহ্নিত করেছিলেন বিপথগামী রাজনৈতিক উগ্রপন্থী হিসেবে; আর ১৯৬৯-তে আধা-অসামাজিক হিসেবে। এবং সি. পি. আই (এম এল) পার্টি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার পর

যেহেতু তারা একটি রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, সেকারণেই দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টের সময়ে (জ্যোতি বসু তখন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) তাদের ওপর পুলিশী আক্রমণ জোরদার করতে তদানীন্তন পশ্চিমবঙ্গ সরকার কিছুমাত্র সময়ক্ষেপ করেনি। অবশ্য এ-সময়টাতে দুই দলের ছাত্রদের মধ্যেই প্রধানত সংঘর্ষ সীমাবদ্ধ ছিল। উভয় পার্টির মধ্যেকার এই সম্পর্কের আরো অবনতি ঘটে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টের পতনের পর। রাজ্য বিধান সভায় বৃহত্তম দল থাকা সত্ত্বেও মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টিকে মন্ত্রিসভা গড়তে রাজ্যপাল আহ্বান জানাননি ; ফলে পার্টির ক্যাডারদের মধ্যে বিশ্বাস পুনর্বার মাথা চাড়া দিয়ে উঠে যে সংসদীয় গণতন্ত্রের পথে কিছুই করা সম্ভব নয়। তখন সি পি. আই (এম. এল) একমাত্র পার্টি, যারা নির্বাচন বয়কটের আওয়াজে সোচ্চার ছিলেন এবং স্পষ্টত বলেছিলেন, 'আজকের যুগে অর্থাৎ যে যুগে সাম্রাজ্যবাদ পরিপূর্ণ ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে, যখন বিপ্লবী সংগ্রাম দেশে দেশে সশস্ত্র সংগ্রামের রূপ নিয়েছে, যখন সোভিয়েত সংশোধনবাদ সমাজতন্ত্রের মুখোশ বাখতে না পেরে সাম্রাজ্যবাদের কৌশল পর্যন্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে, যখন বিশ্ববিপ্লব এক নতুন পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে এবং সমাজতন্ত্রের জয়যাত্রা দুর্বার বেগে এগিয়ে চলেছে—সেই যুগে সংসদীয় পথে পা বাড়ানোর অর্থ বিশ্ববিপ্লবের এই অগ্রগতিকে রোধ করার সামিল হয়ে দাঁড়ায়! সংসদীয় পথ আজ বিপ্লবী মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদীদের পক্ষে গ্রহণীয় নয়। এটা ঔপনিবেশিক দেশের ক্ষেত্রে যেমন সত্য, ধনতান্ত্রিক দেশের ক্ষেত্রেও তা' একই রকম সত্য। বিশ্ববিপ্লবের এই নতুন যুগে যখন চীনের সর্বহারা শ্রমিক সাংস্কৃতিক বিপ্লব জয়লাভ করছে তখন বিশ্বব্যাপী মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদীদের একটি কাজই প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা হোল, গ্রামাঞ্চলে ঘাঁটি গেড়ে দৃঢ় ভিত্তিতে সশস্ত্র সংগ্রামের পথে শ্রমিক-কৃষক ও মেহনতী মানুষের ঐক্য গড়ে তোলা। তাই সমগ্র যুগ ধরে বিপ্লবী মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদীদের আওয়াজ হবে 'নির্বাচন বয়কট করো' এবং গ্রামাঞ্চলে ঘাঁটি গেড়ে সশস্ত্র সংগ্রামের এলাকা বানাও। সংসদীয় পথে চলে বিশ্বব্যাপী বিপ্লবীরা বহু রক্তের ঋণ জমা করেছেন। আজ দিন এসেছে সেই ঋণ শোধ করার।' (২৮) ফলে সংসদীয় পথে বীতশ্রদ্ধ ক্যাডারদের দলগতভাবে সি. পি. আই (এম. এল)-এর দিকে ঝুঁকে পড়ার প্রবণতা দেখা দেওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব ছিল না। সুতরাং মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে এমন এক কৌশলগত লাইন নেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না, যাতে করে তাদের ও নকশালবাদীদের মধ্যে তিক্ততা এত বৃদ্ধি পায় যে ভবিষ্যতে দলত্যাগীরা যেন কোনক্রমেই সি. পি. আই (এম. এল)-এ যোগ দিতে না পারে। (২৯)

দ্বিতীয়ত পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান ঘাঁটিগুলি হোল কলকাতা এবং হাওড়া, হুগলী, চব্বিশ-পরগনা ও বর্ধমান জেলা। পার্টির দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যেরা এসেছেন এই অঞ্চলগুলি থেকে। লক্ষণীয় কলকাতায় এবং এই জেলাগুলিতে নকশালবাসীদের ক্রিয়াকলাপ ছিল অব্যাহত ও ক্রমবর্ধমান। ফলে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান বেসগুলিতে ভাঙন দেখা দেওয়া সম্ভব ছিল। সুতরাং সচেতনভাবে তাঁদের নকশালবাদীদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। আর একবার সংঘর্ষ শুরু হওয়া মানেই হোল বেড়ে চলা। এমন কি কামাখ্যা ব্যানার্জী, যিনি কানু সান্যাল, খোকন মজুমদার, কদম মল্লিক প্রমুখের সঙ্গে নকশালবাড়ি আন্দোলনের সূচনা ঘটান, যখন পুনর্বার মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন, তিনিও নকশালবাদীদের হাতে খতম হন। (৩০) এভাবেই প্রধানত শহরাঞ্চলে পারস্পরিক সংঘর্ষ চলতে থাকে। একটি পরিসংখ্যান অনুসারে ১৯৭১-এর মার্চ থেকে আগস্ট মাসের মধ্যে নকশালবাদীরা ২১ জন মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট ক্যাডারকে হত্যা করে এবং মার্ক্সবাদী পার্টিও সমসংখ্যক নকশাল-ক্যাডারকে হত্যা করে। উভয় পার্টির মধ্যে উক্ত সময়কালে মোট ১২৩টি সংঘর্ষ হয়, যার মধ্যে ৬৮টি বাধান মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট কর্মীরা এবং বাকি ৫৫টি শুরু করে নকশালবাদীরা। (৩১) এবং এরপর থেকে সি. পি (এম) ও পুলিশের সম্মিলিত আক্রমণের মুখে অনেক বেশি সংখ্যায় নকশালবাদীরা নিহত হতে থাকেন। ১৯৭০-এর মার্চ থেকে ১৯৭১-এর আগস্ট পর্যন্ত ১৮ মাসে শহুরে অ্যাকশনে পশ্চিমবঙ্গে ১,৩৪৫ জন নকশালবাদী নিহত হন; সি. পি (এম)-এর কর্মী নিহত হন ৩৬৮ জন। (৩২) উক্ত সময়কালের মধ্যে কলকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে পরপর চারটি বীভৎস রাজনৈতিক গণহত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়: বারাসাত (১৯ নভেম্বর ১৯৭০), ডায়মণ্ডহারবার (২৬ জানুয়ারী ১৯৭১), কোন্নগর (১ জুন, ১৯৭১), বরানগর-কাশীপুর (১২-১৩ আগস্ট, ১৯৭১) এবং পঞ্চমটি ঘটে হাওড়ায় (১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১)। সংবাদপত্র এবং পুলিশী ভাষ্যানুযায়ী এই গণহত্যাগুলির যাঁরা শিকার হয়েছেন তাঁরা প্রায় সবাই 'নকশাল-পন্থী অভিহিত রাজনৈতিক গোষ্ঠী'র সভ্য বা সমর্থক।

এর মধ্যে বরানগর-কাশীপুর এবং হাওড়ার গণহত্যাকাণ্ড নারকীয়তায় চূড়ান্ত। প্রথম ঘটনাটি সম্পর্কে যুগান্তর পত্রিকা তার সম্পাদকীয়তে (১৫.৮.৭১) লেখেন: 'বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা ধরে কাশীপুর-বরানগর অঞ্চলে যা হয়েছে তাতে রাজনৈতিক খুনোখুনি একটা নতুন স্তরে উঠল ("নামল" বললেই বোধ হয় ঠিক বলা হয়)। এখানে-ওখানে দুয়েক-

জন খুন-জখম নয়, অথবা বারাসাতের ঘটনার মতো গোপনে পাইকারী খুন করে লাশ পাচার করা নয়, একেবারে প্রকাশ্য রাজপথে ধরে ধরে কোতল করা এবং একটা বড় অঞ্চল জুড়ে ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে তাণ্ডব চালিয়ে যাওয়া। এটাকে কি বলা হবে? রাজনৈতিক খুনোখুনি? দাঙ্গা? গণহত্যা? পশ্চিমবঙ্গে যেসব বীভৎস কাণ্ড গত কয়েক মাস যাবৎ চলছে সেগুলির মধ্যেও এমন ঘটনার নজীর পাওয়া যাবে না। ১৪ থেকে ৫০ বছর পর্যন্ত বিভিন্ন বয়সের মানুষ মারা গেছেন: তাদের মধ্যে অধিকাংশই তরুণ; মোট কতজন যে খুন হয়েছেন তার কোন সঠিক ও নির্ভরযোগ্য হিসাবই নেই।' এর এক মাসের মাথায় সংঘটিত হাওড়ার গণ-হত্যাকাণ্ড বরানগরকেও ছাড়িয়ে যায়। প্রাসঙ্গিকভাবেই 'যুগান্তর' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে (১৩.৯.৭১) লেখা হয়: 'বরানগরের পর হাওড়ায় আবার পাইকারি হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং বীভৎসতায় তা বরানগরকেও ছাড়িয়ে গেছে।... স্বভাবতই শান্তিকামী ও শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষেরা আজ ভাবতে বাধ্য হচ্ছেন, আমরা সভ্য লোকালয়ে বাস করছি, না আদিম গুহা মানবের যুগে ফিরে গেছি। একথা নিঃসন্দেহে সত্য যে নিত্যকার হত্যা ও সন্ত্রাসের ঘটনায় গোটা সমাজেই একটা ত্রাসের মানসিকতা সৃষ্টি হয়েছে এবং সংহত পৌরুষে তার মোকাবিলায় অগ্রসরও হতে হবে সমাজের মানুষকেই। কিন্তু বরানগরে ও হাওড়ায় প্রতিরোধের নামে যা হয়েছে, তা হ'ল রাজনৈতিক ব্যাধির উৎকট চিকিৎসা। পরস্পর বিরোধী রাজনৈতিক জোট পাইকারী হননের উল্লাসে মেতে এই রকম ভয়াবহ কাণ্ড ১৯৪৬-এর দাঙ্গার পর আর করেনি কোনদিন।...প্রতিরোধবাহিনী বলে কথিত সশস্ত্র জনতার সঙ্গে পুলিশ সেখানে প্রকাশ্য হত্যার পৃষ্ঠপোষকতা করেছে বলে সংবাদ বেরিয়েছে।' সংবাদপত্র প্রকাশিত এই মন্তব্যের পর এখানে অবশ্যই আর বলে দেবার প্রয়োজন নেই যে কে বা কারা এই প্রতিরোধবাহিনী এবং কাদের হত্যা করার জন্যে পুলিশ উক্তবাহিনীর সঙ্গে হাত মেলায়।

এই সংগঠিত আক্রমণের মোকাবিলায় অপারগ নকশালবাদীরা কলকাতায় এবং শহরাঞ্চলে প্রাত্যহিক আত্মদানে তাঁদের রাজনৈতিক বিশ্বাসের মর্যাদা দিয়ে চলেছিলেন। শাসকশ্রেণীর 'শ্বেত-সন্ত্রাসের' বিরুদ্ধে 'লাল সন্ত্রাস' সৃষ্টির প্রয়াসে তাঁরা কতখানি সার্থক বা ব্যর্থ হয়েছেন, সে বিবেচনার দায়িত্ব সংগ্রামী মানুষেই গ্রহণ করতে পারেন ইতিহাসের প্রেক্ষিতে। কিন্তু সমকালে বাঙালী লেখকেরা ওই ঘটনাবলীর চিত্রণে কি পরিমাণ সমাজচেতনার পরিচয় দিয়েছেন, সেটিই বর্তমান অধ্যায়ের আলোচ্য।

। দুই ।

কলকাতা এবং শহরাঞ্চলে ১৯৭০-৭১ সালের নকশালবাদীদের প্রাগুক্ত রাজনীতি, 'খতম', নিহত হওয়া ইত্যাদি সমুদয় ঘটনাবলী প্রায় নিরবচ্ছিন্নভাবে গল্প-উপন্যাসে লিখে চলেছিলেন মহাশ্বেতা দেবী। অবশ্য অনেক আগে থেকেই নকশালবাদী আন্দোলনের প্রেক্ষিতে কৃষি-ভারতের প্রত্যেকটি শোষণের চেহারা উন্মোচনই হয়ে উঠেছিল তাঁর সাহিত্যের বিষয়; আগের অধ্যায়ে বিষয়টির বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। সমকালের প্রায় প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠিত লেখকেরা যখন বিষয়টির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থেকেছেন অথবা ভিয়েতনাম বা তথাকথিত বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের জন্যে আবেগে উদ্বেল হয়েছেন, তখন মহাশ্বেতাই একমাত্র ঘরের মধ্যেকার জ্বলে ওঠা আগুনকে আগুন বলে চিহ্নিত করেছেন আর সেইসঙ্গে পলায়নী মনোবৃত্তিসম্পন্ন লেখকদের ধিক্কার দিয়েছেন। 'ঘরে ফেরা' (৩৩) উপন্যাসের নায়ক তথাকথিত প্রগতি শিবিরের লেখক দেবাদিদেব বসুর স্ত্রী ঈপ্সিতা যখন নকশালবাদী বলাইয়ের দাহ শেষ করে ঘরে ফেরে, তখনই 'দেবাদিদেবের মনে হয়, ঈপ্সিতার কাছে সে হেরে যাচ্ছে। মনে হতেই তার রাগ বেড়ে যায় এবং হঠাৎ, তার ঘরে টেন্‌শান ঢুকিয়ে দেবার জন্য সমগ্র নকশাল আন্দোলনের বিষয়ে মনে আসে বীতরাগ। ফলে সে মনে মনে ঠিক করে, নকশালদের বিষয়ে এতটুকু উদ্বেগও সে খরচ করবে না। উদ্যম ও মনোযোগ দেবে আরো বড় কাজে। এবং বিকেলে স্নান-টান সেরে টেলিফোন তুলতেই বোঝে কলকাতার বাজারী সাহিত্যসমাজও তার ভাবে ভাবিত। তরুণদের লাশ এখন ঘরের চৌকাঠে। অতএব বৃহত্তর ও মহত্তর ঘটনায় জড়িয়ে পড়া আবশ্যিক। ইউ-এস-আই·এস-এর সামনে ভিয়েতনাম বিষয়ক মিছিলের কথায় সবার সম্মতি মেলে ও উপযুক্ত ধুমধামে উক্ত কার্য সমাধা হয়।' এবং 'এভাবেই দেবাদিদেবের জীবন এগোতে থাকে। তারপর তাকে আবার সিংহ গৌরব ফিরিয়ে দিতে মুজিবের যুদ্ধ শুরু হয়। নকশাল আন্দোলনে নীরব থাকা চলে, কেন না, তা পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রিক। বাংলাদেশ বিষয়ে নীরব থাকা চলে না, কেন না, তা সীমান্তের ওপারের ঘটনা। দেবাদিদেব এ সময়ে উক্ত দক্ষিণী শিবিরের নেক নজরে ফেরে এবং দরদী লেখায় বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর জঙ্গী পাকসেনার অত্যাচারের বিষয়টি উজ্জ্বল করে তোলে।'

পেশাদারী সাহিত্যিকদের উক্ত 'আনইনভল্‌ভমেন্টে'র বিষয়টি প্রসঙ্গে মহাশ্বেতা পরবর্তীকালের একটি নিবন্ধে (৩৪) লেখেন, 'আমাদের দেশে এই দশক বিষয়ক অভিজ্ঞতা খুবই দ্যোতক। নকশাল আন্দোলনে মধ্যবিত্তের ঘরে জোর টান

পড়েছিল। যে কারণে এই প্রথম ভদ্রলোকদের মনে নানা রকম প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। শহরে আন্দোলন শুরু হওয়াতেই ঘটে এই তাৎক্ষণিক বিপর্যয়। নইলে কৃষিজীবী নিরস্ত্র মানুষের সংগ্রাম মধ্যবিত্তকে কোনদিনই বিচলিত করেনি। এখনো তা করে না। কিন্তু ঘরের ছেলেরা জড়িত, চোখ একেবারে বুজে থাকাও যায় না।···সত্তর থেকে বাহাত্তর—পশ্চিমবঙ্গের বহু জায়গা ও কলকাতা যখন রক্তাক্ত হচ্ছিল, তখন পেশাদারী সাহিত্যিকরা কতখানি নীরব ছিলেন, সবাই জানেন। প্রত্যেকে নন। তবে প্রায় সকলেই। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য বারবার বলেছি। এই আনইনভল্‌ভমেন্ট এক ক্ষমার অযোগ্য অবিবেকী পাপ। যখন সৈন্য, সি. আর. পি.-প্রশাসনী মস্তানরা দেশকে এক রক্তাক্ত বধ্যভূমি করে আইন ও শৃঙ্খলা পুনর্বাসিত করল, তখনও সবাই চুপচাপ।'

মহাশ্বেতা দেবীর নিজের বক্তব্য, তিনি 'সময়ের দলিলীকরণে বিশ্বাসী'। অবশ্যই এই 'দলিলীকরণ', একজন লেখকেরই দলিলীকরণ। অর্থাৎ রিপোর্টাজ থেকে বিষয়টিকে সাহিত্যের গভীর ও ব্যাপক আবেদনে জনমানসে উপস্থাপিত করা। ১৯৭০-৭১-বিষয়ক গল্প-উপন্যাসে মহাশ্বেতা যে কি গভীর নিষ্ঠা ও পরিশ্রমে কাজটি সম্পাদন করে চলেছিলেন, তা সচেতন পাঠকের অপরিজ্ঞাত নেই। তদুপরি উল্লেখ্য যে, এই পর্বের প্রাথমিক উৎস যে মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী, তা সঠিক মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়েই পরিণতি পায় এক নির্দিষ্ট রাজনৈতিক বক্তব্যের প্রকাশে। পরবর্তীকালের রচনাবলীতে যা আরো স্পষ্ট ও সংহত রূপ পেয়েছে।

'শরীর' (৫৫) গল্পের মেয়েটি ছিল নৃপতির রক্ষিতা। তার জন্যে ফ্ল্যাট ও গাড়ীর ব্যবস্থা করেছে নৃপতি। তার ফ্ল্যাটে নৃপতি ছাড়া আরো দু'একজন আসে। কারণ 'ওর শরীর আদিম মানুষের পূজিতা প্রতিমার মত'। মেয়েটিকে ওরা নকশাল-বাদীদের ধরার টোপ হিসেবে ব্যবহার করে। কারণ মেয়েটির সঙ্গে একটা সূত্রে নকশালবাদীদের যোগাযোগ ছিল। এর বাবা-মা ছিলেন কোন এক উপজাতির মানুষ। ওরা দুজনেই একাধিক খুন করে ধরা পড়েছিল। দুজনেরই ফাঁসি হয়ে যায়। নৃপতির সঙ্গে মেয়েটির এরকম কথা হয় :

'মেয়েটিই কথাটা তোলে কেননা প্রায়ই আজকাল ওর মনে হয় ও ঠিক কাজ করছে না।

এই যে আমাকে দিয়ে ওদের ধরাচ্ছে

তুমি যে ওদের চেন।

মেরে ফেলে কেন ?

ওদের মেরে ফেলাই ভাল।

যদি ওরা বুঝতে পারে ···

তোমাকে টুকরো করে ফেলবে।

আমাকে। মেয়েটি চুপ করে যায়। কি যেন ভাবে।

নৃপতি জিগ্যেস করেন, তোমার সেই তার খবর পাও না?

না।'

অবশেষে একদিন 'সেই' ছেলেটি আসে মেয়েটির কাছে আশ্রয়ের জন্যে। বলে, 'আমাকে একটু রাখতে পারবে? কাল চলে যাব।

পারব। কাল, কাল আমি তোমাকে পৌঁছে দেব। তুমি পালাচ্ছ তো? আমার গাড়ি আছে।

অনুপমকে ও নিজের শোবার ঘরে ঢোকাল। তালা বন্ধ করতে বলল ভেতর থেকে। ও বাইরে বসে রইল। বসেই রইল।...

তারপর এক সময় অতনু এল। অতনু, এম, আরো লোক, আরো অনেক লোক। সিঁড়িতে বুটের শব্দ।

অনুপম ওকে বলল, কত টাকা পাবি?'

'সেই রাতে ওর ফ্লাটে নৃপতি, এম, এঁদের উন্মত্ত আনন্দের আসর বসেছিল। ও ওদের গুলি করতে পারত, মদে বিষ মিশিয়ে দিতে পারত। মেয়েটি সেসব কিছুই করেনি।' মেয়েটি ফ্লাটের জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করল।

গল্পের বক্তব্যে এ-তথ্য প্রমাণিত যে মেয়েটির মধ্যে কোন রাজনীতিক সচেতনতা ছিল না। নিজের একান্ত ভালবাসার জন অনুপমকে ধরিয়ে দেবার পর তার মধ্যে যে অনুশোচনা দেখা দেয় এবং সে আত্মহত্যা করে, তাও সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়ায়। উপজাতি পরিবারে জন্ম সত্ত্বেও 'সরকারী তত্ত্বাবধানে' বড় হওয়া ও স্কুল-কলেজে শিক্ষার গুণে ইতিমধ্যে তা: শ্রেণী চরিত্রের বদলও ঘটে গেছে। সুতরাং নিতান্ত পরগাছা মধ্যবিত্তের মতই তার সমাজ-সম্পর্কহীন প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হয় গল্পটিতে। এখানে সমকালের ঘটনার ডকুমেন্টেশন থাকলেও কাহিনী-নির্বাচন পাঠককে কোথাও পৌঁছে দেয় না।

অথচ 'প্রাত্যহিক' (৩৬) গল্পে তিনি বেছে নেন রুপা নামীয় এমন এক মেয়েকে, যে প্রাত্যহিক পথচলার সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে কিভাবে নকশালবাদী রাজনীতির শরিক হয়ে ওঠে। রুপার বাবা সাহিত্য আর রাজনীতি করত; মা চাকরী আর রাজনীতি করত। ফলে মা ও বাবাকে ও কোনদিন কাছে পায়নি। ফলে রুপা একা একাই 'ফুটপাতে ঘুরে ঘুরে' বড় হতে থাকে। পাড়ার কলেজে পড়া ও বর্তমানের ব্যবসাদার রামলাল ওকে প্রোটেকশন দেবার এক

নৈতিক দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল এবং বেপাড়ার কুশল রূপাকে চিঠি দিয়েছিল বলে তাকে ঘুষি মেরেছিল। তারপর বিষয়টি নিয়ে রূপার বাবার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বুঝেছিল যে তিনি ওকে স্বাধীনভাবে মানুষ হবার অধিকার দিয়েছেন, কোন খবরদারী ওর পছন্দ নয়। এরপর একদিন রূপা, সেই 'ফুটপাতে ছেলেদের সঙ্গে হ্যা হ্যা করা' মেয়েটা, বদলে যেতে আরম্ভ করল। সময় ইতিমধ্যে দশ বছর পেরিয়েছে। রামলাল বিয়ে করেছে। একদিন হঠাৎই রূপা ওর বউ দেখতে গিয়েছিল। 'তারপরও রূপা ফুটপাতে হাঁটতো, অন্য ফুটপাতে। হঠাৎ দেখা গেল রূপা গম্ভীর হয়ে গিয়েছে। সব সময়ে বই পড়ে কলেজে যায়। জগত, মানিক, সুমন ওরা বলল রূপা এখন, দুর্দান্ত আঁতেল হয়ে গেছে।' এরপর একদিন কফি হাউসে ঢুকে রামলাল রূপাকে অন্যরূপে দেখল। সেই কুশল অনেকগুলো ছেলে মেয়েকে কি যেন বোঝাচ্ছিল আর রূপার চোখে মু.খ আলো জ্বলছিল,' এই রূপা আর কুশল তখন ফুটপাতে, বিশেষ করে গড়িয়াহাটায় ঘুরত। তারপর একদিন ওদের আর একসঙ্গে দেখা গেল না। তখন দেখা যেত রূপা 'দুপুরে ফিরছে, রাতে ফিরছে, ক্লান্ত, বিধ্বস্ত হতাশ আর ক্রুদ্ধ চেহারা। যেন ভেতরে ভেতরে ও জ্বলছে।' তারপব একদিন ও বামলালের দোকান থেকে গলায় চিকনের কাজ করা উগ্র কমলা রঙের শার্ট কিনতে চেয়েছিল। রামলাল বলেছিল, কিনতে হবে না। বিয়ে কব। আমি প্রেজেন্ট করে দেব। অন্যদিন: 'হঠাৎ ঢুকল রূপা। বামলাল জানত ও ঢুকবে। ঢুকে বলল, তোমাব দোকানে কমলা রঙের কোন জামা আছে?

সেই জামাটা ছিল না। রূপা আরেকটা জামা কিনল। তারপর রাস্তায় বেরিয়ে এল। রামলাল পেছনে পেছনে এল।

ট্যাক্সি খুঁজছে রূপা! চল আমি পৌছে দেব।

তুমি?

রূপা ওর দিকে তাকিয়ে রইল। এখন ওর মনে হল রামলাল বোধ হয় ওকে ভালবাসত এক সময়ে। রূপা একটু হাসল। বলল ওর দাদা বউদি সবাই সরে গিয়েছে। তুমি যেতে চাও? এর মধ্যে কেউ নিজেকে জড়ায় নাকি?

কোথায় যাচ্ছিস?

হাসপাতালে।'

পাঠকের অবশ্যই বুঝতে সময় লাগে না যে নকশালবাদী আন্দোলনে নিহত কুশলের জন্যেই রূপার এই 'উগ্র কমলা রঙের শার্ট' কেনা। রূপার এই শার্ট কেনা ও হাসপাতালে নিয়ে যাবার মধ্যে অবশ্যই একটা ব্যক্তিগত সম্পর্কের ছোঁয়া

বর্তমান ; কিন্তু সেটা ছাপিয়েও মহাশ্বেতার যে বক্তব্য এখানে প্রাধান্য পায় তা রামলালের ভাবনায় বিধৃত : 'ও বুঝতে পারল ওর জানলার কাচে আর রূপার ছায়া পড়বে না।' অর্থাৎ একদিন যেমন করে কুশল গড়িয়াহাটার ফুটপাত থেকে চলে যায় একটা বিশ্বাসের লড়াইয়ে আত্মদান করতে, রূপাও সেইরকমই চলে যাবে। কার্যত ফুটপাতে ঘোরার ব্যাপারটা এখানে শহরে জীবনের প্রাত্যহিক জীবনবিমুখ বেঁচে থাকার প্রক্রিয়ারই প্রতীকী।

'জলসত্র' (৩৭) গল্পের নায়িকা কুসুম পেশায় বারবনিতা। তার পয়সার লালসা ছিল। পল্লীর অন্য মেয়েরা যখন কসাইদের দেখলে মুখ ফেরাত, তখন কুসুম ওদের ঘরে ঢোকাত। অন্যেরা বলত, 'তুই কি পিচেশ ?' এহেন কুসুম একদিন আশ্রয় দিয়েছিল এক পলাতক নকশালবাদী যুবককে ; তার গুলি-লাগা পায়ে তখন পচ ধরেছে। ধনী কালী শিকদার ছিল কুসুমের বাঁধা বাবু। সেই কুসুমকে বোঝায় ছেলেটাকে পুলিশের হাতে না তুলে দিলে ওর পায়ের ঘাতেই ও মরবে। সরল বিশ্বাসে কুসুম ওকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। তারপর যা ঘটার তাই ঘটেছে। আর তারপরই সে বুঝেছে কত বড় অপরাধ সে করে ফেলেছে। পাঁচজনও তাকে বলেছিল, 'ছেলেটাকে ধরা করাচ্ছিস, টাকা খেয়ে / লিচ্ছিস কত ?' কালী অবশ্য তাকে টাকা দিতে চেয়েছিল, কিন্তু সে টাকাও নেয়নি বলেছিল, ওটাকা কালীর রক্ত। কারণ ততদিনে কুসুমেরও চিন্তাভাবনার বদল ঘটে গিয়েছে। 'ছেলেটা বলত চারিদিকের মাটি, এই লালমাটির কান্না ও শুনতে পায়। ভাবতে গেলে কুসুমের বুক ফেটে যায়। তুমি যা যা বলেছিলে সব আমি বিশ্বাস করি এখন। তুমি আমার চোখ খুলে দিয়েছিলে গো। কুসুমের মনটা এখন অন্য রকম। এই লালমাটির পোড়া দেশটার মত।' তারপরই চিরাচরিত পাপস্খালনের দেশীয় প্রথানুসারে কুসুম এসময়ে জলসত্র দেয়। কারণ তখনই সময়টা ছিল খরার। অবশ্য তখনও তার স্বগোত্র পাঁচজন সে জল খেতে চায়নি। ছেলেটিকে ধরাবার কারণে তাদের মনের মধ্যে তখন গভীর ক্রোধ। বলেছিল, 'তো, মাগীর হাতে জল খেইয়ে মরব কেনে ? কলসী নিয়ে সান কেড়ে বসলে তো হেন খুনে মাগী কি বামুন হয়ে যাবে ? তবু জল দেবার জন্যে বসেছিল কুসুম। 'তবু তো হাটুরেরা আসছে যাচ্ছে, দাঁড়াচ্ছে জল খাচ্ছে। তবু কুসুম ওই লোকদুটোকে জল দেয়নি। ওই দারোগাটা আর ওর সঙ্গের লোকটা। কোথায় জীপগাড়ির চাকা নষ্ট হয়েছে। কতদূর থেকে ওরা হেঁটে আসছে। সব শুনেও কুসুম জল দেয়নি ! বলেছে—ছুবনি। যেথা পাও, সেথা যাও।' কারণ একদিন এই দারোগাই ছেলেটার পচ-ধরা পা-টা, ধরে টেনে

নিয়ে গিয়েছিল তার কাছ থেকে। 'তখনি কি, কুসুম বোঝেনি যে সর্বনাশ করেছে কুসুম ?' 'কুসুম তাকে' জল দেয় কি করে বল ? এরপর কুসুম বলছে, 'ভগবান, ভগবান। তুমি কুসুমকে ছেড়ে যাওনি ? এইটুকু ক্ষমতা কুসুমকে দিলে যে জল না দিয়ে সে ওই দারোগাটাকে যন্ত্রণা দিতে পারে।' এইভাবে এক ব্যক্তিগত ঘটনার মধ্যে দিয়ে কুসুমের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে এই 'শ্রেণীঘৃণা'। অবশ্য শেষপর্যন্ত কুসুম পারেনি। দারোগার কাতর, করুণ চোখে, মিনতিতে কোথায় যেন ধাক্কা লাগে ওর। ও জল দেয়। আর তারপরই সে কাঁদতে থাকে। 'জলসত্রে পুলিশকে জল দিতে দিতে বেশ্যা কাঁদছে এমন দৃশ্য কে কবে দেখেছে ?' এভাবে গল্পের সমাপ্তি টানার মধ্যে মহাশ্বেতার মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীই প্রশ্রয় পেয়েছে। তদুপরি গল্পটির উপস্থাপনায়ও কিছু দুর্বলতা বর্তমান। একটা ছোট শহরে পুলিশের একজন দারোগা একটু জলের জন্যে একজন বেশ্যার জলসত্রে এসে ওরকম কাকুতি-মিনতি কেন করবে, বোঝা দুঃসাধ্য।

তুলনায় 'ধীবর' (৩৮) গল্পটি অনেক বেশি লজিক্যাল ও রাজনীতিক চেতনাসমৃদ্ধ। জগতের জাল আছে। আগে মালিকের পুকুরে মাছ ধরত। এখন মালিক পুকুরে মাছ ছাড়ে না। জগতের জালও কোন কাজে লাগে না। অন্যেরা চাইলে ভাড়া দেয়। এখন জগৎ অন্য কাজ করে। প্রায়ই তার থানা থেকে ডাক আসে। দারোগাবাবুর হুকুমে তাকে বাঁশ নিয়ে নামতে হয় রায়পুকুরে। আর এখান থেকেই সে প্রত্যেকবার তুলে আনে নিহতদের শব। পুলিশ, ডোম দাঁড়িয়ে থাকে পুকুরপাড়ে, আর থাকে লাশ নিয়ে যাবার জন্যে একটা তেরপলের ডুলি। প্রত্যেকটি লাশ ওঠাবার জন্যে জগৎ পায় সাত টাকা। আর যেদিন ও টাকা পায়, সেদিন ও কষ্ট আর ভয় ভোলবার জন্যে মদ খায়। ওর টেকনিকাল স্কুলে পাশ করা ছেলে অভয় এদিকে চাকরীর জন্যে হা-পিত্যেশ করে বসে থাকে। এই অভয়কেও খুবই অচেনা লাগে জগতের। 'ভালো ঘরটা অভয়ের। একটা চৌকি, একটা চেয়ার। দড়িতে জামা, পাজামা, প্যান্ট। দেওয়ালে ক্যালেণ্ডার। জগৎ মাঝে মাঝে ঘরটার দিকে চেয়ে নিশ্বাস ফেলে। কিছুতেই বিয়ে করল না অভয়।' তারপর একদিন তারকেশ্বর থেকে পুজো দিয়ে ফিরে ওর মা বাড়ির উঠোনে একটা মেয়ে ও দুটি ছেলের সঙ্গে অভয়কে কথা বলতে দেখল। ওর মা ভয় পেয়ে জগৎকে বলল, ওরে সরিয়ে দিলে হয় না। এদিকে জগৎ দিনের পর দিন শুধু লাশ আর লাশ তোলে আর লাশ তোলে। এরপর একদিন জগৎ পায় অনেক টাকার কাজ। জগৎ জলের নিচ থেকে তুলে আনে ছ'টা লাশ। কিন্তু কারা এদের 'নিকেশ' করেছে ? 'জগতের পেটের

ভেতরটা বরফ হয় যায়। কারা নিকেশ করেছে। ওরা তো ধরা পড়েছিল। ওদের তো থানায় নিয়ে গিয়েছিল ধরে। জগৎ আর ভাবতে পারে না, ভাবতে পারে না, ভাবতে চায় না, বাড়ি ফিরে এসে এই প্রথম ও মদ খায় না।' কিন্তু অভয় যখন মরে যায় জগৎ ওর লাশ তোলে না। অভয় শেষ পর্যন্ত কেমন করে মরে, কারা ওকে মারে কিছুই জানতে পারে না জগৎ। থানায় যেয়ে শোনে যে তারা অভয়কে ধরেছিল এবং রাত হলে ছেড়ে দিয়েছিল। এর বেশি একটা কথাও জানতে পারেনি জগৎ। জানতে চেয়ে দারোগার ঝাড় খেয়ে ওকে থানা থেকে বেরিয়ে আসতে হয়। 'তারপর দারোগাও একদিন নিখোঁজ হয়ে যায়। সাইকেলে বাড়ি ফিরতে ফিরতে।' যথানিয়মে আবার জগৎকে রায়পুকুরে নামতে হয়। ছোট দারোগা গর্জাতে থাকে, দারোগাবাবু যদি লাশ হয়ে থাকে, তবে আজ রায়পাড়া লাশ করে ফেলাবে। 'জগৎ জলে নামে। জলের নিচে সব সবুজ, শান্ত, অপার্থিব। দারোগাবাবু আর সাইকেলটা জড়িয়ে বাঁধা। অভয়ের গামছা দিয়ে। জগৎ সে লাশ তোলে না। ইট-পাথরের চাপড় টেনে নিয়ে দারোগা-বাবুর পেটের ওপর চাপা দিয়ে উঠে আসে। বলে, লাশ পাওয়া গেল না। তারপর জগৎ ধীবর ছোট দারোগার দিকে চেয়ে এক দুর্বোধ্য হাসি হাসে। 'ছেলে মরে যাওয়ার পর এত সদ্য সদ্য ওর মুখে হাসি দেখে ছোট দারোগাবাবু আজ অবাক হয়ে যায়।' ১৯৭০-৭১ রক্তাক্ত পশ্চিমবঙ্গের পটভূমিকায় এক নিম্নবিত্ত পারিবারিক জীবনে যে ট্রাজেডি রাজনৈতিক কারণেই দেখা দেয়, তার চিরাচরিত বেদনাময় দিকটি অগ্রাহ্য করে মহাশ্বেতা এখানে তুলে ধরেন সময়ের ক্ষুরধার আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান এক পিতার চরিত্র; যে, পুত্রের নিহত শবের পাশেই ক্রোধে, ঘৃণায় শুইয়ে দিয়ে আসতে পারে তার হত্যাকারীর শব। আপাত-বিবেচনায় ঘটনা-বিন্যাসে রাজনীতি সেই, জগৎও সে-অর্থে রাজনীতি সচেতন নয়, কিন্তু সামান্য দু'একটি ইঙ্গিতে মহাশ্বেতা বুঝিয়ে দেন সমকালের রাজনীতির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া।

এমন আর এক পিতার অন্য কাহিনী 'পিণ্ডদান'। (৩৯) দশরথ কঙ্কাল বিক্রি করে বোসবাবু আর পালবাবুদের কাছে। রাতে-ভিতে সে জলে নামে। 'কঙ্কাল তোলে এবং সযত্নে চুনে ও ব্লিচিং-এ মুছে সাফ করে। কঙ্কালগুলো দেখলেই দশরথের মনে প্রজ্বলন্ত স্নেহ কৃতজ্ঞতা যুগপৎ কেলি করতে থাকে। তরুণ কঙ্কাল সব, সেই জন্যে স্নেহ। পালবাবু আর বোসবাবুর কাছে পৌঁছে দিলেই টাকা পায় দশরথ, সেই জন্যে কৃতজ্ঞতা। টাকা পেলেই দশরথ সর্বাগ্রে মদ কেনে।' এদিকে দশরথের একমাত্র ছেলে রাম দু'বছর হল জেল খাটছে। কারণ 'বাবুদের

ছেলেদের সঙ্গে মিশে ওর পাখা গজিয়েছিল।' দশরথের একমাত্র দুঃখ যে সে একটাও আস্ত কঙ্কাল পায় না। 'দশরথ যাদের টেনে তোলে, তাদের করোটিকা-অক্ষকাস্থি-জঘন-কপাল-উর্বাস্থি-অংসফলক-পঞ্জরাস্থি চূর্ণিত, ভাঙা খুঁতো। কোন কোন কঙ্কালের শরীরের প্রতিটি অস্থি চূর্ণিত, তাও দশরথ দেখেছে।' ফলে দশরথ বেশি টাকা পায় না। তার একমাত্র বাসনা কবে একখানা আস্ত কঙ্কাল পাবে, কবে পাবে একখানা বড় নোট। এরপরই একদিন পালবাবু বলে দিলেন, ভাল মাল না পেলে আর আনবি না। অতএব দশরথ 'ভাল মাল' খুঁজতে থাকে। পেয়েও যায় ওষুধ কোম্পানীর দীঘিতে। আর পেতেই, 'অভিপ্রেত এক নিখুঁত কঙ্কালের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে' দশরথ কি যেন দেখে আর দেখে। তারপর 'কঙ্কালের গলা থেকে অতি যত্নে ও রুপোর হারটা খুলল। একটা পদক। ভবানীপুরের গোপাল স্যাকরা গড়েছিল। দশরথ আঙুল বোলাল। 'রামলাল' লেখাটা এখনো খোদাই করা আছে। হারটা ও গেঁজেয় পুরল।' কঙ্কালটা সযত্নে বস্তায় পুরে দশরথ বেরুল। তখন তার 'বুকের মধ্যে পর্বততুল্য তরঙ্গ আছড়াচ্ছে। দশরথ বলল, 'আমায় বুঝাছিল তু জেলে আছিস' তারপর পরম স্নেহে ও কঙ্কালটির পাঁজরা জাপটে ধরল, জীবিত পুত্রকে দশরথ কখনো এমন করে আলিঙ্গন করেনি। আর তখনি তার মনে হলো, আর সে পিণ্ড পাবে না। কঙ্কালের বদলে পালবাবুর কাছ থেকে একশ টাকা নিয়ে সে দশ বোতল মদ কিনে বাড়ি ফিরল। নিধিরাম, চৈতন্যকে ডেকে আনল। বউ কুসি এত রাতে পেঁয়াজ কাটতে আপত্তি জানাতে দশরথ চিৎকার করে উঠল, 'চুপ যা মাগী। ই মদ লয়, আমারে আমি পিণ্ডি দিচ্ছি। রাম মোরে আবার রাজা করে দিয়াছে, তু জানবি কি? ক্যারেও বলতে দিব না দশরথ অপিণ্ডিয়া ছিল।' এখানের নকশালবাদী আন্দোলনে নিহত রামের পিতা দশরথের ব্যক্তিগত ক্রোধের প্রকাশ। সমকালীন কলকাতা ও শহরাঞ্চলের প্রতিক্রিয়ার চরিত্রের প্রতি বিশ্বস্ত থেকেও মহাশ্বেতা যেভাবে কাহিনীকে বিন্যস্ত করেন, তা স্বাভাবিক-ভাবেই পাঠকের মনকে ক্রোধে ও ঘৃণায় উদ্দীপিত করে। ব্যক্তি চৈতন্যের সামাজিকীকরণে দশরথ তখন আর একক ব্যক্তিচরিত্রমাত্র থাকে না।

'এপার বাঙলা ওপার বাঙলা' (৪০) গল্পে মহাশ্বেতা এঁকেছেন এক নকশাল-বাদী যুবককে হত্যার চিত্র এবং তার পটভূমি। মধ্যবিত্ত ঘরের আদরের ছেলে তপন নিজের পাড়া ছেড়ে নিহত হবার ভয়ে জামাইবাবুর বাড়ি এসে আশ্রয় নিয়েছিল। দিদি ওকে প্রাণপণে লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। কারণ, ঝি, ধোপা, গয়লা, পাশের বাড়ির কৃষ্ণার মা, সকলকেই ভয় পায় ওর দিদি। আর

এই আপ্রাণ প্রয়াস চালাতে গিয়ে দিদি মাঝে মাঝে ক্ষেপে যায়, 'এইজন্যেই বাবা তোকে বড় স্কুলে পড়িয়েছিল না? বড় কলেজে গিয়েছিলি না তুই? তপনের জামাইবাবু সাধারণ মধ্যবিত্ত ইউ. ডি কেরানী; অ-রাজনৈতিক, শুধু কেরানী। 'যাদের দেখলে পুলিশ গুলি ছোঁড়ে, মিলিটারি তাড়া করে, পুলিশ আর মিলিটারির নাকের উপর থেকে যাদের টেনে নিয়ে ওরা অনেকক্ষণ ধরে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারে, জামাইবাবুর চোখে তপন তাদেরই একজন।' এই দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যে থাকতে থাকতে তপনের মাঝে মাঝে 'ভগবান' বলে চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে করে। কিন্তু ভগবানের নাম করে চেঁচালেই তো আর বাঁচা যায় না। 'ভগবান ভগবান বলে শঙ্কু চেঁচিয়েছিল, শঙ্কুকে ওরা মাঠে টেনে নিয়ে গিয়েছিল।··· অনেকক্ষণ ধরে ওরা শঙ্কুকে মেরেছিল। পেট ফুটো করে নাড়ী টেনে বের করে মাঠে দিয়ে ছড়িয়ে দিয়েছিল। ওর নাড়ি দিয়ে ওকে ঘিরে দিয়েছিল। শঙ্কু তখনো বেঁচে। শঙ্কু যতক্ষণ চেঁচাতে পেরেছিল ততক্ষণ ছেলেদের নাম ধরে ডেকে ডেকে বলেছিল—তুই? তুই? তুই? যখন আর চেঁচাতে পারেনি তখন নাকি বলেছিল—ভগবান! ভগবান! ভগবান! শালা ভগবানকে ডাকছে রে! বলে ওরা শঙ্কুর গলার ওপর রড ফেলে দুদিকে পা দিয়ে চেপে ধরেছিল।' একঘেয়ে ঘরের মধ্যে আটকে থাকা তপনের মনে হয় এই শঙ্কুর কথা, অনিন্দ্যর কথা, সঞ্চয়নের কথা। তারপর এক রাতে খেতে বসে জামাইবাবু বলেছিল, আচ্ছা তপু, 'পুলিশের কাছে সারেণ্ডার করলে পুলিশ তাদের প্রাণে মারে না?' তপন আস্তে আস্তে চোখ নামিয়ে রেখে বলে গেল কাকে ওরা এজাহার নিয়ে পিঠ চাপড়ে ছেড়ে দিয়েছিল অথচ পেছন থেকে গুলি করে।' তারপরই তপন বলেছিল, আমি চলে যাব। দিদি-জামাইবাবুর আপত্তি ছিল। তবু তপন এক সন্ধ্যেয় বেরিয়ে পড়ে। বাসে করে বাড়ির কাছাকাছি একটা স্টপেজে নামল। পানের দোকান থেকে আলো আসছে; রেডিওতে কেবল ওপার, ওপার, ওপার বাঙলা। তপন একটু এগোতেই শুনলো, 'হল্ট!' ছায়া ছায়া মানুষগুলো এগিয়ে আসতে থাকে। তপন বাড়ির দিকে ছুটতে থাকে। বাবা আমি এসেছি। মা আমি এসেছি। দরজা খুলে দাও। তখনই তপন পড়ে গেল। ওর গলায় রুমাল চেপে বসল। ওরা তপনকে মাঠের দিকে নিয়ে গেল। কিছু হয়নি বোঝাবার জন্যে ব্রজ পকেট টানজিস্টারটা খুলে দিল। 'ওরা শার্ট-প্যাণ্টের ভাঁজ বাঁচিয়ে তপনকে ছোরা মারতে লাগল। অন্ধকারে কোন অসুবিধে হল না ওদের। কেননা অন্ধকারে নিরস্ত্র লোককে ছোরা ওরা এই প্রথমবার মারছে না।'

নকশালবাদী রাজনীতি ও তার ক্যাডারদের বিরুদ্ধে অন্যপক্ষ যে ঘাতকের ভূমিকা গ্রহণ করে, তা উক্ত গল্পে স্পষ্ট প্রকটিত হয়। শহরাঞ্চলে ওপার বাংলা বিষয়ক কুম্ভীরাশ্রুর আড়ালে এপার বাংলার যৌবন-নিধন কেমন আশ্চর্যভাবে চাপা দেওয়া হচ্ছিল, এ-গল্পে মহাশ্বেতা সে সত্যকেও ব্যক্ত করেছেন। 'সঞ্জয়ন আস্তে আস্তে বলছিল, একটা দেশে ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ বছর যাদের বয়স তারা থাকবে। থাকবে না একটা জেনারেশন, ষোল থেকে বাইশ।' অথচ এই ষোল থেকে বাইশ, দেশ বলতে আজও বোঝে মাটি-জল-ধান, মায়ের হাসি, শিশুর কান্না, পাটপচা গন্ধ, একটা নিশান, একজন নেতা, তখন কি তোমাকে পাখিপড়া করে যা শেখানো হয়েছে, সব ভুলেটুলে গিয়ে ওদের এই ভালবাসার সাহসটা তোমার বুকটাও ভরিয়ে দেয় না। তোমার কি মনে হয় না ওরা মরছে না, ওরা বাঁচছে? ওদের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু ভুলে-যাওয়া জিনিস বাঁচছে।' তবুও ওরা বাঁচেনি, ওদের বাঁচতে দেয়নি কায়েমী স্বার্থ আর তার তল্পীবাহকেরা। ওদের মারবার জন্যে পেশাদর ঘাতকও নিয়োগ করা হয়েছিল। মহাশ্বেতার 'ঘাতক' (৪১) গল্প তারই এক অনবদ্য দলিল।

অখিল ওরফে সোনা একদিন অনেক সমাজসেবা সমিতির কর্ণধার অনুপমদার আদেশে তারই একদা বন্ধু নকশালবাদী রঞ্জনকে খুন করে আর এভাবে হাতেখড়ি থেকেই ও হয়ে যায় 'পেশাদারী ঘাতক'। তারপর একদিন সংগ্রামী চাষী সাজাদ মণ্ডলকে খুন করতে যেয়েও ক্ষতবিক্ষত হয়, টিনের মগের ছ্যাঁচা খায়। যদিও শেষ পর্যন্ত ও সাজাদকে হত্যা করতে সমর্থ হয়েছিল, তবু অনুপমদা বলেছিলেন, 'ফর্মা পড়ে যাচ্ছে তোমার। তুমি অফ হয়ে যাও এখন।' আরও বলেছিলেন, এখন 'প্রফেশনালরা টেক ওভার করে। সি-সি-সি বা চঞ্চলচরণ চাকলাদার প্রফেশনালদের ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে ঘুরে জানিয়েছেন, শ্যামা মা এবার রক্ত চাইছেন যে। শ্যামা মায়ের এই ইচ্ছেটা অচিরেই প্রফেশনালরা জেনে যায়। এবং তাদের হাতে তখন 'উচ্চশক্তির অস্ত্রাদি'। অতএব অনুপমদার কথায় পেশাদারী ঘাতক সোনা বুঝে ফেলে যে এবার অপ্রয়োজনীয় তাকেও যে কোন মুহূর্তেই সরিয়ে দেওয়া হবে। 'ঘাতক এখন রক্তে পাগলা ঘন্টি শোনে।' তাই আত্মরক্ষার তাগিদে সোনা অনুপমদাকে বলে, 'আপনি কি ভাবছেন আমি জানি। দেখুন, প্রত্যেকটা কেসের খবর, আপনি, অজিতবাবু, নন্দ রায়, কে কোন কেস হাসিল করতে বলেন, কখন, কোথায়, সব আমি লিখে খামে বন্ধ করে এক জায়গায় রেখেছি।' অনুপম মিত্রের শরীরে যন্ত্রণা হয় অস্বস্তিতে। সামান্য ক'দিনের জন্য হলেও সোনা বেঁচে যায়। তাকে চলে যেতে বলা হয় কলকাতার বাইরে। তারপর

আবার তাকে ডাকা হয় বেশ কিছুদিন পরে সতীশ পাত্রকে সরাবার জন্যে। সতীশ পাত্র তখন নকশালবাদীদের হত্যার তদন্তের দাবীতে বড়ো বেশি হৈচৈ শুরু করেছে, বিক্ষুব্ধ দলত্যাগীদের আশ্রয় দিচ্ছে। এদিকে প্রফেশনালরা তখন সব পাড়ায় ঢুকতে পারছে না। তাই ডাক পড়েছে সোনার। তার সঙ্গে আটহাজারে রফা। এরপরই সতীশ পাত্রের সঙ্গে অনুপম মিত্রের একটা আপোস-রফা হয়ে গেল। অতএব অনুপম তার সেক্রেটারীকে ডেকে পাঠালেন; বললেন, 'লেখ, অখিল ওরকে সোনা নামে একজন সমাজবিরোধীর মৃতদেহ কাল সন্ধ্যায় পুলিশ '—'কারখানার পরিত্যক্ত গুদোমে আবিষ্কার করে। তাহার শরীরে ছুরিকাঘাতের চিহ্ন ছিল। তারপর সতীশ পাত্রকে হত্যার জন্যে কারখানায় অপেক্ষমান সোনা যখন সামনের দিকে তাকিয়ে বসে আছে, তখনই 'চারজন প্রৌঢ় দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়ালেন। সোনার বাসের সঙ্গী যুবকটি সোনার দিকে এগোল। সোনা টের পেল না। ও সামনে চেয়ে বসে রইল। ছেলেটি সোনার কাছে এল। ওর হাতে ছুরি। পিছনের মানুষ চারজন নিশ্চল। প্রকৃত ঘাতকেরা কখনো হাতে ছুরি ধরে না।'

৭ই প্রকৃত ঘাতকের অবাধ হত্যালীলায় ৭০-৭১-৭২-এর কলকাতা এবং শহরাঞ্চল এক বিশাল বধ্যভূমিতে পরিণত হয়। পশ্চিমবঙ্গ বন্দীমুক্তি ও গণবাদী কমিটি ১৯৭০-৭৬ সালে পশ্চিমবঙ্গে নকশালবাদী রাজনৈতিক কর্মীদের ওপর কেবলমাত্র পুলিশী নির্যাতনের যে প্রাথমিক-রিপোর্ট প্রকাশ করেছেন, তা যে-কোন সভ্য দেশের পক্ষেই লজ্জার। '.৯৬৯ সাল থেকে ১৯৭৬ পর্যন্ত বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীদের উপর পুলিশের নির্যাতনের ইতিহাস এক রক্তাক্ত ইতিহাস। এই নির্যাতনে পুলিশ কর্তৃক অনুসৃত তথাকথিত 'সংঘর্ষে'-র পদ্ধতিটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ধরণটা হচ্ছে এই রকম: রাজনৈতিক কর্মীকে তার বাড়ি অথবা আশ্রয় থেকে গ্রেফতারের পর পুলিশ তাকে গ্রেফতারের জায়গায় (অনেক ক্ষেত্রে ঘুমন্ত অবস্থায়ও) অথবা অন্যত্র নিয়ে গিয়ে গুলি করে মারে। অনেক সময়েই পুলিশ হেফাজতে নিয়ে গিয়ে প্রচণ্ড যন্ত্রণা দিয়ে তাকে খুন করা হয়। হত্যার পর পুলিশ ঘোষণা করে অমুক ব্যক্তি পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হয়েছে। ঘটনার বিবরণ সাজান হয় এই ভাবে: অমুক ব্যক্তি সদলবলে পুলিশকে বোমা, পিস্তল ও পাইপগান নিয়ে আক্রমণ করে এবং আত্মরক্ষার্থে পুলিশকে বাধ্য হয়ে গুলি চালাতে হয়। আর একটি অত্যন্ত পরিচিত পদ্ধতি হলো—বন্দীকে পুলিশ হেফাজতে নিয়ে গিয়ে তার উপর অত্যাচার করা হয়। তার গ্রেফতারের বিবরণ পুলিশের খাতায় তোলা হয় না; তারপর হঠাৎ তাকে বলা হয় যে তার বিরুদ্ধে

কোন প্রমাণ নেই অতএব তাকে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। সে যখন চলে যেতে থাকে তখন পিছন থেকে তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। তারপর সংবাদ প্রচার করা হয় যে ধৃত ব্যক্তি পুলিশের হেফাজতে থেকে পালাবার সময় নিহত হয়েছে। রাজনৈতিক কর্মীদের গ্রেফতার করে এইভাবে লোপাট করার পদ্ধতি ভারতে চালু হয় ১৯৬৯ সালে। সরকারী সূত্রের খবরেই প্রকাশ যে ১৯৭১ সালের মার্চ থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে এ-ভাবে ২০২ জনের মৃত্যু ঘটেছে (যুগান্তর, ২৪ নভেম্বর ১৯৭১)। একথা বিশ্বাস করবার যথেষ্ট কারণ আছে যে রাজনৈতিক বন্দীদের এরকম সুপরিকল্পিত ভাবে হত্যা করাটা একটা পরিকল্পিত সিদ্ধান্তেরই ফল। সমগ্র ভারতবর্ষে পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনী রাজনৈতিক কর্মীদের একইরকমভাবে "সংঘর্ষে" হত্যা করার পদ্ধতি অনুসরণ করে, তখন বুঝতে কষ্ট হয় না যে এর পিছনে পরিকল্পনাটা এবং নির্দেশ কেন্দ্রীয়। এছাড়া বড় কথা হচ্ছে এই, পুলিশের এই পদ্ধতি সম্পূর্ণ বে-আইনী হওয়া সত্বেও তার কোনো তদন্ত হয়নি আজও পর্যন্ত এবং দোষী অফিসারকে শাস্তিও দেওয়া হয়নি। উপরন্তু অনেক ক্ষেত্রেই "উগ্রপন্থীদের" সঙ্গে "সংঘর্ষে" জড়িত এই সব অফিসার-দের পুরস্কৃত করা হয়েছে।

তৃতীয়ত, এই সমস্ত তথাকথিত "সংঘর্ষের" সময় দেখা গেছে খুব নামমাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে পুলিশের লোক আহত হয়েছেন। চতুর্থত অনেক সংবাদপত্রে পুলিশের দেওয়া এই সব বিবরণকে চ্যালেঞ্জ করার পরও গভর্মেন্টের পক্ষ থেকে এইসব গুরুতর অভিযোগের তদন্ত করার কোনো ইচ্ছা বা চেষ্টা এ-পর্যন্ত দেখা যায়নি।

অন্যদিকে একথাও বলা যায় যে পুলিশ এবং প্রশাসন অনেক ক্ষেত্রেই জানত যে এটা আইন বহির্ভূত অপরাধ। ১৯৭৩ সালের ১০ মে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী কে. সি. পন্থ মিসা আইনের পক্ষে বলতে গিয়ে লোকসভায় বলেন: "হিংসায় লিপ্ত এদের গুলি করে মারার চেয়ে এটা অনেক ভালো উপায়। আটক থাকাকালে তাদের জীবন অন্তত বাঁচবে" (হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, ১১ মে ১৯৭৩)। এর মানে ঘুরিয়ে একথাই কবুল করা হয় যে "অহিংসায় লিপ্ত" রাজনৈতিক কর্মীদের প্রতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সরকারি নীতি হচ্ছে তাদের "গুলি করে মারা"।' (৪২)

স্বভাবতই এই বধ্যভূমি কলকাতাকে তীর্থবাবুর 'রুং সিটি' মনে হয়। সেদিনের সেই শহরকে আঁকতে মহাশ্বেতা তুলে দেন 'জনা' নাটকের অংশবিশেষ : 'দূরে দূরে-ভীষণ প্রান্তরে/মরুভূমে-দুরন্ত শ্মশানে—/হেথা তোর নাহি স্থান।/দুর্গম

কান্তারে, তুষার-মাঝারে,/পর্বত-শিখরে চল। /চল পাপ রাজ্য ত্যাজি/পতি তোর পুত্রঘাতী অরাতির সখা। /চল পুত্র শোকাতুরা—' 'রং নাম্বার' (৪৩) গল্পের তীর্থবাবুর ছেলে নকশালবাদী দীপঙ্কর নিহত হলে তার মধ্যবিত্ত টিকে থাকার কাল্পনিক সুখী অস্তিত্ব ভীষণভাবে ধাক্কা খেয়ে ভেঙে পড়ে। ফলে 'তীর্থবাবু ভয় করে, খালি খালি ভয় করে। এ একটা অন্য কলকাতায় বাস করছেন তিনি, অন্য পশ্চিমবঙ্গে। দেখতে মনে হয় সেই শহর। সেই গড়ের মাঠ-মনুমেণ্ট-ভবানীপুর-আলিপুর চড়কডাঙার মোড়। সেই আষাঢ়ে রথের মেলা—চৈত্রে কালীঘাটের গাজন—মাঘে বড়দিনের আলোকসজ্জা।' প্রকৃত প্রস্তাবে শহুরে মধ্যবিত্ত মানসিকতা, নকশালবাদী আন্দোলনের ফলে, এই প্রথম একটা বড়ো রকমের আঘাত পেল। অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখে গা বাঁচিয়ে চলার অভ্যস্ত জীবনের সদর দরজা পেরিয়ে রাজনীতি সোজা চলে এল একেবারে অন্দর মহলে। ফলে এই প্রথম তারা বুঝতে পারলেন তারা বেঁচে নেই, টিকে আছেন। স্বাভাবিক-ভাবেই বহুদিনের অতি প্রযত্নে অর্জন করা বোধ থেকে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ার ফলে তীর্থবাবুর মত সৎ মানুষেরা মানসিক ভারসাম্য হারালেন; সত্যকে অস্বীকার করে বেঁচে থাকার এক অন্তহীন প্রয়াস চালিয়ে যেতে থাকলেন। পুত্র দীপঙ্কর নিহত জেনেও, সত্যকে অস্বীকার করে স্ত্রীকে বলতে থাকলেন, 'পাগলামি কর না সবু। দীপু নীরেনের কাছে আছে, তুমি ত জান। ওখান থেকে নীরেন ওকে দিল্লীতে ভর্তি করে দিতে চেষ্টা করছে। সব জেনেও পাগলামি কর কেন?' এদিকে তার কাছে বারংবার টেলিফোন আসে, ফোর সেভেন...নাইন? এটা তীর্থঙ্কর চাটার্জীর বাড়ি? উনি, না, রং নাম্বার বলে কেটে দেন। আসলে তিনি রিয়ালিটিকে অস্বীকার করতে চান: 'আমার মনে হয় বাড়িটা আমার নয়। কড়া নাড়লে কেউ দরজা খুলবে না—কেননা আমি রং অ্যাড্রেসে এসেছি। পথে ঘাটে চলতে চলতে আমার শুধু মনে হয় কলকাতা এখন কলকাতায় নেই। বাইরের বাড়ি-ঘরদোর গড়ের মাঠ মনুমেণ্ট সব অন্য একটা শহরকে ধরে দিয়ে কলকাতা উধাও হয়ে গেছে। মনে হয় ইটস এ রং সিটি। কোন প্রয়োজন নেই তবু এটা যে সেই কলকাতাই তা নিজেকে বিশ্বাস করবার জন্যে সেদিন ক্যাওড়াতলা গিয়েছিলাম। দেওয়ালের লেখাগুলো পড়েই বুঝতে পারলাম আমি ভুল জায়গায় এসেছি। মনের ডাক্তার মনোজের কাছে তার এ স্বীকারোক্তিতেই প্রকাশিত হয় এক রক্তাক্ত সময়ের শহুরে মধ্যবিত্ত মানস। এরা সে-সময়ে হয় এ-ঘটনাকে ভুলে থাকতে চেয়েছে, অথবা বাংলাদেশ-ভিয়েতনাম নিয়ে মিছিলে মেতেছে অথবা শহর থেকে পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছে।

কিন্তু ঘটনাবলী তখন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে পালিয়ে বাঁচা যায় না। তীর্থবাবুও 'জেগে জেগে কলকাতার পথ ঘুরলে একটাও বেরোবার পথ দেখতে পান না'। তাই তীর্থবাবুও ঘুমের মধ্যে জনার পেছন পেছন পালিয়ে যেতে চেয়েছেন।

এই মহান গল্পে মহাশ্বেতা এঁকেছেন সমকালীন শহরে মধ্যবিত্ত জীবনের এক নিখুঁত বাস্তব চিত্র, যা কেবলমাত্র সময়েরই দলিল নয়, শ্রেণী হিসেবে মধ্যবিত্তের অবস্থানগত চরিত্রেরও দিগ্‌দর্শন। বিষয়টি প্রেক্ষিত ও চরিত্র-বিন্যাসে অধিকতর বিস্তৃত হয়েছে মহাশ্বেতার 'হাজার চুরাশির মা' (৪৪) উপন্যাসে। সুজাতা চ্যাটার্জী নাম্নী ধনী পরিবারের এক পঞ্চাশোত্তীর্ণা মহিলা একদিন সংসারের প্রয়োজনে চাকরী নিয়েছিলেন। দুই পুত্র ও দুই কন্যার জননী সুজাতা কিন্তু সংসারের প্রয়োজন ফুরোবার পরও চাকরী করে চলেছিলেন। আর ইতিমধ্যেই স্বামীর সঙ্গে, মেরুদণ্ডহীন সন্তানদের সঙ্গে তার মানসিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। একমাত্র কনিষ্ঠ সন্তান ব্রতীই ছিল তার আশ্রয়, যে অন্তত তার বাবা (ব্রতীর ভাষায় 'বস') ও অন্যান্য ভাইবোনদের মত সংসারের ফিউডাল-কাঠামোকে আঁকড়ে ধরে থাকেনি। এই ব্রতীকে পেয়েই আবার মা হতে অস্বীকার করতে পেরেছিলেন সুজাতা। পেরেছিলেন চাকরী না ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিতে। এই ব্রতীই একদিন তাকে 'বাবা' প্রসঙ্গে বলেছিল, 'দিব্যনাথ চ্যাটার্জী একক ব্যক্তি হিসেবে আমার শত্রু নন।·· উনি যে সব বস্তু ও মূল্যে বিশ্বাস করেন। সেগুলোতে অন্য বহুজনও বিশ্বাস করে। এই মূল্যবোধ যারা লালন করছে, সেই শ্রেণীটাই আমার শত্রু। উনি সেই শ্রেণীরই একজন।' সুজাতা এ-কথার অর্থ অনুধাবন করতে পারেননি। কিন্তু 'সুজাতা বুঝতে পারছিলেন ব্রতী ওঁর অজানা হয়ে যাচ্ছে ক্রমে, অচেনা।' তখন সুজাতার মনে অবশ্যই দুঃখ হয়েছে, কিন্তু আশঙ্কা হয়নি। কারণ ব্রতীকে তিনি অন্যরকমভাবে মানুষ করেছেন। 'একা ব্রতীর জন্যে সুজাতা স্বামীকে শাশুড়িকে অমান্য করেছেন। অর্থহীন শাসন, আর স্বেচ্ছাচারী প্রশ্রয়, যা অন্য সন্তানেরা ভোগ করেছে, তা ব্রতীকে ভোগ করতে দেননি।' ব্রতীও তাই ঘৃণা করতে শিখেছিল তার বাবা-দাদা-বোনদের জীবনচর্যা ও সমাজকে। নিজের বাড়ির মধ্যেকার শ্রেণী-প্রতিনিধিদের চিনতে, ঘৃণা করতে শিখেই একদিন ব্রতী চিনতে পারে বৃহত্তর ভারতবর্ষের সেই শ্রেণীকে, যাদের শোষণ-শাসন আজও অব্যাহত। এর স্বাভাবিক পরিণতিতেই ব্রতী যুক্ত হয় সশস্ত্র রাজনৈতিক আন্দোলনে বিশ্বাসী নকশালবাদী রাজনীতির সঙ্গে। সুজাতা এ-সমস্ত জানলেন সেদিনই যেদিন

পুলিশের ফোন পেলেন 'হাজার চুরাশি' নং লাশ সনাক্ত করার জন্যে। বিব্রত দিব্যনাথরা তখন ঘটনার বিবরণ যাতে প্রকাশিত না হয় তার জন্যে ব্যস্ত।

'সেদিন ব্রতীর সঙ্গে সঙ্গে সুজাতার চেতনায় ব্রতীর বাবারও মৃত্যু ঘটে। ব্রতীর বাবার সেদিনের, সেই মুহূর্তের ব্যবহার সুজাতার চেতনায় উল্কাপাত ঘটায়। বিরাট বিস্ফোরণ। আদিম পৃথিবীতে যেমন ঘটেছিল কোটি কোটি বছর আগে। যেমন বিস্ফোরণে মহাদেশগুলো ছিটকে মাপের দুপাশে সরে গিয়েছিল। মাঝখানের দুস্তর ব্যবধান ঢেকে ফেলেছিল মহাসমুদ্র।' আর সুজাতা উপলব্ধি করেছিলেন, 'ব্রতী এই সমাজে, এই ব্যবস্থায় বিশ্বাস হারিয়েছিল। ব্রতীর মনে হয়েছিল যে পথ ধরে সমাজ ও রাষ্ট্র চলেছে, সে পথে মুক্তি আসবে না। অপরাধের মধ্যে ব্রতী শুধু স্লোগান লেখে নি, স্লোগানে বিশ্বাসও করেছিল।' পুলিশ যখন ব্রতীর ঘর তল্লাস করছিল, তখন সেসব স্লোগানের বয়ান ('কেননা জেলই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়!', 'বন্দুকের নল থেকেই···', 'এই দশক মুক্তির দশকে পরিণত হতে চলেছে।' 'ঘৃণা করুন! চিহ্নিত করুন! চূর্ণ করুন মধ্যপন্থীকে', ইত্যাদি) সুজাতা দেখেছেন। সুজাতার এই পরিবর্তিত চেতনা তাকে নিয়ে যায় ব্রতীর সহকর্মী নন্দিনীর কাছে, মৃত কমরেড সমুর মার কাছে। বারবার কথা বললেন এদের সঙ্গে। আর এভাবেই সুজাতার চেতনার যথার্থ উত্তরণ ঘটে, চিনতে পাবেন দেশের রাজনীতিক-সামাজিক প্রেক্ষাপটকে। বুঝলেন, 'ব্রতী তাঁকে তাঁর নিঃসঙ্গলোকের একাকীত্বে রেখে চলে যায়নি। তার মত আরো বহুজনের সঙ্গে তাঁকে এক করে, আত্মীয় পাতিয়ে দিয়ে গেছে। সম্পূর্ণ নতুন করে খুঁজে পেতে লাগলেন নিজের সন্তানকে : ব্রতী তাঁর রক্তের রক্ত, যাকে জন্ম দিতে গিয়ে তাঁর প্রাণ সংশয় হয়েছিল, যে তাঁর কাছে ক্রমশঃ অবোধ্য হয়ে গিয়েছিল, অচেনা, তার সঙ্গে সুজাতার যেন নতুন করে পরিচয় শুরু হয় সেই মুহূর্ত থেকে।' আর এই নতুন চেতনার উন্মেষ অনিবার্যভাবেই তাঁর চরিত্রে ঘটিয়ে দিল এক গুণগত পরিবর্তন। কার্যত এর ফলেই রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি ডি. সি ডি. ডি. সরোজ পালের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সুজাতার মনে পড়েছিল 'সরোজ পাল, তোমার ক্ষমা নেই'। 'সুজাতা তাকালেন। সরোজ পাল তাকাল। হাজার চুরাশির মা। ব্রতী চ্যাটার্জীর মা। এঁকে দেখতে হবে বলেই ও আসতে চায়নি।' ওর মনে হতে থাকে, ওর আশেপাশের মানুষগুলো, ধীমান অসিত-দিব্যনাথ-মিঃ কাপাডিয়া-তুলি-টোনি-বিশু মিত্র-মলি মিত্র-মিসেস কাপাডিয়া প্রমুখ যারা তুলির এনগেজমেন্ট পার্টিতে সমবেত হয়েছিল, তারা 'শবদেহ, শটিত শবদেহ সব।' আর 'এই শবদেহগুলো

অস্তিত্ব নিয়ে পৃথিবীর সব কবিতার সব চিত্রকল্প—লালগোলাপ—সবুজ ঘাস…নিয়ন আলো—মায়ের হাসি—শিশুর কান্না—সব চিরকাল, অনন্তকাল ভোগ করে যাবে বলেই কি ব্রতী মরেছিল? এইজন্যে? পৃথিবীটা এদের হাতে তুলে দেবে বলে? 'কখনো না।' নিতান্ত ব্যক্তিগত শোকের স্তর পেরিয়ে সুজাতা তখন রূপান্তরিত হয়েছেন হাজার চুরাশির মাতে। আর এজন্যেই 'সুজাতার দীর্ঘ, আর্ত, হৃৎপিণ্ডচেরা বিলাপ বিস্ফোরণের মত, প্রশ্নের মত, ফেটে পড়ল, ছড়িয়ে গেল কলকাতার প্রতি বাড়িতে—শহরের ভিতের নিচে ঢুকে গেল, আকাশপানে উঠে গেল। হাওয়ায় হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ল রাজ্যের কোণ থেকে কোণে, দিক থেকে দিকে, ইতিহাসের সাক্ষী যত স্তূপের অন্ধকার ঘরে ও থামে, ইতিহাস ছাড়িয়ে পুরাণের বিশ্বাসের ভিতে, সে কান্না শুনে বিস্মৃত অতীত, শতকালের অতীত, বর্তমান, আগামীকাল, সব যেন কেঁপে উঠল, টলে গেল। প্রত্যেকটা সুখী সুখী অস্তিত্বের সুখ ছিঁড়ে গেল। এ কান্নায় রক্তের গন্ধ, প্রতিবাদ, শোক।'

উপন্যাসটি প্রসঙ্গে এখানে পুলক চন্দের মন্তব্যের উদ্ধৃতি প্রাসঙ্গিক: 'অপরিসীম মমতার সঙ্গে সত্তরের বিদ্রোহের অভিঘাতকে ব্যাপক সামাজিক ক্ষেত্রে এবং গভীরতর চেতনার স্তরে উত্তীর্ণ করে দিতে সক্ষম হন মহাশ্বেতা দেবী।…(তিনি) কোন রৌদ্ররসময় বর্তমান কিংবা স্বপ্নময় ভবিষ্যৎকে যান্ত্রিকভাবে চিহ্নিত করেননি। রাজনৈতিক ঘটনাবলীর বর্ণনার ক্ষেত্রে, অগভীর হবার ঝুঁকি নিয়েও, নিজের অধিকার বা অভিজ্ঞতার সীমানা অতিক্রম করেননি। তিনি উচ্চবিত্ত শ্রেণীর এবং রাজনৈতিকভাবে নিতান্তই অসচেতন, এক মায়ের ক্রম আত্মোপলব্ধির ভিতর দিয়েই একটি বিভ্রান্ত সময়ের অর্থ, তার তাৎপর্যকে উন্মোচিত করতে চেয়েছেন পাঠকের সামনে।' (৪৫) সর্বোপরি এই হাজার চুরাশির মা তখন আর এক বিশেষ উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহিণী বা কেবলমাত্র ব্রতীর মা হিসেবে চিহ্নিত থাকেন না, অনায়াসে রূপান্তরিত হন এক প্রতীকী চরিত্রে, যারা পরিবার ও স্বসমাজের মধ্যে আর একাকিত্বে বন্দী থাকেন না, বহু পুত্রের আত্মদানে, আত্মোপলব্ধির সততায় ও আয়াসসাধ্য প্রয়াসে এসে মিলতে পারেন এক ব্যাপক ও দীর্ঘকালীন সংগ্রামী জনমানসের সঙ্গে যারা স্লোগান লিখলে বুলেট ছুটে আসে জেনেও স্লোগান লিখে চলে। আবশ্যিক বিবেচনায় দুটি উদাহরণ তুলে দিচ্ছি: (ক) বহরমপুর জেলে নিহত গোরা দাশগুপ্তের মা মহাশ্বেতা দেবীকে এক ব্যক্তিগত চিঠিতে লেখেন, 'একটা কথা, "চেয়ারম্যানের" একটা স্ফুলিঙ্গই দাবানলের সৃষ্টি করতে পারে, এটা আমার

গোরা খুবই বলত। তাই আজ আমি ওদের সুরে সুর মিলিয়ে তোমায় আশীর্বাদ করি, তোমার লেখা স্ফুলিঙ্গ থেকে দাবানলের মত জ্বলে উঠুক, দিকে দিকে ছড়িয়ে দিক মাস্টার সাব, গোরা-ব্রতীদের গান। অন্য এক শহীদের মা এক প্রকাশিত (৪৬) খোলা চিঠিতে লিখেছেন, 'আমাদের সন্তানদের যখন জল্লাদেরা খুন করছিল, আমরা মায়েরা তখন কি করতে পেরেছি? সমস্ত শিক্ষক-সমাজ, যারা এই সমস্ত তরুণ ও কিশোরদের সঙ্গে জীবিকার বন্ধনে বাঁধা, তারা কোন দায়িত্ব পালন করতে এগিয়ে এসেছিলেন? প্রশাসক শ্রেণী, যাদের বিদ্যায় বুদ্ধিতে সমাজের সেরা বলে মনে করা হয়, তাঁরা কতটুকু দায়িত্ব স্বীকার করেছেন? বুদ্ধিজীবীরা, শিল্পী ও সাহিত্যিকেরা কতটুকু ভাবনা চিন্তা এ-সম্বন্ধে করেছেন? আমাদের প্রত্যেকের হাতেই আজ রক্তের দাগ। সে দাগ আমরা ধুয়ে ফেলতে পারি কেবলমাত্র "সেই মুক্তি পাগল" সন্তানদের স্বপ্ন সফল করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে। যারা চলে গছে তারা আর ফিরবে না, কিন্তু এখনও যারা সাহসের সঙ্গে জঘন্য নির্যাতনের মুখোমুখি হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে তাদের আমরা এভাবে মরতে দেব না। আমাদের প্রত্যেক মায়ের মনে আজ এই কথা আগুন দিয়ে লেখা হচ্ছে। জেলের পাগলা ঘন্টি বাজিয়ে বাজিয়ে, লোহার গরাদের আড়ালে, প্রকাশ্য দিনের আলোয়, রাত্রির অন্ধকারে নরকের যে প্রেত-তাণ্ডব চালানো হয়েছে, তা আবার হবে যদি আমরা এখনও সতর্ক না হতে পারি।... সত্তরের দশক শেষ হয়ে আসছে। এটা মুক্তির দশক হবে এটাই ছিল ছেলেমেয়েদের পণ। সেই পণ রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের নিতে হবে।'

▮ তিন ▮

অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত লেখকেরা, যাঁরা নকশালবাদী আন্দোলনকে বিষয়বস্তু করে গল্প-উপন্যাস লিখেছেন, তাঁদের বহুবিচিত্র মানসিকতার ফসল নানাভাবে সমকালীন ক্লীব শহুরে মানসিকতাকে চিহ্নিত করার পক্ষে সহায়ক। এক্ষেত্রে লেখকদের মধ্যে যেমন আছে সচেতনভাবে নকশালবাদী রাজনীতিকে হেয় করার প্রয়াস, তেমনি আছে এক রক্ষণশীল বাঙালী সেন্টিমেন্টকে জাগিয়ে তুলে তাদের ঘৃণ্য অসামাজিক রক্তলোভী পিশাচ হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা। এঁদের লেখায় কোথাও মতাদর্শগত লড়াইয়ের চিহ্নমাত্র নেই, নেহাতই অজ্ঞতাপ্রসূত ব্যাখ্যান অথবা শহুরে মধ্যবিত্ত 'সুখী সুখী অস্তিত্ব'কে গেল গেল রব তুলে বিভ্রান্ত করা। এ-

সময়ের তথাকথিত বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের চরিত্র ও কর্মকাণ্ডের যথার্থ ইতিহাস তো মহাশ্বেতাই তুলে ধরেছেন তাঁর 'ঘরে ফেরা' উপন্যাসে।

এই বুদ্ধিজীবীদের ও লেখকদের একটি বৃহৎ অংশ যেহেতু ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির (সি. পি. আই) কাগজপত্রের নিয়মিত লেখক বা রাজনৈতিক মতাদর্শের অংশভাগ (কেউ কেউ পার্টি সদস্য ছিলেন বা আছেন), সেহেতু নকশালবাদীদের প্রাত কমিউনিস্ট পার্টির মনোভাব এখানে অবশ্য আলোচ্য। কমিউনিস্ট পার্টি যেমন একদিকে নকশালবাদীদের ভারতীয় পরিস্থিতির শ্রেণী-বিচারের বিরোধিতা করে, তেমন তাদের সশস্ত্র সংগ্রামের তত্ত্বকে স্বীকার করেনি। কিন্তু ক'লকাতায় নকশালবাদীদের সন্ত্রাস সৃষ্টির প্রয়াস বিষয়ে তারা নীরবই থেকে যায়। অন্তপক্ষে তারা কলকাতায় সন্ত্রাস সৃষ্টির জন্যে সি. পি. এম-কে দায়ী করতে থাকে। তারা বলে যে, সি. পি. এম-এর 'অ্যাডভেঞ্চারিজম' ও 'বাম সংকীর্ণতাবাদ'-ই নকশালবাদীদের জন্ম দিয়েছে। যদিও নকশালবাদী পত্র-পত্রিকাগুলিতে এস. এ. ডাঙ্গে, ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত প্রমুখ কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে প্রভূত সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে। এ-প্রসঙ্গে ও কমিউনিস্ট পার্টি নীরব থেকে যায়। আর এভাবে শহরে সন্ত্রাস সৃষ্টি করার জন্যে সি. পি. এম কেই দায়ী করে, কমিউনিস্ট পার্টি নকশালবাদীদের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে একটি ভাল সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করে চলে। আসলে তারা ভেবেছিলেন যে পশ্চিমবঙ্গে নকশাল-বাদীরাই হয়ে উঠবে এমন এক রাজনৈতিক সংগঠন, যারা সি. পি. এম-এর ক্রমবর্ধমান অগ্রগতিকে রোধ করতে পারবেন। (৪৭) ফলে তারা কখনও নকশালবাদীদের 'রাজনৈতিক হত্যা' বা 'ব্যক্তিগত সন্ত্রাস'কে নিন্দা করেনি। ১৯৭১ সালের নির্বাচনে তারা সি. পি. এম-কে হটাবার জন্যে যাদবপুর, বরানগর ও টালিগঞ্জে নকশালবাদীদের সাহায্য চেয়েছে। এতদ্‌সত্ত্বেও কোন কোন অঞ্চলে নকশালবাদী ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে সংঘর্ষ বেধেছে, যদিও কোথাও তা গুরুতর আকার ধারণ করেনি। আর এই সংঘর্ষ যে তথাকথিত কমিউনিস্ট লেখকদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি, এমন নয়। কিন্তু সর্বোপরি যে মানসিকতা কাজ করেছে, তা হোল লেখকদের শহুরে মধ্যবিত্ত অস্তিত্ব এবং ঔপনিবেশিক শিক্ষার প্রতিক্রিয়াশীল প্রভাব।

সমরেশ বসুর 'ওদের বলতে দাও' (৪৯) উপন্যাস শৌভিক নামক এক আধাবাউল, আধা রাবীন্দ্রিক চরিত্রের নিহত হবার যে কাহিনী গুরুত্ব পায়, তা বাঙালী শহুরে মধ্যবিত্ত মানসিকতাকে নকশালবাদীদের প্রতি বিরূপ করে তোলার পক্ষে খুবই উপযোগী। এই উপন্যাসে, বাঁশি, পুতুল, কৃষ্ণা, শ্রী, কেতকী এবং

রুবি, সারা সময় কেবল এর বাড়ি, তার বাড়ি ঘুরে বেড়ায়, প্রেম করে ইত্যাদি। এবং এই ঘুরে-বেড়ানো সূত্রে (অবশ্যই বোঝা যায় যে কারো কোন কাজকর্ম নেই, বেশির ভাগ মেয়ের বাপ-মাও কিছু বলে না) তারা সারা শহরে শুধু অসুস্থ লোক দেখে। এর মধ্যে বাঁশির মা নিজের বস ধ্রুপদ চক্রবর্তীর গাড়িতে অফিস যায়, তার সঙ্গে ডিনার খেয়ে রাতে বাড়ি ফেরে ; শ্রী-র বাবা-মা সর্বদাই ঝগড়া করেন, গোমেজের বউ সন্তান তাকে ছেড়ে গিয়ে একজন 'হ্যাণ্ডসাম' বড়লোককে বিয়ে করেছে, অলকা নামীয় জনৈকা অভিনেত্রী বেশ্যাবৃত্তি করে ; ডাঃ হিমানী চ্যাটার্জী স্বামীকে ছেড়ে এসেছেন, তার একজন বয়ফ্রেণ্ড সন্ধ্যেবেলায় আসে, মেয়েদের একজন লুকিয়ে তাদের কীর্তিকলাপ দেখেছে ; ইত্যাদি। এবং এদের একজনের কথা (শ্রীর বাবা) 'নকশাল করার থেকে প্রেম করা ভালো।' এভাবে সমরেশ পাঠকদের বুঝিয়ে দেন যে সারা শহরে কোন সুস্থ লোক থাকে না। এর মাঝখানে একমাত্র ব্যতিক্রম শৌভিক। তার শহরে একটি বড় বাড়ি আছে, কিন্তু ভাড়াটেরা তাকে ভাড়া দেয় না। অবশ্য এটা নিয়ে সে মাথাও ঘামায় না। সে সারাদিন ছবি আঁকে, গান করে, পড়ে, এস্রাজ, প্রেমজুরি, গোপীযন্ত্র, খঞ্জনি ইত্যাদি বাজায় আর মাঝে মাঝে বাণী দেয়, 'ওরা বলে। / ওরা কী বলে? / ওদের বলতে দাও।' আশ্চর্য! ওরা কারা? ওরা কি বলতে চায় সে-সম্পর্কে সমরেশ কিছুমাত্র আলোকপাত করেন না। আর কেন মেয়েরা ওর সঙ্গে দোহার টেনে বলে 'ওদের বলতে দাও' তারও কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। অথচ এই শৌভিক নামীয় লোকটি এমন আধাবাউল, আধা রাবীন্দ্রিক ঢঙে কথা বলে, যেন মনে হয় তার জ্ঞানের যেন আর সীমা পরিসীমা নেই। আর এ-হেন আধপাগলাকে দেখে একটা মেয়ে (বাঁশি) তো প্রায় দিগম্বরী হয়ে তাকে দেহদানই করতে যায়। তখনি অবশ্য শৌভিক সিংহপুরুষ হয়ে যায় এবং রাবীন্দ্রিক ভাষায় বলে, 'আমার মন বলছে, তুমি যা বলেছিলে, তা সবই একটা কবির সৃষ্টি। কল্পনা হতে পারে, মিথ্যা না। কিন্তু তার পরেও কবিতা আছে। সে কথাটা মনে রাখতে হয়, কারণ সংসারটা যে চলছে, তার নানান দোলার মাঝখানেও স্থির হয়ে থাকতে না পারলে, গোটা সৃষ্টিটাই ভেঙে যেতে পারে। বাঁশি, তোমাকে যে অনেক সুরে বাজতে হবে।' অতএব স্বাভাবিক-কারণেই এই বাঁশি বা বাঁশিদের 'দেওয়ালগুলোর দিকে তাকাতে ঘেন্না করে।' কারণটা না বললেও বোঝা যায় যে দেওয়ালগুলোতে নকশালবাদীদের স্লোগান লেখা থাকে। আর স্লোগানগুলোও তার আজকাল 'অশ্লীল' বলে মনে হয়। উক্ত শৌভিকের কাছে একদিন অনীল আর গোরা গিয়েছিল। মেয়েরা ওকে জিজ্ঞেস

করে ওরা কি বললো। উত্তরে শৌভিক, 'সে যে অনেক, অনেক, অনেক কথা।' কীর্তনের চঙে সুর করে গাইলো। তারপর বললো, 'ওরা আমাকে রাজনীতির কথা বললো, মার্ক্স লেনিন মাওয়ের কথা বললো। তারপর জিজ্ঞেস করলো, আমি কী তাই করতে চাই। বললাম, যা করছি তাই। ওরা বললো, কিন্তু এতো কোনো কাজ না, অকাজ। আমি বললাম, পৃথিবীতে কিছু অকাজের লোকের দরকার আছে। ওরা হাসলো। আমি বললাম, তোমরা যে সাহেবদের নাম করলে, তাদেরই জিজ্ঞেস করে এসো। মিথ্যে বলছি কী না। ওরা আবার হাসলো। আমি বললাম, 'জানি তোমরা বিশ্বাস করবে না। ওরা বললো: তুমিও করো না। বললাম, আমার জীবনটাই তার প্রমাণ। ওরা বললো, কিন্তু এটা একেবারে অবাস্তব। আমি বললাম সংসারের সবটাই বাস্তব, অবাস্তব বলে কিছু নেই, তবে মুশকিল হল বাস্তবের কোন ছক নেই, বলতে পারো, একটা ছন্দ আছে, কিন্তু মিল নেই। ওরা আবার হাসলো, শৌভিকদা তোমাকে হিংসা হয়, তোমার মতো বিশ্বাসটা আমাদের নেই, তোমার মতো চলতে পারি না কিছুতেই, যখন একলা একলা ভাবি, তখন মনে হয়, তোমার কথা সব সত্যি, তুমি আমাদের গুরু।' এ হেন শৌভিক, (পরোপকার ছাড়া যার কাজ নেই, যে সর্বদাই ভাবে বিভোর একদিন খুন হয়ে গেল। আর খুন যখন হোল, তখন অবশ্যই নকশালবাদীরা করেছে, এ ইঙ্গিত দিতে সমরেশের কিছুমাত্র ভুল হয়নি। তারপর তার মৃতদেহ মর্গ থেকে পেলে মেয়েরা, তাদের বাবারা এবং নকশালবাদীরা (?) শবের পেছনে হাতধরাধরি করে মিছিলে চললো। আহা! প্রেমের নদীয়ায় হালখাতা!

অতঃপর উপন্যাসটির ঘটনা বিন্যাস ও লেখকের বক্তব্যের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। প্রথমত উপন্যাসের পটভূমিকায় আছে অনেকগুলি অসুস্থ, আত্মসর্বস্ব মানুষ। এই প্রেক্ষিতে একজন মাত্র মানুষ, শৌভিক, আত্মত্যাগে ও সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে থেকে, ওদের বলার গণতান্ত্রিক অধিকার স্বীকার করে নিয়ে নিজের গুরুত্বকে বাড়িয়েছে। তদুপরি বাউলতত্ত্ব আর রবীন্দ্রনাথ মিলিয়ে সে এমন একটি বক্তব্য খাড়া করে, যার সঠিক কোন অর্থ না থাকলেও একশ্রেণীর ভাববাদী চেতনাকে প্রভাবিত করে। সুতরাং এমন একজন লোক নিহত হলে পাঠকেরা স্বভাবতই নকশাল বন্দীদের নরকের কীট ভাবতে শুরু করবেন, তাতে আর আশ্চর্য কি! ঘটনাসংস্থাপনার কৌশলটা এক্ষেত্রে খুবই কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছে। চারিদিকের অসুস্থ-সংকীর্ণমনা মানুষের মেলা না বসালে শৌভিককে অত স্পষ্ট করে চেনানো যায় না, অতএব মেয়েরা শহরে কেবল ঐ রকম জীবনই দেখল। তদুপরি গোরা

নামক এক নকশালপন্থী (?) যুবকের এমন একটি চিত্র সমরেশ এঁকেছেন, যার একমাত্র বাসনা বাশি 'মেণ্ডাক্স ট্যাবলেট খেয়ে' যাবে এবং অবশেষে যে তার সঙ্গে বিবাহপূর্বেই যৌনসঙ্গম করে। অতএব সমরেশ বসুর বাঙালী মধ্যবিত্ত পাঠক জেনে গেল নকশালবাদীরা সাধুসন্ত লোকদের খুন করেছিল এবং কুমারী মেয়েদের সঙ্গে যৌনসঙ্গমে তারা ছিল অভ্যস্ত। আশ্চর্য এক বৈষ্ণবী চক্ষে গল্প খাড়া করে সমরেশ তাঁর উদ্দেশ্যটি চরিতার্থ করলেন!

সমরেশ বসুর পরবর্তী উপন্যাস 'মানুষ শক্তির উৎস' (৪৯) নকশালবাদীদের অন্তর্দ্বন্দ্ব, পারস্পরিক হত্যা ইত্যাদির কাহিনী। যমুনা ওরফে বিন্দুর আত্মকথনের মধ্যে দিয়েই সম্পূর্ণ কাহিনীটিকে ব্যক্ত করা হয়েছে। যমুনা গ্রামের মেয়ে। তার মামা-মামীর কোন কন্যা সন্তান না থাকায় তারা তাকে কলকাতায় নিয়ে আসেন। এর পর থেকে সে ক্রমশ উচ্চমধ্যবিত্ত জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে যায়। অবশ্য ততদিনে ওর নিম্নমধ্যবিত্ত বাবা কোন অসৎ উপায়ে নিজের ভাগ্য ফিরিয়ে ফেলেছেন। কলেজে পড়ার সময় মামাতো দাদা রামুর বন্ধু সজলের সঙ্গে ওর আলাপ হয়। সে আলাপ থেকে ক্রমশ প্রেম। ইতিমধ্যেই অবশ্য কলেজের ফাংসন উপলক্ষে কবি অংশুমালী গুপ্তর সঙ্গে যমুনা মিত্রের আলাপ-প্রেম-দেহদান পর্ব সমাপ্ত হয়েছে। এরপর সজল 'এঞ্জিনিয়ারিং' পাস করেছে। এবার ওর চাকরির দরকার ভীষণভাবে। যমুনার মামা তার কারখানায় সজলকে একটা চাকরি দেবেন ভেবেছিলেন; কিন্তু তখনি তার কারখানায় ধর্মঘট-লকআউট হোল। যমুনার মামাতো ছোট ভাই রাজনীতি করছে। সে বলে, নতুন সরকারকে (পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার) বেকায়দায় ফেলবার জন্যই, কারখানার মালিকেরা চক্রান্ত করে এসব করছে। সজলেরও তাই বিশ্বাস। মামাও তাঁর কারখানায় লক আউট ঘোষণা করেছেন। দীপু বলে, বাঁ...ক আলাদা করে দেখবার কিছু নেই। এঁরাও সঙ্ঘবদ্ধ, শ্রমিকরাও সঙ্ঘবদ্ধ।' এ-সময়ে সজলই একদিন যমুনাকে কলেজ স্ট্রীটে নিয়ে গিয়ে প্রৌঢ় বামপন্থী নেতা হরিশদার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। হরিশদা বললেন, 'এ সরকার কখনো টিকতে পারে না, ভাঙলো বলে। সর্ষের মধ্যেই ভূতগুলো সব বসে। তিনি এমন কোনো কোনো নেতার নাম করে সমালোচনা করলেন, হরিশদা নিজেই যাঁদের দলের লোক। আরো বললেন, একে শ্রেণীসংগ্রাম বলে না, বিপ্লবের পথ-ও বলে না। এসব হচ্ছে মন্ত্রিত্বের পার্টি পলেটিকস্, একটি পাক্কা সুবিধাবাদী রাস্তা। "শুয়োরের খোঁয়াড়ে" বসে বিপ্লব করা যায় না। তাই এখন দেখছি, আমরাই সেই সব কৃষকদের আর নেতাদের দমন করতে শুরু করেছি, যারা সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী।'

নীরেন ওকে জিজ্ঞেস করে, 'কিন্তু সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সময় এসেছে বলে আপনি মনে করেন ?' উত্তরে হরিশদা জোর দিয়ে বলেছিলেন, 'সময় আসে না নীরেন, সময়কে তৈরি করে নিতে হয়।' যমুনা অবশ্য এসব কথার অর্থ তখনো বোঝে না। ওখানেই সে শুনলো, 'সুবীর এ-পার্টির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছেদ করেছে। ওকে ইতিমধ্যেই একস্ট্রিমিস্ট বলা হয়েছে।' এরপর প্রথম যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙে গিয়েছিল, দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাও। হরিশদা, সুবীর সকলেই আণ্ডারগ্রাউণ্ডে। যমুনা এম. এ. পাশ করে বসে আছে। সজল তখনো চাকরি পায়নি। এবং তখনও আণ্ডারগ্রাউণ্ডে যায়নি। ওকে বাইরে থেকে কাজ করতে বলা হয়েছে। 'কিন্তু ওর সঙ্গে যোগাযোগ আছে। ওকে অবশ্যি খুব সাবধানে থাকতে হয়। যে কোন মুহূর্তেই অ্যারেস্ট হতে পারে। জানাজানি হলে, খুনও হতে পারে। খুন এখন রাজনীতির এক মুখ্য অঙ্গ। বহু ছেলে জেলে পচছে। নিজেদের মধ্যে খুনোখুনি, তার সঙ্গে পুলিশের খুন করা, এবং পুলিশও খুন হচ্ছে।' এর একবছর আগে সজল একদিন যমুনাকে গোপন শেলটারে নিয়ে গিয়ে সুবীরের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। এখানেই 'পদ্ধতিটা ঠিক কিনা' এ নিয়ে সুবীর সজলের মধ্যে প্রথম বিতর্কের সূত্রপাত হতে দেখেছিল যমুনা। এরপর অনেকবার যমুনা একাই গেছে সুবীরের ওখানে। ওর 'সুবীরকে যেন ক্রমেই খাঁচায় বন্দী বাঘের মত অস্থির মনে হচ্ছিল।' কিন্তু সজলের সঙ্গে ওদের পদ্ধতি নিয়ে বিরোধটা ক্রমেই বাড়লো। একদিন হরিশঙ্করদার ছেলে হিরণ, যার হাতে সর্বদাই কোন-না-কোন অস্ত্র থাকে, বলেছিল, 'সজলদা আমাদের সাধারণ খুনীর মতো মনে করেন।' সজল বলেছিল, 'কথা তৈরি করো না হিরণ। কিন্তু অনেক অশুভ হাতের সঙ্গে কি আমাদের হাত মিলিয়ে খেলো করা হচ্ছে না ?' এরপরই 'লুম্পেন প্রলেটারিয়েট'-দের ভূমিকা সম্পর্কে সুবীর-সজলে বিতর্ক শুরু হয়। এই বিতর্কের সময়ে সুবীর উত্তেজিত হলেও, সজল কিন্তু বিষণ্ণ গাম্ভীর্যের মধ্যে শান্তভাবে কথা বলে যাচ্ছিল। অবশেষে সুবীর বলে, 'মতভেদ থাকলে তোমাকে পার্টি ছাড়তে হবে।' হিরণ বলে উঠেছিল, 'পার্টি থেকে বের করে দেবার কোনো নিয়ম আমাদের নেই।' তখন যমুনা ভাবে: 'হিরণের চোখে আমি হিংস্রতা দেখেছিলাম। আমি জানতাম, পার্টি থেকে বের করে দেবার কোনো নিয়ম নেই, শ্রেণীশত্রুরূপে তার অস্তিত্বকে বিলোপ করাই পার্টির নীতি।' এর পরদিন যমুনা পেল সজলের শেষ চিঠি, এম. এন. রায়-মার্কা মানবতাবাদ (লেনিনের ভাষায় বলা চলে, 'ভাববাদের চোরাকারবার'): 'মানুষই সব কিছুর স্রষ্টা, সব কিছুর থেকে মানুষই বড়। ইতিহাসের বহু তত্ত্বের সিংহাসন সে ভেঙেছে,

আরো অনেক গড়বে এবং ভাঙবে। কিন্তু তথাপি, তার সেই স্বর্গলাভ কখনো হবে না, যে-স্বর্গের লোভ তাকে দেখানো হয়। সেই হিসাবে, মানুষ চিরকাল বড় অসহায়। মানুষ যে সব থেকে বড় শক্তির উৎস, তার প্রমাণ, সে যুগে যুগেই তার অসহায়তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, করবে।' এরপরই সজল নিহত হোল। হিরণ সজলকে মেরেছিল, তাই ওরা সিদ্ধান্ত নিয়ে হিরণকে মারলো। হিরণের মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন পিতা হরিশদা। তিনি নিচু গম্ভীর পরিষ্কার স্বরে বললেন, 'আমি এ হত্যার অংশীদার। কিন্তু যমুনা, এ হত্যার দায় নিতে বড় ভার লাগছে। কারণ এ হত্যা, একটা উপলব্ধি এনে দিয়েছে, যা কঠিন অথচ অনেক হত্যাই সামনের পথ খুলে দেয়নি, পথ রুদ্ধ করেছে।' তখন অবশ্য আর যমুনার হিরণকে হত্যাকারী বলে মনে হয় না, 'ওকে আমি ঘৃণা করতে পারছি না, ওর প্রতি আমার রাগ হচ্ছে না, আমি ওর ভিতরের আন্তরিক আর আগুন-ভরা প্রেরণার কথা ভাবছি।'

উক্ত কাহিনীর ভিত্তিতে এবার সমরেশ বসুর বক্তব্যের অনুধাবন করা যাক। তিনি প্রথমেই আমদানি করেন সজল নামীয় এমন একটি ছেলেকে, যে সর্বাংশে মধ্যবিত্ত ঘরের তথাকথিত প্রাণচঞ্চল ভালো ছেলে। সে আরো দশটা মধ্যবিত্ত এসকেপিস্ট মধ্যবিত্ত ছেলের মত তত্ত্বসর্বস্বতা নিয়ে লড়াইয়ের ক্ষেত্র থেকে সরে থেকে পদ্ধতি বা কৌশলগত নীতির সমালোচনা করে, ভাবে 'যা সমাজের পক্ষে, প্রতিটি ব্যক্তির ক্ষেত্রে অশুভ', তাই অশুভ এবং সর্বোপরি চাকরি করে বিন্দুর মতো কোন মেয়েকে প্রতিমা বানিয়ে দিব্যি সুখে ঘরকন্না চালিয়ে যেতে চায় ('বিন্দু, দেখ, আমি খুব আবেগের সঙ্গেই বলছি, তুমি আমার প্রতিমা, নারীর সেই চিরন্তন প্রতিমা, সাধারণ পুরুষ যার সঙ্গে সুখে দুঃখে ঘরকন্না করে, সন্তান উৎপাদন করে, লালন পালন করে, সেইরকম প্রতিমা'). স্বভাবতই এরকম ছেলের প্রতি সাধারণ মধ্যবিত্ত পাঠকের (এবং অনস্বীকার্য এখনো বাংলা উপন্যাসের পাঠক বললে এদেরই বোঝায়) সহানুভূতি বা ভালবাসা আকর্ষিত হবে, এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। অন্যদিকে সুবীর অ্যাকশনের ছেলে। রাজনৈতিক আদর্শে গভীরভাবে আস্থাবান, সংশয়হীন এবং স্বভাবতই মতামত প্রকাশে সোচ্চার, তত্ত্বের সঙ্গে কাজকে মেলানোতেই যার আগ্রহ। কিন্তু তার রাজনৈতিক চরিত্র আঁকার ব্যাপারে সমরেশ অত্যন্ত একপেশেভাবে অসহিষ্ণু চরিত্রই বড়ো করে দেখান। এমনকি হিরণ যখন পরোক্ষে সজলকে হত্যা করার কথা বলে, তখন সে সেদিন থেকে তাকে সম্মতি জানায়। অর্থাৎ শেষপর্যন্ত সুবীরের মত অ্যাকশনের ছেলেরা, লেখকের বক্তব্যে, রক্তলোলুপ হত্যাকারী ছাড়া আর কিছু

নয়। এমতাবস্থায় সজল নিহত হলে, পাঠকের মন স্বাভাবিকভাবেই বিরূপ হয়ে পড়বে নকশালবাদীদের ওপর। কারণ কমিউনিস্ট পার্টি তো এদেশে এমন মানসিকতা তৈরি করেই দিয়েছে যে আসলে বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনও গলায় গাঁদা ফুলের মালা পরে মিছিল করে গ্রেপ্তার বরণ করা ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং রক্ত—হত্যা শুনলেই, মহাশ্বেতা দেবীর ভাষায়, মধ্যবিত্তের 'সুখী সুখী অস্তিত্ব' বিপন্ন হয়। তদুপরি সজলের নিহত হওয়ায় তাদের সমস্ত সহানুভূতি তার প্রতি যেভাবে কেন্দ্রীভূত হয়, যার সঙ্গে সাম্প্রতিককালের কারাগৃহে বন্দী মানুষদের ছবিওয়ালা নির্বাচনী পোস্টারই তুলনীয়। কেবলমাত্র এভাবেই সমরেশ এখানে নকশালবাদীদের হেয় করেন না। হিরণকে মৃত দেখে যমুনার ভালবাসা উথলে পড়ে আর সেখানেই সে সুবীরের পরাজয় দেখে। তার রঙ লাগানো মাটি সব যমুনার চোখে সজলের রক্তে ধুয়ে যায় এবং ভেতরের কাঠখড় সব বেরিয়ে পড়ে। আর তারপরই নিরস্ত্র যমুনা বেরিয়ে পড়ে, 'অস্ত্রে আমার দরকার নেই। নিরস্ত্র অবস্থাতেই আমি ওর কাঠামো টুকরো টুকরো করবো।' আশ্চর্য! এতসব 'গলায় মালা পরা' রাজনীতি আউড়েও যমুনাকে দিয়ে সুবীরকে 'টুকরো টুকরো' করার কথা বলতে হয়? অবশ্য এতে শঙ্কিত হবার কিছু নেই, সবই তো অহিংস গান্ধীবাদী পথে!

এভাবে নকশালবাদীদের চরিত্রহননের অন্য উল্লেখযোগ্য প্রয়াস সমরেশ বসুর গল্প 'সিদ্ধান্ত'।(৫০) এই গল্পের নায়ক কুনালের বাবা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন করতেন, এখন পার্টির স্থানীয় নেতা; মাও সক্রিয়ভাবে একই রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত, লোকাল কমিটির সদস্যা এবং শিক্ষিকা। কুনাল বাবা-মায়ের আদর্শ অনুসরণ করে ছাত্রকাল থেকেই রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয় এবং পার্টির সদস্যপদ পায়। ভাল বক্তা হিসেবে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে সারা জেলায়। তাকে পাঠানো হয় ভিন্ন প্রদেশের এক শহরে 'কারখানার আন্দোলনের জন্যে'। ফিরে এসে সে দেখে পার্টির মধ্যে অন্তঃকলহ শুরু হয়ে গেছে। ওর গুরুতুল্য অধ্যাপকের পরামর্শে কুনাল কিছুদিন নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় এবং স্থানীয় ল্যাণ্ডরেভেনিউ বিভাগের সাবরেজিস্ট্রারের মেয়ে কস্তুরীর সঙ্গে প্রেম করতে থাকে। এরপরই তার রাজনীতির পথ যায় বদলে। সেই অধ্যাপকই ওকে নতুন পথের দীক্ষা দেন এবং জানান যে কুনালের বাবা ও তাদের পার্টি জনগণের শত্রু। আর তার বাবার পার্টির প্রতি কস্তুরীর বাবার 'সামান্য সমর্থন' ছিল বলে কুনালরা তাকে একদিন হত্যা করে। কুনালের বাবা এই হত্যার বিরুদ্ধে শহরের সর্বত্র ঘুরে ঘুরে কুনালদের ধিক্কার দিয়ে সমালোচনা করেন। ফলে স্থানীয়ভাবে কুনালদের এক

গোপন সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে তার বাবাকে হত্যা করা হবে এবং তার মা যদি তার স্বামী হত্যায় বাধা দেন তাহলে তাঁকেও আঘাত করা হবে। 'সে আঘাতে মৃত্যু ঘটলেও বলার কিছু নেই।' কুনাল সে সভায় উপস্থিত থেকেও প্রতিবাদ করেনি। 'দলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে, ব্যক্তির মতভেদের কোন মূল্যই নেই, সেই অধিকারও তার নেই। আর তা থাকলে, পরিণতি কী, তা আমি জানি। মৃত্যু। হত্যা।' তারপরই কুনালকে বাড়িতে পাঠানো হয়, তখন তার পেছনে পুলিশ গ্রেপ্তারী পরোয়ানা নিয়ে ঘুরছে। এবং স্থির হয় ওরা এসে কুনালের ঘরের বাইরের জানলায় দুবার টোকা মারবে। কুনাল তখন ওর বাবার দরজায় গিয়ে টোকা দেবে এবং বাবা দরজা খুললেই ওরা বাবার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। শব্দ করার মতো কোন অস্ত্র ব্যবহার করা হবে না। কুনাল যথারীতি দিন তিনেক আগে বাড়ি আসে এবং হত্যার দিন যত এগিয়ে আসতে থাকে, ততই ওর মনের দ্বন্দ্ব প্রবলতর হতে থাকে। অবশেষে হত্যার সময়ের কয়েক-মুহূর্ত আগেও উপলব্ধি করে, 'আদর্শের থেকেও, বাবাকে আমি ভালবাসি বেশি।' এবং আত্মহত্যা করে। সেই মুহূর্তেই দরজায় প্রচণ্ড আঘাতের শব্দ শোনা যায়।

এ-গল্পে সমরেশ পাঠকদের স্পষ্টত বোঝালেন, খাঁটি নকশালবাদীরা কী পরিমাণ খুনে বজ্জাত যে ছেলেকে দিয়ে বাবাকে হত্যা করায়! কিন্তু হাজার হলেও ছেলে তো, সে কি বাবাকে হত্যা করতে পারে? তাই নিজেই আত্মহত্যা করে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে। নিখুঁতভাবে গল্পটি সাজানো। প্রথমে প্রেমিকার বাবাকে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে বাধ্য হওয়া,—পাঠকদের আর কিছুই অবিদিত রইল না!

সমরেশ বসুর পরবর্তী উপন্যাস 'গন্তব্য' (৫১) এমন এক সময়ের কাহিনী যখন শহরাঞ্চলে নকশালবাদী আন্দোলন বহু সংঘাতে দীর্ণ এবং তার ওপর পুলিশী ও অন্য রাজনৈতিক দলের যুগপৎ নৃশংস আক্রমণ শুরু হয়েছে। কাহিনীটি এই প্রকার: ফুল্লরা, তার দিদি অঙ্গু, জামাইবাবু কুমার এবং তাদের পাঁচ বছরের বুবাইকে নিয়ে চলেছে দীঘা, কলকাতা থেকে সকাল সাতটায় ছাড়া সরকারী পরিবহণের বাসে। জানলার ধারের তের নম্বর সিটের যাত্রী তখনো পৌঁছয়নি। বাস স্টার্ট করে ছাড়ার পরেই একটা ট্যাক্সি বাসের সামনে এসে ব্রেক করল। তা থেকে টিকিট হাতে বেরিয়ে এল তের নম্বর যাত্রী। তারপর এক সিটে ফুল্লরা আর তের নম্বর যাত্রী, ফুল্লরার একদা প্রেমিক বর্তমানে নকশালবাদী কমল। এই কমল-দা ফুল্লরার কাছ থেকে সরে গিয়েছিল। কারণ তখন 'জীবনকে দেখার চোখ ওর বদলিয়ে গিয়েছে। নিজের জীবনযাপন

ওর কাছে অর্থহীন বলে মনে হয়েছিল, স্ব-বিরোধিতায় ভুগছিল, যার থেকে একমাত্র মুক্তির পথ ছিল, সশস্ত্র আন্দোলন সংগঠন করা।' আর তা করতেই সে গ্রামে চলে গিয়েছিল। সেদিনের কমরেডদের প্রসঙ্গে কমল ফুল্লরাকে বলে, 'শিবতোষদা এখন জেলে। শ্যামল কলকাতায় আছে, আমার সঙ্গে ওর সম্পর্কে ফাটল ধরেছে। অবশ্যি আমাদের মত আর পথ নিয়েই।' তার এই মত ও পথ এখন কেবলমাত্র সশস্ত্র বিপ্লবের বিরোধী, তাই নয়, মার্কসবাদ বিরোধীও। তার প্রিয় লেখক এখন কাফ্‌কা। আর এইসব কারণে শ্যামলদের সঙ্গে তার বিরোধ। কমল তার বর্তমান চিন্তা প্রসঙ্গে বলেছে, 'বিপ্লবী সরকারে আমার বিশ্বাস নেই, তারা কোনো লোকায়ত্ত রাষ্ট্রও গঠন করতে পারবে না। সেই জন্যেই মার্কসবাদকে আমি আর ঠিক আগের চোখে দেখছি না। মনে হচ্ছে, যথার্থ না জেনেই, আমি একজন রাইফেলধারী হয়ে গেছি। মার্কসবাদের সঙ্গে আমাদের মূলতঃ কোথায় বিচ্ছেদ ঘটছে, সেটা খুঁজে বের করা দরকার। এই কথাটা বলেই আমি দলের একটা অংশের শত্রু হয়ে গেছি। ফলে দলের আর পুলিশের বন্দুক, দুই-ই আমার পেছনে ঘুরছে।' এর পরেই সে গ্রামে নকশালবাদী আন্দোলন ব্যর্থ হবার কারণ প্রসঙ্গে একটা বাজারচালু ব্যাখ্যা দিয়েছে: 'আমাদের কোন প্রস্তুতিই ছিল না, অর্থচ তার জন্যে আমরা অপেক্ষা করতেও রাজী ছিলাম না। আমাদের সেই ধৈর্য কোথায় ছিল? আমরা কেবল ঝাঁপিয়ে পড়তেই চেয়েছিলাম। বুঝতে পারিনি, সেই থেকেই মূল তত্ত্ব থেকে আমাদের বিচ্ছেদ শুরু হয়েছিল। কৃষকদের যৌথ চেতনাকে আমরা জাগাতে পারিনি, আর এটাও বুঝতে পারিনি, দল বিপ্লব করে না, বিপ্লব ঘটায় জনতা। ফলে অতিবিপ্লববাদের কল্পনাবিলাস আমাদের পেয়ে বসলো, আমরা রোমান্টিকতার নামে হয়ে উঠলাম হৃদয়হীন। পুলিশের কাছে না, নিজেদের বন্ধুশ্রেণীর প্রতিই আমরা এমন নিষ্ঠুর হয়ে উঠলাম, আমাদের ডগমা এত বড় হয়ে উঠলো, আমরা জোর করে সশস্ত্র বিপ্লব ঘটাতে চাইলাম। তার ফলেই আমাদের গ্রাম ছাড়তে হয়েছে। আসলে গ্রাম আমাদের ছাড়ানো হয়েছে। অথচ শহরে এসে আমরা একটা মন্ত্রীকে মারতে পারিনি, পুলিশের আই. জি বা কোনো কমিশনারকেও না। এমন কি কোনো ছদ্মবেশী নিখুঁত শত্রু শয়তানকেও না। মাঝখান থেকে শাসক দলের কতগুলো গুণ্ডা মস্তান এখন আমাদেরই দল ভাঙিয়ে খাচ্ছে, আমাদেরই মারছে, পুলিশের অনুচর ছাড়া তারা কিছুই নয়।' এবং এই পলাতক কমল 'কলকাতায় দুমাস পড়াশুনা' করেই সারসত্য বুঝে ফেলে যে আসলে প্রয়োজন হোল লোকায়ত্ত রাষ্ট্র, যার রূপরেখা ঠিক করে দিয়ে

গেছেন নিরাজসমাজবাদীরা। এবং প্রকৃতিবাদী লাওৎসের মতবাদই হলো, তার বিবেচনায়, শেষ লক্ষ্য। এ হেন কমলকে কেন পুলিশ ভুবনেশ্বরে বাস থামলে নামিয়ে নেয় এবং সে পালাতে গেলে গুলি করে মারে, বোঝা শক্ত। অবশ্য একমাত্র ফুল্লরাই স্বপ্নের চোখে দেখল যে, 'সমুদ্রের ধার দিয়ে কমল হেঁটে চলেছে, উজ্জ্বল চোখে হা... হাজার হাজার বছর আগে নিরাজবাদী সমাজের কবিতা বলছে ...'

এই দুর্বল, অসংলগ্ন উপন্যাসটি সম্পর্কে আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। একজন নকশালবাদীর সঙ্গে দলের মতপার্থক্যের অর্থ বোধহয় মূল মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও মাও-সে-তুঙের চিন্তাধারাকে অস্বীকার নয়। এ-তাবৎ নকশালবাদীদের মধ্যে মতপার্থক্য বিষয়ক বহু পুস্তিকা, বক্তব্য এবং বিতর্ক প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু এ রকম তাজ্জব বক্তব্য কোথাও চোখে পড়েনি। বোধহয় সম্ভবপর নয় বলেই। এটি কি লেখকের নিজের বক্তব্য? তদুপরি কমলের কোন বক্তব্যে এমন কোন কথা নেই, যাতে বোঝা যায় যে লোকটির মার্কসবাদ থেকে মাওবাদ পর্যন্ত, কোন বিষয়ে কোন কাণ্ডজ্ঞান আছে। সে বাজার চলতি কথা বলেছে, 'বিপ্লব ঘটায় জনতা'। কিন্তু এ-বিপ্লবে সব দেশেই কমিউনিস্ট পার্টির একটা বড়ো ভূমিকা আছে এবং থাকবে। লেনিনবাদ না পড়েও ইতিহাসের দিকে তাকালেই এটা জানা যায়। কমলের সে কাণ্ডজ্ঞান-টুকুও নেই। এ-হেন কমল যখন 'দু-মাস' পড়েই মার্কসবাদকে চ্যালেঞ্জ করে, তখন ব্যাপারটার আর কিছুই গুরুত্ব থাকে না, হাসির খোরাক হয়ে দাঁড়ায়। এতদসত্ত্বেও গ্রন্থের দুটি উল্লেখযোগ্য দিক আছে। প্রথমত কয়েকটা অসামাজিক ছেলেকে দিয়ে বাসের মধ্যে 'আদরিব' ভালগার গান গাওয়ানোর মধ্যে লেখকের ভালগার মানসিকতার প্রকাশ এবং দ্বিতীয়ত পুলিশ যখন কমলকে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেয় একমাত্র বাস কণ্ডাক্টর খুব উদাসীনভাবে ঘটনার উল্লেখ ছাড়া সমস্ত বাসে কোন ধিক্কারবাক্য উচ্চারিত হয় না, এমন কি ফুল্লরাও তখন পুলিশের গুলি করে মারাতে প্রতিবাদমুখর না হয়ে স্বপ্ন দেখতে থাকে। পূর্বোক্ত উপন্যাসগুলি ও গল্পের প্রেক্ষিতে এটিই বোধহয় সমরেশ বসুর শেষ সিদ্ধান্ত যে পুলিশ ওদের নির্বিচারে হত্যা করে ঠিক কাজই করেছিল।

সমরেশ বসুর সঙ্গে তুলনায় অসীম রায়ের 'শ্রেণীশত্রু' ও 'অগ্নি' গল্পে উদ্দেশ্য-মূলকভাবে নকশালবাদীদের কুৎসা করার প্রয়াস নেই। সাধারণভাবে আগের জেনারেশনের চোখে পরবর্তীকালের জেনারেশনকে দেখা, সে-দেখাও কোথাও রাজনীতি আছে, কোথাও নেই, তাঁর গল্পের কেন্দ্রীভূত বিষয়। অবশ্যই পুরোন

জেনারেশনের কাছে নতুন জেনারেশন অচেনা, অনভিজ্ঞ ইত্যাদি ব্যক্ত করার পশ্চাতে যে সূক্ষ্ম আক্রমণ থাকে, তা অবশ্যই কোন বিদ্বেষপ্রসূত নয়। অসীম বিশ্বাস করেন, 'যেহেতু সাহিত্যকর্মের নিজস্ব গতির চাপে প্রাক্তন সিদ্ধান্ত দাঁড়ায় না, এমন-কি কোনো একটা লোককে খুব বিষণ্ণ কিংবা প্রসন্ন চরিত্রে, ভাঁড় কিংবা মহাপুরুষে দাঁড় করাব এ [illegible] নিয়েও অচল তখন লেখক সৌন্দর্যের স্পন্দিত শক্তির কাছেই আত্মসমর্পণ করে...। সে আত্মসমর্পণে বিপদ কম। কারণ, সে শক্তির চাপে যেমন প্রচণ্ড আত্মকেন্দ্রিকতার ঝোঁক আছে তেমনি রয়েছে বহির্জগতের সঙ্গে অন্তর্জগতের সম্পর্ক স্থাপনের প্রবল সম্ভাবনা। এভাবে উপন্যাসে বাহিরের ঘটনা অন্তরের অগ্নিতে শুদ্ধ করে নেওয়া সম্ভব হয়।' (৫২) অসীম যাই বলুন, রাজনীতির ভিত্তিমূল দৃঢ় না হলে, এই 'সৌন্দর্যের স্পন্দিত শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ' শেষ পর্যন্ত প্রতিক্রিয়ার শক্তিকেই মদত দেয়। প্রাসঙ্গিকভাবে মনে রাখা দরকার যে নকশালবাদীদের বিষয়ে কমিউনিস্ট পার্টির কৌশলগত লাইন ছিল মোটামুটি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের। এবং হিংসাত্মক কার্যকলাপের জন্যে সি. পি. এমকে দায়ী করা।

'শ্রেণীশত্রু' (৫৩) গল্পে অসীম রায় শহরতলির এক কলোনী অঞ্চলের চিত্র এঁকেছেন, যেখানে নকশালবাদী ও অন্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে নিত্য সংঘর্ষ চলেছে, হত্যা প্রতিশোধ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অঞ্চলটা দু'দলে ভাগ করে নিয়েছে; একে অন্যের এলাকায় প্রবেশ করলে মৃত্যু নিশ্চিত। ইতিমধ্যেই নটা খুন হয়েছে; এক দলের হাতে চার, অন্য দলের হাতে পাঁচ। এক দলের নেতা রমেন, অন্যদলের নন। ছাত্রজীবনে এরা দুজনেই ছিল সহপাঠী, এবং কৃতী ছাত্র। আগে পুরো অঞ্চলটাই ছিল ননদের হাতে, 'বলতে গেলে মুক্ত অঞ্চল।' এখন একমাত্র ননর বাড়ির দিকটি ছাড়া অন্য 'তিন দিক জুড়ে রমেনদের পার্টি তাদের ডালপালা' মেলেছে। এবং রমেনদের জন্যেই নন-কে পালিয়ে যেতে হয়েছে। কিন্তু তিন সপ্তাহ পালিয়ে থেকেও আসন্নপ্রসবা স্ত্রীর কথা মনে করে সে না ফিরে পারলো না। স্ত্রীর প্রথম সন্তান, সুতরাং চিন্তাই স্বাভাবিক। কিন্তু এরকম ব্যক্তিগত একটা ব্যাপারে রমেনদের সঙ্গে সংঘর্ষে নামতেও তার মন চাইছিল না। কারণ 'পাড়ার আশেপাশের মাস্তান নিয়ে সেও জোরাল স্কোয়াড তৈরি করছে, হত্যার উৎসবে সে মেতেছে।' তবু এক গভীর আকর্ষণে সে বাড়ির দিকে পা বাড়ায়। খানিকটা যেতেই হেডমাস্টারের বাড়ি। 'লোকটা পলিটিক্স করতে করতে বসে গেছে, কিন্তু এই তীব্র শ্রেণীসংগ্রামের যুগেই সমান দাপটে চালিয়ে যাচ্ছে!'

তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে নন-কে ফিরে যেতে বলেন। পুরোন দিনের আঁকড়ে থাকা মূল্যবোধ থেকে তিনি ননদের দোষারোপ করেন: 'তোর ফিরতে হবে। কেন ফিরতে হবে জানিস না? সমস্ত অঞ্চলটা তো দাঙ্গার সময়কার হিন্দু-মুসলমানদের মতো ভাগ করেছিস। এ পাড়ায় রমেনদের মারছিস, ও পাড়ায় রমেনরা তোদের মারছে। এই শ্রেণীসংগ্রাম কদ্দিন চলবে নন? কদ্দিন এই তাজা রক্ত ঝরবে কলোনিতে?' নন ফিরে দাঁড়িয়েছে, বলেছে, 'রাজনীতি আপনাদের মতো ভালো মানুষদের জন্যে নয়। ঐ সব উদারনৈতিক ভালোমানুষদের দিন চলে গেছে।' নন চলতে থাকে। কলোনির শিরা-উপশিরা দিয়ে যেতে যেতে ভাবে, 'পবিত্র এক শিখার মতো মানুষকে দাঁড়াতে হবে, সে যদি আগুন জ্বালাতে চায় তাহলে তাকে নিজে হতে হবে অগ্নিবৃক্ষ। নইলে বিপ্লবের দাবানল সম্ভব নয়।... আর সুধীরবাবু স্যার! পলিটিক্সে নতুন ইমেজ আনার কথা যে বলে? কথাগুলো ঠিকই, কিন্তু সুধীরবাবু তো কখনোই তাদের সংঘর্ষের পথ মেনে নেবে না, দূরে থেকে দাঁড়িয়ে সেকেলে আদর্শবাদীদের মতো তাদের জখমে হাত বুলোবে, বড়জোর তাদের যুদ্ধের স্ট্রেচার বেয়ারার। এ রকম লোকেরও হয়তো দরকার আছে—নন এ-ব্যাপারে ঠিক সিদ্ধান্তে আসতে পারে না।' নন আর বেশি দূরে এগুতে পারে না। পরপর দুটো রিভলবারের গুলির আওয়াজ শোনা যায়।

এ-গল্পে অসীম রায় তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি আক্রমণাত্মক নকশাল-বাদীদের বিরোধীপক্ষের প্রতি: 'আশ্চর্য ড্রিবল করতে পারত রমেন। সেটা ছিল তার একই সঙ্গে দোষ-গুণ। তারপর থেকে রমেন ড্রিবল করতে করতেই গেল, খালি ফন্দি ফিকিরের ড্রিবল, খালি কতগুলো কবিতার মতো স্লোগানের আওয়াজ তুলে শ্রেণীসংগ্রামকে ঠেকিয়ে রাখার ড্রিবল। আশ্চর্য ক্ষমতা নিয়ে রমেন আরো অনেকের মতো গেঁজিয়ে গেল। গেঁজিয়ে যাওয়া ছাড়া নন কি বলবে? সবই তো এখন বিপ্লবের নামে এক কাস্ত রুটিন।...পুলিশ থেকে মিল্মালিক অবধি সবাই এখন ব্যস্ত রমেনদের সঙ্গে টার্মসে আসতে। আর রমেনরা তা নিজেরাও জানে। তাই তো তারা বর্তমান সমাজব্যবস্থার আর একটা নতুন খুঁটি। এ নড়বড়ে ব্যবস্থাটায় ধাক্কা মারতে গিয়ে তারা আরও এর বনেদ পাকা করতে উদ্যত।' গল্পের শেষে নন যখন নিহত হয়, তখন সারা কলোনি জুড়ে বৃষ্টি নামে, আর সে আওয়াজের সঙ্গে মিলিয়ে কাননদেবীর গান ভেসে আসে, 'তার বিদায় বেলার মা খানি আমার গলায় দোলে।' এই গানের লাইনটি এখানে সংগ্রামের ধারাবাহিকতা বোঝাতেই তাৎপর্য পায়।

অসীম রায়ের অন্য গল্প 'অনি'-র(৫৪) কাহিনী এইপ্রকার। নকশালবাদী অনি বা অনির্বাণ মুখার্জীর বাবা একদা রাজনীতি করতেন; বর্তমানে কর্পোরেশনের লাইটিং ইন্সপেক্টর। মায়ের সঙ্গে অনির সম্পর্ক সহজ। কিন্তু বাবার সঙ্গে সম্পর্কটা রাজনৈতিক বিরোধিতার। কিন্তু সম্পর্কটা তিক্ত নয়। বাবার মনের গভীরে অনি বারংবার নাড়া দিয়ে যায়, চিন্তায়, কর্মে। সময়ের মানসিক ব্যবধান সত্বেও তিনি অনিকে বা বৃহত্তর অর্থে নকশালবাদকে বুঝতে চান: 'আমি পলিটিক্স থেকে সরে গেছি সত্যি কথা কিন্তু কোন্ স্লোগান হৃদয়ে রক্ত সঞ্চার করে, পেশী সংবদ্ধ করে নতুন প্রতিজ্ঞায়, বোঝবার ক্ষমতা বোঝবার ক্ষমতা বোধ হয় তখনও হারাইনি। অনিদের স্লোগানে এমন অদ্ভুত অদ্ভুত কথা আছে যা আপাতদৃষ্টিতে ভাবের কথা, মেলোড্রামার কথা কিন্তু তার প্রচণ্ড রোখ আমায় স্পর্শ করে। এই কথাগুলো যেন শুধু চিৎকার করে না, বস্তুত আমাদের বাঙালী মধ্যবিত্ত জীবনের অস্তিত্বের শিকড় ধরে নাড়া দেয়।..আগুন এত কাছে যে, তার আঁচ গায়ে এসে লাগছে, ঘটনা এখন বিচার-বিশ্লেষণের ঊর্ধ্বে এমন এক আশ্চর্য স্বয়ম্ভূতা অর্জন করছে, এমন আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ হয়ে রোজ প্রাতঃকালে উদিত হচ্ছে খবরের কাগজে যে, বিপ্লবের ইতিহাস ভূগোল যা যৌবনে পড়েছি এবং বহুকাল পর্যন্ত এই মধ্যবয়সী জীবনের স্রোতে ভেসে যাওয়া কুটোর মতো আঁকড়ে ধরে থেকেছি তা সব ভুলতে বসেছি। আমি এখন নিজেই চমকে উঠি নিজের প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তায়।' তথাপি পিতৃস্নেহে অনিকে বাঁচাবার জন্তে দিল্লী, বম্বে বা অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেবার কথাও ভাবেন। এসময়ে পাড়ায় একদিন পুলিশের গাড়িতে বোমা পড়তেই, অনেকের সঙ্গে পুলিশ অনিকেও নিয়ে যায়। সেসময় থেকে বাবা আরও চিন্তিত হন। এদিকে অনি তার মাকে, বাবার সম্পর্কে বলে, 'আসলে বাবা তার নিজের অতীত থেকে বেরোতে পারছে না। কারণ বাবা আর পলিটিক্যাল এলিমেন্ট নয়। বাবা ভাবছে তাদের সময় যেমন পুলিশের মার খেয়ে আন্দোলন গুটিয়ে গিয়েছিল এবারেও তাই হবে। একবারও তাকিয়ে দেখছে না চারিদিকে।...আমরা যুদ্ধ শুরু করেছি, শেষ করব।' বাবা বলেন, 'আমি তো বলেছি তোদের একটা প্রয়োজন ছিল। বাস্তবিক, বিপ্লবের নাম করে সবাই যখন নিজের কেরিয়ার করছে তখন তোদের অপরিসীম আত্মত্যাগ..।' একটা হাত শূন্যে তুলে অনি প্রতিবাদের ভঙ্গীতে দাঁড়ায়। আস্তে আস্তে বলে, 'এইসব বস্তাপচা কথা, এইসব স্তোকবাক্য আর বোলো না। সবাই বলে তাই তোমাকেও বলতে হবে? বিপ্লবটা কি খবরের কাগজে সম্পাদকীয় লেখা কিংবা ককটেল পার্টি? বিপ্লবে মৃত্যু, ত্যাগ অবধারিত।' তারপরই

একদিন বাবা যে-দলের সঙ্গে ছিলেন যৌবনে এবং বর্তমানে বন্ধুত্বের সূত্রে জড়িত, সেই দলের ছেলেরা বোমা ছুঁড়তে ছুঁড়তে পাড়া কাঁপিয়ে এল অনিকে হত্যা করতে। বাবা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন আর অনি তখন বাড়ি ছিল না। বাবা তারপরই অনিকে বলেন, 'তোকে আমি দিল্লী পাঠিয়ে দেব।' উত্তরে অনি বলেছিল, তুমি আমাকে বাঁচাতে পারবে না বাবা। রাস্তায় দেখলে পুলিশ গুলি করে মারবে, বাড়িতে এলে অন্য পার্টির লোক চড়াও হয়ে মারবে। আর যদি চাকরি-বাকরি করব ভাবি তাহলে আমার বন্ধুরা ছেড়ে দেবে না। আমার জন্যে চেষ্টা কোরো না-বাবা।' এরপর থেকে বাবা 'ভবিষ্যত অনিবর্তনীয় নিয়তির' জন্যে অপেক্ষা করতে থাকেন। তার এক বন্ধু তাকে পরামর্শ দেন, অনিকে পুলিশে ধরিয়ে দিতে, তাতে অন্তত তার প্রাণটা বাঁচবে। কিন্তু অনির বাবা 'সেই পলায়ন' চান না। তারপরই একদিন অনি পুলিশের গুলিতে নিহত হোল। আর সেই মুহূর্তে বাবার মনে হোল, 'এ তো অনির মৃত্যু না, এ আমারও মৃত্যু, আমার সমাজবাদ স্বপ্ন দেখার মৃত্যু, আমার লেনিন স্তালিন মাও-সে-তুংয়ের মৃত্যু।' বাবার মনে পড়ে অনির বাক খাতায় লেখা সেই কবিতার লাইন— 'আমি যে বসিতে চাই বাংলার ঘাসে।' গল্পের সমাপ্তিতে অসীমের এ-লাইন ব্যবহার জীবনানন্দের কল্পলোক ছাড়িয়ে অনিবার্যভাবে অনিদের গ্রামীণ ভারত-বর্ষের কথা স্মরণ করায়, যেখানে দাঁড়িয়ে তারা কৃষি-বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেছিলেন বা আজও দেখছেন।

পরবর্তী উপন্যাস 'অসংলগ্ন কাব্য'-তে ৫৫) অসীম রায়ের পূর্বোক্ত দৃষ্টিভঙ্গীর বদল ঘটেছে। এর নায়ক সূর্য ব্যানার্জী / সোনা। ভবিষ্যত সম্ভাবনাময় চাকরি ছেড়ে দিয়ে একদিন গ্রামে চলে যায় কৃষিবিপ্লবের মূল লক্ষ্য সফল করার কাজে। সে বলেছে, 'আমাদের মূল লক্ষ্য কৃষিবিপ্লব। কৃষিবিপ্লব ত্বরান্বিত করার জন্যে আমাদের যা যা করণীয় সমস্ত কিছু করতে হবে।' এর কিছুদিন পরেই শহর-তলির একাংশে (যে অঞ্চলকে কেন্দ্র করে এই কাহিনী) 'সমস্ত ঘর বাড়ি পাঁচিল আলসে দেয়ালে মাও সে তুং লেনিনের বাণী আলকাতরার আঁচড়ে প্রকাশিত হয়।' তখন এ অঞ্চলের নেতা সূর্য ব্যানার্জীর অপরিসীম প্রভাব। আর সে প্রভাবের ফলেই শহরাঞ্চলে 'খতম' শুরু হবার প্রথম পর্বে এ-অঞ্চলে গুণ্ডা-মস্তানদের অত্যাচার ছিল না, কোন 'খতম' হয়নি কিন্তু বেশিদিন ব্যাপার-টাকে বন্ধ রাখা যায়নি। পার্টিতে সূর্যের দল সংখ্যালঘু হয়ে যায়। আর তখন থেকেই সূর্যের মানসিকতায় একটা হতাশাবোধ কাজ করতে থাকে। সে বলে : 'আমি আপাতত গ্রামেই থাকছি। শহরে নতুন আন্দোলন শুরু হয়েছে।

আমাদের এখানেও কিছুদিনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে। অনেক জিনিষ ঘটবে যার সঙ্গে হয়ত কৃষিবিপ্লব মেলাতে পারবেন না, অন্তত আমি পারছি না। এ কথাটা এমন প্রকাশ্যে কাউকে বলিনি। বলায় বিপদ আছে বলে নয়, বলার নিরর্থকতার জন্যে।' এরপরের ঘটনা প্রসঙ্গে লেখক লিখেছেন, 'কয়েকমাস পর থেকেই ঘটনার গতি অন্য মোড় নিল। কৃষিবিপ্লবের চেহারাটা ক্রমশ মিলিয়ে যেতে লাগল শহরের আজগুবি অ্যাকশনে। এই অ্যাকশনে আমাদের অঞ্চলের প্রধান শিকার সূর্যের মায়ের স্কুল। দোতলা বাড়িটার সমস্ত দরজা-জানালা থেকে একসঙ্গে লেলিহান শিখা উঠে কিছুক্ষণের মধ্যেই অর্ধভস্মীভূত ভুতুড়ে বাড়িতে পরিণত করল। এবং 'পুলিশ মারো অস্ত্র কাড়ো' দেয়ালে দেয়ালে এই স্লোগান অনুসরণ করে আমাদের অঞ্চলের তরুণরা চরম নৃশংসতায় কতগুলি পুলিশ অফিসারকে হত্যা করল। ছেলের সামনে বাপের, স্ত্রীর সামনে স্বামীর সেসব মৃত্যু প্রকাশ্যে রাজপথে, দিনের আলোয়।' তখন পার্টির মধ্যে স্বাভাবিক কারণেই সূর্য-র সমালোচনা শুরু হয়ে গেছে (সূর্যর ভাই উপমন্যু বলেছে, 'দাদা কৃষিবিপ্লব করছে না, কৃষিবিপ্লবের নামে সে শোধনবাদের শিকার হয়েছে।') কয়েক মাসের মধ্যেই 'অবস্থার দ্রুত অবনতি হতে থাকে। সূর্য ব্যানার্জীর কোন সন্ধান নেই। ইতিমধ্যে উপি (উপমন্যু) তার গুপ্তঘাঁটি থেকে ধরা পড়ে। আস্তে আস্তে এ অঞ্চলের সমস্ত ঘাঁটিগুলি পুলিশের করতলে আসতে থাকে।' আর সমস্ত শহর জুড়ে যখন এ-অবস্থা চলেছে তখনি একদিন সূর্য ব্যানার্জী আসে। সে তখন সম্পূর্ণ উন্মাদ। তাকে শেষ পর্যন্ত পাগলা গারদে ভর্তি করা হয়।

বংশী মিস্ত্রির (যার আত্মকথনের মধ্যে দিয়ে কাহিনীর বিস্তার) বা লেখক এখানে আশ্চর্য এক লজিক আমদানি করেছেন। গ্রামে কৃষিবিপ্লব, জোতদার খতম খুবই ভাল, সেটা প্রয়োজনীয়, কিন্তু শহরে দু'চারটে খতম হওয়া খুবই খারাপ। তখন নকশালবাদীরা ঘৃণ্য নরকের কীট অথচ পুলিশ বা বিরোধী পার্টির মাস্তানরা যখন নির্বিচারে নকশালবাদীদের হত্যালীলা চালায়, সে-বিষয়ে নীরব থাকা চলে। বংশী মিস্ত্রির বা আমির বক্তব্য: 'কোনরকম মনের মাধুরী দিয়ে বা মন্ত্র জপ করে এই হত্যার অভিযানকে কৃষিবিপ্লব না অন্য কোন বিপ্লব বলে ভাবতে পারি না। আমি এখনো মানি যে এই স্বপ্নের ভিত ছিল, তা আকাশকুসুম রচনা নয়। ভারতবর্ষে কৃষিবিপ্লব ইতিহাসের অমোঘ নির্দেশ, সূর্য ব্যানার্জীর এই কথা আমাদের সমস্ত শতাব্দী জুড়ে ধ্বনিত হবে।' অবশ্য বংশী মিস্ত্রিদের পক্ষে ভাবাও সম্ভব নয়। সে তো এই শহরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই এসকেপিস্ট। যখন শহরে রক্তের প্লাবন, তখন সে অনায়াসে নিজেকে নিরাপদ

দূরত্বে সরিয়ে নিতে পেরেছে, সাহেবের বাড়ি ডিনার খেয়ে চাকরিতে উন্নতি করেছে এবং কয়েকবছরের জমানো বোনাসের টাকায় সমকালীন ঘটনার বিরুদ্ধে 'অন্তরের প্রতিবাদ' জানাতে সজোরে 'শানাই বাজিয়ে' 'জাঁকালো' বিয়ে করেছে। আর নকশালবাদীদের বিরুদ্ধে যখন অন্য পার্টির 'গণ অভ্যুত্থান চলেছে, তখন সস্ত্রীক দিল্লী চলে গেছে। অথচ 'অনি' গল্পে এই অসীম রায়ই অনির দিল্লী যাওয়ার 'সেই পলায়ন'-এর বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন!

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নভেলেট 'কেন্দ্রবিন্দু'তে (৬৬) শহরাঞ্চলে নকশালবাদী আন্দোলনের প্রেক্ষিতে এক মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত। নিম্নস্তর এক 'সুখী সুখী' অস্তিত্ব বজায় রাখা মধ্যবিত্ত পরিবারের অন্দরমহলে ঢুকে পড়ে মান্তুর মতো পড়াশুনোয় কৃতী ছেলেদের আন্দোলনে সংযুক্ত হওয়ার সমস্ত কর্মকাণ্ড আর ফলে, বাবা-মা-মাসি-ভাইয়েরা সংসার এবং বাইরের ধাক্কায় আত্মরক্ষা ও প্রতিরোধের মধ্যে নানা প্রতিক্রিয়ায় আন্দোলিত হতে থাকে; অবশ্য শ্রেণীর চিন্তাভাবনার গণ্ডি থেকে প্রায়শই তারা কেউ বেরিয়ে আসতে পারে না। এক সার্বিক মানবতাবাদী প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তার বহুস্তর চোরাবালিতে নিজেদের ক্রমশ নিমজ্জমান হতে দেখেও তাকেই মহৎ অস্তিত্ব বলে মনে স্বীকৃতি দেয়। মান্তু খেতে বসে যখন 'শ্রেণী চরিত্রের' কথা বলতো, যখন এই 'শ্রেণীর বিলোপ' ঘটিয়ে মানুষের সমাজে সাম্য' আনার কথা বলতো, তখন ওর বাবা এ-কথার সত্যতাকে অস্বীকার করতে পারতেন না। কিন্তু মধ্যবিত্ত সংশয় সহজে ঘোচে না, নানা তাত্ত্বিক তর্ক দিয়ে প্রতিরোধ করতে চায় সত্যকে। বাবা ভেবেছেন, 'এটা একটা মহৎ আদর্শ বটে, কিন্তু পৃথিবীতে কি এই আদর্শ কোনোদিন সত্যিই প্রতিষ্ঠিত হবে?' তারপরই আবার ভেবেছেন, 'হঠাৎ কি এ দেশের হাজার হাজার ছেলে এরকম মহাপুরুষ হয়ে গেল, যে তারা ব্যক্তিগত সুখ স্বচ্ছন্দ উপেক্ষা করে মানুষের মুক্তির জন্যে কাজে নেমে পড়েছে?' তাই যখন মান্তু গ্রামের চাষীদের মধ্যে কাজ করতে গিয়েছিল, তখন বাবা ওদের মনে মনে সমর্থন করেছিলেন, 'ওরা সফল হোক'। 'তারপর দিনের পর দিন যে-সব ঘটনা শুরু হলো বাবা একেবারে বিভ্রান্ত, বিমূঢ় হয়ে পড়লেন। প্রত্যেকদিন বীভৎস খুন জখম, নারকীয় ঘটনা। বন্ধুকে বন্ধু ডেকে নিয়ে গিয়ে খুন করে রাস্তায় ফেলে দিয়ে যায়। একজন ছাত্র আর একজন ছাত্রের বুকে ছুরি বসায়। বৃদ্ধ অধ্যাপককে খুন করে ছাত্ররা উল্লাস দেখায়। ক্লাসের মধ্যে ঢুকে শিক্ষিকার গলায় দা'য়ের কোপ মারে। চোদ্দ বছরের ছেলেকে দুপুরবেলা দাঁড় করিয়ে গুলি করা হয়।' ইত্যাদি, ইত্যাদি। ফলে বাবার মধ্যবিত্ত মানসিকতা আঘাত

যায়; যা ঘটেনি, কল্পনায় সে সমস্ত নারকীয় ঘটনাও তাঁর চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তদুপরি আদর্শবাদী নেতা রবি চক্রবর্তীকে যারা খুন করে, তাদের মধ্যে মান্তুও ছিল এবং বাবা যখন নিজের চোখেই রক্তমাখা জামাকাপড়ে ছুটে যেতে দেখেছিলেন, তখন তার মনে হয়েছিল, যেন তার 'সর্বস্ব কেউ কেড়ে নিয়েছে।' এদিকে স্থানীয় বিরোধী দলের ছেলেরা তাকে খুঁজতে থাকে। মান্তুর বাবাকে-ভাইকে তারা পথেঘাটে সর্বত্র মান্তুর খোঁজে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে। এমনকি রবি চক্রবর্তীর পরে স্থানীয় নেতা বিষ্ণুদাও একদিন ধরেছিলেন বাবাকে। এরপর একদিন মান্তু অন্যপাড়ায় নিহত হোল। পাড়ার দেয়ালে দেখা গেল: 'কমরেড মান্তু, তোমাকে আমরা ভুলবো না। তোমার মৃত্যুর বদলা আমরা নেবোই।' আর তখন পরীক্ষা দিতে যাবার পথে মান্তুর প্রেমিকা রেবা 'চারিদিকে বোমার শব্দ, খুন আব উত্তেজনা'র মধ্যে ভাবে, 'হয়তো এইরকমভাবেই সব দেশেই বিপ্লব হয়। প্রথমটা বোঝা যায় না—অনেকেই সন্দেহ করে। তারপর হঠাৎ একদিন দারুণভাবে….'

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়েব গল্প 'পলাতক ও অনুসবণকারী'-তে (৫৭) কিন্তু উক্ত লজিক কাজ কবে না। এ-গল্পে নকশালবাদী (?) রবি নিহত হবার ভয়ে পালাচ্ছে। তাকে হত্যা করাব জন্যে বিপক্ষ দলের তিনজন হত্যাকারী অনুসরণ করছে। রবি প্রথমে আশ্রয় নেয় তার এক বৌদির বাড়ি, অনুসরণকারীদের সেখানে আসতে দেখেই সে পালায়। অনুসরণকারীরা বোমা ফাটিয়ে জানিয়ে দিয়ে যায়, তারা এসেছিল। এবপর রবি আশ্রয় নিতে যায় চন্দন নামে তার এক বন্ধুর বাড়ি, কিন্তু সে-বাড়ির দরজা খুলবাব আগেই তাকে পালাতে হয়। তারপর সারারাত এক শ্মশানে বসে থেকে সকালের ট্রেন ধরে চলে যায় শ্রীরামপুরে এক বন্ধুর বাড়ি। এখানেও অনুসরণকারী হানা দিতেই সে আবার পালায়। তারপর স্টেশনে পৌঁছাবার পথে এক মাঠের মধ্যে সে ওদেব হাতে নিহত হয়। আর তাদের ছুরি চালাবার কাজ শেষ হতেই তারা শুনতে পায় একটা কলরব। আট-দশজন লোক ছুটে আসছে। এবার পূর্বোক্ত তিন অনুসরণকারী ছুটতে শুরু করে। 'অবিলম্বে সেই দলটি এখানে এসে পৌঁছল। ভূতপূর্ব রবির দিকে এক পলক তাকালো শুধু, তারপর শোনা গেল একটা প্রতিজ্ঞার উচ্চারণ।' এই দলের ন'জন লোক তিনজন করে ভাগ হয়ে তিনদিকে ছুটলো। একটু আগে যারা ছিল অনুসরণকারী, এখন তারাই পরিণত হোল পলাতকে।

গল্পটির আপাতচমক অসামান্য। কিন্তু সুনীল এখানে এমন কোন যুক্তিসিদ্ধ প্রেক্ষিত সৃষ্টি করলেন না যার ফলে পারস্পরিক হত্যা ছাড়া অন্য কিছুই এখানে

উপস্থাপিত হয়। এই হত্যা কি, কেন, এটা বলাও বোধহয় লেখকদের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে, অন্যথায় প্রত্যেক লেখাই প্রতিক্রিয়ার শক্তিই বৃদ্ধি করে।

প্রধানদের মধ্যে বিমল মিত্রের দু'টি উপন্যাসে (রাগভৈরব (৫৮) ও জন-গণ-মন) নকশালবাদীদের প্রসঙ্গ এসেছে। কিন্তু বিষয়টিতে তাঁর অজ্ঞতা এতই সুগভীর যে কোন তাত্ত্বিক আলোচনার অবকাশ নেই। 'রাগভৈরবে' প্রভা চক্রবর্তী একটা স্কুলের শিক্ষয়িত্রীর চাকরি নিয়ে রায়পুর থেকে শহরের নস্কর-বাগান লেনে বাড়ি ভাড়া করে বাস করছিল। পরে তার বাবা ভৈরব চক্রবর্তীও কিছুদিন পরে রিটায়ার করে মেয়ের বাড়িতে এসে বাস করতে থাকে। শহরে তখন নকশালবাদীদের অ্যাকশন চলছে। ভৈরব রাজনৈতিক চেতনাহীন আদর্শবাদী মানুষ। মুখে সমস্ত সময় 'সীতা-সাবিত্রী-দময়ন্তী-রামমোহন-পরমহংসদেব-বিবেকানন্দ বিদ্যাসাগর-সুভাষ বোসের' নাম। আর এইসব লোকেদের দেশে অশান্তি হলে তাঁর সহ্য হয় না। একথা পার্কে দাঁড়িয়ে চেঁচাতে যেয়ে আধলা ইটের ঘা কপালে খেয়ে কিছুদিন শয্যাশায়ী থাকেন। কিন্তু ইতিমধ্যে প্রভার সঙ্গে নকশালবাদীদের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। একদিন নস্কর-বাগান লেনে স্থানীয় থানার ও. সি খুন হোল। ফলে সারা এলাকা জুড়ে নতুন ও. সি সকলকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন এবং যথারীতি সকলেই 'আমরা কিছু জানিনা' বলে পাশ কাটায়। কিন্তু একমাত্র প্রভা রুখে দাঁড়ায় জানি, কিন্তু বলবো না' বলে। পুলিশের প্রশ্নের উত্তরে সে জানায়, যে সে নকশালবাদীদের সমস্ত কার্যকলাপ সমর্থন করে, কারণ 'গভর্ণমেণ্ট আমাদের জন্যে কি করেছে যে, সমর্থন করবো না?' এরপরই রাতে ভৈরব চাদর মুড়ি দিয়ে দারোগা অধীর ব্যানার্জীর কাছে যায় এবং হত্যাকারীর নাম বলে আসে। নকশালবাদীদের সে খবর পেতে দেরি হয় না। চাদর মুড়ি দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে ভৈরব তাদের হাতে নিহত হয়। নিহতের মুখ দেখেই নকশালবাদী সমর ছুটে আসে প্রভার কাছে। বলে, 'আমাদের তুমি ক্ষমা করো প্রভাদি, আমরা ভুল করেছি, বুঝতে পারিনি—' সীতা-সাবিত্রী-দময়ন্তীর দেশের মেয়ে প্রভা বলে, 'না, তোরা ভুল করিসনি, ঠিক করেছিস—।' তারপর ওরা চলে যেতেই কান্নায় ভেঙে পড়ে। অর্থাৎ, বিমল মিত্রের মতে, নকশালবাদীদের এই হত্যা ইত্যাদিকে প্রতিরোধ করার একমাত্র পথ হোল ক্ষমা ও প্রেম।

'জন-গণ-মন' উপন্যাস একটি ব্যক্তিগত প্রতিশোধ গ্রহণের কাহিনী। এর মধ্যে নকশালবাদীদের হঠাৎ আমদানি করা হয়েছে কেন, বোঝা শক্ত। স্থানীয় কংগ্রেস নেতা হরিসাধন চট্টোপাধ্যায় রাজনীতি করে প্রভূত অর্থের মালিক

হয়েছেন। প্রত্যেকবার এম. এল. এ-ও তিনিই হন। তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী 'কানাই ঘোষ বারবার তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হারে। একদিন এই কানাই ঘোষের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেন হরিসাধন। . একমাত্র কানাইয়ের মেয়ে সন্ধ্যা ছাড়া সকলেই পুড়ে মারা যায়। সন্ধ্যা পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় পায় এক বাঈজীর কাছে। তারপর ঘটনাচক্রে অনেক বছর পরে হরিসাধনের ছেলে স্বদেশের সঙ্গে তার যোগাযোগ ঘটে এবং দুজনে কলকাতা ছেড়ে পালায় অন্য শহরে। এখানেই সন্ধ্যার সঙ্গে নকশালবাদীদের যোগাযোগ। তারপর 'রাগ-ভৈরবে'র একই ছকে এখানে একজন পুলিশ অফিসার খুন হয় এবং রাগভৈরবের প্রভা সেদিন যা যা যেভাবে বলেছিল, সেই একই কথা, একইভাবে বলে যায় সন্ধ্যা। এরপর তার বিভলবার পাচার করতে যাবার পথে স্বদেশ ধরা পড়ে। জেলে যায়। এদিকে এক সভায় বক্তৃতা করার সময়ে হরিসাধন সন্ধ্যার গুলিতে নিহত হয়। সন্ধ্যা ধরা পড়ে এবং তার ফাঁসির হুকুম হয়।

কিন্তু এই ২৭৬-পাতার উপন্যাসটি পড়ে পাঠকেরা লেখকের বক্তব্য পাছে না বোঝেন, সেজন্যে তিনি একটি প্রস্তাবনা জুড়ে দিয়েছেন। সেটার বক্তব্য: 'পুরাণে আমরা দেখি সত্ত্বগুণের আধার-স্বরূপে, দেবতাগণও বার বার দানবশক্তির দ্বারা পরাভূত হয়ে স্বর্গভ্রষ্ট হয়েছেন। এই পরাজয় তাদের মনে ঘোর অবসাদ এনে দিয়েছিল। তখন তাঁরা দেবী মহামায়ার উপাসনা দ্বারা শক্তিমন্ত্রে বলীয়ান হয়ে আবার অসুর-লাঞ্ছনার হাত থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। তাইতেই পৃথিবীতে আবার সত্য, ন্যায়, আর ধর্মের প্রতিষ্ঠা ফিরে আসে।' সত্যি, এ-প্রস্তাবনা না লিখলে বই পড়েও পাঠক অন্ধকারেই থেকে যেতেন!

নকশালবাদীদের নিয়ে লেখা গজেন্দ্রকুমার মিত্রের কাহিনী 'বন্ধুমেধ' (৬০) শেষ পর্যন্ত একটি ভূতের গল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রবাল একটি নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলে। তার বাবা একটা দোকানে শ'দেড়েক টাকা মাইনের চাকরি করেন। প্রবাল ক্লাস নাইনে ফেল করার পর আর পড়াশুনোয় মন দিতে পারেনি। তখন হাবুদা-নারানদা-জীবনদা-কাজলদা, এরা ওর চোখ খুলে দিয়েছে। দরকার হলে সে প্রাণ দিয়েও সে এই 'বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থাকে' রদ করবে। ফলে সে হয়ে দাঁড়ায় পার্টির বিশ্বস্ত কাডার। 'বেইমান অজয়কে' মারার ভার পড়েছিল তারই ওপর। নির্বিঘ্নেই কাজটা সে সমাধা করেছিল কিন্তু গোল বাধলো তার বন্ধু সুখেনকে হত্যা করতে গিয়ে। ছুরি খেয়ে পড়ে যেতে যেতে সুখেন আকাশ-ফাটা চিৎকার করে উঠল, 'খোকা—একি করলি খোকা!' ফলে সেই মুহূর্তে পাড়ার সকলেই জেনে গেল খোকার নাম। আর সেই মুহূর্তে খোকাকে

(প্রবালের ডাক নাম) পালাতে হোল। খোকা মুরারির বাড়িতে আশ্রয় নিতে গিয়েছিল কিন্তু সে ফিরিয়ে দেয়। আবার পালাল খোকা। হাঁটতে হাঁটতে সে চলে আসে এক নির্জন ঝিলপারে। আর তখনি সে শুনতে পায় সুখেনের ডাক 'খাকা!' প্রবাল ভয় পায়। নিজের মনকে বোঝাতে চায়, এ হতে পারে না, এ মিথ্যে। আবার সে সেই ডাক শোনে আর ভয় পেয়ে তখনি সে চিৎকার করে ঝাঁপিয়ে পড়ে একমানুষ জল-থাকা ঝিলের মধ্যে। পরের দিন সন্ধ্যে নাগাদ প্রবালের লাশ ঝিলের জলে ভেসে ওঠে। গজেন্দ্রবাবুরা বোধহয় এভাবেই এক অদৃশ্য নিয়ন্ত্রণদ্বারা দুষ্টের (?) দমন আর শিষ্টের পালনের স্বপ্ন এখনো দেখেন!

॥ চার ॥

নকশালবাদী আন্দোলন অনেক তরুণ লেখকের জন্ম দিয়েছে। এঁদের মধ্যে কয়েকজন আন্দোলনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন ; জেল, নির্যাতনের অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরেছেন। অজানিত কেউ বা শহীদ হয়েছেন। সম্ভাবনাময় গল্পকার তিমিরবরণ সিংহ, যার অনেক লেখাই পুলিশ ও জেল কর্তৃপক্ষ নষ্ট করে ফেলেছে, ১৯৭১-এর ২৪শে ফেব্রুয়ারী বহরমপুর জেলে নিহত হন। তার একমাত্র প্রকাশিত গল্প (পূর্ব অধ্যায়ে উল্লেখিত) 'সূর্যসেনা'(৬১) অবশ্যই একটি গল্পের খসড়ামাত্র। এটি একটি প্রতীকী গল্প : প্রত্যেক বছর একটা শকুন ডানা মেলে গ্রামটাকে ঢেকে ফেলে একবার না একবার। শকুনের নোখগুলো মাটিতে বিঁধে যেত। আর প্রত্যেকবারই শকুনটা একটি যুবতী মেয়েকে ছিনিয়ে নিয়ে যেত। লখিনের বৌ চম্পাকে নেওয়ার সময়ই বাধা এল মরদগুলোর কাছ থেকে। তারা রুখে দাঁড়ায় : 'আজ অনুশোচনার দিন নয়, আগুনের মত জ্বলে ওঠার দিন, কোন হত্যাই যেন বিনা বদলায় না যায়। তাই কালকে আগ্নেয়গিরির লাভায় আকাশটা টকটকে লাল হয়ে যাবে, আর সেই আগ্নেয় লাভা ঠিকরে বেরিয়ে আসবে মরদগুলোর বুক থেকে।'

গ্রামাঞ্চলে শকুনদের এই অত্যাচারের অবসানের জন্যে নকশালবাদীরা যে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলেন, তার পরিপূরক আন্দোলন শুরু হয় শহরাঞ্চলে। খুন, খুনের বদলা এবং পুলিশী হত্যা মিলিয়ে শহরাঞ্চল রক্তাক্ত হয়। শহরে মধ্যশ্রেণী (তথাকথিত প্রগতিশীল, অপ্রগতিশীল সকলেই) তখনিই 'গেল গেল' রব তুলে প্রতিক্রিয়ার হাত শক্ত করতে উঠে পড়ে লেগে যান। তাঁদের চরিত্র-হননে এই শ্রেণীর মুখপাত্রেরা কী পরিমাণ সচেষ্ট হয়ে ওঠেন, তা ইতিপূর্বেই

আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু বিশেষ কেউই নকশালবাদীদের রাজনীতি নিয়ে চিন্তিত হননি অথবা যখন তাদের ওপর গণহত্যার তাণ্ডব চলছিল, তখন অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিতে দ্বিধাবোধ করেননি। এই সময়ের ব্যাখ্যায় নকশালবাদীদের পক্ষে বক্তব্য রেখেছিলেন শশাঙ্ক: 'প্রতিবিপ্লবী সন্ত্রাসের বিভীষিকার মধ্যে মহানগরীর এক কোণে বিপ্লবী সন্ত্রাসের এই সামান্য একটা স্ফুলিঙ্গ দেখে এই যে এলোপাতাড়ি হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে এ কীসের ইঙ্গিত বহন করছে? কলকাতা মহানগরীতে বুর্জোয়া একনায়কত্বের মধ্যেই সর্বহারা একনায়কত্বের একবিন্দু অগ্রিম আস্বাদ কী পাওয়া যাচ্ছে না এর ভেতর? শ্বেতসন্ত্রাসের মধ্যে লালসন্ত্রাসের একটুখানি আভা? পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চল জুড়ে শ্বেতসন্ত্রাসের মধ্যেই সশস্ত্র কৃষক সংগ্রামের পথে ইতিমধ্যেই যে লালসন্ত্রাসের অভ্যুদয় ঘটেছে, শহরের সর্বহারার বুকে একী সেই মেঘেরই একটু ছায়া নয়? হ্যাঁ, তাই। ঠিক তাই।'(৬২)

শঙ্কর বসু বেলিয়াঘাটা (বেলিয়াহাট্টা) অঞ্চলের সমকালীন ঘটনাকে কেন্দ্র করে লিখেছেন তাঁর উপন্যাস (?) 'কমুনিস'।(৬৩) এখানে যাঁরা নকশালবাদী আন্দোলনে এসেছেন, তারা সকলেই শ্রমিকশ্রেণী বা তাদের পরিবার থেকে। এবং কাহিনী মুখ্যত ব্যাপ্ত হয়েছে আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। এবং চার পর্বে বিভক্ত: (ক) হাঁসের পালক ও পর্বতের কথা, (খ) অজ্ঞাতবাস, (গ) বালুচর, (ঘ) অজস্র কেন-র ফুল ফুটিয়ে ছড়া গাথার সাধ, এবং (ঙ) বধ্যভূমি, কারাগার, একঝাঁক-বুলেট। সোনার পুলিশের হাতে নিহত হওঁয়া থেকে মুখ্যত কাহিনীর শুরু। সেই সোনা, যে একমাত্র যুদ্ধই বোঝে, 'আগুন দিয়ে রাস্তা বানাতে চায়। সোনা, গোরা, বীরু, মধুরা এক সেলটারে অপেক্ষা করছিল ওদের নেতা এ বি (অশোক বোস)-র জন্যে। ওর আসতে দেরি হওয়া'য় গোরা ভেতরে ভেতরে উত্তেজিত হচ্ছিল। 'এ. বি-র সাথে আজকের মিটিংটায় একটা হেস্তনেস্ত হত।' অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরও এ. বি না আসায় ওরা বেরিয়ে পড়ে এবং পুলিশের মুখোমুখি হয়। সংঘর্ষে সোনা নিহত হোল। এ বি বলেছে, 'কমরেড…। সোনাই প্রথম নয়। তার আগে আমরা নন্টেকে হারিয়েছি। শাসকশ্রেণী তার গুণ্ডাবাহিনী নিয়ে সবত্রই আমাদের ওপর হামলে পড়েছে কারণ ওরা জানে এটা বিপ্লবী পার্টি…অ্যাকশন…খতম…বদলা। অ্যাকশন হল পার্টি লাইন, না মানলে পার্টি ছাড়তে হবে।' কিন্তু পার্টি-ক্যাডারদের মনে বোধহয় লাইন সম্পর্কে সংশয় ছিল, প্রতিবাদও যে ওঠেনি, এমন নয়। কিন্তু এ. বি জোর দিয়ে বলেছে, 'অ্যাকশন থেকে, স্ট্রাগল থেকেই জনতা শিক্ষালাভ করে।' কিন্তু

তেমন কোন অ্যাকশনের চিত্র এ-গ্রন্থে নেই। কুলি বস্তি, রেলওয়ে গ্যাঙম্যানদের ঝুপড়ি ইত্যাদি বারংবার এসেছে, তাদের মধ্যে থেকে দু-একটি মানুষ আন্দোলনের প্রসঙ্গে আভাষিত হয়েছে, কিন্তু সেও কেমন যেন বিচ্ছিন্নতায়। অবশ্য প্রায়শই বলা হয়েছে যে পুলিশ এদের বুকে 'রাইফেলের দানা' ছড়িয়ে দিয়েছে। অথবা 'পুলিশের সহিত সংঘর্ষে… ওরফে বাবু নিহত। এভাবেই আন্দোলনের পথে চলতে ওরা কেউ নিহত আর বাকিরা জেলে। আর জেলের ভেতরে বসেই ওরা শোনে 'পার্টির ভেতরের ভাঙনের খবর'। আর জেলা কমিটির সম্পাদক কঠোর মুখে বলেন, শোধনবাদী! শোধনবাদ নিপাত যাক।' শোনে বিট্রে করার খবর। 'এমনি কত যে গেরো পড়ে গ্যাছে জীবনে। আর তাই নিয়ে মজাসে হোহো হেসে সব ফাইল মাতিয়ে রেখেছে।' কারণ ওরা জানে জেল কমিউনিস্টদের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়। তবু মাঝে মধ্যে ঝিম্ নামে নিম-গাছটার বেঁকা ছায়ার মতো জেলখানার শেডের ওপর। তখন গোরা ভাসতে ভাসতে কোথায় যেন চলে যায়।'

এই 'কোথায় যেন চলে' যাওয়ার মধ্যবিত্ত ভাববিলাস হয়তো বাস্তবে এখনো বিদ্যমান আছে, কিন্তু ঘটনাটার এইপ্রকার প্রয়োগ যথাযোগ্য কিনা সে বিষয়ে আমার সংশয় আছে। তদুপরি শঙ্কর বসুর ভাষায়, যা মনে হয় কারুকর্মের জন্যে ইচ্ছাকৃত জটিলতা, কোন গণমুখী সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব ছিল, সে-বিষয়েও বিতর্কের অবকাশ থেকে যায়। সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'অকাল বোধন'(৬২) গল্পটি বিষয়ে যে প্রশ্নটি তোলেন তা সর্বাংশে প্রাসঙ্গিক: 'এই গল্পগুলির (স্পন্দন, ব্যারিকেড, নক্ষত্রের রোদ ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশিত গল্পাদি) মধ্যে একটি বিশেষ আঙ্গিক নজরে পড়ে, তা হোল কাটা কাটা ভাষা- প্রয়োগ (একটা শব্দে বা খুব কম সংখ্যার শব্দে বাক্য তৈরী করা, কি বা একটা বাক্যকে ভেঙে দিয়ে ছোট ছোট বাক্য তৈরী করা ইত্যাদি। 'অকাল বোধন' গল্পটিও এই অঙ্গের আওতায় পড়ে। এই আঙ্গিক প্রয়োগ করতে গিয়ে গল্পে মাঝে মাঝে দুবোধ্যতা এসে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, বর্তমান আলোচ্য গল্পেও তাই হয়েছে খানিকটা। ·· আলোচ্য গল্পটিতে, মনে হয়, গল্পকার যেন ধরেই নিয়েছেন যে পাঠককুল জেলখানার ভাষায় ও অবস্থার সঙ্গে ভালোভাবেই পরিচিত। জেলের বর্বর নির্যাতনের শিকার মঙ্গলের অবস্থা বুঝতে গিয়ে পাঠক যেখানে দেখছে যে, মাষ্টার এসে মঙ্গলের মুখের ওপর হুমাড় খেয়ে পড়েছে সেখানে কিন্তু বন্ধুর জন্যে মাষ্টারের অসহ্য নিপীড়নবোধ ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেছে, এই ভয়ঙ্কর অসহ্য অবস্থার সঙ্গে মাষ্টারের বন্ধুত্ববোধটা ভেতর থেকে এসেছে বলে মনে হয় না।

সুবলার সহমর্মীতা অনেক বাস্তবসম্মত, কিন্তু মাষ্টারের সেটা নয়। দুজনের মর্মবোধে তফাত থাকতেই পারে, কিন্তু মাষ্টারের মর্মবোধ অনেকটা যান্ত্রিকভাবে এসেছে। গল্পটিতে জেলের জীবন সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা গড়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও উপরোক্ত কারণগুলোতে বেশ খানিকটা নষ্ট হয়েছে। সর্বোপরি, গল্পের প্রারম্ভে রামায়ণের যে মিথটি (পুরাকল্প) ব্যবহার করা হয়েছে, গল্পের সঙ্গে তা একেবারেই খাপ খায়নি।…অথচ সারা গল্পটার মধ্যে যে মাল-মসলা লুকিয়ে ছিল, তাতে যথেষ্ট উঁচুমানের গল্প তৈরী হবার সম্ভাবনা ছিল।'(৬৫)

নবারুণ ভট্টাচার্যের 'খোঁচড়'(৬৬) গল্পটিতে চিত্রিত হয়েছে নকশালবাদী যুবক গৌতম বিশ্বাসকে পুলিশ কর্তৃক হত্যার কাহিনী। এই গৌতম বিশ্বাস 'অ্যাকশন না করলেও' ছিল 'ধোড়েল অর্গানাইজার'। অনেকদিন ফেরার। আই. বি অর্থাৎ খোঁচড় এসে থানায় খবর দেয় গৌতম স্থানীয় একটি জলসা শুনতে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ভ্যান ছোটে। জলসার মধ্যেই প্লেন ড্রেসে দুজন খোঁচড় পুলিশ অফিসারের পেছন পেছনে গিয়ে গৌতমের সামনে দাঁড়ায়। রিভলবারটা প্রায় পেটের সঙ্গে ঠেকিয়ে ট্রিগার টানে। গৌতম পড়ে যায়, কারো গায়ে বা পায়ে রক্ত ছিটকে লাগে। পুলিশ লাশ নিয়ে থানায় ফেরে। আসবার আগে জলসা চালাতে হুকুম করে, কারণ উদ্যোক্তরা তখন বলাবলি করছিল, 'এরকম একটা ব্যাপারের পর জলসা থামিয়ে দেওয়াই উচিত। কাজ মিটে গেলে থানা অফিসারকে বাড়ির দরজায় পৌছে দিতে গাড়ি যায়। এখন আর না গিয়ে উপায় নেই, কারণ এর আগের এস. আই সুধীর বোসকে, পাড়ায় কোন গণ্ডগোল না থাকা সত্ত্বেও, 'একদম বাড়ির চৌকাঠের সামনে চুপিয়ে দিয়ে' যায়। অফিসার বাড়ির কাছেই নামে। সেফটিটা সরিয়ে ট্রিগারে আঙুল রাখে। আর তখনি, 'বদলার একটা ছুরি চিৎকার করে ছিটকে যায়। ঝলসে ওঠে ফলা। পেছন থেকে একটা তীক্ষ্ণ আলো পাইপগানের উগরোনো গলা এক টুকরো সীসে হয়ে ছুটে আসে।…ও রিভলবারটা হাতে নিয়ে সাপের মত চারিদিকে তাকায়।' এখন তার সমগ্র অস্তিত্ব ভীত কৃমির মত কুঁচকে যায়। 'ভয়। মৃত্যুভয় তারা খসে পড়ার পর ভয়াবহ অন্ধকার বাতাসে শব্দহীন ঘাতক হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে আছে, চারিদিকে পায়ের শব্দে রাস্তা কাঁপিয়ে সংখ্যাতীত অশ্বারোহী প্রতিশোধ —খালি পায়ে দৌড়বার শব্দ…স্ট্যাবকেস…হালাল…নীল শার্ট আর পায়জামা পরা…মুখে রুমাল ও বাঁধা…গায়ে চাদর জড়িয়ে বোমা ধরে রাখার বিশেষ হাতের নিশানা…"আমরা নেবোই নেবো" বদলার শব্দ মর্গের ভ্যাপসা আলোয় . শ্মশানে ও প্রান্তরে…প্রতিহিংসার প্রতিধ্বনি বাড়ি খেয়ে ফেরে… ।'

নবারুণের এ-গল্পে নকশালবাদীদের শহরাঞ্চলীয় আন্দোলনের একটা যৌক্তিক পটভূমি মেলে। তথাকথিত বামপন্থীদের দ্বারা বহুনিন্দিত নকশালবাদীদের 'খতমের নীতি যে নিছক রক্তলোলুপতা নয় এবং 'শ্বেতসন্ত্রাসে'-র বিরুদ্ধে 'লাল-সন্ত্রাস'-ই, গল্পটি তারই প্রামাণিক।

অমল চক্রবর্তীর 'বাঘ'(৬৭) গল্পেও নকশালদের ওপর পুলিশী আক্রমণের এই চিত্রই প্রতিভাত। শহরে সার্কাস এলে শ্যামাকান্ত জোগাড় করা পাস নিয়ে বউ বিমলার সঙ্গে শো দেখতে গেল। অবশ্য আগ্রহটা ছিল বিমলারই। সব শেষে বাঘেব খেলা দেখে সে সত্যিই ভয় পেয়েছিল। বারবার মনে হয়েছিল, বাঘটা যদি এখুনি তাদেব ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এর দুদিনেব মাথায় ঘটনাটা ঘটে। খেলাশেষে খাচা নিয়ে যাবার সময় কি করে একটা বাঘ পালিয়ে যায়। তারপর সার্কাসেব লোকজন থেকে থানাব পুলিশ পর্যন্ত সারা শহবের আশপাশ খুঁজে খুঁজে হয়রান হোল এবং বাঘের সন্ধান পাওয়া গেল না। ফলে অঞ্চল জুড়ে নেমে এল ভয়। মাঝখানে একদিন বাঘটা একজনকে সত্যিই তুলে নিয়ে গেল। আর শ্যামাকান্ত তার থাবার ঘায়ে আহত হোল। 'সন্ধ্যে থেকে ভোর অবধি রাতের প্রতিটি মুহূর্তে এক প্রগৈতিহাসিক আদিম ভয়াবহতা থাবা গেড়ে বসলো'। এর মধ্যে একদিন বিমলাদের দরজায় ধাক্কা পড়ল। পুলিশের ধাক্কা। শ্যামাকান্ত দরজা খুলতেই পুলিশের লাথি খেল। ভাই পরিমল বেরিয়ে আসতে পুলিশ তাঁর মাথায় ভারি রুল কষালো এবং চ-কারন্ত, ব-কাবন্ত শব্দে গালাগালি করতে করতে থানায় নিয়ে চললো। শ্যামাকান্ত জানলো তার ভাই নকশালবাদী। বিমলার কথায় শ্যামাকান্ত সবাইকে ডাকতে বাইরে বেরিয়ে আসে। সব বাড়ি থেকেই তখন লোকেরা বেরিয়ে এসেছে। 'একমাত্র বাঘের ভয়ে কিছুক্ষণ আগেও ঘরে খিল এঁটে থাকা মানুষগুলো আব ভয় পেল না! স্বাধীন ভারতবর্ষের পঁচিশ বছবের খাঁচা খুলে লেলিয়ে দেওয়া বাঘের-চেয়েও-ভয়ঙ্কর একদঙ্গল জীবের আবির্ভাবে গোটা জায়গাটা যেন প্রচণ্ড নাড়া খেয়ে ঝিমুনি ভেঙে সটান হয়ে গেছে।'

দ্যুতিমান চ্যাটার্জীর 'অপ্রতিদ্বন্দ্বী' (৬৮) গল্পেও চিত্রিত হয়েছে নকশালবাদী বুলুর নিহত হওয়ার বিরুদ্ধে এক সামগ্রিক প্রতিবাদ। বুলুব নিহত হবার সংবাদ পেয়ে তাঁর দাদা সিদ্ধার্থ কলকাতায় আসে বালুরঘাট থেকে। এখানে এসে সে শুনলো যে বুলু আর তাঁর এক কমরেড মিন্টু শ্রমিক বস্তিতে থাকতো। পুলিশ সংবাদ পেয়ে সেখানে হানা দেয়। তাদের হাত থেকে পালাতে পারলেও, স্থানীয় এক নির্বাচনী অফিসের মাস্তানরা বুলুকে খুন করে রাস্তায় ফেলে যায়। মিন্টুর

বাবা সন্তোষবাবু সিদ্ধার্থকে বলছেন, 'আমি তো পাপ করেছি, পাপ। চুটিয়ে ইউনিয়ন করতাম, পার্টি করতাম, ভোটের জন্যে প্রাণপাত করতাম। এ পাড়ায় ভোটের জন্য আমাদের পার্টি ঢুকতে পারছিলো না, এই সব বাঘের বাচ্চাদের প্রেরণায় সবাই ভোটের বিরুদ্ধে। তাই, বেশ বুঝতে পারছিলাম, এদের খুন করার একটা পরিকল্পনা চলছিলো ঠাণ্ডা মাথায়।' সন্তোষবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে আসবার পথে সিদ্ধার্থ শোনে বিচ্ছুর কথা, 'বুলুদা ছিলেন আমাদের নেতা। আপনার মাকে বলবেন, এক বুলু গেছে, কিন্তু আমরা হাজার বুলু তৈরীই আছি। বুলুদার মৃত্যুর বদলা আমরা নেবোই।' শোনে সাবিত্রী ঝি-এর কথা, যারা বুলুদাদাবাবুর মত লোককেও খুন করতে পারে, তাদের ভোটের মুখে লাথি মাবি। সে দেখলো, দেয়ালের আলকাতরা মোছা লেখাটা তার সামনে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, 'নির্যাতন করে বিপ্লবের জোয়ারকে রোখা যায় না।' বাসে উঠেও সিদ্ধার্থ দেখলো মাওৎসে-তুঙের ছবি। আর তখনি 'মাও সেতুঙের ছবির ওপর ক্রমান্বয়ে ভেসে উঠতে লাগলো বুলু-রন্টু-বিন্দুর মুখগুলো। ছবিটার তলায় খুদে খুদে অক্ষরে লেখা: হাত দিয়ে বলো সূর্যের আলো রুধিতে পাবে কি কেউ? আমাদের মেরে ঠেকানো যাবে কি জনজোয়ারের ঢেউ?'

উক্ত গল্পটিতে কাহিনীর চেয়ে আবেগই প্রাধান্য পেয়েছে। পঠনকালে এ-আবেগ পাঠকের মনে কতটা সঞ্চারিত হ'তে পারবে, সে-বিষয়ে সংশয় থেকেই যায়। বুলু বা রন্টুর রাজনীতিক চরিত্র প্রায় অস্পষ্টই থাকে। হঠাৎ আলোচনার মধ্যে দিয়ে সিদ্ধার্থের রূপান্তর রাজনীতি সচেতন পাঠকের মন আবেগচঞ্চল করলেও, সে আবেগের স্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা কম। এ-মন্তব্য একইভাবে প্রযোজ্য বিকাশ গুপ্ত-র রিপোর্টাজ (৬৯) গল্পটি প্রসঙ্গে। নকশালবাদীরা কলকাতার দেয়ালে তখন স্লোগান লিখছেন আর পুলিশ চুনকাম করে মুছে দিচ্ছে অথবা লিখতে দেখলে ধরছে বা গুলি করে মারছে। এসময় এতদিন তাঁরা লিখছিলেন 'রাজনীতিকে অর্থনীতির আগে না রাখার মানে মার্ক্সবাদের অ-আ-ক-খ ভুলে যাওয়া—লেনি'। যারা লিখছিলেন, তারা লেখাটা শেষ করতে পারেননি। লেনিনের শেষ 'ন'-টা লেখা হয়নি। কারণ 'পুলিশ ভ্যানটা যখন দু-দুটো চোখ জেলে মইটাকে, ছেলেটাকে আর কবিতাটাকে ফুটফুটে আলোয় ভরিয়ে দিয়েছিল তখন ও শেষ 'ন'-টা লিখতে যাচ্ছিল। তারপর নিশ্চয়ই ছেলেটা গ্রেপ্তার? উহুঁ। কবিদের স্বভাবই এই যে কবিতা শেষ না ক'রে তারা নড়তে চায় না। তাই বন্দুক উঁচিয়ে উঠল। তাই প্রচণ্ড গর্জন করে নেমে আসতে বলা হল। তাই হঠাৎ দু'টো বন্দুকের নল চাঙ্গা হয়ে উঠল। নিশানায় নিপুণতা আনার

জন্য পুলিশ ক্যাম্পের মধ্যে বারবার অনুশীলনের মূল্য যে কতখানি বেশ বোঝা গেল।'

অন্যদিকে সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প 'মিছিলের জন্য মানুষ' (৭০) নকশালবাদী সুকুর নিহত হবার ঘটনাকে কেন্দ্র করে শহরে মধ্যবিত্ত জীবনের ভিত ধরে নাড়া দিয়েছে। আজ আর প্রেমিকা অতসীর সাথে খোলা মন নিয়ে কথা বলতে পারলো না সুগত। নিজেদের কথা বলতে গিয়ে বলে ফেলে, 'অতসী, আমাদের পাড়ায় একটা ছেলেকে থানার মধ্যে পিটিয়ে মেরে ফেলেছে।' ...ছেলেটাকে পরশু বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল—আমরা জানতাম।' ছেলেটাকে সুগত ভাল করেই জানতো, তবু সে থানায় যেতে পারেনি, কারণ চিহ্নিত হয়ে থাকার ভয়। তাছাড়া সে মধ্যবিত্ত ঘরের ভালো ছেলে। 'কোন পার্টিতে নেই'। অথচ সে বিশ্বাস করে ওঁদের ক্রোধটা সত্য এবং সে-ক্রোধের সেও অংশীদার। তারপর অন্যদিনের চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরে, যদি কোন গণ্ডগোল হয়। আর সুকুর শিক্ষক মহিম তখন অনুশোচনায় দগ্ধ হতে থাকেন। কারণ সুকুর বিরুদ্ধে ওরা যে অ্যাকশনের চার্জ এনেছিল, সেটা যখন ঘটে, তখন সুকু ওর কাছে পড়ছিল আর সে সত্যি কথাটা উনি গিয়ে পুলিশের কাছে বলতে পারেননি। মহিম ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিলেন, 'কিন্তু আমি তো ভয় পেয়েছিলাম সুগত, আমি তো সুকুর জন্যে কিছু করিনি'। এরপর একসময় অসিত এসে সুগতকে খবর দিয়েছিল, 'পোড়ানো হয়ে গেছে।' 'ওরাই ভ্যানে করে নিয়ে গেছে। সুকুর মাকে শুধু সঙ্গে যেতে দিয়েছিল।' সুগত জিজ্ঞেস করে, 'মিছিল হয়নি ?' 'নাঃ। পারমিশন দেয়নি।' একটু থেমে অসিত বললো, 'আর দিলেই বা কি লাভ হতো। লোক কই ? মিছিলের ?...'

সত্তর-বাহাত্তরের পটভূমিতে শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চরিত্র উদ্‌ঘাটনেই কেবলমাত্র নয়, উপস্থাপনার গুণেও গল্পটি সার্থক। সন্দীপ পাঠককে বারবার এনে দাঁড় করিয়েছেন আত্মজিজ্ঞাসার মুখোমুখি, যখন নকশালবাদীদের নির্বিচারে হত্যা করে শহরে রক্তের হোলিখেলা চলছিল, তখন তুমি তোমার কোন ভূমিকা পালন করেছো ? কেন মিছিলের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আত্মরক্ষার মধ্যবিত্ত তাড়নায় প্রত্যেকদিন নিজের রাজনৈতিক বিবেককে হত্যা করেছো ? পাঠকের মনে এই প্রশ্ন উত্থাপিত করাই তো আজকের একজন লেখকের সবচেয়ে বড়ো দায়িত্ব।

সুবিমল মিশ্র-র 'রক্ত' (৭১) গল্পটিতে চারজন রাজনৈতিক কর্মী নির্জন জায়গায় একটা পোড়ো বাড়িতে বসে কোন একজনের প্রতীক্ষা করছেন।

প্রতীক্ষা করতে করতেই তারা বারংবার তাদের প্রথম 'খতমের'র বিষয়টি নিয়ে কথা বলছে। রবিন হঠাৎই বলেছে, 'লোকটা পড়ে গিয়ে দু'হাতে মাটি আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করেছিল।' অথবা, 'গুলি করার আগে লোকটার মুখ দেখেছিল রবিন—ঠিক তার জেঠুর মতো। কেউ তাকে ধরতে পারেনি, নিরাপদে কাজ উদ্ধার করে সে চলে এসেছে, পার্টির সবাই বাহবা দিয়েছে। জেঠু পুজো করতেন। তাঁর ঘরে অনেক দেবাদেবীর ছবি ছিল। দুর্গার ছবি, কালীর ছবি, শিবের ছবি— দরজার একদিকে এতবড় নরকের ছবি। ভিন্ন ধরনের পাপের ভিন্ন ভিন্ন শাস্তি'। এইভাবে সারারাত ধরে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ায় চারজন নকশালবাদী কোন একজনের প্রতীক্ষা করে চলে।

গল্পটির আশ্চর্য ধোঁয়াটে বক্তব্য কোন চিন্তার দিক নির্দেশে সমর্থ নয়। নকশালবাদীরা কেউ যেন জানেই না কেন তারা খুন করেছে আর যেন তার পেছনে কোন রাজনীতি নেই। ফলে তারা দেশীয় নরক-চিত্রের পাপবোধে হাবুডুবু খেতে থাকে। এও এক ধরনের চরিত্র হননের প্রয়াস। 'শোধনবাদী' রাজনীতি ও চিন্তার বিরুদ্ধে নকশালবাদী রাজনীতি সুস্পষ্ট বক্তব্যকে নস্যাৎ করে কেবলমাত্র রক্তপাতের নেতিবাচক দিকটি প্রকাশের দ্বারা সুবিমল পূর্বোক্ত সন্দীপের গল্পে উদ্‌ঘাটিত নিজের মধ্যবিত্ত পলায়নী মনোবৃত্তিকেই প্রকট করে তুলেছেন।

অসীম চক্রবর্তীর গল্প 'রণক্ষেত্রে অস্ত্রহীন একা' (৭২) উক্ত মধ্যবিত্ত পলায়নী মনোবৃত্তির বিরুদ্ধেই এক সুতীব্র প্রতিবাদ। অসীম অবশ্য সহজ রীতিতে গল্প বলেন না; তাঁর কাহিনী বিস্তৃতি পায় প্রতীকী চরিত্রের রূপকাশ্রয়ী বিন্যাসে। এ-গল্পে বালকপ্রতিম যে ট্রেন থেকে নামে, তার পরনে নীলাভ উজ্জ্বল পোষাক, চোখ স্বপ্নময়; এই মানুষটি এদেশীয় নকশালবাদী আন্দোলনের এক নায়কের প্রতীক। তাই স্বাভাবিকভাবে 'সে দুনম্বর প্লাটফর্মে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে ওভার ব্রিজের নিচে লুকিয়ে থাকা একদল সশস্ত্র সৈন্য তার দিকে রাইফেল তুলে ধরে।' অথচ এই বালকপ্রতিমের ভালো লাগে পার্কের সবুজ ঘাস, লঘু বাতাসের হিল্লোল, সে বিভোর হয়, তখনো সৈন্যের দল তার দিকে বন্দুক তাক করে থাকে। তারপর সে ঢোকে বিখ্যাত এক বিশাল শিক্ষায়তনে, তিনজন শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলে; ঢোকে গীর্জায়, যেখানে সুমধুর সংগীত: 'এই পূর্ণ প্রভাতে প্রভু তোমারই নামে, মুখরিত এই ধরণী'; ঢোকে পান্থশালায়, কিন্তু পকেট শূন্য বলে তার খাওয়া হয় না, ফিরে আসে পার্কে, এখানে একটি সুন্দর মেয়েকে দেখে বসে থাকতে; সে সেই বিষণ্ণ করুণ মেয়েটার পাশে বসে; বলে, 'আমার যে তোমাকে ভীষণ ভালবাসতে

ইচ্ছে করছে,' মেয়েটি বলে, এখানে ভালবাসতে হলে যে অবলম্বন চাই'। সে মেয়েটির পথ ছেড়ে আবার পথে নামে। তখনো তার মনে সেই গীর্জার শোনা কথাগুলির অনুরণন, 'যাঞা কর তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে। অন্বেষণ কর পাইবে। দ্বারে আঘাত কর তোমাদের জন্য দ্বার খুলিয়া দেওয়া হইবে।' কিন্তু কার্যত দেখা গেল ছেলেটির সকল যাঞা ও অন্বেষণ ব্যর্থ হল। তখনো তার পেছনে সৈন্যরা রাইফেল তাক করে আছে। ছেলেটা কিন্তু ততক্ষণে বুঝে গেছে যে সমস্তই আছে, কিন্তু সে সমস্ত শুধু অন্য শ্রেণীর গুটিকয় মানুষের ভোগের জন্যে, তাদের জন্যে নয়। মধ্যবিত্তের তথাকথিত 'সুখী সুখী অস্তিত্বে'র আড়ালে যে ছেলেদের এতকাল ভুলিয়ে রাখা হয়েছিল ঔপনিবেশিক শিক্ষা আর কিছু ছুঁড়ে দেওয়া মাংসের আস্বাদ পাইয়ে, তারা এ-সত্যই উপলব্ধি করেছিল। 'ফলে ক্রুদ্ধ যুবকটি এবার গম্ভীর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। হ্যাঁ, সে পারে। কেননা ক্রমাগত বিশ্লেষণেই অন্ধকারের মত সংযমে দ্যুতিময় হীরকের জন্ম হয়, এবার সে দাবী করবে সবকিছু। প্রয়োজন হলে বন্ধ দ্বার ভেঙে ফেলবে। এ সিদ্ধান্ত তাকে অনমনীয় দৃঢ়তা যোগায়। সকল রকম অলিখিত অস্থিরতা দ্বন্দ্বসংঘাত ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যেও যেমন পাইন গাছ ক্রমে ঋজু ও টানটান হয়ে বেড়ে উঠে স্পর্শ করতে চায় প্রকৃত আকাশকে তার সকল তৃষ্ণা ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তেমনি সেও এবার সমুন্নত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ায়।" আর তখনি সৈন্যদের ওপর আদেশ আসে 'ফায়ার'। রাইফেলের গুলি বিদ্ধ করে ছেলেটিকে। ইতিহাস জানে এভাবে কত নিরস্ত্র তরুণকে শহরে-গ্রামে পুলিশ আর মাস্তানরা হত্যা করেছে! ছেলেটার 'দেহটা কাঁপতে থাকে রৌদ্রময় সবুজ ঘাসের ওপর। সকল জাগতিক বোধ থেকে মুক্তি পাওয়ার প্রাক্-মুহূর্তে সে অনুভব করে আবার কেউ যেন তাকে তুনম্বর প্লাটফর্ম থেকে একটি ট্রেনের দীর্ঘ অন্ধকার কামরায় তুলে দিচ্ছে আরেক দীর্ঘ অনিবার্য যাত্রার জন্য। চৈতন্য বিলুপ্তির এই শেষ মুহূর্তে সে বুঝে যায়, কোন নতুন স্টেষনে নামার সময় সশস্ত্র অবস্থায় প্রস্তুত হয়ে নামা আবশ্যক।'

নির্দেশিকা

(১) ছাত্র-যুবকদের কাছে পার্টির আহ্বান, দেশব্রতী, ২১শে আগস্ট, '৬৯
(২) Biplab Dasgupta, The Naxalite Movement, p. 69
(৩) ছাত্র-যুবকদের কাছে পার্টির আহ্বান।
(৪) যুব ও ছাত্র সমাজের প্রতি, দেশব্রতী, ২রা মে ১৯৬৮। কমরেড

চারু মজুমদারের সংগৃহীত রচনাবলী, কেন্দ্রীয় কমিটি, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কস্‌বাদী-লেনিনবাদী), ১৯৭৫ পৃঃ ঘ—৫
(৫) On the political-organisational report, Naxalbari and After, Vol. II, 1978, p. 295
(৬) Decleration of the Revolutionaries of the Communist Party of India (Marxist), Liberation, Vol. I, No. 2 December 1967, Naxalbari and After Vol. II p. 195-6.
(৭) পরিমলবাবুর রাজনীতি, কমরেড চারু মজুমদারের সংগৃহীত রচনাবলী, পৃঃ ঘ—৪৬
(৮) Liberation, December 1967.
(৯) যুব ও ছাত্রসমাজের প্রতি, দেশব্রতী, ২রা মে, ১৯৬৮। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ঘ—৫
(১০) পরিমলবাবুর রাজনীতি, পৃঃ ঘ—৪,৯-৫০
(১১) দেশব্রতী, ২১শে আগস্ট, '৬৯
(১২) শ্রমিকদের মধ্যে আমাদের পার্টির কাজ, দেশব্রতী, ১২ই মার্চ, '৭০
(১৩) শ্রমিকশ্রেণীকে তার গুরু ভূমিকা পালন করতে হবে, সম্পাদকীয়, দেশব্রতী, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, '৭০
(১৪) Ranjit Roy, From one crisis to another, Hindusthan Standard January 3, 1974
(১৫) Ranjit Roy, Crisis can and must be solved, Hindusthan Standard, August 15, 1973
(১৬) Myron Weiner, The Politics of Scarcity, Public Pressure and Political Response in India, 1962, pp. 90-92.
(১৭) Charu Majumdar, A Note on Party's Work in Urban Areas, Liberation, July 1971—January 1972, Vol. 5, No. 1, Naxalbari and After, Vol II, pp. 318-9
(১৮) বিপ্লবী ছাত্র ও যুবকদের প্রতি কয়েকটি কথা, দেশব্রতী, ৫ই মার্চ, ১৯৭০
(১৯) তদেব

(২০) রঞ্জন মিত্র, মার্কস্‌বাদ ও মূর্তিভাঙা, অনীক, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর-নভেম্বর (বিশেষ সংখ্যা) ১৯৭৮।

(২১) মূর্তিভাঙা প্রসঙ্গে (পুনর্মুদ্রিত), অনীক, পূর্বোক্ত সংখ্যা।

(২২) কৃষকের বিপ্লবী সংগ্রামের সাথে মিলিত হোন, (পুনর্মুদ্রণ) অনীক, পূর্বোক্ত সংখ্যা।

(২৩) Sankar Ghosh, The Naxalite Movement, pp. 115-6

(২৪) শ্রীকাকুলামের শহীদদের হত্যার বদলা নাও, দেশব্রতী, ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৭০

(২৫) The Present Party Line and a summing up of our experience, Bengal-Bihar-Orissa Boarder Region Committee of the CPI (ML).

(২৬) To The Police—CPI (ML)—Leaflet issued by the West Bengal State Committee of the CPI (ML), Quoted in Sankar Ghosh pp. 119-20.

(২৭) Sankar Ghosh, The Naxalite Movement, p. 125.

(২৮) চারু মজুমদার, 'নির্বাচন বয়কট করো' স্লোগানের আন্তর্জাতিক তাৎপর্য, দেশব্রতী, ২১শে নভেম্বর, ১৯৬৮।

(২৯) Sankar Ghosh, op. cit. pp. 127-8.

(৩০) Ibid p. 128.

(৩১) The Statesman, October 29, 1971.

(৩২) Sankar Ghosh, op. cit p. 192.

(৩৩) শরৎ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ১৯৭৯; প্রথম প্রকাশ, প্রসাদ শারদীয়,

(৩৪) আজকের লেখা : কি ও কেন, প্রস্তুতিপর্ব, শারদীয়া, ১৩৮৬।

(৩৫) প্রসাদ, (?)……

(৩৬) অমৃত, ২৯শে বৈশাখ, ১৩৭৯

(৩৭) অমৃত, শারদীয়া, ১৩৭৯

(৩৮) কথা সাহিত্য, পৌষ, ১৩৭৮

(৩৯) অমৃত, শারদীয়া, ১৩৮০

(৪০) সপ্তাহ, শারদীয়া, ১৯৭১

(৪১) প্রসাদ, শারদীয়, ১৯৭৫

(৪২) সপ্তাহ, ৮ জুলাই, ১৯৭৭

(৪৩) প্রথম প্রকাশ ? পুনর্মুদ্রণ

(৪৪) প্রথম প্রকাশ, প্রসাদ (?) ……। করুণা প্রকাশনী, কলকাতা ৯

(৪৫) মহাকালের সন্ত্রাস ও সন্তরের নির্ভীক জননী: সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাসের একটি দিক, অনীক, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর-নভেম্বর, ১৯৭৭

(৪৬) জেল থেকে মাকে, অজয় বসু রায়, সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, বর্ণনা, ১৯৭৭

(৪৭) The Statesman, July 22, 1971

(৪৮) আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা-৯, ১৯৭২

(৪৯) আনন্দ পাবলিশার্স ১৯৭৪

(৫০) মাসের প্রথম রবিবার বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা-৯, ১৯৭৮

(৫১) বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ১৯৭৮

(৫২) অসীম রায়, নৈতিক ঔচিত্যবোধ্য ও সৌন্দর্যবোধ, পরিচয়, ভাদ্র ১৩৭১

(৫৩) শারদীয় পরিচয়, ১৩৭৩, অসীম রায়ের গল্প, অধুনা, কলকাতা-১২ ১৯৭২

(৫৪) দেশ, ১৩ই মার্চ, ১৯৭১, পূর্বোক্ত গ্রন্থ

(৫৫) প্রাইমা পাবলিকেশনস, কলকাতা-৭, ১৯৭৩

(৫৬) দে'জ পাবলিশিং কলকাতা-৯ ১৭৯১

(৫৭) মহাপৃথিবী, বিশ্ববাণী, ১৯৭৪

(৫৮) আনন্দ পাবলিশার্স, ১৩৭৮

(৫৯) মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা-১২, ১৩৮৫

(৬০) আকাশের আয়না (৭), রবীন্দ্র লাইব্রেরী, কলকাতা-১২, ১৩৭৯

(৬১) স্পন্দনের গল্প, সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, স্পন্দন প্রকাশনী, কলকাতা-৩২, ১৯৭৮

(৬২) পত্রিকার দুনিয়ায়, দেশব্রতী, ২রা এপ্রিল, ১৯৭০

(৬৩) বর্ণনা, কলিকাতা-৯ ১৩৮২

(৬৪) ছাড়পত্র, প্রথম সংখ্যা

(৬৫) বিগত তিনটি সংখ্যার মূল্যায়ন, সম্মুখ, বিশেষ অক্টোবর বিপ্লব সংখ্যা, ১৯৭৩

(৬৬) সাহিত্যপত্র (?)

(৬৭) উত্তরযুগ, শারদীয়া, ১৯৭৩: দশ বছরের গল্প-কবিতা

(৬৮) দশ বছরের গল্প-কবিতা

(৬৯) গন্থ সাতাত্তর, প্রকাশক : রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায় ও আশীষ মুখোপাধ্যায়

(৭০) তদেব

(৭১) নাঙ্গা হাড় জেগে উঠছে, পাঠক সমবায়, কলকাতা-২৭, ১৯৭৪

(৭২) কবিপত্র, ১৯৭৭, মৌলিক স্বপ্নের উদ্যান, পরিবেশক : মডেল পাবলিশিং হাউস, কলকাতা-৭৩, ১৯৭৯

প্রথম অধ্যায়

॥ এক ॥

১৯৭২ সালের মধ্যে নকশালবাদী আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ের সমাপ্তি ঘটে। এ-বছরের জুন মাসে এক বিবৃতিতে চারু মজুমদার নিজেই বলেন, 'আমাদের দেশে সশস্ত্র সংগ্রাম একটা পর্যায়ে ওঠার পর আমরা ধাক্কা খেয়েছি। এই সময় আমাদের কাজ হোল পার্টিকে বাঁচিয়ে রাখা। পার্টিকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে ব্যাপক শ্রমিক কৃষক জনগণের মধ্যে পার্টি গঠন করতে হবে। রাজনীতিগতভাবে ঐক্যবদ্ধ পার্টি যদি আমরা গঠন করতে পারি, তবেই আমরা পারব ধাক্কা সামলিয়ে উঠতে, তবেই আমরা পারব সংগ্রামকে পূর্বের তুলনায় আরও উন্নত পর্যায়ে তুলতে।' (১)

আগস্ট ১৯৬৯-এ মেদিনীপুরের ডেবরা অঞ্চলে নকশালবাদীদের নেতৃত্বে যে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হয়, ১৯৭০-৭১ এ তা ছড়িয়ে পড়ে কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গের শহরাঞ্চলে, যার মূল বক্তব্য ছিল, 'শ্রেণী সংগ্রাম অর্থাৎ খতম অভিযান' চালিয়েই সমস্ত সমস্যার সমাধান। শহরাঞ্চলে এই সংগ্রাম চলার সময়েই ১৯৭০-এর মে মাসে সি. পি আই. (এম. এল) এর প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। এখানেও পূর্বোক্ত 'খতমে'র লাইনকেই, পার্টির রাজনৈতিক লাইন হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। বলা হয় যে, 'শ্রেণীসংগ্রাম অর্থাৎ এই খতমের লড়াই-ই আমাদের সামনের সমস্ত সমস্যাকে সমাধান করতে পারে ও লড়াইকে উচ্চতর স্তরে নিয়ে যেতে পারে, আমাদের জনগণের চেতনাকে উচ্চতর স্তরে তুলতে পারে, নতুন ধাঁচের মানুষের—মাও-সেতুং যুগের মানুষের, কষ্ট অথবা মৃত্যুকে ভয় করে না এমন মানুষের আবির্ভাবে উপযুক্ত অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে, গণফৌজ গড়ে তুলতে পারে এবং এইভাবে স্থায়ী ঘাঁটি এলাকা গঠনকে সুনিশ্চিত করতে পারে। খতমের লড়াই মানুষকে শুধু যে জমিদারশ্রেণীর ও তার রাষ্ট্রের নিপীড়ন থেকেই মুক্ত করে তাই নয়, পশ্চাদপদ ধ্যানধারণাগুলির বেড়ী থেকেও তাদের মুক্ত করে এবং তাদের মন থেকে স্বার্থবুদ্ধি, গোষ্ঠীস্বার্থ, স্থানীয় সংকীর্ণতা, জাতিভেদ, ধর্মীয় কুসংস্কার ইত্যাদি যত বিষাক্ত আগাছাগুলিকে দূর করে দেয়।' (২) সুশীতল রায়চৌধুরী এই নীতির সমালোচনা করে মধ্যপন্থী হিসেবে নিন্দিত হন। নকশালবাড়ির পরে পশ্চিমবাংলায় যে দুটি অঞ্চলে সি. পি. আই.

(এম. এল.)-এর আন্দোলন সর্বাধিক প্রসার লাভ করেছিল, সেই মেদিনীপুর ও বীরভূমের পার্টি নেতৃত্ব চারুবাবুর লাইনের বিরোধিতা করতে থাকে। ভাঙনের গতি তীব্রতর করে তোলে চীনা নেতৃবর্গের সমালোচনা।

এই সমালোচনায় চৌ এন লাই বলেছিলেন, 'প্রত্যেক দেশের সর্বহারা শ্রেণীকে তার নিজ দেশের মুক্তি আনতে হবে। কোন একটি দেশের নেতাকে অন্য দেশের নেতা হিসাবে ভাবা সেই জাতির ভাবনা-বিরোধী, শ্রমিকশ্রেণী এটা গ্রহণ করতে পারে না। একজন মহান মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নেতার প্রতি শ্রদ্ধা দেখান এক কথা, কিন্তু তাকে নিজ দেশের নেতা ভাবা সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। এটা একটা নীতির প্রশ্ন। চেয়ারম্যান বলেছেন, পার্টিকে অবশ্যই জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত হতে হবে। এই প্রসঙ্গে আমাদের সামনে দুটি প্রশ্ন আসে। (১) পার্টি একটি সংগ্রামী সংগঠন। (২) অগ্রবাহিনীকে অবশ্যই জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে। অন্যথায় বিফলতা আসবে। চেয়ারম্যানের স্বীয় নেতৃত্বে পরিচালিত সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় জনগণ মাও সে-তুঙ চিন্তাধারা আত্মস্থ করেন। অর্থাৎ ক্ষমতা দখলের পরও আমাদের গণ লাইন অনুসরণ করতে হয়। বুর্জোয়া তোষণকারী দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ (চেন-তু-সিউ) ও অন্য দিকে কৃষি বিপ্লবের পর্যায়ে তিনটি বাম সুবিধাবাদী লাইনই জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন। তারা কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় অগ্রবাহিনীর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল, জনগণের ওপর নয়। অর্থাৎ তাঁরা কষ্টসাধ্য কর্মসূচী অনুসরণ করেন নি। এক সময় আমি সাংহাই নগরে ছিলাম। সে সময় আমরা আচমকা সভা আহ্বান করতাম। মে দিবসের মতো উৎসবের দিনগুলিতে এসব করতাম। হঠাৎ আমরা নগরীর কর্মব্যস্ত অঞ্চলে জমায়েত এবং ইস্তাহার ও পত্র-পত্রিকা বিলি করতাম। প্রথম দিকে কিছু কিছু বেশি লোক জড় হতে, কিন্তু শেষে কেবলমাত্র কেডাররাই থাকতেন। যখন শাসকশ্রেণীর অত্যাচার (শ্বেতসন্ত্রাস) শুরু হয়, তখন আমরা ছোট ছোট দল গঠন করে প্রতিক্রিয়াশীল পুলিশ অফিসারদের খতম করতাম।...... গ্রামাঞ্চলে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা করার ব্যাপারে যেখানেই আমরা চেয়ারম্যানের চিন্তাধারার অনুসরণ করেছি সেখানেই আমরা সফল হয়েছি। আমরা গরীব চাষীদের ঐক্যবদ্ধ করে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালিত করেছি। জমি বণ্টন করেছি। তারা আগ্নেয়াস্ত্র কেড়ে নিয়েছেন এবং সব সময় বৃহত্তর জনতার উপর নির্ভর করেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তারা অত্যন্ত ঘৃণ্য জমিদার হত্যা করেছেন; কিন্তু জনগণের আদালতে উপযুক্ত বিচারের পরই তা করেছেন।

একমাত্র এইভাবেই কৃষক আন্দোলনে ঢেউয়ের মত ছড়িয়ে পড়েছে, গণফৌজ গঠন করা সম্ভব হয়েছে ও মুক্ত এলাকা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।...কিন্তু সবক্ষেত্রে সশস্ত্র সংগ্রামকে জনগণের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। প্রকাশ্যভাবে ভূমিনীতি ঘোষণা করতে হবে (আমাদের ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে পার্টির ভূমিনীতি রূপ নিয়েছিল) ১৯২৭ সালের পর অন্য রকম 'বাম' হঠকারিতার অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছিল। তাঁরা মুষ্টিমেয় অগ্রবাহিনীর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন, তাঁরা গ্রামে চলে গিয়েছিলেন ও জমিদার খতম করেছিলেন। অত্যন্ত অল্প সময়ের জন্য তাঁরা জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছিলেন। তাঁদের গণভিত্তি ছিল না। কারণ তাঁরা জনগণের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। মুষ্টিমেয় কয়েকজন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পালিয়ে বেড়িয়েছিলেন এবং সহজেই দমিত হয়েছেন। এই রকম সংগ্রাম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।' (৩)

কাং-সেন-এর বক্তব্য: '(১) আপনারা বলেছেন, "সংগ্রাম কেবল রাষ্ট্র-ক্ষমতার জন্য, জমির জন্য নয়।" আমরা মনে করি এটা পুরোপুরি সঠিক নয়।' (২) 'আপনাদের "শ্রেণীশত্রু খতমে"র তত্ত্বটি আমরা প্রথমে বুঝতে পারিনি। কেবলমাত্র ১৯৭০ সালের জুলাই মাসের 'লিবারেশন' পাওয়ার পর আমরা বুঝতে পারলাম যে ছোট ছোট দলের সাহায্যে গ্রামাঞ্চলে গোপন হত্যা চালানোই এর উদ্দেশ্য। কমরেড লিন পিয়াও যা বলেছেন 'শ্রেণীশত্রু খতমে'র তত্ত্ব তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। জুলাই মাসের 'লিবারেশনে'র রিপোর্ট থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে আপনাদের পদ্ধতি ১৯২৭ সালের পরাজয়ের পর চীনে যা করা হয়েছিল ঠিক তারই অনুরূপ। জনগণ থেকে গোপন যে জনগণের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা সুষ্ঠুভাবে বৃদ্ধি পায়নি তাদের থেকে গোপন ও পার্টি কমিটির থেকে গোপন গেরিলা সংগঠনের চরিত্র বদলে দিতে বাধ্য। গেরিলা যুদ্ধের নীতির সঙ্গে এটি অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। জনগণ ও পার্টি সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্কহীন এইরূপ গেরিলা সংগঠন অত্যন্ত বিপজ্জনক।...ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কে আপনাদের মনোভাব সঠিক ও কার্যকারী নয়। পার্টিসদস্যদের ট্রেড ইউনিয়নে কাজ করার ব্যাপারটির সঙ্গে নীতির প্রশ্ন জড়িত এবং এর পুনরালোচনা ও পুনর্বিবেচনা প্রয়োজন।...গেরিলা লড়াইয়ে মাঝারি কৃষকদের অংশগ্রহণ না করতে দেওয়ার নীতি ভুল।...আমাদের ধারণা হচ্ছে আপনারা এসবের কোন সমাধান খুঁজে পাননি। ও ব্যাপারে আমরা যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি তা হল, 'আমরা সশস্ত্র সংগ্রাম সংগঠিত করেছি, গেরিলা যুদ্ধ সংগঠিত করেছি এবং কৃষকদের জমি ও ঘরবাড়ির উপর অধিকার কায়েম করতে আহ্বান জানিয়েছি এবং এতে আমরা সাফল্য লাভ

করেছি, প্রথমত, আমাদের একটি ভূমিনীতি আছে এবং এই ভূমিনীতির সাহায্যেই জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলাম। তারপরই আমরা রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের লড়াই পরিচালনা করেছিলাম। আপনাদের অভিজ্ঞতা কম। সুতরাং আপনারা ক্রমান্বয়ে সমস্যাগুলির সমাধান করতে সক্ষম হবেন। আপনারা যদি জনগণের সাধারণ সমস্যাবলীর মধ্যে কাজে লেগে থাকেন তাহলে আপনারা বিশেষ নীতিগত সমস্যার সমাধানের সূত্র খুঁজে পাবেন। আমাদের সংগ্রামেও বিপর্যয় এসেছে।'(৪)

১৯৭৩ সালের মধ্যে একে একে সুনীতি ঘোষ, কানু সান্যাল, অসীম চ্যাটার্জী, খোকন মজুমদার প্রমুখ অনেকেই, জেলে ও জেলের বাইরে পার্টির পুরোনো লাইনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠলেন। ১৯৭৩-এর এপ্রিলে কানু সান্যাল, তাঁর 'মোর অ্যাবাউট নকশালবাড়ি' প্রসঙ্গে সরাসরি চারুবাবুকে আক্রমণ করে লিখেছেন যে, তাঁর আত্মবাদী অতি উৎসাহের রোগ তাঁর মধ্যে একটা ব্যক্তিগত ইগো এনে দিয়েছে। তিনি সচেতনভাবে অতীত ইতিহাসকে নস্যাৎ করতে চান এবং তা থেকে কোন শিক্ষা গ্রহণ করেননি। তিনি কোন বস্তুস্বাগতিক সত্যকে অনুধাবন করতে চাননি, ফলে তাঁর আত্মবাদী অতি উৎসাহ ও ইগো সব সময়েই নীতির ঊর্ধ্বে স্থান পেয়েছে। মার্ক্সবাদ লেনিনবাদ ও মাওৎসে-তুঙের চিন্তাধারা সবসময়েই এই শিক্ষা দিয়েছে যে আত্মবাদী ভাবনা সর্বদাই সুবিধাবাদ ও অ্যাডভেঞ্চারিজমের দিকে ঠেলে দেয়। কার্যত তাই ঘটছে। চারু মজুমদার চেয়েছিলেন এক নতুন ধরনের সন্ত্রাসবাদ সৃষ্টি করতে(৫), অসীম চ্যাটার্জীও যে এই ভাবনায় ভাবিত ছিলেন, তা তাঁর পরবর্তীকালের প্রবন্ধে(৬) স্পষ্ট। তিনি চারুবাবুকে একজন পেটি বুর্জোআ বিপ্লবী ছাড়া আর কিছুই ভাবতে রাজী নন। তার ব্যক্তিগত ধ্যানধারণা সর্বদাই মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-মাওৎসে-তুঙ চিন্তাধারার ঊর্ধ্বে স্থান পেয়েছে। বিপ্লবের চেয়ে ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার ইচ্ছাই ছিল তাঁর বেশি। এর ফলেই তিনি আমাদের দেশের প্রলেতারিয় আন্দোলনকে ধ্বংস করেছেন ইত্যাদি। অসীম চ্যাটার্জীর এই বিরোধী চিন্তার জন্ম বোধ হয় ১৯৭১ সালেই। ১৫ই মে, ১৯৭১-এ চারু মজুমদার তাঁকে চিঠিতে লেখেন, 'তোমাদের চিঠিতে স্পষ্ট করে বলা নেই কি সঠিক নীতি হওয়া উচিত। তা ছাড়া জাতীয় প্রশ্নে কি কি বিষয় তোমাদের ভাবিত করেছে তাও জানাও নি। এ সবগুলো তোমাদের লিখিতভাবে জানানো উচিত। তাহলেই কেবল রাজনৈতিক স্বচ্ছতা আসতে পারে এবং আলোচনা ফলপ্রসূ হতে পারে।'(৭) এর উত্তরে অসীম চ্যাটার্জীদের বোধহয় কোন সঠিক নীতিগত লাইন দেবার ছিল না।

অন্তত কোন তেমন নজির পাওয়া যায়নি। তাঁর পূর্বোক্ত লেখায়ও যথার্থ অর্থে তা খুঁজে পাওয়া যায় না। কানু সান্যাল নকশালবাড়ি সম্পর্কে আরো বক্তব্য উপস্থাপিত করেও কি কোন 'সঠিক নীতি'র পথ দেখাতে পেরেছেন? চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষে কাং-সেন কিন্তু বলেছিলেন, 'জনগণের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করুন, তাদের অভিজ্ঞতার সারসঙ্কলন করুন। ধাপে ধাপে সশস্ত্র শক্তির প্রতিষ্ঠা করে গোপন দলগুলির স্থলাভিষিক্ত করুন। আমরা বিশ্বাস করি কমরেড চারু মজুমদারের নেতৃত্বে আপনাদের ভবিষ্যৎ উজ্জল।'

ইতিপূর্বে (৪ নভেম্বর, ১৯৭২) জেল থেকে নকশালপন্থী ছ'জন নেতা (কানু সান্যাল, চৌধুরী তেজেশ্বর রাও, সৌরেন বসু, ডি. নাগভূষণম পট্টনায়ক, কোলা ভেঙ্কাইয়া এবং ডি. ভুবনমোহন পট্টনায়ক) যে এগারো দফা নীতি সম্বলিত বিবৃতি দেন(৮) তার মূল উদ্দেশ্য ছিল যে প্রত্যেক এলাকায় পার্টি সদস্যেরা তাঁদের সংগ্রামের পর্যালোচনা করবেন এবং সমগ্র পার্টিতে সে আলোচনা চালাতে হবে: 'বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ' নিবন্ধে আলোচিত নকশালবাড়ির পথের আলোকে নিজেদের ভুল-ত্রুটি সংশোধন করতে হবে; মহান চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির সঠিক পথ নির্দেশ মেনে নিয়ে এবং নতুনভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সশস্ত্র কৃষক সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এর কয়েকমাস পরেই (এপ্রিল, ১৯৭৩) কানু সান্যাল (উক্ত বিবৃতির প্রথম স্বাক্ষরকারী) 'মোর অ্যাবাউট নকশালবাড়ি প্রসঙ্গে পার্টির আভ্যন্তরীণ আলোচনার বিষয়টিকে বিকৃতভাবে জনসমক্ষে হাজির করে, তাঁদেরই মতে, কেবলমাত্র 'সংশোধনবাদী'দের যুক্তি ও আক্রমণকেই শক্তিশালী করেননি, সেইসঙ্গে প্রগতিশীল মধ্যবিত্ত চেতনাকেও প্রবল আঘাতের সামনে দাঁড় করিয়েছেন। কানু সান্যালের উক্ত প্রবন্ধের জবাবে কোলা ভেঙ্কাইয়া যথার্থই লেখেন যে উক্ত বিবৃতি যখন কমরেড চারু মজুমদার ও সেন্ট্রাল কমিটির কার্যাবলীর সমালোচনার পথ উন্মুক্ত করছে, এবং আত্মসমালোচনার দ্বারা পার্টির সঠিক নীতিনির্ধারণের ডাক দিয়েছে, তখনি কমরেড সান্যাল তাঁর প্রবন্ধে, পার্টির সুবিধাবাদী নীতি ও তার ব্যর্থতার সমস্ত দায়দায়িত্ব কমরেড চারু মজুমদারের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। কোন আত্মসমালোচনা না করে, এই প্রবন্ধে কমরেড চারু মজুমদার এবং অন্যান্য বহু মতাবলম্বী কমরেডদের বিরুদ্ধে অযৌক্তিক সমালোচনা করে তাঁদের শত্রু প্রতিপন্ন করা হোল। এবং নিজেও কোন সঠিক বক্তব্য উপস্থিত করতে পারলেন না। যখন ছ'জন কমরেডের বিবৃতি পার্টি সদস্যদের কাছে পার্টির অতীত কার্যক্রম সম্পর্কে দায়দায়িত্ব গ্রহণে ও ভুল-ভ্রান্তি থেকে শিক্ষাগ্রহণের দ্বারা সঠিক তথ্যের ওপরে দাঁড়িয়ে নতুনভাবে

ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানিয়েছিল, তখন উক্ত প্রবন্ধ তার দায়িত্বহীন সমালোচনার দ্বারা পার্টি কর্মীদের মধ্যে শত্রুতা ও অনৈক্য জাগিয়ে তুলেছে।(৯)

পরিণামে দেখা যায় যে ১৯৭৩ সালের মধ্যে সি. পি. আই (এম. এল) বহু উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। অবশ্য পশ্চিম বাংলার কানু সান্যাল, জঙ্গল সাঁওতাল, অসীম চ্যাটার্জি, অন্ধ্রের তেজেশ্বর রাও, উড়িষ্যার নাগভূষণ পট্টনায়ক কোন উপদলেই যোগ দেননি। এই উপদলগুলির মধ্যে প্রধানত উল্লেখযোগ্য হলো ছ'টি: (১) চারু মজুমদার-লিন পিয়াও-পন্থী, (২) লিন বিরোধী-চারুমজুমদার পন্থী, (৩) কেন্দ্রীয় কমিটি (সত্যনারায়ণ সিং গোষ্ঠী), (৪) কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কমিটি, (৫) ইউনিটি কমিটি এবং (৬) ইউ. সি. সি. আর আই. (এম-এল)। এতদ্‌ব্যতীত ছিল মাওবাদী কম্যুনিস্ট কেন্দ্র (এম. সি. পি); এরা নকশালবাড়ি আন্দোলনের সময় থেকেই স্বতন্ত্র দল হিসেবে কাজ করেছেন। প্রথম পর্যায়ে এদের পরিচিতি ছিল 'দক্ষিণদেশ গ্রুপ' হিসেবে। পরবর্তীকালে অবশ্য এদের মধ্যে নানাভাবে ঐক্যপ্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে বা হচ্ছে। 'প্রলেতারিয়ান পাথ' পত্রিকার মে-জুন ৭৫-সংখ্যায় লিখিত হয়; 'কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা এক গণবিপ্লবী লাইনের জন্য আপোসহীন লড়াই চালিয়ে এসেছে। নিদারুণ প্রতিবন্ধকতার সামনেও তারা সুদৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছে এবং অবশেষে সি. পি. আই (এম. এল)-এর নেতৃত্বের ও সাধারণ কর্মীদের একটি অংশসহ অন্যান্য বিপ্লবীদের তাদের সপক্ষে আনতে পেরেছে এবং তার ফলে বিপ্লবীরা আগের চাইতে অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ হয়েছে ও তাদের লাইন আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে আর দৃঢ় পদক্ষেপে তারা এগিয়ে যাচ্ছে। এর অর্থ এই নয় যে, এ ব্যাপারে সব কিছুই নির্ঝঞ্ঝাটে চলছে। অপরদিকে, পার্টি গঠনের জন্য সমস্ত বিপ্লবীদের ঐক্যসাধনের আগে অনেকগুলি প্রস্তুতি পদক্ষেপ নেওয়ার আছে। এই প্রক্রিয়ার অমূল্য ও প্রধান উপাদান হচ্ছে সি. পি. আই (এম-এল)-এর সকল উপগ্রুপ ও ব্যক্তির সমস্ত অংশকেই ঐক্যের ব্যাপারে সমগুরুত্ব দেওয়া। পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও যারা ঐক্য চায় তাদের সকলকেই কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা সম-মর্যাদায় গ্রহণ করে এবং তাদের আকাঙ্ক্ষার সততায় আস্থা স্থাপন করে। আলাপ-আলোচনায় ও কাজকর্মে কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা তাদের মৌল লাইনকে ভিত্তি করে, কিন্তু তবুও অন্যদের পেশকরা লাইনকেও তারা বন্ধুত্বপূর্ণভাবে আলোচনা করতে প্রস্তুত আছে—যাতে করে একটি সাধারণ বোঝাপড়ায় আসা যায় এবং অবশেষে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের একটি পার্টিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়া যায়। মৌলিকভাবে একটি সঠিক লাইন এবং তার সঙ্গে সংযুক্ত নীতিনিষ্ঠ মতাদর্শগত সংগ্রামই হচ্ছে ঐক্য গঠনের পথের প্রধান

উপাদান। এখানেই দুই লাইনের মৌলিক পার্থক্য নিহিত রয়েছে এবং এই সংগ্রাম ভবিষ্যতেও চলতে থাকবে। তাই, আমরা সমস্ত বিপ্লবী গ্রুপ ও ব্যক্তির কাছে আবেদন জানাই, একটি পার্টির মধ্যে সমস্ত বিপ্লবীদের ঐক্যবদ্ধ করবার ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে, আর ভেসে না বেড়িয়ে, দ্বিধাহীনভাবে তারা এগিয়ে আসুন।'(১০) 'দেশব্রতী' পত্রিকার মে-জুন, ৭৭-সংখ্যার আবেদনে বলা হয়: 'সি. পি. আই (এম-এল)-র নেতৃত্বে সংগ্রামের সার সঙ্কলন না করে কেবল কমরেড চারু মজুমদারের উপর দোষ চাপিয়ে পার্টির ভুলের সংশোধন করা যায় না। অথবা নেতৃত্ব সঠিক ছিল, লাইনে কোন ত্রুটি ছিল না, কেবল কর্মীবাহিনী ভুল করেছে, এইভাবে উদারতাবাদ ও সুবিধাবাদ করেও ভুলের সংশোধন করা যায় না। পার্টি—নেতৃত্বে সংগ্রামের সামগ্রিক মূল্যায়নের ভিত্তিতেই পার্টিকে পরবর্তী ধাপে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। আর একমাত্র এর ভিত্তিতেই অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক সারসংকলনের ভিত্তিতেই পার্টির ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্ব গড়ে তোলা সম্ভব। আসুন, ভারতের সশস্ত্র সংগ্রামের ঐতিহ্যবাহী, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ মাও ৎসে-তুঙ চিন্তাধারায় সচেতন নেতৃত্বদায়ী পার্টি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) র পতাকাতলে সমবেত হওয়ার আন্তরিক প্রচেষ্টা শুরু করি, একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার মার্কসবাদী-লেনিনবাদী প্রচেষ্টা শুরু করি।'

কিন্তু কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের এই ঐক্যসাধনের কাগুজে প্রস্তাবগুলি ক্রমশ সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড থেকে বিযুক্ত হয়ে বুদ্ধিজীবীদের আলোচনা ও বিতর্কের বিষয়ে রূপান্তরিত হচ্ছে। ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে এই ধরনের বিতর্ক এতদিনে বোধহয় একটা ঐতিহ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং যার সঙ্গে কাজের কোন সম্পর্ক কোনকালেই থাকেনি। আজকের কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের উপদল-গুলির মধ্যে মতাদর্শগত সংগ্রামের নামে বিতর্কে উক্ত ধারাই প্রবল হয়ে উঠছে। পরিণামে সম্ভবত এরা বিপ্লবী পার্টি হিসেবে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারবেন না। অবশ্য এঁদের মধ্যে লিন-বিরোধী চারু মজুমদার গ্রুপ এখনো সক্রিয় এবং মতাদর্শগত লড়াইও চালিয়ে যাচ্ছেন। সঠিক মত ও পথ কি, সে উত্তর ইতিহাসই দেবে এবং আমার বর্তমান গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়ও নয়। মুখ্যত সাহিত্যের প্রেক্ষিত হিসাবেই বিষয়টির উপস্থাপনা।

সি. পি. আই (এম-এল)-এর ভাঙন ও উপদলীয় কোন্দল সাধারণভাবে কেবলমাত্র সরাসরি পার্টি কর্মীদের ও সমর্থকদের মধ্যেই হতাশার সৃষ্টি করলো না, সেইসঙ্গে প্রতিক্রিয়ার শক্তিকেও বলীয়ান করে তুললো। ক্যাডারদের মধ্যে

পরস্পরের প্রতি দোষারোপ ও সন্দেহ মাথা চাড়া দিল। বিরুদ্ধবাদী লেখকরা ওটাকেই পাঠকের চোখের সামনে তুলে ধরলেন। উপদলীয় কোন্দল কোন কোন লেখার উপজীব্য হয়ে উঠলো। ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পলায়নী মনোবৃত্তির প্রবণতা লালিত হবার সুযোগ বৃদ্ধি পেল।

এই সন্দেহ-অবিশ্বাস মনে নিয়ে যাঁরা জেল থেকে বাইরে এলেন, তাঁদের মানসিকতায় বহু দ্বন্দ্ব তখন স্পষ্টতর। যে-কাজের ক্ষেত্র ছিল তাঁদের আকাঙ্ক্ষিত, যে-সংগঠন ছিল তাঁদের স্বপ্ন, সেখানে তখন বহু পরিবর্তন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সরকারী হস্তক্ষেপে আন্দোলনেব বিশেষ স্থানগুলোতে বাহ্যিক পরিবর্তন ঘটানোর চেষ্টা চলেছে। যে-মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে তাঁরা এসেছিলেন, তাদের আর্থনীতিক বনিয়াদ তখন আরো ধসে গিয়েছে। শঙ্কর সেনগুপ্ত-র গল্পে (ফিরে এসে নব্বুই দিন পরে) (১১) এই অবস্থার বর্ণনা লক্ষণীয় : সুকুমার 'সাত বছর পরে বাড়ি ফিরে এলাকায় যথেষ্ট পরিবর্তন লক্ষ্য করছে। পুরনো দোকানপাট নেই। প্রায় সব ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। একশো কুড়ি ফুট চওড়া রাস্তা হয়েছে—মার্কারি জ্বলছে। প্রচুর নূতন বাড়ি—খালি জমিগুলিতে নূতন নূতন সুন্দর বাড়ি—নূতন নূতন মানুষের মুখ। হরিপদ-এর চায়ের দোকানটা উঠে গিয়ে একটা সুন্দর ছিমছাম মাংসের দোকান হয়েছে ; পাঁঠা, মুরগী এমন কি শূয়োরের মাংসও পাওয়া যায়। সুকুমার অবাক— এ-পাড়ায় শূয়োরের মাংস খাবার লোকও নিশ্চয়ই যথেষ্ট এসেছে। অথচ এই হরিপদ এর চায়ের দোকানটা কতবার রেইড হয়েছে। হরিপদকেও মাসছয়েক জেল খাটতে হয়েছিল। সুকুমার শুনেছে ছ'মাস জেল খেটে এসে হরিপদ কোথায় চলে গেছে—কেউ জানে না। ননীদার ঘড়ির দোকানটা ঠিকই আছে। নরেনের মিষ্টির দোকানটাও আছে ; তবে অসংখ্য নূতন দোকান—নূতন কাপড়ের দোকান, রেডিওর দোকান, মেয়েদের জামাকাপড় তৈরী করারও একটা দোকান—যেটা এদিকে একটাও ছিল না। একটা ঝকঝকে রেস্টুরেন্ট, সবগুলিরই একটা পস্ গেট আপ, গ্রন্থপীঠ বইএর দোকানটা আছে, তবে বন্ধ। ওটা ছিল অমিয়দার—অনেক কষ্টে চালাতেন। দেখা হতে সুকুমার জিজ্ঞেস করেছিল—বন্ধ কেন ? অমিয়দা ভীষণ কষ্টে আছে বোঝা গেল। চোখের জল আটকাতে পারলেন না : বন্ধ করেই রেখেছি সুকু—এ পাড়ায় আজকাল কেউ বই কেনে না। সেই তোরা চলে গেলি—এ পাড়ায় অনেক কিছুই জোর করে বদলে দে ‘য়া হলো। ওই একটা ম্যাগাজিনের স্টল হয়েছে—ওদেরই কিছু বিক্রি আছে। সুকুমার আর কিছু জিজ্ঞেস করেনি। সেই স্টলটা ও দেখেছে। যেসব ম্যাগাজিন সাজিয়ে ও ঝুলিয়ে রেখেছে—ডেবোনার,

সানডে, স্টারডাস্ট—সুকুমার ভাবে—পাড়ায় আজকাল এসবেরই কাটতি। অমিয়দার দোকান বন্ধ করে রাখার কারণটা ও বুঝেছিল। সুকুমারে মনে হয়—পরিবর্তনের একটা আলগা ছাপ বাইরে থেকে দেবার চেষ্টা, কিন্তু ভেতরে সমস্তটা মনে হয় পুরনোই।'

তদুপরি কাজের কোন তাৎক্ষণিক ক্ষেত্র না থাকায়, নেতাদের প্রাগুক্ত বিতর্কের ফলে শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যে স্বাভাবিক হতাশার প্রবণতা, তার দ্বারা সরাসরি আক্রান্ত এই পার্টি কর্মীরা পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ উপস্থিত করেছেন এবং নিজেরা এক নিশ্চিন্ত আশ্রয় খুঁজতে সচেষ্ট হয়ে পড়েছেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'পায়ের তলার মাটি'-তে (১২) এ-বিষয়ক একটি চিত্রণ এইপ্রকার; জেল থেকে ফিরে এসে নকশালবাদী দ্বারিক নতুন করে কাজ আরম্ভ করার কথা ভাবছে। সে বলছে, 'আমি আর একটা জিনিস নতুনভাবে অনুভব করছি কিছুদিন থেকে। আমবা কুসংস্কার বা ধর্মীয় গোঁড়ামিতে কখনো আঘাত দিইনি। অথচ সেগুলো দূর না কবলে কি দেশের মানুষের মন পরিবর্তন করা যাবে? সবাই ভাগ্য মেনে বসে আছে। ধর্মের আসল অস্তিত্ব কিছু নেই। শুধু কতকগুলো সংস্কারে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা সবাই। তোরা কি ভাবতে পারিস যে এখনো লোকে বিশ্বাস করে, নরবলি দিলেই তবে কুয়ো থেকে জল উঠবে। চবণামৃত খাবার জন্য লোকে এখনো মন্দিরের সামনে লাইন লাগায়। একটা ফিয়ার সাইকসিস, একটা সার্বজনীন ভয় যেন দেশটার ওপর চেপে বসে আছে। ভূতপ্রেতের ভয়, ঠাকুর দেবতার ভয়, পুলিশের ভয়, পাপের ভয়, জাত যাবার ভয়, এর সঙ্গে আছে জোতদার মহাজনকে ভয় পাওয়া, গভর্নমেন্টেব লোকদের ভয় পাওয়া—নিরীহ নিরীহ লোক কোনো দোষ করে নি, তবু সব সময় একটা ভীতু ভীতু ভাব—এইসব দূর করার জন্য আমরা কোনো চেষ্টা করিনি, আগেই কোনো কাজ হয়নি—তোদের কি মনে হয় না, এখান থেকেই আমাদেব কাজ শুরু করা উচিত?

সুটুর ঠোঁটে একটা সূক্ষ্ম হাসি ফুটে উঠলো, তার মনে হলো, দ্বাবিকদা এখন বিপজ্জনক রাজনীতি ছেড়ে সোশ্যাল ওয়ার্কার সাজতে চাইছেন। সুবিধাবাদী ফাঁকা আইডিয়ালিস্টদের যেটা একটা সময় কাটাবার ছল।

দ্বারিক ভেবেছিল, সবাই তার কথা মন দিয়ে শুনছে। তার গলার আওয়াজে অনেকখানি আবেগ এসে গিয়েছিল। হঠাৎ রবি দুম করে একটা অন্য কথা বললো।

—আচ্ছা দ্বারিকদা, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি। ভুতো কি শেষ দিকে পুলিশের স্পাই হয়ে গিয়েছিল?

এই ভুতো অবশ্য ইতিমধ্যেই পুলিশের হাতে নিহত হয়ে তার রাজনৈতিক সততার প্রমাণ দিয়েছে। পারস্পরিক সন্দেহের রাজনীতি তখন অবশ্য সুদূর গ্রামাঞ্চলেও ব্যাপ্ত। অমর মিত্র-র গল্প 'জীবন-বেত্তান্ত'তে(১৩) এ-বিষয়ক চিত্রণ এই প্রকার: 'নব সোরেন মঙ্গলকে তীক্ষ্ণ চোখে দেখে। এই বেটা কানাইশোর যায় কী করতে। কীসের মানত। তার গাঁয়ের লোক পয়সা দিয়ে খাস জমি পেয়েছে। মঙ্গলও। এই বেটা পয়সা পেল কোত্থেকে। সেটা বড় রহস্য। এমনি তো হাড়হাবাতে মরা গরীব। টাকা পেল কোত্থেকে মঙ্গল সোরেন। এক কালের লড়াকু মানুষ। একেবারে বদলে গেল ক'বছরে। দিনরাতের মত বদল। অথচ এককালে এই মঙ্গল সোরেনই না বড় নেতা। গরীব পাট্টির গরীব নেতা। বাবু নেতারা উহারে কমোরিট বলে। খাস দখল নিতে টাঙ্গি নিয়ে মঙ্গল সোরেন সবার আগে যায়। পুলুস আসলে জঙ্গলে পালায়, আবার বেরিয়ে আসে। তারপর একদিন মৌজা ভর্তি হয়ে গেল মিলিটারিতে। মঙ্গল পালাল। কেউ গেল জেহেলে কেউ নাকে খত দিয়ে পুরনো মজুরীতে। সে এক আন্ধার ডোবার দিন।

মঙ্গল সোরেন সেই ভাগল। গাঁ ঘর তখন খাঁ খাঁ ডাহি জমির মত। তারপর দু'বছর কাটলে গুটিগুটি ফিরে এল গাঁয়ে। মরার মত চেহারা। কেউ কান দেয় না। বিড়বিড় বকে, পাগল হওয়ার উপক্রম।

তারপরই ভোজবাজি। সেটা বড় রহস্য নবর কাছে। বদ মানুষে ত'সিলদার বাবুকে ধরে জমিন পায়, মঙ্গল পেল কী করে। দু'বিঘে জমিতে ত'সিলদারবাবু নির্ঘাত শ'টাকা, পেল কী করে এই পুরনো দাগী। ত'সিলদার তো রাজা। গোবর্ধন হাটুই, ত'সিলদারবাবু, জমিজমা সামান্য কিন্তু মানুষটা যেন রাক্ষস! এতখানি হাঁ। তখন গরীব পাট্টির খোঁজ নই। খোঁজ আছে ঝাড়গাঁ আর মেদিনীপুরের জেহেলে। এই ফাঁকে গাঁয়ে গাঁয়ে রব উঠেছে খাস জমিন বিলির। বিলির মজা অনেক। এই সময়ে ত'সিলদার তার পাকা ঘরখানা কমপিলিট ক'রে ফেলে। জমিনের লোভে সবাই টাকা পয়সা উজাড় করে দেয় ত'সিলদারের পায়ে। একেবারে দালাল বদ মানুষ হয়ে গেল সব। যেমন এই মঙ্গল সোরেন। কিন্তু কী ভাবে হ'ল তা নবর কাছে রহস্য। দালালি করেছিল নিশ্চিত।

নব, মঙ্গলের দিকে তাকায়। মানত করেছে কানাইশোর দেবতার কাছে, তাহলে আরো ধান্দা। আরো জমিন গুছিয়ে নেবে ত'সিলদারের কাছ থেকে। নাকি কুনো পুরনো কমোরিটকে জেহেলে ঢুকাবে। ঠিক তাই হয়েছে, বেটা

পুলুসের দালাল। সেই দালালির টকায় জমিন নিইছে। সরকারের উবগার করিছে তাই জমিন পাইছে। গা ঘিনঘিন করে মঙ্গলকে দেখলে।'

অথচ মঙ্গল পুলিশের দালাল ছিল না। যা ছিল তা হোল সমস্ত চাষীদের মত জমির ক্ষুধা। তাই সে জেল থেকে বেরিয়ে আসা কমরেড বুড়ন সাঁওতালকে বলে, 'বন্ধু, সি লড়ায়ে তু জেহেলে গেল, মুর জমিনের ক্ষুধা গেল না, মু খাসুয়া হই জমিন পাইলাম বন্ধু, মানুষে জানে না হে, অপরিশন করি জমি পাইলাম শ' টাকা দিয়া।'

কার্যত, যে সমস্ত পার্টি-ক্যাডাররা শহর থেকে গ্রামে গিয়েছিলেন, তারা কেউই প্রায় তাদের শহুরে মধ্যবিত্ত মানসিকতা বা অবস্থান থেকে কিছুমাত্র বেরিয়ে আসতে না পারার ফলে, গ্রামে গিয়ে তারা কৃষকদের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার পরিবর্তে কৃষকদেরই তারা শিক্ষা দেবার আপ্রাণ প্রয়াসে মেতে উঠেন। ফলে ওরা কোনদিন তাদের একজন হয়ে উঠতে পারেন নি, রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা তো অনেক দূরের কথা। স্বভাবতই পুলিস যখন গ্রামাঞ্চলে আক্রমণ চালায়, তখন তারা শহরেই ফিরে আসতে বাধ্য হলেন। এবং ক্রমে এভাবেই তাঁরাও শহরকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত রাজনীতির শিকার হলেন। জেল থেকে বাইরে এসে তাঁরা স্বাভাবিক প্রবণতায় কেউ বা ট্রাডিশনাল শহুরে রাজনীতিক বিতর্কের শরিক হিসেবে নিজের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখতে চাইলেন, কেউ বা, একদা তাঁদের নামাঙ্কিত 'সংশোধনবাদী' বা 'নয়া সংশোধনাবাদী'দের দিকে হাত বাড়ালেন, অথবা কেউ বা একান্তভাবে অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে সাংসারিক হিসেবী জীবনযাত্রাকেই শ্রেয় বলে মেনে নিলেন। যে কৃষিবিপ্লবের প্রাথমিক অঙ্গীকারে নকশালবাড়ির জন্ম ও বিকাশ, সেই মূল কেন্দ্রে ফিরে যাওয়া বা আন্দোলন সংগঠিত করার কথা না ভেবে এই মধ্যশ্রেণীর বিপ্লবীদের বৃহৎ অংশ শহুরে রাজনীতিক বিতর্কের মধ্যে আত্মগোপনই শ্রেয় বলে নিশ্চিন্ত রইলেন। মহাশ্বেতা দেবী তো যথার্থই লেখেন, 'রক্তাক্ত এ দশকের কারণ তো আসলে নিহিত গরীব চাষী-ক্ষেত-মজতুর-বর্গাদার-আদিবাসী-জঙ্গলজীবী-বর্ণধর্ম-নির্বিশেষে এদের উপর নির্লজ্জ শোষণে, যা আজও আছে অব্যাহত। তার কারণ তো নিহিত বর্ণজাতিধর্ম নির্বিশেষে পরিপূর্ণ সেকুলোর উদারতায় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার যেভাবে ভারতের নয়া জমিদার এই জোতদারদের মদত দিয়ে থাকে সৈন্যে-পুলিশে-হুকুমবরদারিতে-ঢালাও বন্দুক প্রদানে—তার মধ্যে।...শিক্ষিত ছেলেরা জেলে গেল, নিহত হল, নির্যাতন সইল, তাতে সংগ্রাম ফুরায়? আমার একমাত্র বিশ্বাস, যা আমাকে প্রবল

প্রতিকূলতার মুখেও নিজের মধ্যে ধরে রাখে, তা হল—সংগ্রাম কখনও ফুরায় না। সংগ্রাম যেখানে চলবার, চলছে। তা দমনের কাজও আছে অব্যাহত।'(১৪) এই বৃহত্তর শোষিত মানুষের সংগ্রাম সরাসরি সংযুক্ত না হয়ে, বিপ্লবের কার্যক্রম বিষয়ে তত্ত্বগত লড়াইয়ের এক শৌখিন মধ্যবিত্ত রাজনীতিক প্রবণতাই আজ ক্রমশ ব্যাপ্ত হচ্ছে। অবশ্য সৌভাগ্য যে অন্যদিকে এর বিপরীত ধারাও বর্তমান এবং তা কিছুমাত্র অবহেলার যোগ্য নয়।

সি. পি. আই (এম. এল.)-এর ১১ই জুন, ১৯৭৮ তারিখে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশনের আলোচনায় বিষয়টি স্পষ্টত বিবৃত হয়েছে: 'বিগত দশ বছরের লড়াই এবং ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে এই শিক্ষায় আমাদের পার্টি এসে পৌঁছেছে যে শ্রদ্ধেয় নেতার রাজনীতি হোলো ভারতবর্ষের মাটিতে কমরেড লিনের জনযুদ্ধের তত্ত্বের প্রয়োগ। এই প্রয়োগ করতে গেলে বহু বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হতে হয়, বহু রং বেরং-এর সংশোধনবাদী চক্রান্তের বিরুদ্ধে লড়তে হয়, লড়তে হয় নিজেদের সংশোধনবাদী চিন্তার বিরুদ্ধে। আমাদের সফলতা যেমন আমাদের প্রেরণা জোগাচ্ছে, তেমনি ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে আমরা শিখেছি, আমাদের কঠিন সময়গুলোতে আমরা আমাদের কৃতকার্যের কথা ভুলে যাই, আসল লক্ষ্য বস্তু থেকে সরে দাঁড়াই, লক্ষ্যকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে রাখতে পারি না, জনগণ সম্পর্কে সঠিক ধ্যানধারণার অভাবের ফলে কখনও দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি কখনও বামপন্থী বিচ্যুতিতে ভুগি, জনগণ থেকে বিচ্ছিন্নতার জন্য কখনও সংগ্রাম বিমুখিনতা, কখনও বা সমরবাদের খপ্পরে পড়ি, সংগ্রামের স্তর সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা না থাকার ফলে সংশোধনবাদের খপ্পরে পড়ি, লড়াইয়ের একস্তরে। যে রণনীতি-রণকৌশল প্রযোজ্য, বিকশিত স্তরে, সেই রণনীতি রণকৌশল প্রয়োগ করতে গিয়ে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্নতা আরও বাড়ে, সংশোধনবাদী, অর্থনীতিবাদী চোরাগলির মধ্যে ঘুরপাক খেয়ে মরি, জনগণের সংগ্রামী মেজাজকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারি না, হতাশার সংশয়ের শিকার হই। এই সংশোধনবাদী আক্রমণ কখনও ডান দিকে কখনও বাঁ দিকে তথাকথিত বামপন্থী বুলির আড়ালেও আসতে পারে, তাই কেন্দ্রীয় কর্তব্য নির্ধারণ করতে গেলে সংগ্রামের স্তর সম্পর্কে পরিষ্কার ধ্যানধারণা ছাড়া, সঠিক রূপায়ণ ছাড়া সঠিক লক্ষ্যে আমরা পৌঁছুতে পারব না।'(১৫)

উপরোক্ত প্রেক্ষিত স্মরণ রেখেই বর্তমান পর্যায়ের উপন্যাস-গল্পগুলির আলোচনা কর্তব্য।

॥ দুই ॥

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'পায়ের তলার মাটি'-তে নকশালবাদী দ্বারিক জেল থেকে বেরিয়ে সোজা চলে আসে তার গ্রামে। সেখানে স্কুলে শিক্ষকতার চাকরি নেয়। বাড়িতে তখন মা আর প্রায় উন্মাদ বাবা। ছোট ভাই স্বদেশ (ভূতো)-এর কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। এ সময় তাদের বাড়িতে অকস্মাৎ একদিন এসে হাজির হয় বীথি—স্বদেশের স্ত্রী। কেউই তাদের বিয়ের কথা জানতেন না। তবু তারা বীথিকে মেনে নেন। গ্রামের রাস্তায় ইতিমধ্যে একদিন পাওয়া যায় একটা ক্ষতবিক্ষত মুণ্ড। এর আগেই গ্রামের একটা কিশোর হারিয়ে গিয়েছিল। সুতরাং গ্রামের সকলেই ধরে নিল যে ওটা সেই কিশোর বিটুরই মুণ্ডু এবং দ্বারিকই তার হত্যাকারী। কারণ দ্বারিকরাই আগে হত্যার রাজনীতি চালিয়েছে। তদুপরি দ্বারিকদের ব্রাহ্মণ পরিবারে শূদ্রকন্যা বীথির বউ হয়ে আসাতে গ্রামসমাজে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এরপর নতুন যারা জেল থেকে বেরিয়ে আসে (সুখময়, তুটু, রবি, অনন্ত এবং রাজেন) তাদের মনে তখন নানা সংশয়, নানা জিজ্ঞাসা। অনন্ত বলেছে, চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান স্লোগান দেওয়া ভুল হয়েছিল, রবি বলেছে আমরা জনসাধারণের কনফিডেন্স নিইনি, গোড়া থেকে আমরা আণ্ডারগ্রাউণ্ড পার্টি হয়ে গেলাম, অন্য জন বলেছে. আমাদের কাজের মধ্যে কোন কো-অর্ডিনেশন ছিল না, ইত্যাদি। 'ভুল সম্পর্কে ওরা ওদের মতামত জানাতে লাগলো তীব্র ভাষায়, খুব মনোযোগ দিয়ে শুনলো দ্বারিক। সদ্য জেল থেকে বেরিয়েছে বলে ওদের গলায় রয়েছে অভিমানের সুর। নইলে যতগুলো ভুলের কথা ওরা বলছে, তার সব কটাই ভুল ছিল না। সার্থক না হওয়া মানে পথটা ভুল নয়। অভিজ্ঞতার অভাবে ভুল হয়। পাঁচবার সাতবার এ রকম ব্যর্থ হলেও পথটা ঠিক রাখা যায়। যারা ঘন ঘন পথ বা মত বদলায় তাদের দিয়ে কোনো কাজই হয় না।' এদিকে গ্রামীণ রক্ষণশীলেরা কিন্তু দ্বারিকদের পরিবারের পেছনে লেগেই থাকে। একদিন ওদের ঘরে আগুনও দেয়। সেটা থানায় জানাতে গিয়ে উল্টে দ্বারিককেই পুলিশ আটকে রাখে নরবলির গুজব সত্য ভেবে। অবশ্য বিটুকে পুলিশ খুঁজে পাওয়ায় সে ছাড়া পায়। এরপর এক সন্ধেবেলায় বেড়াতে বেরিয়ে বীথি আক্রান্ত হয়। অবশ্য এর আগেই বীথি ঠিক করেছিল বহরমপুর ফিরে যাবে। বীথি দ্বারিককেও

বলে ওর সঙ্গে যাবার জন্তে। কিন্তু সে রাজী হয়নি। কারণ তার কর্মক্ষেত্র এখানেই। সে ভাবে, 'স্বাস্থ্যটা এবার ভাল করে নিতেই হবে। সামনেই আসছে কঠোর গ্রীষ্ম, শরীর ভালো না থাকলে সে যুঝতে পারবে না। জলের ভাগ বাঁটোয়ারা কিম্বা ধান কাটার সময় ঝামেলা বাধবেই। দ্বারিকের সামনে এখন অনেক কাজ। এই তার গ্রাম, এখানে সে জন্মেছে, জেল থেকে সে এখানেই ফিরে এসেছে। এখানে যদি সে হেরে যায়, এখান থেকে যদি তাকে পালিয়ে যেতে হয়, তা হলে অন্য কোনো জায়গায়, অন্য কোনো বৃহত্তর জয়েরও কোনো মূল্য থাকবে না।'

দ্বারিক গ্রামের ছেলে, জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সে গ্রামেই ফিরেছে, যেখানে সামন্ততান্ত্রিক শোষণব্যবস্থা এবং তজ্জনিত সংস্কারগুলি পূর্বের মতই একইভাবে বিদ্যমান। এবং জীবনধারার সঙ্গে কাজের মাধ্যমে জড়িয়ে থাকার ফলে দ্বারিকেরা কখনও শহুরে মধ্যবিত্তের হতাশায় আক্রান্ত হয় না অথবা তা ঢাকবার জন্তে কাজের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন তত্ত্বের ঝড় তোলে না, অথবা দ্বিধাহীন চিত্তে ভাবতে পারে যে অতীতের সবটাই ভুল ছিল না, একবার ব্যর্থ হলেই তত্ত্বটা বাতিল করা চলে না।

অন্যদিকে শঙ্কর সেনগুপ্তের 'ফিরে এসে নব্বুই দিন পরে' গল্পের সুকুমার জেল থেকে ফিরে এসে শহরে নিজের মধ্যবিত্ত পারিবারিক জীবনের মধ্যেই বাঁধা পড়ে। সে স্বাভাবিকভাবেই দিনের পর দিন দেখতে থাকে মা ছাড়া, প্রায় প্রত্যেক ভাইবোন-বাবার নির্মম অবহেলা ও কশাঘাত। 'নানারকম মন্তব্য ওর কানে ভেসে আসে—দাদাগিরি ফলাতে এসেছেন—সাত বছর জেলের ভাত খেয়ে এখন ভাইদের সহবত শিক্ষা দিতে এসেছেন—আরো অনেক অনেক কিছু। কোথায় সুকুমারের কোন কোন বন্ধু বিপ্লব করা ছেড়ে কোথায় কোথায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার ফিরিস্তি।...তিনমাস হলো এসেছে সুকুমার। আসার কয়েকটা দিন পর থেকেই লক্ষ্য করছে—সবকিছু থেকে ওকে আলাদা করা। একমাত্র মা ...' এই মা-ই একমাত্র বলেছেন, 'সুকু; যাতে তুই শান্তি পাস, তাই কর।' এই সুকুমার কিন্তু কিছুই করে না। অন্তত গল্পে তার কোন হদিস নেই। মাঝে মাঝে বেরুবার জন্তে মার কাছে টাকা চায়। আর এই টাকা চাওয়া নিয়ে একদিন বাবা মাকে বলেন, তোমার বিপ্লবী ছেলেকে জিজ্ঞেস করো বিপ্লব করতে যাবার আগে ঘরে কটা টাকা রেখে গেসলো যে টাকা চায়।' আর তখন সুকুমারের একমাত্র জেলে তার ওপর পুলিশের অত্যাচারের কথাটা মনে পড়ে। আশ্চর্য, একটি বৃহৎ আন্দোলনের আর কোন কথাই তার মনে পড়ে না।

আর তখন 'একটা যন্ত্রণা সুকুমারের শরীরে দ্রুত ছড়ায়।' খুবই স্বাভাবিক। মধ্যবিত্ত শ্রেণীচেতনার মধ্যে আবদ্ধ একজন একদা বিপ্লবী' এ-পথেই প্রতিক্রিয়ার হাত শক্ত করতে এগিয়ে যায়।

তন্ময় শিকদারের 'সেতুবন্ধন'(১৬) গল্পে একদা বিপ্লবী অমিতাভ ও শালিনীর বিয়ে করা, অধ্যাপনার চাকরি নিয়ে মোটামুটি সচ্ছল জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠা এবং অবশেষে অমিতাভ-র ভাই অরিন্দম আসায় তাদের নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ জীবনের আবার ঝড় ওঠার কাহিনী ব্যক্ত হয়। অরিন্দম একদা নকশালবাদীদের আজকের ভূমিকার সমালোচনায় বলেছে, আজকে যারা পার্টির বামপন্থী বিচ্যুতি নিয়ে তীব্র বাদানুবাদ তুলেছে, তারা কি বিপ্লবকে যে কোন দিক থেকে অস্বীকার করে নিজেদের বিপ্লবী ইমেজ এবং আজকের নিরাপদ অবস্থান একসাথে টিকিয়ে রাখার দলে নয়? এই ধর না কেন তোমার কথা। একসময় এগিয়ে গিয়েছিলে অনেকটা। ফিরে এসে বিয়ে করেছ। স্বভাবতই অনিশ্চয়তা ও বিপদপূর্ণ জীবনযাপন থেকে ফিরে বছরখানেক হল নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ জীবন কাটাচ্ছ। এ ধরনের নিরুদ্বেগ জীবনের একটা নির্লিপ্ত আচ্ছন্নতা আছে মানো তো। কাজ করতে গিয়ে তুমি তো দেখেছ প্রচণ্ড দারিদ্র্যে মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও ভূমিহীন চাষী মাথা তোলার বদলে কেমন উদ্বেগহীন, অলসভাবে বলেন 'ভগবান এই দিচ্ছেন'। তো স্বাভাবিকভাবেই তুমি বা তোমাদের মত যারা আছেন তারা কোন লাইন গ্রহণ করবেন বা বর্জন করবেন, তা অনেকখানিই নির্ভর করবে তোমরা তোমাদের এই আপাত-নিরাপদ নিরুদ্বেগ উদ্দেশ্যহীন জীবনকে কতটা ভালবাসছ বা ঘৃণা করছ তার উপর। আমি বিশ্বাস করি, শহরের ভালো ভালো কলেজ থেকে পাতিবুর্জোয়া রোমান্টিক মানসিকতাসম্পন্ন ছেলেদের গ্রামে নিয়ে গিয়ে দুটো হত্যা করানোর পর পুলিশের চাপে এলাকা ছেড়ে দিয়ে এধার ওধার ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়ানো ও পরে শহরে ফিরে এলে আর যাই হোক পার্টির লাইনের সমালোচনা করার যোগ্যতা অর্জন করা যায় না।' দু'ভাইয়ের মধ্যে এবম্প্রকার রাজনীতিক আলোচনা চলতে থাকে। অমিতাভ-র সানমাইকা ঢাকা ডাইনিং টেবিল, গ্যাস, বসার ঘরে স্টিরিও, রাশি রাশি বই কেনা, ইত্যাদি নিয়েও খোঁচা দেয় অরিন্দম। অমিতাভ ক্রমে দুর্বল অসহায় হয়ে পড়েছে। আত্মরক্ষার জন্যে ধোঁয়াটে বক্তব্য রেখেছে: 'চারিদিকেই তো দেখছি ধ্বংসাবশেষ। কিসের ওপর দাঁড়িয়ে, কার ওপর দাঁড়িয়ে আমি এই উদ্দেশ্যহীন জীবনের বিরুদ্ধে সাঁতার কাটবো বলতে পারিস। একদিকে রয়েছিস তোরা এখনও বামপন্থী বিচ্যুতিতে ভুগছিস, আর অন্যদিকে দক্ষিণপন্থার সুস্পষ্ট আবহাওয়া।' আর অরিন্দমের

সঙ্গে কথা বলতে বলতেই সে অনুভব করতে থাকে, সর্বক্ষেত্রেই তাদের 'ব্যক্তিগত পরাজয়' ঘটে যাচ্ছে। কথাটা আরো স্পষ্ট হয়ে যায় অরিন্দমের জবাবে, 'ফিরে এসে নতুনভাবে ভাবনা চিন্তা করা অবশ্যই পরাজয় নয়, কিন্তু ফিরে এসে পার্টির ইতিবাচক দিকগুলোকে অস্বীকার করা এবং নিজের স্থবিরতা বা এলোমেলো চলাফেরার স্বপক্ষে হাস্যকর যুক্তি তুলে পার্টির ঐতিহ্যকে ম্লান করার চেষ্টা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত পরাজয় বললে কমই বলা হয়—এ এক নিন্দনীয় প্রবণতা, যার বিরুদ্ধে প্রত্যেক বিপ্লবী কর্মীকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে বলে আমরা মনে করি।'

অরিন্দমের সে রাতেই চলে যাবার কথা ছিল। ভোরেই তাকে একটা জায়গায় পৌঁছতে হবে। শালিনী বাধা দিয়েছিল। কথা ছিল ভোর চারটেয় তাকে তুলে দেওয়া হবে। কিন্তু ভোর হবার আগেই অরিন্দমকে ধরতে পুলিশ এলো। ধরা দেবার আগে অরিন্দম অমিতাভ শালিনীর হাতে তুলে দিল একটা প্যাকেট—কেন্দ্রীয় রাজনীতিক কমিটির খসড়া দলিল। শালিনী তাকে রাতে চলে যেতে না দিয়ে ভুল করেছে, এ-কথা বলে কান্নায় ভেঙে পড়েছে। আর তখনি অমিতাভ বলেছে, অরু তো কতদিন বলেছে তোমায়, মানুষ, মানুষই পারে একমাত্র ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে সঠিক পথের দিকে এগিয়ে যেতে। অরুই তো বলেছে, মানুষের হাজার বছরের ইতিহাস ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে সত্যের দিকে, বিজয়ের দিকে এগিয়ে যাবার ইতিহাস। শালিন, ভুল যদি হয়েই থাকে, তবে কি আমরা শুধু কান্নায় ভেঙে পড়ে অনুশোচনা করবো?…কে বলতে পারে শালিন, তোমার এই ভুলের ভেতর থেকেই হয়ত আবার আমরা নতুন করে বেঁচে উঠলাম।' এভাবেই সম্ভবত একজন মধ্যবিত্ত মানুষ তার সাময়িক হতাশা কাটিয়ে, শ্রেণীচরিত্রের বদল ঘটিয়ে বিপ্লবের সঠিক পথ '-র্ণয়ের ও সংগ্রামের অংশীদার হয়।

নির্দেশিকা

(১) জনগণের স্বার্থই পার্টির স্বার্থ, ৯ই জুন, ১৯৭২, কমরেড চারু মজুমদারের সংগৃহীত রচনাবলী, পৃঃ ছ-৭৯

(২) প্রথম পার্টি কংগ্রেসের রাজনৈতিক-সাংগঠনিক রিপোর্ট, তদেব, পৃঃ পরিশিষ্ট ক-১৫

(৩) সংস্কৃতি, অক্টোবর-নভেম্বর, ১৯৭৪ (বদরুদ্দীন উমর সম্পাদিত);

(৪) ১৯৭৪ সালে সি. পি. আই (এম. এল) এর প্রতিনিধিরূপে সৌরেন বসু চীনে যান। সেখানে তিনি চীনা পার্টির সঙ্গে ভারতীয় রাজনীতি ও পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। এই আলাপ-আলোচনা শেষে চীনা পার্টির পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন চৌ এন লাই এবং কাং সেন। চীন থেকে প্রত্যাবর্তনের পর পার্টি সম্পাদক চারু মজুমদারের হাতে নোট দুটি দেন। বর্তমান উদ্ধৃতি-দুটি উক্ত নোট থেকে নেওয়া হয়েছে।

(৫) Naxalbari and After, Vol. II, p. 342.

(৬) Hold High the Genuine Lessons of Naxalbari, (30 November, 1975) Ibid, Vol II p. 392

(৭) খোকনের (অসীম চট্টোপাধ্যায়) চিঠির জবাব, কমরেড চারু মজুমদারের সংগৃহীত রচনাবলী, পৃঃ ছ-২৮

(৮) Frontier, November 4, 1972 , Naxalbari and After, Vol. II, pp. 322-6.

(৯) New Controversies in the name of 'More About Naxalbari', Ibid, p. 352.

(১০) লালতারা, ৭ই জুন, ১৯৭৫ঃ

(১১) অনুষ্টুপ, শারদীয় সংখ্যা, ১৯৭৮

(১২) বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ১৯৭৮

(১৩) অনুক্ত. বৈশাখ-আশ্বিন ১৩৮৫

(১৪) আজকের লেখা কি ও কেন, প্রস্তুতিপর্ব, শারদীয়া, ১৩৮৬

(১৫) দেশব্রতী, জুলাই, ৭৮-সংখ্যা,

(১৬) অনীক, নভেম্বর ও ডিসেম্বর, ১৯৭৯

নির্ঘণ্ট